মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support".

— Subhas Chandra Bose

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

— সুভাষচন্দ্র বসু

Price : Rs. 150.00

(NSOU-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয় **)**

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector - I, Salt Lake, Kolkata - 700 064 and
Printed at Classic Print & Process, 20B, Sankharitola Street, Kolkata-700014, Phone : 2264-2911

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

PGBG

PAPER 5

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

PGBG

PAPER 5

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপরকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্র নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশকিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

প্রথম পুনর্মুদ্রণ : জুন, 2017

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী ও অর্থানুকুল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission

পরিচিতি

বিষয় ঃ বাংলা **স্নাতকোত্তর পাঠক্রম**

পাঠক্রম : পর্যায়

PGBG-05 : 1—4

পর্যায় : 1 (প্রবন্ধ সাহিত্য)

রচনা	সম্পাদনা
ড. বারিদবরণ চক্রবর্তী ড. অলোক চক্রবর্তী	অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত

পর্যায় : 2 (শৈলীবিজ্ঞান)

রচনা	সম্পাদনা
অধ্যাপক আশিসকুমার দে	অধ্যাপক স্বপনকুমার ব্যানার্জী

পর্যায় : 3 (প্রবন্ধসাহিত্য)

রচনা	সম্পাদনা
ড. শান্তনু সরকার	ড. মননকুমার মণ্ডল

পর্যায় : 4 (প্রবন্ধ সাহিত্য)

রচনা	সম্পাদনা
অপর্ণা দাস	ড. মননকুমার মণ্ডল

পুনর্বিন্যাস, পরিমার্জন ও সম্পাদনা :

ড. মননকুমার মণ্ডল
এসোসিয়েট প্রফেসর, স্কুল অফ হিউম্যানিটিস্

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PGBG - 5

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

পর্যায় : 1

একক 1 সাম্য ❑ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **9-24**

একক 2 কৌতুক হাস্য; কৌতুক হাস্যের মাত্রা ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **25-39**

একক 3 সুখ না দুঃখ? সৌন্দর্যবুদ্ধি ❑ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী **40-58**

পর্যায় : 2

একক 1 শৈলীবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব **61-94**

একক 2 কবিতার শৈলীবিচার **95-106**

একক 3 গদ্যের শৈলী **107-119**

একক 4 ছোটোগল্পের শৈলী **120-129**

একক 5 উপন্যাসের শৈলীবিচার **130-160**

পর্যায় : 3

একক 1 ভেজাল ও নকল ❑ রাজশেখর বসু **175-183**

একক 2 রূপকথা ❑ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় **184-192**

একক 3 জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ❑ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় **193-203**

একক 4 গল্পের গাঁটছড়া ❑ সুকুমার সেন **204-216**

পর্যায় : 4

একক 1 সংস্কৃতির সংজ্ঞা ❑ গোপাল হালদার **219-246**

একক 2 বাংলার রেনেসাঁস ❑ আবদুল ওদুদ **247-308**

একক 3 উত্তরতিরিশ ❑ বুদ্ধদেব বসু **309-348**

বাংলা (পঞ্চম পত্র)

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পর্যায় ঃ ১

একক — ১ - ৩

একক ১ ❑ সাম্য ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১.১ বঙ্কিমচন্দ্রের মনোজগৎ ও সময়-দেশ-কাল

১.২ গ্রন্থ-প্রস্তাবনা ও গ্রন্থ-পরিচিতি

১.৩ রচনার প্রেক্ষাপট

১.৪ 'সাম্য' : নিবিড় পাঠ

১.৫ বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

১.৬ বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যভাবনার মূলকথা

১.১ ❑ বঙ্কিমচন্দ্রের মনোজগৎ ও সময়-দেশ-কাল

বাংলা সাহিত্যের সচেতন পাঠকের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের "সাম্য" রচনাটি আজও একটি উদ্যত জিজ্ঞাসা হয়েই আছে। কেন-ই বা লিখতে গেলেন? আবার কেন-ই বা লিখেও পরবর্তী মুদ্রণের সময় প্রত্যাহার করে নিলেন? অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রমথনাথ বিশীর মতো সমালোচকেরা এর উত্তর যদিও দিয়েছেন, ভাষাগত হেরফের থাকলেও তাঁদের মূল বক্তব্য সাম্যগত তত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্রের আগের বিশ্বাস আর ছিলনা, 'গীতা, মহাভারত ও কৃষ্ণের প্রভাবে' পূর্বের প্রবন্ধটি তাই অবাঞ্ছিত মনে হয়েছে। একপেশে সরলীকৃত এই ব্যাখ্যার পাশাপাশি আর এক ধরণের স্থূল অগভীর আলোচনা আছে, যেখানে বঙ্কিমচন্দ্রকে ভীরু-পলাতক রূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ফলত প্রশ্নটি আজও সম্যক্‌রূপে আলোচিত হয়নি—অথচ প্রশ্নটি সরল নয় জটিল,—বহুমাত্রিক; তত্ত্বগত কারণে 'সাম্য'কে বঙ্কিমচন্দ্র যদি পুনর্মুদ্রণের অযোগ্য বলেই মনে করে থাকেন, তবে মূল সাম্য গ্রন্থভুক্ত 'বঙ্গদেশের কৃষক' বিস্তারিতভাবে পরবর্তীকালে প্রকাশ করলেন কেন? সমাজস্থ অসাম্যজনিত দুঃখকষ্ট যন্ত্রণার উদ্‌গার কেন করলেন কমলাকান্তের 'বিড়াল'-এ, 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী'-তে হাল্কা হাসিমস্করা দিয়েও সে যন্ত্রণার টুঁটি টিপে ধরতে পারলেন না কেন? সমাজবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণ নিয়ে দেখলে সহজেই বোঝা যায়, চলতিকালে ব্যক্তিকে বহুধা-ব্যক্তিত্ব নিয়েই চলতে হয় (multipersonality), চিন্তার জগতের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের ছোটবড় দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে, কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হলে সেই দ্বন্দ্বই প্রকট হয়ে ওঠে, প্রতিভাসিত হয় আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপে। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে 'সাম্য' পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেও পরবর্তীকালে প্রত্যাহার করে নেয়ার পেছনে বঙ্কিমচন্দ্র কী তেমন কোন নিজস্ব সংঘাতের মুখোমুখি হয়েছিলেন? প্রশ্নটির আদ্যন্ত আলোচনাই সমীচীন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' রচনা করতে গেলেন কেন? এক কথায় এর উত্তরে বলা যায়, তৎকালীন বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মনন-চিন্তনের পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা, দেশের অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতই বঙ্কিমচন্দ্রকে বাধ্য করেছিল এই জাতীয় রচনায়,—"সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। জল উপরিস্থ বায়ু এবং নিম্নস্থ পৃথিবীর অবস্থানুসারে, কতকগুলি অসংখ্য নিয়মের অধীন হইয়া, কোথাও বাষ্প, কোথাও বৃষ্টিবিন্দু, কোথাও শিশির, কোথাও হিমকণা বা বরফ, কোথাও কুজ্‌ঝটিকারূপে পরিণত হয়। তেমনি সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়।" (বিদ্যাপতি ও জয়দেব) তৎকালীন বাংলার সারস্বত-সামাজিক পরিমণ্ডলই ছিল সাম্যচিন্তায় পরিপূর্ণ, এ বিষয়ে পথিকৃৎ হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন ডিরোজিও এবং ডিরোজিও শিষ্যরাই; নীলচাষের পটভূমিকায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করে, সরকারী চাকরিতে ভারতীয় বিনিয়োগের দাবি তুলে, সরকারের বিচারপদ্ধতির

সমালোচনা করে সাম্যভিত্তিক মানবতাবোধের প্রতিই তাঁরা তর্জনী নির্দেশ করেছিলেন,—একটি একটি অগ্নিক্ষরা লেখা লিখে চলেছিলেন 'ইন্ডিয়া গেজেট', 'দি কুইন', 'দি পার্থেনন', 'হিন্দু পাওনিয়ার' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায়—'Freedom', 'Colonisation of India,' 'India under Foreigners'। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা তো রীতিমত হয়ে ওঠে চাঞ্চল্যকর, সোচ্চারে লিখে চলেন,—সাম্য মানুষের জন্মগত অধিকার, জন্মকালে এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের কোন পার্থক্যই থাকে না,—পৃথকীকরণ করা হয় পরবর্তী সময়ে স্বার্থে, সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনে; রামগোপাল ঘোষও 'কালা আইন' আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়ে হৃৎকম্প ধরিয়ে দেন কোম্পানীর কর্মকর্তাদের। রাজনৈতিক চিন্তায় ও সমাজ সংস্কারের পরিকল্পনায় সাম্যনির্ভর বিভিন্ন খবরাখবর নিয়ত নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করে চলে,—দ্বিতীয়-তৃতীয় সংস্কার আইন ইংলন্ডে লিপিবদ্ধ হচ্ছে, 'Third Republic' প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ফ্রান্সে, আমেরিকার শাসনতন্ত্রও বেশী করে গণতন্ত্রমুখী হচ্ছে;—দশদিক থেকে ঝড়ো বাতাস শুধু উড়িয়ে আনতে থাকে মানুষের অধিকার স্বীকৃতির সংবাদ (History of Political Thought Vol. I : Biwan Behari Majumder, P. 116-117)—'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার মত পত্রিকাতেও পূর্ববঙ্গের বিপ্লবী নেতা টিপুপাগলের সাম্যদর্শী মতবাদের প্রসঙ্গে এসে পড়ে লুই ব্ল্যাঙ্কের তুলনা;—লুই ব্ল্যাঙ্ক তো 'Young Bengal'-এর কাছে স্বপ্ননায়ক হয়ে ওঠেন,—তিনি সোচ্চারে মানুষের অধিকারের কথা বলছেন, রাজতন্ত্র ভেঙে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব নিয়ে চলেছেন, তখন কলকাতার শিক্ষিত যুবকদের হাতে হাতে ঘুরছে পতাকার মত তাঁর গ্রন্থ 'Letters on England' (1866), 'Observation on Economic, Political and Social Life in England' (1867), অনিবার্যভাবেই ১৮৭০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিজ্ঞানের (Political Economy) সাম্মানিক পরীক্ষায় (Honour Examination) প্রশ্ন করা হচ্ছে "What is the aim of Communism? Describe the Schemes profounded by Fourier and St. Simon respectively". এই রকম পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বলতম বুদ্ধিজীবী বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাজগত সাম্যচিন্তায় যদি না উদ্রিক্ত হতো, তাহলেই বিস্মিত হতে হতো।

সাম্যরচনার পশ্চাৎপর্বে বহিরঙ্গের এই তাগিদটা ছাড়াও কার্যকর হয়েছিল অন্তর্গত একটি দাহ,—দেশকে আবিষ্কার করার প্রয়াস, দেশের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞানটি খুঁজে নেবার প্রাণগত উৎকণ্ঠা,—'এই জীবন লইয়া কি করিব?' এই উৎকণ্ঠার কথা বলতে গেলে অবশ্যই সংযুক্ত করে নিতে হয় আরো কিছু কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের নাম, যাঁরা ইংরেজি সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিশ্বরূপ ও ন্যায়াদর্শের সর্বভূমিনতা দেখে আহ্লাদিত হয়েও কিছুদিনের অভিজ্ঞতার মধ্যে বুঝেছিলেন তথাকথিত এই সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে দেশীয় অধিবাসীদের সুখদুঃখের, দারিদ্র্য দূরীকরণের কোন সম্পর্ক নেই; প্যারীচাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, শিশির কুমার ঘোষ প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা চাষীর দুরবস্থা, খেতমজুর ও গ্রামবাসীদের দুঃসহ জীবনকথা প্রতিবেদনের মধ্যে দিয়ে সেই প্রশ্নকেই তুলে ধরলেন, শ্রমিকদের স্বার্থে অনুরূপ ভাবনা-চিন্তায় রচনা সমৃদ্ধ করে এগিয়ে এলেন শশিপদ ব্যানার্জী, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষক সমাজের করুণজীবনের সার্থক চিত্র তুলে ধরলেন লালবিহারী দে, রমেশচন্দ্র দত্ত। চিন্তাভাবনায় এঁরা যে সবাই একস্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তা নয়, তাহলেও সবাই মোটামুটি বুঝতে পেরেছিলেন ইংরেজদের চলতি কর্মকান্ড এদেশের শিল্পায়নের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে চায়, কৃষককে করতে চায় তার জাতীয় ধনভাণ্ডার পূর্ণ করবার জন্য নিযুক্ত কৃষি-মজুর মাত্র। দক্ষিণারঞ্জন-রামগোপাল-রাধানাথ দে-র চেতনায় এই বোধ গুঞ্জন তুললেও, তা ছিল মূলত অধ্যয়ন-পঠন-পাঠনের হাওয়াতেই ভাসন্ত, এঁদের মত সংবেদনময়, দৃঢ়মূল জীবনচারিতায় আশ্লিষ্ট নয়,—তাই ওঁদের ক্ষেত্রে অনেকটাই ছিল প্রভাব, এঁদের ক্ষেত্রে দাহ। এই সময়বৃত্তের উল্লেখনীয় লেখাগুলি যথাক্রমে, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'The Zeminder and the Ryot' (1846), কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'The Ryot and the Zamindar (1859) সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'Bengal Ryot' (1864), লালবিহারী দের 'The History of a Bengal Raiyat' (1866)

এবং 'Bengal Peasant Life' or Govinda Samanta (1874) রমেশচন্দ্র দত্তের 'The Peasantry of Bengal (1874), ও ‘ভারত শ্রমজীবী’ পত্রিকার (1874) বিভিন্ন সংখ্যাগুলি। ইংরেজদের গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি অকলঙ্ক শ্রদ্ধা ও বৃটিশ রাজপুরুষদের ওপর অচঞ্চল নির্ভরশীলতা থাকা সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও দুর্গতি এঁদের নিঃসন্দেহ ভাবিয়ে তুলেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবন কেটেছিল মধুসূদনীয় উচ্চাকঙ্ক্ষা ও স্বপ্নচারিতার মধ্য দিয়েই, রং আর রক্তের পরিচয় ভিন্ন রুচি-উদ্যম-নীতিজ্ঞান-মনীষা সব দিক দিয়েই খাঁটি ইংরেজ হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। পিতা যাদবচন্দ্র ছিলেন তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধির সংসারী লোক,—বুঝেছিলেন দেশীয় রাজারাজড়া আমীর ওমরাহদের দিন আর নেই, ইংরেজরাই এ দেশের ভবিষ্যৎ এবং ইংরেজ আচরিত সামাজিক আদর্শ ও চালচলন রীতিনীতিই আগামী দিনগুলিতে সামাজিক প্রতিপত্তিলাভের সহায়ক হবে,—অন্য ছেলেদের মত বঙ্কিমচন্দ্রকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ করেছিলেন। তিনি যখন মেদিনীপুরে থাকতেন, ইংরেজ পরিবারদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই থাকতে চেষ্টা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র বড় হয়ে উঠেছিলেন ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষা, ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সঙ্গ-সান্নিধ্যের মধ্যে দিয়েই। বড় হয়ে জীবিকার সূত্রে জীবনের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে এসে দাঁড়াতেই তাঁর জীবনের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। ইংরেজী শিক্ষা-সংস্কৃতি অনুধ্যানে যে দেশের পরিচয় পেয়েছিল, সেই দেশকে বাস্তবে কোথাও পেলেন না, দেশের সঙ্গে নিজের যোগসূত্রটিও খুঁজে পেলেন না,—নিজের মধ্যে অদ্ভুতকে নিঃসঙ্গতা বিচ্ছিন্নতা একাকীত্বের বোধ গড়ে উঠতে থাকলো,—‘কমলাকান্ত’র ‘একা’র মধ্যে সেই রুদ্ধ বেদনাই হাহাকার করে উঠল, নিজের আহার-নিদ্রা-মৈথুন-কর্তৃত্বদারি নিয়েই জীবনের পূর্ণতা নয়। শহর গড়ে উঠছে, জেল্লাজৌলুষ আনন্দস্ফূর্তি নিয়ে ইংরেজি শিক্ষিত বাবু ও তার পরিজনদের জীবন মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে, বাহ্যসম্পদ (ভোগ্যপণ্য) সংগ্রহ প্রতিযোগিতায় ক্রমশ ‘মিথ্যা-প্রবঞ্চনা উৎকোচ গ্রহণ জালজুয়োচুরির’ সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে,—মুৎসদ্দি-ব্যাপারী-দেশীবিদেশী আমলা-দালাল আর নানান ধরনের উপস্বত্বভোগীদের সঙ্গে দেশের গরিবগুর্বো কৃষক-কারিগর শ্রেণীর ভেদরেখা ক্রমেই হচ্ছে স্পষ্ট তীক্ষ্ণ,—বঙ্কিমচন্দ্র এই ভয়াবহ শূন্যগর্ভতা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না, চাপা বেদনায় কমলাকান্তের জবানীতে ছট্‌ফট্ করতে থাকেন,—‘দেখ কত বাণিজ্য বাড়িতেছে,—দেখ, কেমন রেলওয়েতে হিন্দুভূমি জালনিবদ্ধ হইয়া উঠিল—দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু। দেখিতেছে, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই যে,—তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে? আমার এই হারান মন খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবে? (‘আমার মন’) কঙ্কালসার সর্বস্বান্ত রামধনপোদ-রামাকৈবর্ত-হাসিমশেখ-পরাণ মণ্ডলদের বাদ দিয়ে কোন ভবিষ্যৎ ভাবনাতেই নিরত থাকতে চান না, ধনসঞ্চয়ের কোন খতিয়ান মেনে নিয়ে তিনি বলতে চান না, দেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে,—ক্রুদ্ধ গর্জনে ফেটে পড়েন, “দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ।” তীব্র দাহ আর দ্বন্দ্ব, আবেগগাঢ় বেদনায় সমস্ত ধরনের অভিজ্ঞতা-নিরীক্ষা-অধ্যয়ন-অনুক্রম নিয়ে তিনি দেশ এবং সেই দেশের সঙ্গে নিজের আইডেনটিটি খুঁজে পাবার চেষ্টা করে চলেন, লিখিত হয় ‘সাম্য’।

‘সাম্য’ প্রবন্ধটির মধ্যে যদিও ‘কম্যুনিজম’ ও ‘ইন্টারন্যাশনাল’ এই কথা দুটির উল্লেখ আছে, তথাপি মার্কস-এঙ্গেলস’ এর মতবাদসমূহের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচিত হবার সুযোগই ছিলনা, কেন-না 'Das Capital'-এর সর্বপ্রথম ইংরেজি অনুবাদ হয় ১৮৮৭ সালে Samuel Moore ও Edward Aveling কর্তৃক এবং 'Communist Manifesto' ইংরেজীতে অনূদিত হয় Samuel Moore কর্তৃকই ১৮৮৮-এ। মেধাবী সর্ববিদ্যাবিশারদ বহুদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি পত্রপত্রিকার মাধ্যমে এই সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। মূলত ‘সাম্য’-এর মধ্যে

তিনি রুশো ছাড়া প্রুঁধো (১৮০৯-১৮৬৫), সেন্ট সাইমন (১৭৬০-১৮২৫), রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮), শার্ল কুরিয়র (১৭৭২-১৮৩৭), লুই ব্ল্যাঙ্ক (১৮১১-১৮৮২) প্রমুখের সাম্যবাদী চিন্তাচেতনার উল্লেখ করেছেন। যে সমাজের ধনবৃদ্ধি হয় শুধু ধনীর সমৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে, সে সমাজ যে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির ওপরেই বসে থাকে, বস্তুনিষ্ঠ পরিবেশসচেতন বঙ্কিমচন্দ্র একথা জানতেন বলেই সমকালীন এইসব চিন্তাবিদদের আত্মস্থ করেছিলেন। প্রুঁধো সম্পর্কে সমাজতন্ত্রীদের নানান অভিযোগ জেনে নিয়েও তো বলা যায়, তিনিই 'What is property' (১৮৪০) গ্রন্থে 'Property is theft' বলে সেই চাঞ্চল্যকর শ্লোগানটি তুলে এবং তার পরের বৎসরেই 'Warning to proprietors' লিখে ব্যঙ্গবক্র ভর্ৎসনায় পশ্চিম ইউরোপকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। যুগোপযোগী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার প্রসার ঘটিয়েছিলেন সেন্ট সাইমন, আজকের যুগে তাঁর গোটা কর্মকাণ্ড কৌতুককর হলেও, তখন এরই প্রভাবে ইংরেজ পুঁজিবাদী শ্রেণী নড়েচড়ে বসেছিল, জন স্টুয়ার্ট মিল ও টমাস কার্লাইল নতুন চিন্তার সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। শার্ল কুরিয়রও সেই সময়ের এক উল্লেখনীয় ব্যক্তিত্ব। সামাজিক অগ্রগতিতে শ্রমের অধিকার সর্বাগ্রে, বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় সেই শ্রম তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলেই চলতি রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে কুরিয়র বিরামহীনভাবে বিষোদ্গার করেছিলেন, আর রবার্ট ওয়েন তো ছিলেন এক চাঞ্চল্যকর জীবনেরই অধিকারী,—যিনি ধনীর সন্তান হয়ে ধনৈশ্বর্যের আবেষ্টনী ভেঙে মানুষের মঙ্গলের জন্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন পাতার কুটিরে,—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের 'Utopian Socialist' দের মধ্যে সর্বোত্তম,—এঙ্গেলস যাঁর সম্পর্কে ছিলেন সশ্রদ্ধ, "a man of almost sublime and childlike simplicity of character, and at the sametime one of the few born leaders of men."—বঙ্কিমচন্দ্র সাম্যতন্ত্রী এইসব বিচিত্র চিন্তাচেতনার সঙ্গেই তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণাগুলি যাচিয়ে নিয়েছেন, বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী চিন্তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না,—সে আলোচনার মধ্যে আসার তাই প্রশ্নও ওঠেনা।

১.২ গ্রন্থ-প্রস্তাবনা ও গ্রন্থ-পরিচিতি

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের গুরু জানিয়েছেন—"অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, 'এ জীবন লইয়া কি করিব?' 'লইয়া কি করিতে হয়?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি।" ('ধর্মতত্ত্ব' একাদশ অধ্যায়, ঈশ্বরে ভক্তি) —গুরুর এই ভাষ্যকে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনভাষ্য বলা যায়। আবার এই জীবনভাষ্যের মধ্যে যে আত্মজিজ্ঞাসা উঠে আসে তা আসলে সমাজজিজ্ঞাসারই নামান্তর। জীবনের প্রতি পর্বে বিভিন্ন রচনার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সেই সমাজজিজ্ঞাসাকে তথা সত্যানুসন্ধানকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। আমাদের আলোচ্য 'সাম্য' গ্রন্থ রচনার উৎস মূলেও আছে এই সমাজজিজ্ঞাসা।

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে 'সাম্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এর আগে পত্রিকায় গ্রন্থটি বিচ্ছিন্নভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। ১২৮০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'সাম্য' নামে একটি প্রকাশিত হয়। আষাঢ় সংখ্যায় ওই বছরেই বেরোয় 'সাম্য দ্বিতীয় সংখ্যা' এবং ১২৮২ বঙ্গাব্দে কার্তিক সংখ্যায় বেরোয় 'সাম্য তৃতীয় প্রস্তাব স্ত্রীজাতি'। উক্ত তিনটি প্রবন্ধের সঙ্গে ১২৭৯ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটির কিছু অংশ সংযোজন করে পুস্তাকাকারে 'সাম্য' প্রকাশ করেন।

১.৩ গ্রন্থ-রচনার প্রেক্ষাপট

'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার আমাদের জানিয়েছেন—"বঙ্কিমবাবু বলিলেন, এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সেসব গিয়াছে।' নিজের লেখা প্রবন্ধের কথা উঠিলে বলিলেন, 'সাম্যটা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না।" আমরা এও জানি, বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' আর না ছাপিয়ে 'বঙ্গদেশের

কৃষক' প্রবন্ধটি কেবল তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করেন। ফলত একটি প্রশ্ন উঠতে পারে 'সাম্য' গ্রন্থটির পুনঃপাঠের প্রয়োজনীয়তা কী?

বঙ্কিমচন্দ্র সীতা-কৃষ্ণ-মহাভারত' ইত্যাদি গ্রন্থকে আকররূপে ধরে, অনুশীলনতত্ত্ব নামে একটি বিশেষ তত্ত্ব প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন তার শেষ দিকের রচনায়। শেষের দিকের উপন্যাস—'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' কিংবা 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণ চরিত্র' নামের প্রবন্ধগ্রন্থ-এর সাক্ষ্য বহন করে। বঙ্কিমচন্দ্র তখন যে দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন তখন সাম্য-এর ভাবনা তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। কিন্তু একজন শিল্পী ব্যক্তিত্বের পূর্ণপরিচয় যখন আমরা নিতে যাব তখন তাঁর প্রতিটি রচনাই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনসম্পর্কিত অভিজ্ঞতা উপলব্ধির বিবর্তন রেখাটি চিনে নিতে এইজন্যই 'সাম্য' গ্রন্থটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'সাম্য' রচনা করেছেন তখন কলকাতাকেন্দ্রিক বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে সাম্য চিন্তার ঢেউ উঠেছিল। ডিরোজিওর শিষ্যরা নীলকরসাহেবদের অত্যাচার, সরকারের বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল। প্যারীচাঁদ মিত্রের The Zamindar and the Ryot (1846), কিশোরচাঁদ মিত্রের লেখা 'The Ryot and the Zamindar (1859), সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের Bengal Ryot (1864) ইত্যাদি প্রবন্ধ, 'ভারত শ্রমজীবী (১৮৭৪) নামক পত্রিকায় প্রকাশিত নানা নিবন্ধ সাম্যচিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছিল। স্মরণ রাখতে হয় আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা (১৭৭৪) এবং ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯-৯১)-এই দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা পরোক্ষে সারাবিশ্বেই মানবমুক্তির বার্তা ধ্বনিত করেছিল। উনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীর মধ্যেও সেভাবনার তরঙ্গ পৌঁছেছিল। 'সাম্য' রচনার প্রেক্ষাপটটি গ্রন্থটি আলোচনার ক্ষেত্র এইজন্য স্মরণ করে নিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যবাদী চিন্তাভাবনার ভিত্তি হল—রুশো, সেন্ট সাইমন, রবার্ট ওয়েন, শার্ল ফ্যুরিয়র, লুই ব্লাঙ্ক—প্রমুখ সাম্যবাদীদের মতবাদ। এছাড়া মিলের মতবাদ এখানে গুরুত্ব পেয়েছে।

১.৪ সাম্য : মূল প্রবন্ধের নিবিড় পাঠ

।। প্রথম পরিচ্ছেদ ।।

মানবসমাজের মধ্যে একটি প্রধান প্রবৃত্তি হল বৈষম্যজ্ঞান। এজন্যই কেউ অভিহিত হন বড়োলোক বলে আবার কেউ আমাদের চোখে ছোটোলোক। এই বড়োলোক এবং ছোটোলোকের প্রভেদ তৈরি হয় কীভাবে? অর্থনৈতিক মানদণ্ডই এই পার্থক্যরেখা তৈরি করে। কিন্তু প্রাবন্ধিক সে-কথা বলেই ক্ষান্ত হলেন না, জানালেন অন্যকথা; একজন বড়োলোক হয় কীভাবে? যদু চুরি করতে জানে না, বঞ্চনা করতে জানে না, অতএব যদু ছোটোলোক। আর রাম চুরি করে, বঞ্চনা করে, অতএব বড়োলোক। আবার যদি রাম নিরীহ ভালো মানুষ আর রামের প্রপিতামহ জুয়াচোর ছিলেন—এরকম হয়, তবুও রাম বড়োলোক। অর্থাৎ অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বড়োলোক হবার উপায় শঠতা, বঞ্চনা।

অর্থনৈতিক মানদণ্ড ছাড়াও আরেকপ্রকার বড়োলোকের কথা বললেন বঙ্কিম। এসেছে 'কন্যাভারগ্রস্ত' গোপাল ঠাকুরের কথা। গোপাল দরিদ্র, মুর্খ, পাপিষ্ঠ, তবুও সে বড়োলোক। কারণ সে জাতিতে ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ জাতি বৈষম্যেও ছোটোলোক-বড়োলোক নির্ধারিত হয়।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে বঙ্কিমের তাই সিদ্ধান্ত—"অতএব সংসার বৈষম্যপরিপূর্ণ।—সকল বিষয়েই বৈষম্য জন্মে।" এই বৈষম্য দু-প্রকারের—প্রকৃত বৈষম্য ও অপ্রকৃত বৈষম্য। যে বৈষম্য প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন তাই

প্রকৃত বৈষম্য। আর যে বৈষম্য প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী নয়, মনুষ্যকৃত বৈষম্য তাই অপ্রকৃত বৈষম্য। এই অপ্রকৃত বৈষম্যই অসাম্যকে প্রতিষ্ঠা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য—"সমাজের উন্নতিরোধ বা অবনতির সে সকল কারণ আছে, অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার প্রধান।"

বঙ্কিমের মতে পৃথিবীতে তিনজন ব্যক্তি এই অসাম্য দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনজনের মহামন্ত্রের স্থূল মর্ম, 'মনুষ্য সকলেই সমান'। এই তিনজন হলেন—বুদ্ধদেব, যিশুখ্রিস্ট এবং রুশো।

শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব ভারতবর্ষকে বৈদিক ধর্মসঞ্জাত বৈষম্যের পীড়ন থেকে উদ্ধার করেছিলেন। ভারতবর্ষের বর্ণবৈষম্য তার উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করেছিল। সকল উন্নতির মূল জ্ঞানোন্নতি। বর্ণবৈষম্যের ফলে একমাত্র ব্রাহ্মণরাই ছিলেন একমাত্র জ্ঞান আলোচনার অধিকারী, অথচ ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক ব্রাহ্মণেতর বর্ণ। ব্রাহ্মণরা লিখলেন সকল কাজই পাপ, আর সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত কঠিন।

এরকম অবস্থায় ভারতবর্ষে শাক্যসিংহের আবির্ভাব নতুন মন্ত্র নিয়ে এল। বঙ্কিমের জবানিতে লেখা যায়—"তখন বিশুদ্ধাত্মা শাক্যসিংহ .... দিগন্ত প্রভাবিত রবে বলিলেন, 'আমি উদ্ধার করিব। ...... তোমরা সবাই সমান। ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান। মনুষ্যে মনুষ্যে সকলেই সমান। সকলেই পাপী, সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। বর্ণবৈষম্য মিথ্যা। যাগযজ্ঞ মিথ্যা। বেদ মিথ্যা, সূত্র মিথ্যা, ঐহিক সুখ মিথ্যা, কে রাজা, কে প্রজা, সব মিথ্যা। ধর্ম্মই সত্য। মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সকলেই সত্যধর্ম্ম পালন কর।' বৌদ্ধধর্মে বর্ণবৈষম্য অনেকখানি দূর হয়েছিল। অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, শিলাদিত্যের মতো সম্রাটের এই সময়কালেই অভ্যুদয় হয়েছিল। শিল্পবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞানে ভারতবর্ষের বিশেষ উন্নতি ঘটেছিল। বঙ্কিমের চোখে দ্বিতীয় সাম্যাবতার হলেন যিশুক্রিস্ট। যিশুর জন্য আবির্ভাব ঘটে তখন "রোমক সাম্রাজ্যে চিরদাসত্বজনিত বৈষম্য সাংঘাতিক রোগস্বরূপ প্রবেশ করিয়াছিল।" ভূমিকর্ষণ, গৃহস্থালির কাজ, শিল্পকার্যাদি সমস্তই সাধিত হত দাসদের দ্বারা। পশুর ন্যায় দাস কেনা-বেচা হত। রোমসাম্রাজ্যের তখন দুটি শ্রেণি—প্রভু ও দাস।

একদিকে যেমন মানবসমাজের বৈষম্য, অন্যদিকে ছিল সম্রাটের স্বেচ্ছাচারিতা। ঠিক এইসময় যিশুখ্রিস্ট নিয়ে এলেন মানবতার নতুন বাণী। "তিনি বলিয়াছিলেন, মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ। সকল মনুষ্যই ঈশ্বরসমক্ষে তুল্য। বরং সে পীড়িত, দুঃখী, কাতর, সেই ঈশ্বরের অধিক প্রিয়। এই মহাবাক্যে বড় মানুষের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল—প্রভুর গর্ব্ব খর্ব্ব হইল—অঙ্গহীন ভিক্ষুকও সম্রাটের অপেক্ষা বড় হইল।"

আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার যে লৌকিক উন্নতি ঘটেছে তার পিছনে রয়েছে অনেক কারণ, কিন্তু প্রধান কারণ খ্রিস্টীয় নীতি এবং গ্রিক সাহিত্য ও দর্শন। তবে খ্রিস্টধর্মে কেবল সুফল ফলেনি, ফলেছিল কুফলও। কালক্রমে ধর্মযাজকদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইউরোপীয় দেশগুলিতে গুরুতর বৈষম্য দেখা দিয়েছিল। বিশেষত ফ্রান্সে উচ্চশ্রেণি আর নিম্নশ্রেণির বৈষম্য এমন গুরুতর হয়েছিল যে তার ফলে ফরাসি বিপ্লব ঘটেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র জানালেন—"সেই মথিত সাগরের একজন মন্থনকর্ত্তা ছিলেন—তিনিই তৃতীয়বারের সাম্যতত্ত্ব প্রচারকর্ত্তা। তৃতীয় সাম্যাবতার রুশো।"

।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।।

অষ্টাদশ শতাব্দির ফ্রান্সের অবস্থা এবং ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে কার্লাইলের অভিমত উপস্থাপিত হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। পঞ্চদশ লুইয়ের প্রমোদাসক্তি, উপপত্নীদের পরিতুষ্টির জন্য অর্থব্যয় রাজকোষ শূন্য করে দিয়েছিল। এই অর্থব্যয়ের জন্য প্রজা শোষণ ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। তৎকালীন ফ্রান্স রাজ্যের অবস্থা ছিল এই রকম—"একদিকে

রম্যোদ্যান, বনবিহার, নৃত্যগীত, পরস্ত্রীর সহিত প্রণয়, হাস্যপরিহাস, অনন্ত প্রমোদ, চিন্তাশূন্যতা;—আর একদিকে দারিদ্র্য, অনাহার, পীড়া, নিরপরাধে নাবিক দাসত্ব, ফাঁসিকাঠ, প্রাণবধ! পঞ্চদশ লুইর রাজ্যকালে ফ্রান্সদেশে এইরূপ গুরুতর বৈষম্য।"

রুশোর মূলকথা হল সাম্য প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষমাত্রেই নৈসর্গিক সমান এবং সম্পত্তির অধিকারেও। পৃথিবীর ভূমিতে রাজার যে অধিকার, ভিক্ষুকেরও সেই অধিকার। যখন বলবান দুর্বলকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে লাগল, তখনই আরম্ভ হল সমাজ-সংস্থাপন। সেই অপহরণের স্থায়িত্বকরণেরই অপর নাম আইন।

রুশো তাঁর বিখ্যাত 'Le Contrat Social' গ্রন্থে পূর্ববর্তী বক্তব্যকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করেন। সম্পত্তির ক্ষেত্রে তিনি প্রথমাধিকারীকে অধিকারী বলে প্রথমে স্বীকার করে নেন, তবে সেক্ষেত্রে কতকগুলি শর্তের কথা বলেন। প্রথম যদি ভূমিটি পূর্বে অধিকৃত না থাকে, দ্বিতীয়ত, অধিকারী যদি কেবল আত্মভরণপোষণের উপযোগী মাত্র ভূমি অধিকার করে, তৃতীয়ত যদি নামমাত্র দখল না নিয়ে কর্ষণাদির দ্বারা দখল নেওয়া হয়। তিনি আরও জানালেন, পাঁচজন ব্যবসাদার যেমন পরস্পরের কতকগুলি নিয়ম বা শর্ত ঠিক করে নিয়ে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি খোলে, তেমনি সমাজ, রাজ্য, শাসন মানুষের মঙ্গলার্থ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। এছাড়াও রয়েছে ফুরিরিজম তত্ত্ব। তাঁদের মত হল, ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি থাকতে পারে না—একথা বলা যায় না। উৎপন্ন ধনের মধ্যে প্রথমে কিছু অংশ সমপরিমাণে সকলের মধ্যে বিতরিত হবে। যে শ্রমে অপারগ, সেইজনও তার ভাগ পাবে। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা শ্রমকারী, মূলধনাধিকারী এবং কর্মনিপুণদের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে বিভক্ত হবে।

ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্নেই বঙ্কিমচন্দ্র জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। মিলের মতে যিনি উপার্জন কর্তা, উপার্জিত সম্পূর্ণ অধিকার। এই সম্পত্তি অপর্যাপ্ত হলেও যাবজ্জীবন ভোগ করার এবং জীবনান্তে যাকে খুশি দিয়ে দেবার অধিকার আছে। কিন্তু তিনি যদি জীবনান্তে অন্যকে ভোগ করার অধিকার না দিয়ে যান তাহলে তাঁর সম্পত্তি একা ভোগ করার অধিকার কারও নেই।

মানবজগতে যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত সেই ব্যবস্থার সংশোধন না করলে কখনও মানবপ্রজাতির প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। পৃথিবীর সুখে তথাকথিত বড়োলোক এবং ছোটোলোকের সমান অধিকার। এইজন্যই প্রাবন্ধিক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনে পিতৃসম্পত্তি অর্জন করে দোর্দন্ড প্রতাপশালী মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছেন, তাঁরও যেন মনে থাকে যে বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁর সমকক্ষ, তাঁর ভাই। কারণ যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করছেন পরাণ মণ্ডলও তাঁর ন্যায়সঙ্গত অধিকারী। এই দিক দিয়ে দেখার ফলে তার ফল হল গুরুতর।—

—"এ কথার ফল অতি গুরুতর। তোমায় আমায় চুক্তি হইয়াছে যে তুমি আমার জমী চষিয়া দিবে, আমি তোমাকে খাইতে পরিতে দিব, এবং গৃহে স্থান দিব। তুমি যে দিন আমার ভূমি কর্ষণ বন্ধ করিলে, সেই দিন আমি তোমার গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলাম এবং গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ করিলাম। এই কার্য্য ন্যায়সঙ্গত হইল। তেমনি যদি রাজাপ্রজার সম্বন্ধ কেবল চুক্তিমাত্র হয়, তবে প্রজা অত্যাচারী রাজাকে বলিতে পারে, "তুমি চুক্তিভঙ্গ করিয়াছ। প্রজার মঙ্গল করিবে এই অঙ্গীকারে তুমি রাজা; তোমার কার্য্য আমাদের মঙ্গল করা, আমাদের কার্য্য তোমাকে করদান ও তোমার আজ্ঞাপালন। তুমি এখন আর আমাদের মঙ্গল কর না, অতএব আমারও তোমাকে কর দিব না বা তোমার আজ্ঞাপালন করিব না।" বঙ্কিমের মতে 'Le Contrat Social' গ্রন্থের চরম ফল হল ষোড়শ লুইয়ের সিংহাসনচ্যুতি এবং প্রাণদণ্ড।

রুশো যে "ভূমি-সাধারণের" কথা বলে মহাবৃক্ষের বীজ রোপণ করেছিলেন তাতে নিত্য নতুন ফল ফলতে আরম্ভ করে। "কম্যুনিজম" সেই বৃক্ষের ফল। "ইণ্টারন্যাশনল" সেই বৃক্ষের ফল।"

ভূমি এবং মূলধন যার দ্বারা ধনের উৎপত্তি, তা সামাজিক সর্বলোকের সম্পত্তি হোক। যা উৎপন্ন হবে, তা সকলে সমানভাবে বণ্টন করে নেবে। সকলের সমান পরিশ্রম, সকলের সমান ধনের অধিকার—এটিই কম্যুইনিজ্‌ম্‌-এর মূল কথা। তবে কম্যুইনিস্টদের মধ্যে কেউ কেউ শ্রমানুসারে ধনের ভাগ কর্তব্য বলে মনে করেন, যেমন লুই ব্লাং। এই মতকে বলা হয় সেন্টাসাইমনিজম্‌। যে যেমন পরিশ্রমের উপযুক্ত, ও যে কাজের উপযুক্ত, সে সেই রকম পরিশ্রম করবে এবং সেরকম কাজে নিযুক্ত হবে।

।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।।

বঙ্গাদেশের কৃষকের প্রতিনিধি স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র পরাণ মণ্ডল চরিত্রটিকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার মধ্য দিয়ে বঙ্গাদেশের কৃষকদের দুদর্শার কথা বর্ণনা করেছেন।

যে বসুন্ধরা কারও একার সম্পত্তি নয়, কিন্তু তাকেই ভূমধ্যিকারীরা বণ্টন করে নেওয়ারফলে যে বৈষম্য দেখা দিয়েছে তাই এখানে বর্ণিত হয়েছে।

জমিদারবাবু যখন সাতমহল পুরীর মধ্যে স্ত্রী-কন্যার গৌরকান্তি রূপ প্রত্যক্ষ করছেন, তখন পরাণ মণ্ডল পুত্রসঙ্গো দ্বিপ্রহর রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দুটি অস্থিচর্মসার বলদে এবং ভোঁতা হালে জমিদারের ভোগের আয়োজন চালাচ্ছে। এই একটি ছবির মধ্য দিয়েই সামাজিক বৈষম্য, বঙ্গাদেশের কৃষক এবং কৃষিব্যবস্থার প্রকৃত অবস্থাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন লেখক।

পৌষ মাসে ধান কেটেই কৃষককে পৌষের কিস্তি খাজনা মেটাতে হয়। প্রত্যেকেই পুরো খাজনা মেটাতে পারে না। কৃষক সারাবছরের খাজনা মেটাতে হাজির হয় চৈত্র মাসে। পরাণ মণ্ডলের পৌষের কিস্তির পাঁচ টাকার এক টাকা বাকি, আর চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা, মোট চার টাকা নিয়ে হাজির। কিন্তু সোমস্তার কঠিন হিসাব, পৌষের এক টাকা বাকির জায়গায় তিন টাকা বাকির কথা লেখা থাকে খাতায়। পরাণ মণ্ডলকে মেনে নিতে হয়। তারপর আবার গোমস্তার হিসাবানা, এছাড়া নামের গোমস্তা, তহশিলদার, মুহুরি, পাইক, সকলকেই পাটণী দিতে হয়।

আষাঢ় মাস নববর্ষের শুভ পুণ্যাহ। শুভ পুণ্যাহে খাজনা দিতে হয়, তার সঙ্গো আবার জমিদারকে নজরানা দিতে হয়। জমিদাররা অনেক শরিক হলে নজরানাও পৃথক পৃথক। শুধু জমিদার নয়, নায়েব, নায়েবের পর গোমস্তা সকলেই নজরানা নেয়।

সমস্ত কিছু মিটিয়ে চাষি হয়ে পড়ে নিঃস্ব। ঘরে খাবার জোগাড় নেই, এদিকে চাষের সময় উপস্থিত। তখন পরাণ মণ্ডলদের ভরসা মহাজন। "পরাণ মহাজনের কাছে গেল। দেড়া সুদে ধান লইয়া আসিল। আবার আগামী বৎসর তারা সুদ সমেত শুধিয়া নিঃস্ব হইবে। চাষা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়া সুদ দেয়।" কোনও কোনও ক্ষেত্রে জমিদার নিজেই মহাজন। মহল জমিদার স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করে তাকে নিঃস্ব করেন, আবার তাকেই ধার দিয়ে সুদের টাকা আত্মসাৎ করেন।

খাজনার কিস্তি জমা না দিলে আরেক বিপদ। হয় পাইক, পিয়াদা, না হয় গোমস্তার পীড়ন তাকে সহ্য করতে হয়। কেবল খাজনা বাকি থাকার জন্য নয়, কাছারিতে আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা করা তাদের জীবনে নৈমিত্তিক ব্যাপার। পরাণ মণ্ডলে রা খাজনা বাকি রাখলে জমিদার সম্পত্তি ক্রোক করে। আইনের আশ্রয় নিয়েও কোনও সুরাহা হয় না। কারণ 'আদালত এবং বারাঙ্গানার মন্দির তুল্য; অর্থ নাহলে প্রবেশের উপায় নাই।" এদিকে আদালতের সাক্ষীরা জমিদারের প্রজা—ভয়ে তাঁর বলীভূত, আর 'পিয়াদা মহালয় রৌপ্যমন্ত্রের সেই পথবর্ত্তী।' ফলে মামলাতে পরাণের পরাজয় হয়।

কিন্তু বঙ্গদেশের কৃষকদের এই দুর্দশা কথা জানানোর পরেও দু-একটি কথা জানানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রথমত তিনি জানান সকল জমিদারই অত্যাচারী নন। দ্বিতীয়ত এই সকল অত্যাচার অনেক ক্ষেত্রেই জমিদারের অজ্ঞাতে বা অভিমত বিরুদ্ধে ঘটে। তৃতীয়ত, অনেক জমিদারির প্রজাও ভালো নয়। পীড়ন না করলে প্রজারা খাজনা দেয় না। কিন্তু সেইসঙ্গে এ-কথাও বলেন যে প্রজার উপর আগে অত্যাচার না হয়ে থাকলে, তারা বিরুদ্ধভাব ধারণ করে না।

।। চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।।

বঙ্গদেশের তথা ভারতবর্ষের কৃষকদের এই দুর্দশা কেন হল সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চতুর্থ পরিচ্ছেদে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এই দুর্দশা একদিনে ঘটেনি। যতদিন ভারতবর্ষে সভ্যতার সৃষ্টি প্রায় ততদিন থেকেই ভারতবর্ষের কৃষকদের দুর্দশারও সূত্রপাত।

বঙ্কিচন্দ্র এই দুর্দশার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে বক্‌ল্‌-এর মতের সাহায্য নিয়েছেন। প্রাবন্ধিক জানালেন যে জ্ঞানের উন্নতি না হলে সভ্যতার উন্নতি হয় না। জ্ঞানের উন্নতির জন্য বিদ্যালোচনার প্রয়োজন। আর অনাহারে বিদ্যালোচনা হয় না। সকলেই উদরপোষণের সন্ধানে থাকলে জ্ঞানালোচনার অবকাশ তৈরি হবে না। ফলে সভ্যতার সৃষ্টি লগ্নেই একদল মানুষ তৈরি হয়েছেন যারা ভরণপোষণের জন্য খাদ্য উৎপন্ন করে—এরা শ্রমজীবী। উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ যখন অধিক হয়, নিজের ভরণপোষণের পরও যখন সঞ্চয় হয়, তখনই জ্ঞানের উদয় সম্ভব। কারণ এই অতিরিক্ত উৎপন্ন খাদ্যে শ্রমবিরত ব্যক্তি ভরণপোষণ যোগায় এবং তাঁরা বিদ্যানুশীলন করতে পারেন। অর্থাৎ সভ্যতার প্রাথমিক প্রয়োজন ধনসঞ্চয়। দুটি কারণে একটি দেশে ধনসঞ্চয় হয়ে থাকে। প্রথম কারণ—ভূমির উর্বরতা। ভূমি উর্বর হলে খুব সহজেই বেশি শস্য উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় কারণ—দেশের উষ্ণতা বা শীতলতা। যে দেশ উষ্ণ সে দেশের লোক স্বল্পাহার আবশ্যক, আর শীতল দেশে অধিক আহার প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ অবং এর ভূমিও উর্বর। এইজন্য ভারতবর্ষে ধনসঞ্চয় সম্ভব। ধনাধিক্য হেতুই জ্ঞানালোচনাতেও তৎপর হতে পেরেছিল এই দেশ। কিন্তু যে কারণে সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছিল দ্রুত, সেই নিয়মেই সাধারণ প্রজাদের দুর্দশা ঘটেছিল।

জনসমাজে ধনসঞ্চয় সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিল। একদল শ্রমোপজীবী, অন্যদল বুদ্ধ্যপজীবী। যারা শ্রম করে না, তারা চিন্তা করে, শিক্ষা পায় এবং সমাজে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের উৎপন্ন ধন দুভাগে বিভক্ত হয়—এক শ্রমোপজীবীর, অন্যভাগ বুদ্ধ্যপজীবীর। প্রথম ভাগে প্রাপ্তি মজুরির বেতন, দ্বিতীয়ভাগে প্রাপ্তি মুনাফা। শ্রমোপজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, উৎপন্ন ধনের যে অংশটি বেতন সেটিই বিভক্ত হবে। অর্থাৎ শ্রমোপজীবীর সংখ্যাবৃদ্ধি শ্রমোপজীবীর দুর্দশার কারণ।

যদি লোকসংখ্যাবৃদ্ধি না হয়ে ধনবৃদ্ধি হয়, তাহলে শ্রমোপজীবীর উন্নতি হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে ধনবৃদ্ধি অপেক্ষা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অধিক। এই লোকসংখ্যাবৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম। সমস্যাটি থেকে উদ্ধারের দুটি উপায়,—প্রথমত দেশীয় লোকদের কিছু অংশে দেশান্তরে গমন। দ্বিতীয়ত বিবাহপ্রবৃত্তির দমন। কিন্তু ভারতবর্ষে এই দুটির কোনওটিই অবলম্বিত হয়নি বলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

শ্রমোপজীবীদের দুর্দশার পরিচয় দিয়ে তার তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এরপর সূত্রাকারে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

এক।। শ্রমোপজীবীদের অবনতির কারণ তিনটি—দারিদ্র, মূর্খতা, দাসত্ব। বেতনের স্বল্পতা সৃষ্টি করেছে দারিদ্র। বেতন অল্প হলেও পরিশ্রম অধিক, অবকাশের অভাবে বিদ্যাচর্চার অভাব। এর ফল মূর্খতা। বুদ্ধ্যপজীবীদের অত্যাচার ও প্রভুত্ববৃদ্ধির ফলে এল দাসত্ব।

দুই।। প্রাকৃতিক কারণেও ভারতবর্ষে শ্রমোপজীবীদের অবনতির ধারা অব্যাহত থাকল। মানুষের মনে নিত্য নতুন আকাঙ্ক্ষার জন্ম তাকে সফলতা দেয়। ভারতবর্ষের ভূ-প্রকৃতি তার অনুপযুক্ত। তাপাধিক্যের কারণে এদেশের মানুষ এককালীন অধিক পরিশ্রম করতে পারে না। একদিকে সুখলালসার অভাব অন্যদিকে প্রকৃতির বিরূপতা উদ্যমহীন করে তোলে, যা দুর্দশা ডেকে আনে। আবার "কি ব্রাহ্মণ, কি বৌদ্ধ, কি স্মার্ত্ত, কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন যে ঐহিক সুখ অনাদরণীয়।" এইসকল কারণেই ভারতবর্ষের সামাজিক বৈষম্য ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকল।

তিন।। কেবল শ্রমোপজীবী নয়, শ্রমোপজীবীদের দুর্দশার কারণে সকল শ্রেণির মধ্যেই এই দুর্দশা দেখা গেল।

(ক) বৈশ্য বাণিজ্যব্যবসায়ী। ব্যবসা পরিপূর্ণভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে। যে দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামগ্রী উৎপন্ন না হয় সে দেশে বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভব নয়। বাণিজ্যের উন্নতি না হলে 'বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগের সৌষ্ঠবের হানি।'

(খ) সাধারণ প্রজা যদি নিস্তেজ হয় এবং রাজাদের নিয়ন্ত্রণ করবার মতো মানসিকতা না থাকে তাহলে রাজপুরুষ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দের উন্নতি হয় না। কেউ যদি প্রতিবাদ না করে তাহলে স্বেচ্ছাচারী হয়ে যায়। আর "স্বেচ্ছাচারী হইলেই আত্মসুখরত, কার্য্যে শিথিল এবং দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইতে হয়।"

(গ) প্রজাদের অবনতিতে ক্ষত্রিয়দের প্রথমে প্রভুত্ব বাড়ে,তারপর বিলুপ্ত হয়। ঠিক সে কথা প্রযোজ্য ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেও। তিন বর্ণের অনুন্নতিতে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব প্রথমে বৃদ্ধি পায়। ব্রাহ্মণরা শাস্ত্রজাল, ব্যবস্থাজাল বিস্তার করে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রকে জড়িয়ে ফেলতে থাকেন। কিন্তু পরকে ভ্রান্ত করতে চাইলে ক্রমে নিজেরও ভ্রান্তি জন্মে। যা পরকে বিশ্বাস করাতে চাওয়া হয়, তাতে নিজের বিশ্বাস দেখাতে হয়। ফলে নিয়মজালে জড়িত হয়ে ব্রাহ্মণদের মানসক্ষেত্র মরভূমিতে পরিণত হয়।

।। পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে লিঙ্গ-বৈষম্যের কথা আলোচিত হয়েছে। মানুষে মানুষে সমনাধিকার বিশিষ্ট। যেহেতু "স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী।" নারী-পুরুষের স্বভাবগত বৈষম্য আছে, অতত্র অধিকারগত বৈষম্য থাকা বিধেয়—এই মতে বিশ্বাসী নন বঙ্কিমচন্দ্র। কারণ তাহলে ইংরেজ ও বাঙালিরও স্বভাবগত বৈষম্য আছে, কিন্তু তাই বলে দুই জাতির অধিকার বৈষম্যকে আমরা সঙ্গত বলতে পারি না। আবার নারী-পুরুষের যে অধিকার বৈষম্য প্রত্যক্ষ করি তা মূলত সামাজিক নিয়মের দোষে, স্বভাবগত বৈষম্যের কারণে নয়।

আমাদের দেশে নারী খাঁচায় বন্দি রাখা পাখির মতো। যে বুলি শেখাবে তা বলবে, খেতে দিলে খাবে, তা নাহলে একাদশী করবে। পতি তাদের কাছে দেবতাস্বরূপ। নারী-পুরুষের এই গুরুতর বৈষম্য দূরীকরণে বর্তমানে কিছু প্রচেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ করেছেন। সেইদিকটিকেই এখানে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছেন।—প্রথমত, আমাদের দেশে পুরুষের বিদ্যাশিক্ষা করে, নারীরা থাকে অশিক্ষিত। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনোভাব সামান্য হলেও পরিবর্তিত হয়েছে। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো দরকার একথা অনুভব করেছে। কিন্তু মেয়েরা ছেলেদের মতো সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি শিখুক—এরকম মনোভাব নেই। মেয়েদের শিক্ষা সেই কথামালাতেই সমাপ্ত। মেয়েদের শিক্ষাঅর্জনের বাস্তব সঙ্কটও রয়েছে। মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল নেই। আবার ছেলেদের স্কুলেই মেয়েদের পাঠানোর মানসিকতা তৈরি হয়নি। এছাড়া মেয়েরা লেখাপড়া শেখার কাজে ব্যস্ত হলে সন্তান প্রতিপালন, সংসারের কাজ করবে কে? বঙ্কিমচন্দ্র এর মধ্যেই অসাম্যটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তিনি জানান—"যাহাকে

গৃহধর্ম্ম বলে, সাম্য থাকিলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই তাহাতে সমান ভাগ। একজন গৃহকর্ম্ম লইয়া বিদ্যাশিক্ষায় নির্ব্বিঘ্ন হইবে; ইহা স্বভাবসঙ্গত হউক বা না হউক, সাম্যসঙ্গত নহে।"

দ্বিতীয়ত অসাম্যের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে। বিধবা বিবাহ ভালো, কি মন্দ—এই প্রশ্নের কোনও সন্তোষজনক উত্তর হয় বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করছেন না। কিন্তু উচিত-অনুচিত ব্যাপারটিকে সরিয়ে সাম্যনীতির দিকটি বিবেচনার অবকাশ আছে। এ ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিকের মন্তব্য—"কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে, যে যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমন কার্যমাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে করিতে পারে। সুতরাং পত্নীবিযুক্ত পতি, এবং পতিবিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃপরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে।"

তৃতীয়ত, স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্যের গুরুতর দিক হল স্ত্রীদের গৃহবন্দি করে রাখার প্রবণতা। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক সমস্ত কিছুর অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। ধর্মরক্ষার্থ নারীদের পিঞ্জরাবদ্ধ আবশ্যক—এরকম মতামতও অনেকে পেশ করে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁরও বিরোধিতা করেন,—

"ধর্ম্মরক্ষার্থ যে স্ত্রীগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ রাখা আবশ্যক, হিন্দুমহিলাগণের এরূপ কুৎসা আমরা সহ্য করিতে পারি না। কেবল সংসারে লোকসহবাস করিলেই তাহাদিগের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে, পুরুষ পাইলেই তাহারা কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার পিছু পিছু জুটিবে, হিন্দু স্ত্রীর ধর্ম্ম এরূপ বস্ত্রাবৃত বারিবৎ নহে।"

চতুর্থত, নারী-পুরুষের বৈষম্যের প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে বহুবিবাহের অধিকার নিয়ে। এক্ষেত্রে নারীরাও পুরুষের মতো বহুবিবাহের অধিকারিণী হন এরকম বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত নয়। বরং তিনি মনে করতেন মনুষ্যজাতি মধ্যে কারও বহুবিবাহের অধিকার থাকা উচিত নয়।

এই চারটি ছাড়াও নারী-পুরুষের বৈষম্যের ক্ষেত্রে সম্মত্তির অধিকার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের সম্পূর্ণ অধিকার, অথচ কন্যা সেখানে কেউ নয়। কেউ কেউ বলেন স্ত্রী স্বামীর ধনে স্বামীর মতোই অধিকারিণী, এইজন্য পৈতৃক ধন অধিকারিনী হবার কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন বিধবা কন্যা বিষয়াধিকারিণী হয় না কেন? কিংবা যে কন্যার বিবাহ দরিদ্র ঘরে হয়েছে, সে উত্তরাধিকারিণী হয় না কেন? লক্ষণীয় স্ত্রীকে স্বামী বা পুত্র বা এরকম কোনও পুরুষের আশ্রিতা হয়ে ধনের অধিকারিণী হতে হয়। অন্যদিকে পুরুষ সর্বাধিকারী—স্ত্রীর ধনও তার ধন। বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন—"এ বৈষম্য গুরুতর, ন্যায়বিরুদ্ধ এবং নীতিবিরুদ্ধ।"

সম্পত্তির অধিকারের পর এসেছে উপার্জনের প্রসঙ্গ। তথাকথিত নিম্নশ্রেণির নারীরা ছাড়া এসেধে নারীরা উপার্জন করতে পারে না। এর প্রথম কারণ—দেশি সমাজের রীতি অনুসারে ঘরে বাইরে মেয়েদের বেরুনো নিষেধ। আর বাইরে না বেরুলে উপার্জন অসম্ভব। দ্বিতীয় কারণ হল মেয়েরা সে পরিমাণে শিক্ষিত নয়, যাতে উপার্জন করতে পারে। তৃতীয়ত পুরুষদের চাকরির অভাব, সেখানে নারীদের রোজগারের জায়গা নেই। তবে তিনটি ক্ষেত্রেই এই সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হবার উপায় বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছে—শিক্ষা। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়—"লোকে সুশিক্ষিত হইলে, বিশেষতঃ স্ত্রীগণ সুশিক্ষিতা হইলে, তাহারা অনায়াসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই, অর্থোপার্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে। এবং এ দেশী স্ত্রীপুরুষ সকল প্রকার বিদ্যার সুশিক্ষিত হইলে, বিদেশী ব্যবসায়ী, বিদেশী শিল্পী বা বিদেশী বণিক, তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবে না। শিক্ষাই সকল প্রকাল সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।"

।। উপসংহার ।।

উপসংহারে এসেছে জাতিগত বৈষম্যের কথা। অবশ্য এই জাতি কথাটির অর্থ বর্ণ নয়। এখানে জাতিগত বৈষম্য মানে বলতে চাওয়া হয়েছে জয়ী ও বিজিতের মধ্যে সম্পর্ক। রাজা এবং প্রজার মধ্যে যে অধিকারগত বৈষম্য সে-কথাকেই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু বিশদভাবে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়নি।

বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির তারতম্যে অবস্থার তারতম্য ঘটে এ কথা স্বীকার করেন প্রাবন্ধিক। তবে অধিকারের সাম্য থাকা আবশ্যিক এই জন্যও প্রবন্ধটির শেষ বাক্য—"সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি।"

১.৫ বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

☐ প্রথম পরিচ্ছেদ

'সংসার বৈষম্য পরিপূর্ণ', 'পরস্পর বৈষম্য জ্ঞান মনুষ্যমণ্ডলীর কার্য্যের একটি প্রধান প্রকৃতিমূল' এই দুই উপপাদ্য থেকে বৈষম্যের শ্রেণিবিভাগ করেছেন, (১) প্রাকৃতিক বৈষম্য (২) অপ্রাকৃতিক বৈষম্য;—অপ্রাকৃতিক বৈষম্যকে আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন, সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। 'সমাজের উন্নতিরোধ ও অবনতির যে সকল কারণ আছে, অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার প্রধান। ভারতবর্ষের যে এতদিন হইতে এত দুর্দশা, সামাজিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট কারণ,—অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে স্পষ্ট বীতরাগ জানিয়ে বলেছেন, বৈষম্যের ফলেই বিপ্লব সংঘটিত হয়, প্রসঙ্গত ফরাসী বিপ্লবের কথা বলেছেন। বৈষম্যের পরিবর্তে সমাজে সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনতে সশস্ত্র বলের থেকে 'বাক্যবলই' যে কাঙ্ক্ষিত,—এ দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা বলে বুদ্ধ, যিশু, রুশোর ঐতিহাসিক অবদানের আলোচনা করেছেন, তাঁর মতে পৃথিবীতে এই তিনজনই প্রকৃত 'সাম্যাবতার'।

☐ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বের ফ্রান্সের বৈষম্য পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক সামাজিক জীবনের ভয়াবহ ছবি এঁকেছেন এবং সেই তথাকথিত বৈষম্যের স্থলে সাম্য সংস্থাপিত করতে রুশো যে কি ভূমিকা নিয়েছিলেন, তারই মূল্যায়ন করেছেন, বিশেষত 'সামাজিক চুক্তি মতবাদ'-এর,—"তিনি মহিমাময় লোকহিতকর নৈতিক সত্যের সহিত অনিষ্টকারক মিথ্যা মিশাইয়া, সেই মিশ্র পদার্থকে আপনার অদ্ভুত বাগিন্দ্রজালের গুণে লোকবিমোহিনী শক্তি দিয়া, ফরাসীদিগের হৃদয়াধিকারে প্রেরণা করিয়াছিলেন।....... সকল ফরাসী তাঁহার মানস শিষ্য হইল। তাহারা সেই শিক্ষার গুণে ফরাসী বিপ্লব উপস্থিত করিল।" আবার, "ভূমিসাধারণের—এই কথা বলিয়া রুশো যে মহাবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার নিত্যনূতন ফল ফলিতে লাগিল। অদ্যাপি তাহার ফলে ইউরোপ পরিপূর্ণ। 'কম্যুনিজম' সেই বৃক্ষের ফল। "ইন্টারন্যাশনল' সেই বৃক্ষের ফল।" এরপরেই তিনি সমকালীন পশ্চিম ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাগুলির অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। সারিবদ্ধভাবে এনেছেন সাইমন-কুরিয়র-ওয়েনের সঙ্গে প্রুঁধো এবং ব্ল্যাঙ্ককে; প্রুঁধোর 'The Philosophy of poverty'-র (1847) লেখেন, তখন থেকেই সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর চিড়-রেখাটা স্পষ্ট কাটলে রূপ নেয়, আর ব্ল্যাঙ্ক ১৮৭১-এর প্যারী কমিউনের অন্যতম নেতা ও বিধায়ক (ভোটে ভিক্টরহুগোকে পরাজিত করেছিলেন) হওয়া সত্ত্বেও কালের বিচারে সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের তিনি ক্ষতিই করেছিলেন,—যদিও রাজনৈতিক এসব ঘটনাবলী বঙ্কিমচন্দ্রের জানার কথা নয়, সেদিন কলকাতার বুকে বসে জানা সম্ভবই ছিল না, যদিও বঙ্কিমচন্দ্র 'The Spectator', 'The Westminister Review', 'Black Wood's Magazine' প্রভৃতি বিলিতি পত্র-পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবাহটিকে দেখেছিলেন তাত্ত্বিক দিক থেকেই,—'Letters on England' (1866), 'Observation on Economic, Political and Social life in England (1867) গ্রন্থদ্বয়ে ইংল্যান্ডের উনিশ শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির উদ্‌ঘাটন করে জন অভ্যুত্থানের যে স্বপ্ন উদ্ভিন্ন করে তুলেছিলেন, তার ভিত্তিতে সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্ল্যাঙ্ককে কী ভাবেই বা চিহ্নিত করা যেতে পারতো? 'Principles of political economy' (1848), 'On

Liberty' (1859), 'On the Subjection of Women' (1869) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা জন স্টুয়ার্ট মিলকেও (১৮০৬-১৮৭৩) 'সাম্যতত্ত্বের উদ্‌গাতা' বলে অভিহিত করে এক্ষেত্রে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। সাম্য আন্দোলন বলতে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন, মানুষে মানুষে ভেদ অসমতা দূরীকরণের সমকালীন প্রয়াসগুলিকেই। পরিদৃশ্যগত ভেদাভেদগুলি কতক দূর করে, কতক সামঞ্জস্যের মধ্যে এনে 'পূর্বতন কুব্যবস্থার সংশোধন' করে 'সুব্যবস্থার প্রবর্তনই তো ছিল উনিশ শতকী বুর্জোয়া মানবতাবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার অভীষ্ট,—যার যাত্রা শুরু হয়েছিলো ইংলন্ডে, Reform Bill (1832), Emancipation of Slaves (1833), System of National Education (1834) কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ যা পরিপূর্ণ তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি পায় স্টুয়ার্ট মিলের নেতৃত্বে,—প্রাসঙ্গিক ভাবেই তাই বঙ্কিমচন্দ্র মিলকে উদ্ধৃত করেছেন।

☐ তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রচলিত ব্যবস্থাদির সংশোধন, বিশেষ করে সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের আশু যে সংস্কার দরকার, এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় তিনি বাংলার জমিদার ও কৃষক সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের উপস্থাপনা করেছেন। জমিদারী ব্যবস্থার জন্য উপস্বত্বভোগী নানান শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে—জমিদার-সরকার-আমলা এবং এইসব উপস্বত্বভোগীর ধারাবাহিক নিয়ত নতুন অত্যাচারে শোষণে বাংলার কৃষক, মোট জনসংখ্যার যারা 'নিরানব্বই' ভাগ, তারা যে সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে,—তারই হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। তাই 'জমীদার সম্প্রদায়ের প্রতি বক্তব্য' 'দুর্বৃত্ত জমীদার'দের 'দুর্বৃত্তি' ত্যাগ করান; দৃঢ়মূল বিশ্বাস, 'সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন, জমীদারদিগের দ্বারা অনেক সৎকার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে।'

☐ চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেশের জনসংখ্যার যে 'নিরানব্বই ভাগ' কৃষক,—তিনি কৃষকদের সামাজিক দুরবস্থা ও অর্থনৈতিক দুর্গতির উৎস সন্ধান করেছেন। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 'সমাজ শ্রমোপজীবী' ও 'বুদ্ধ্যপজীবী' দুই শ্রেণীতে ভাগ হয়ে পড়ে,—তত্ত্বের অবতারণা করে দেখিয়েছেন 'লোকসংখ্যাবৃদ্ধি শ্রমাপজীবীদের মহৎ অনিষ্টের কারণ', এ ছাড়াও যদিও আছে তাদের নিজস্ব জীবনদর্শন, "ঐহিক সুখ সম্পর্কে নিস্পৃহতা,—কি ব্রাহ্মণ—কি বৌদ্ধ, কি স্মার্ত, কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন যে, ঐহিক সুখ অনাদরণীয়।" ইউরোপেও ধর্মযাজকগণ একসময় এই তত্ত্বই প্রচার করেছিলেন, কিন্তু রেনেসাঁস আন্দোলন বিশেষকরে ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকেই নানান কার্যকারণে সেই জীবনদৃষ্টি লোপ পেয়ে যায়, ঐহিক জীবন সম্পর্কে নতুন চিন্তা-তৎপরতা আসে এবং তারই সূত্রে আসে আধুনিক সভ্যতা,—যে সভ্যতা ভোগ্যপণ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে, 'সর্বদা নূতন নূতন সুখের আকাঙ্ক্ষা'র জন্ম দেয়,—ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে সেই সভ্যতারই মুখোমুখি হয় ভারত, ফলে ধনলিপ্সা, ধনসঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়ে,—'সমাজ উৎকট বৈষম্যাবস্থায় পতিত' হয়,—'অধস্তন শ্রেণী, হয়ে ওঠে 'শ্রমোপজীবী'। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস, সমাজ পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়েই অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলে," যেমন এক ভাণ্ড দুগ্ধে এক বিন্দু অম্ল পড়িলে, সকল দুগ্ধ দধি হয়, তেমনি সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দুর্দশায় সকল শ্রেণীরই দুর্দশা জন্মে।" সিদ্ধান্তে এসেছেন, ভারতীয় জীবনের এই অনিষ্টকারক বৈষম্যবিশেই ভারতীয় জীবন দুর্দশাগ্রস্ত,—ইউরোপ ষোড়শ শতাব্দী থেকে এই বৈষম্য দূরীকরণের জন্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়েই বর্তমানে সুখ-সমৃদ্ধি পেয়েছে, হয়েছে সভ্য।

☐ পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভারতীয় জনজীবনের পুরুষ-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক, সমাজে নারীর অধঃস্থ ভূমিকা নিয়ে সবিস্তারে

আলোচনা করেছেন। সমাজ যেমন এগিয়ে চলে সমতা-সামঞ্জস্যে, সংসারও তেমন এগিয়ে চলতে পারে পুরুষ-নারীর সমানাধিকারের মধ্য দিয়ে। ভারতীয় জনজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাই তাঁর প্রস্তাব,—

(ক) স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন।

(খ) পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার।

(গ) উপার্জনের অধিকার।

(ঘ) বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার।

এ বিষয়ে তাঁর মূলনীতি 'যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমত কার্যমাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে' করবার অধিকার, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে আছে। পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাই তাঁর ভর্ৎসনা,—"তুমি বিধানকর্তা পুরুষ, তোমার সুতরাং পোয়াবারো। তোমার বাহুবল আছে, সুতরাং তুমি এ দৌরাত্ম্য করিতে পার। কিন্তু জানিয়া রাখ , এ অতিশয় অন্যায়, গুরুতর এবং ধর্মবিরুদ্ধে বৈষম্য।........ স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্য পশুর ন্যায় বদ্ধ রাখার অপেক্ষা নিষ্ঠুর, জঘন্য, অধর্মপ্রসূত বৈষম্য আর কিছুই নাই। আমরা (পুরুষ) শতকের ন্যায় স্বর্গমর্ত্য বিচরণ করিব, কিন্তু ইহারা দেড়কাঠা ভূমির মধ্যে পিঞ্জরে রক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক, যাহা কিছু জগতে ভাল আছে, তাহার অধিকাংশে বঞ্চিত থাকিবে! কেন?"

১.৬ বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যভাবনার মূল কথা

ইউরোপে ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে শিল্পবিপ্লব ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় বুর্জোয়া উৎপাদনী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবীদের জীবন-পরিস্থিতি রুক্ষকঠিন হয়ে উঠতে থাকে; পুঁজির প্রভুত্বের সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে নিষ্ঠুর শোষণপীড়ন, অন্যদিকে বর্ধিত পরাক্রম নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠতে থাকে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধ আন্দোলন, লিঁয়োতে অভ্যুত্থান, চার্টিস্ট ধর্মঘট, সাইলেশিয়ায় তাঁতিদের হাঙ্গামা,—একেরপর এক ঢেউগুলি ঝাঁপিয়েই পড়তে থাকে। সংস্কারমূলক আইনগুলির দয়াদাক্ষিণ্য পেয়েও তাদের জীবন কশাইখানার শূকরদের থেকে বৈশি উন্নত হতে পারে না? বড় বড় শহরগুলিতে শুধু রুটির জন্যে দাঙ্গা হয়ে ওঠে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা; শ্রমিকশ্রেণী নিজস্ব অবস্থান, নিজস্ব কৃত্যাকৃত্যগুলি বুঝে নেবার জন্যে উদ্বেল হয়ে ওঠে। সেন্ট সাইমন-কুরিয়র-ওয়েনের মতবাদগুলি এই সময়-বৃত্তেই আন্দোলিত-আলোড়িত হয়ে চলে,—শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নানান প্রশ্ন জাগায়, ক্ষোভ জাগায়,—উত্তরণের পথানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে তোলে; একের সঙ্গে অন্যের মতপার্থক্য থাকলেও এঁরা (দার্শনিকেরা) সমকালীন বস্তুভিত্তিক জিজ্ঞাসাগুলি থেকে রীতিমত এক মীমাংসায় পৌঁছতে চান, দুঃখ-দারিদ্র্য-দুরবস্থার মধ্যে পতিত শ্রমিকশ্রেণীকে দেখতে পান, বিত্তবান মালিকশ্রেণীকে চিনতে পারেন, ব্যক্তিগত মুনাফা-মজুরি-শ্রম সম্পর্কিত ধারণাগুলিও তাঁদের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শ্রমিকশ্রেণীকে নতুন সমাজের স্রষ্টা হিসেবে দেখে বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রত্যয় ঘোষণা না করতে পারলেও সমাজের সবচেয়ে সংখ্যাবহুল ও সবচেয়ে দরিদ্রশ্রেণীর অবস্থা উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে পুঁজিবাদের বিকল্প সন্ধানের চেষ্টাও করে চলেন। রাজনীতির ভাষায় এঁরাই ইউটোপিয়ান সমাজতান্ত্রিক। এঙ্গেলস এঁদের সম্পর্কেই শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন, "জার্মান তাত্ত্বিক সমাজতন্ত্র কখনো ভুলবে না যে, তা দাঁড়িয়ে আছে তিনজন মনীষী সাঁ সিমো, কুরিয়ের আর ওয়েনের স্কন্ধে, তাঁদের মতবাদের সমস্ত উৎকল্পনা ও সমস্ত ইউটোপিয়া সত্ত্বেও যাঁরা সর্বকালের মহত্তম চিন্তানায়কদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা এমন সব সত্যের প্রতিভাদীপ্ত পূর্বানুমান করেছিলেন, যার সঠিকতা আমরা এখন দেখাচ্ছি বৈজ্ঞানিক দিক থেকে।"

সিদ্ধান্ত নেয়াই যায় সেন্ট সাইমন-কুরিয়র-ওয়েন-প্রুঁধোকে এঙ্গেলস-লেনিন যেভাবে দেখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের

সেভাবে দেখার প্রশ্নই ওঠেনা,—ভারতবর্ষের ত্রিসীমানার মধ্যে তখন শিল্পের দূরশ্রুত পদধ্বনিও শোনা যায়নি, শ্রমিক শ্রেণিরও জন্ম হয়নি,—তবুও বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের সন্ধান রেখেছেন, নিজেদের সমাজের অধস্তন শ্রেণির দুঃখ কষ্টের প্রাসঙ্গিকতায় এঁদের চিন্তাভাবনা দ্বারা আলোড়িত হয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর সর্বাপেক্ষা স্পর্শকাতর জায়গা,—'অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।' এই ক্ষুধার প্রশ্নে বেঁচে থাকার প্রশ্নে শ্রমিক কৃষকে তিনি কোন পার্থক্যই দেখতে পান নি। তাঁর এই স্পর্শকাতর জায়গাটি যাঁরাই ছুঁতে পেরেছিলেন, তাঁরাই হয়ে উঠেছিলেন সমাজতান্ত্রিক, বুদ্ধ-যিশু-রুশো-প্রুঁধো-মিল নির্বিচারে সবাই।

যদিও জন স্ট্যুয়ার্ট মিল সম্পর্কে তাঁর বিশেষ দুর্বলতা দেখা গেছে এই প্রবন্ধে। যে উপযোগিতাবাদের ভিত্তিতে মানুষের নৈতিক লক্ষ্য অর্জনই জীবনের চরমতম কথা বলে বেনথাম মনে করতেন, সেই বেনথাম পদ্ধতিরই সারভূত রূপ দেখতে পান মিলের মধ্যে; ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ ও নৈতিকতার উন্নয়ন,—মিলের এই দুটি দিকই তাঁকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল,—মিল যেমন ভাবতেন, প্রচলিত ব্যবস্থাদির সংশোধনের মধ্যে দিয়ে মানবজাতির প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব, বঙ্কিমচন্দ্রও তেমন ভাবতেন গুরুতর সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যের আধিক্যগুলি অপনোদিত হতে পারে ব্যক্তির সদিচ্ছার মধ্যে দিয়ে, প্রতিদিনের আত্মকর্ষণার মধ্যে দিয়ে নৈতিকতার বোধকে জাগিয়ে তুলে। মিলকে নিজের মত করে বুঝে নিয়েই তাই তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন।

(ক) 'বৈষম্য থাকাই উচিত'।

(খ) সমাজের দ্বিধাবিভক্তি 'মঙ্গলকর'।

তবে দুটির ক্ষেত্রেই আধিক্য যেন না ঘটে,—প্রচলিত ব্যবস্থাদির সংস্কারের মধ্যে দিয়ে 'অতিরিক্ত বৈষম্যে'র ক্ষেত্রটিকে ক্রমশ সঙ্কুচিত করে আনাই কাঙ্ক্ষিত।

বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও ইংরেজী শিক্ষার কল্যাণে বুর্জোয়া মানবিকতার তত্ত্ব আর সেই তত্ত্বের উদ্গাতারূপে মিলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল,—বঙ্কিমচন্দ্র মিলের দর্শনেই 'সাম্য' এর মীমাংসা খুঁজে পেয়েছেন, মিলই শেষাবধি থেকে গেছেন তাঁর গুরুরূপে, পথনির্দেশকরূপে। 'সাম্য'-এর 'উপসংহার'-এ 'জাতিগত বৈষম্য'-এর উল্লেখ করেও যে আলোচনা থেকে নিরত থেকেছেন, তার কারণ এইখানেই,—আলোচনা উঠলেই 'জেতাবিজেতা'র প্রসঙ্গ এসে যাবে, অবশ্যই ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষের কথা আসবে, আসবে মিলের প্রসঙ্গ,—কেন-না মিলই তো সিপাহী বিদ্রোহের পরেও ভারতে কোম্পানীর শাসন থাকার পক্ষে, উপনিবেশগুলিতে শক্তপোক্ত শাসন অব্যাহত রাখার যুক্তিতে বৃটিশ পার্লামেণ্টে জোর সওয়াল করেছিলেন। বৃটিশ ভারতের অবসান হোক বা কোনভাবে বৃটিশ শাসনের প্রতি ভারতীয়রা বিদ্বেষী হয়ে উঠুক, বঙ্কিমচন্দ্র কোনভাবেই চান নি, তা সত্ত্বেও প্রশ্নটিকে আলোচনার স্তরে এনে ঘৃতাহুতি দিতে চান নি,—'জেতাবিজেতা' সম্পর্ক নিয়ে নাড়াচাড়া করলেই অনেক কঠিন সত্য বেরিয়ে আসবে যা প্রকারান্তরে ইংরেজ বিরূপতাকেই জাগিয়ে তুলবে, পরন্তু নিজের ভূমিকাকেও করে তুলতে হবে আরো স্পষ্ট। ইংরেজ শাসনকে মেনে নিয়েও তখন তিনি চা ভেতরে ভেতরে ক্ষতবিক্ষত হয়ে চলেছেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পররাজ্য আগ্রাসনের প্রশ্নে 'ইহাই এখনকার international law। যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে' (কমলাকান্তের জোবানবন্দী)।

ভবতোষ দত্ত 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে বলেছেন "সাম্য প্রবন্ধে আসলে পরের মতের, বিশেষত মিলের মতের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কি আছে? আর যা আছে, তা তিনি 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।" কেউ কেউ আরও বলেছেন, এই মিলের প্রভাব তাঁর শেষজীবনে তেমন ছিল না, এবং বিশেষত ব্যক্তিত্ববাদী বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তির সম্যক্ অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে মনুষ্যত্বের শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হওয়া যাবে, বিশ্বাস করেই

বাইরের থেকে আরোপিত সাম্যতত্ত্বে আর বিশ্বাস করেন নি, একান্ত ভারতীয় হয়ে গীতার মধ্যে দিয়েই সেই কর্মযোগের সন্ধান পেয়েছেন, তাই সাম্যকে পরিত্যাগ করেছেন।

বঙ্কিম সম্পর্কিত এই ভারতীয়ত্বের তত্ত্ব সম্ভবত ঠিক নয়। অনুশীলন তত্ত্বে, ধর্মতত্ত্বে তিনি যে মনুষ্যত্বের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন, তাও তো মিলেরই প্রতিধ্বনি। মিলই তো 'Utilitarianism' গ্রন্থে বলেছেন, সামঞ্জস্যের অভাবেই দুঃখ আসে, অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই সেই দুঃখ অতিক্রম করা যায়, মানুষের সব দুঃখই দূর করা সম্ভব। সমাজের সুষ্ঠু বিধানে, ব্যক্তির শুভবুদ্ধিতে সবই করা যায়,—শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষার সম্যক্ অনুশীলনই মানুষের পূর্ণতালাভের একমাত্র পথ; বঙ্কিমের অনুশীলন তত্ত্বে এর থেকে বেশি আর কি আছে? বঙ্কিম-মনীষার বিচারে পাশ্চাত্য ও ভারতীয়ত্বের প্রাচীর খাড়া করা তাই যায়না। 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর ব্যাখ্যানে কতটুকু গীতা আছে, আর কতটুকুই বা সিলির 'Ecco Homo'র যীশুখৃষ্টের আধুনিক জীবনভাষ্যে আছে তা অনুসন্ধান করে লাভ কী। বঙ্কিমচন্দ্র জীবন সত্যকেই ধরতে চেয়েছেন,—যে সত্য জীবন্ত, বিকাশমান;—অতীত বা বর্তমান, দেশী বা বিদেশী—কোন কিছুতেই যার বীতস্পৃহা নেই।

'সাম্য'-এ এই জীবনের সন্ধানেই দেশীবিদেশী জ্ঞানবিজ্ঞানের পুঁজি আর বাস্তব অভিজ্ঞতার জগৎ তোলপাড় করে তুলেছেন কিন্তু শুরুতেই এমন কতকগুলি স্থিরীকৃত প্রত্যয় ও বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন, যেখান থেকে নিষ্ক্রমণের পথ আর পান নি। যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণি সম্পর্কে তিনি কখনই শ্রদ্ধাশীল নন, কদাপি আস্থা রাখতে পারেন নি, যখন যেখানে পেরেছেন,—সে 'কমলাকান্ত'-তেই হোক বা 'লোকরহস্য'-তেই হোক,—সর্বত্রই শেষে বিদ্রূপে ভর্ৎসনায় তাদের অন্তঃসারশূন্যতাকে বিস্ফারিত করে দিয়েছেন, অথচ এখানে সেই বুধ্যপজীবীদের সবচেয়ে জটিল-কঠিন দায়িত্বটি পালন করতে দিয়েছেন,—ইতিহাসচর্চার মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্তে এসেছেন,—এই 'বুধ্যপজীবী' শ্রেণীই চিন্তা-শিক্ষা-বুদ্ধি দিয়ে সভ্যতাকে ক্রমাগত উন্নত করে চলে।—বর্তমানের 'বৈষম্যের পরিবর্তে সাম্য সংস্থাপিত করতে এরাই অগ্রণী ভূমিকা নেবে। অথচ যে 'বুধ্যপজীবী'র স্থানীয় প্রতিনিধি 'কেরানী, মাষ্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সংবাদপত্র সম্পাদক এবং নিষ্কর্মা।' যারা কি-না বঙ্কিমের শুধুই হাসি-ঠাট্টা-পরিহাসেরই লক্ষ্যবস্তু।

'সাম্য'-এর এইসব প্রকল্পিত-প্রত্যয় (hypothesis) ও সিদ্ধান্তগুলির বিভ্রান্তি ও স্ববিরোধিতা পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কাছেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল, ম্যাথু আর্নল্ড কথিত ভালো প্রবন্ধের যা গুণ 'precision, reason, and balance'—প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধে তিনি যা রক্ষা করে গেছেন, এক্ষেত্রে তারই ব্যত্যয় দেখেছেন, কিন্তু শুধু এই কারণেই যে, 'সাম্য'-এর পুনর্মুদ্রণে সম্মত হননি তা নয়; —তাঁর সামগ্রিক জীবন অন্বেষাই তখন সমষ্টির পথ ছেড়ে ব্যষ্টির পথ ধরেছে, ব্যক্তির পুর্ণতা অর্জনই হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনের ধ্রুব। ব্যক্তির মঙ্গাল ব্যক্তিকেই করতে হবে, বাইরে থেকে কেউ করে দেবে না,—সভ্যতার ইতিহাসই তো ক্রমোত্তরণের ইতিহাস,—ব্যক্তি তো তারই একক, ব্যক্তিকে অনিবার্যভাবেই সে-ই পূর্ণমান অর্জন করতে হবে;—নতুন করে সেই জীবনের প্রকল্প রচনা করার জন্যে দেশীবিদেশী গ্রন্থাদির পঠনপাঠনে অভিনিবিষ্ট হয়ে ওঠেন,—গীতা উপনিষদ সীলি কার্লাইল মিলের সংশ্লেষে (Synthesis) প্রস্তুত করেন তাঁর অনুশীলন ধর্ম, (doctrine of culture)—যা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মানবতাবাদের পূর্বাভাস। স্বাভাবিকভাবেই তখন আর বস্তুবাদী সমাজবীক্ষণে উৎসাহ রাখতে পারেন না, 'সাম্য'-এর তত্ত্বাংশটি প্রত্যাহার করে নেন।

একক ২ ❑ কৌতুকহাস্য ঃ কৌতুকহাস্যের মাত্রা ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ 'পঞ্চভূত' গ্রন্থটির পরিচয়

২.৩ 'পঞ্চভূত' : রচনারীতি

২.৪ প্রবন্ধদুটির নিবিড়পাঠ

২.৪.১ 'কৌতুকহাস্য'

২.৪.২ 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা'

২.৫ 'কৌতুকহাস্য' ও 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা'-র বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা ও সামগ্রিক বিশ্লেষণ

২.১ ❑ প্রস্তাবনা

সাহিত্য-আলোচনার ক্ষেত্রে একজন আলোচক যেমন একটি সাহিত্যকর্মকে সংজ্ঞায় বাঁধতে চেষ্টা করেন তেমনি একজন লেখক তাঁর রচনাকর্মকে সংজ্ঞার সীমানা-অতিক্রমী বৈশিষ্ট্য প্রদান করতে সচেষ্ট হন। একথা ঠিক, একজন লেখক সংজ্ঞা মিলিয়ে কখনওই কোনও সাহিত্য রচনাতে ব্রতী হন না। ফলে তাঁর রচনাটি সংজ্ঞা-নির্ধারিত হয়ে উঠেছে কি না, বা কেমন লিখলে তা সংজ্ঞা-নির্ধারত হবে সে-সম্পর্কে লেখকের কোনও সচেতন প্রয়াস থাকে তাও বলা যায় না। সাহিত্য বা শিল্প রচনার মধ্যে থাকে 'হয়ে-ওঠা'। তবে একজন বড় লেখকের লেখায় এমন কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকে যা তাঁর রচনা-বৈশিষ্ট্যকে জানান দেয়, তা সব সময় প্রচলিত সংজ্ঞার সীমানা-অতিক্রমী লেখা নাও হতে পারে। রচনাকর্মের প্রচলিত সংজ্ঞার সীমানা-অতিক্রমী প্রদানের কাজটি আসলে সহজ নয়। কিন্তু তবুও কোনও কোনও রচনার মধ্যে থাকে সেই অভিজ্ঞান; 'পঞ্চভূত' এরকমই একটি গ্রন্থ।

'পঞ্চভূত' গ্রন্থটিকে আমরা প্রচলিত সংজ্ঞায় প্রবন্ধ-গ্রন্থ বলে চিহ্নিত করলেও তাতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা প্রচলিত প্রবন্ধের সঙ্গে মেলে না। এজাতীয় গ্রন্থগুলির আস্বাদনের যেমন স্বাতন্ত্র্য আছে, তেমনি স্বাভাবিকভাবেই এর আলোচনাও রচনাকর্মের অনন্যতার কারণে একটু ভিন্ন পথ অনুসরণ করে।

২.২ 'পঞ্চভূত' গ্রন্থটির পরিচয়

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে, বাংলা ১৩০৪ সালে 'পঞ্চভূত' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। 'কৌতুকহাস্য' ও 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' রচনাদুটি গ্রন্থটির অন্তর্গত। 'সাধনা' পত্রের তৃতীয় বর্ষের ১৩০১-এর পৌষ সংখ্যায় প্রথমটি এবং ১৩০১-এর ফাল্গুন সংখ্যায় দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থের অন্যান্য রচনাগুলিও——'পরিচয়', 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ', 'নরনারী', 'পল্লিগ্রামে', 'মনুষ্য', 'মন', 'অখণ্ডতা', 'গদ্য ও পদ্য', 'কাব্যের তাৎপর্য', 'প্রাঞ্জলতা', 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ', 'ভদ্রতার আদর্শ', 'অপূর্ব রামায়ণ', 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল', সাধনা'র ১৩০০—১৩০১-এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালে কোন কোন রচনার শিরোনামে ছিল 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় স্বীয় রচনার সংস্করণে নিরত থাকতেন পরিমার্জনা-পরিবর্জন-সংযোজনা নিয়ে, এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। ১৩১৪-এর বৈশাখে প্রকাশিত 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়েছিল রচনাগুলি। যদিও সাধারণ্যে পরিচিত থেকেই গিয়েছিল 'পঞ্চভূত' নামেই।

ডায়েরির সংজ্ঞা ও পঞ্চভূত :

ডায়ারি বা Diary কথাটি সদ্যতন বাংলা হয়ে উঠলেও কথাটি বিশুদ্ধ ইংরেজি। এসেছে ল্যাটিন Dies শব্দ থেকে ইংরেজি Day ইংরেজিতে অর্থ করলে বলতে হয় a daily record, আরও ছড়িয়ে করলে বলতে হয় a book for noting daily engagement, duties, etc, বাংলায় বলা যায় দিনপঞ্জি বা রোজনামচা। ডায়ারি রচনা করা হয় একেবারে নিজের জন্যে। যার ভাষা অনেক সময় হয় ডট ডট কন্টকিত, সাংকেতিক। ভবিষ্যতের নিজস্ব কাজকর্মের প্রস্তুতিতে বা ব্যবহারিক জীবন থেকে পাওয়া নানা দুঃখবেদনা প্রত্যাশা-ভঙ্গের কষ্টকে দেগে রাখতে বা আনন্দঘন বিস্ময় ও নিবিড় অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে পরবর্তী জীবনের লেখালেখির উজ্জীবন ঘটাতেও এই ধরনের দিনলিপি রচনা করে যান লেখকেরা—বাংলা সাহিত্যের বড়ো লেখকেরা ডায়ারি রচনা করে গিয়েছিল। ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে জীবনানন্দ দাশের ডায়ারি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়ারি, সতীনাথ ভাদুড়ীর ডায়ারি, সবার ঊর্ধ্বে তো আছেই বিভূতিভূষণের একাধিক ডায়ারি। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও দুই গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে, যা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছিল 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী', 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী।' ডায়ারি সংক্রান্ত সমস্ত আলোচনার এক ধরনের নিষ্পত্তি ঘটে যায় 'পঞ্চভূত অন্তর্গত 'পরিচয়' প্রবন্ধটির সূত্রে। আলোচনার পরিসরটিকে জিইয়ে রেখেও তিনি স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন কাকে তিনি 'ডায়ারি' জাতীয় রচনা বলেন, কাকে বলেন না। আধুনিক কালের যে কোন কবি-লেখক-প্রাবন্ধিক অল্পবিস্তর সাহিত্যের প্রকরণগুলি জানেন, এবং লেখালিখিতে রত হন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এ বিষয়ে প্রথম শ্রেণির থিয়োরিস্ট বা তত্ত্ববিদ্।

ডায়ারি' সম্পর্কে তাঁর প্রথম কথা, ডায়ারিকে সাহিত্যের রসাস্বাদের বিষয়বস্তু করা যায় না। ডায়ারির অন্তর্গত জীবন এবং যাপিত-জীবনের সেই-সব দিনলিপি একে অন্যের প্রতিনিধিত্ব করে না। দুয়ের মধ্যে থাকে স্পষ্ট বিরোধ। তাঁর ভাষায় 'জীবনের গতি স্বভাবতই রহস্যময়, তাহার মধ্যে অনেক আত্মখণ্ডন অনেক স্বতোবিরোধ, অনেক পূর্বপরের অসামঞ্জস্য থাকে।' অর্থাৎ বিশুদ্ধ ডায়ারি, যদি অর্থবোধে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে না, তবে সে হয় বস্তুগত। একেবারে নিখাদ খনিজ। অন্যদিকে ডায়ারিকে যদি প্রকাশযোগ্য করতে হয়, তবে তাকে একটা সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করতে হয়, যাতে বিরোধের মীমাংসা ঘটবে, অসামঞ্জস্য দূরীকৃত হয়ে একটা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে উপনীত হবে, যা প্রকারান্তরে দার্শনিক প্রতীতি থেকে জীবনবাণীর বাহক হবে। সমসাময়িক সময়ে লেখা 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী' গ্রন্থের ভূমিকায় সুহৃদয় শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে এই মনোভাবের কথাটিই আর এক ভাবে ব্যক্ত করেছেন, 'অনেক দিন থেকে ইচ্ছা ছিল য়ুরোপীয় সভ্যতার ঠিক মাঝখানটাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে একবার তার আঘাত আবর্ত এবং উন্মাদনা, তার উত্তাল তরঙ্গের নৃত্য এবং কলগীতি, অট্টহাস্য করতালি এবং ফেনোচ্ছ্বাস, তার বিদ্যুৎবেগ, অনিদ্র উদ্যম এবং প্রবল প্রবাহ সমস্ত শিরা স্নায়ু ধমনীর মধ্যে অনুভব করে আসব।' অর্থাৎ তাঁর দিনযাপনের কালপঞ্জিকা হয়ে উঠবে সময়ের মন্থনক্রিয়া, একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে উঠবে সময়ে নির্গলিত প্রবাহটিকে পরিবেষন করা। যে কারণে তিনি ডায়ারি-ধর্মী রচনা কম লেখেননি—— 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী', 'জাপানযাত্রী', 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', 'জাভা-যাত্রীর পত্র', 'রাশিয়ার চিঠি', 'পারস্যে', 'পথে ও প্রান্তে', কোথাও তিনি সেভাবে স্থান-দিন-তারিখকে গুরুত্ব দেননি, কোথাও কোথাও সবিস্তারে বলেছেন বটে কিন্তু তা করেছেন গ্রাহকজনের কাছে নিজের জীবন-বানীর প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা বা গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতেই, জীবনের কূটিল আবর্তনের গতি-প্রকৃতিকে চিনে-বুঝে আমাদের মগজ-মেধার চলিষ্ণুতায় সময়ের সংযোগ ঘটাতেই।

পঞ্চভূত রচনার অন্তর্গূঢ় কারণ :

সবকিছুই 'নিয়মের ফল'—— অবশ্যই যে কোন ধরনের রচনাও। 'পঞ্চভূত'এর ষোলটি প্রবন্ধ নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলে দেখা যাবে এর পাঁচটি চরিত্র ক্ষিতি, স্রোতস্বিনী, দীপ্তি, সমীর ও ব্যোম তাদের

মধ্যে নিরন্তর তর্কাতর্কি করে চলেছে 'সত্য' এর উদঘাটনে। যে-সত্য অবশ্যই ব্যক্তি নিরপেক্ষ নয়, ব্যক্তি সাপেক্ষ। অর্থাৎ ক্ষিতির কাছে যা পরম সত্য, তা ব্যোমের কাছে গ্রহণীয় নয়—— দীপ্তি স্রোতাস্বিনী সমীরের কাছে সেই সত্য গ্রহণেও নানা বাধা আছে, গ্রহণবর্জনের প্রাসঙ্গিকতা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের প্রতি দায়বন্ধ—— 'ধর্মশপথ' নিয়েছে সভ্যতার অভিমুখকে তর্কাতর্কির মধ্যে দিয়ে 'নিষ্কাশিত অমিলতার মতো' শাণিত-সুন্দর করবার জন্যে, মনুষ্যত্বের অর্জনকে ফলপ্রসূ করে তোলবার জন্যে আমাদের জীবনযাপনের সর্বাঙ্গীন প্রক্রিয়া থেকে 'অনাবশ্যককে পরিহার' করে 'আবশ্যকের সঞ্চয়'কে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করবার জন্যে প্রয়াসী থেকে যাবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'মানুষের সহিত জড়ের সম্বন্ধ লইয়াই সংসার নহে, মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধটাই আসল সংসারের সম্বন্ধ। কাজেই বস্তুবিজ্ঞান যতই বেশি শেখ-না কেন, তাহাতে করিয়া লোকব্যবহার-শিক্ষার কোনো সাহায্য করে না। কিন্তু সেগুলি জীবনের অলংকার, যাহা কমনীয়তা, যাহা কাব্য, সেইগুলিই মানুষের মধ্যে যথার্থ বন্ধন স্থাপন করে, পরস্পরের পথের কন্টক দূর করে, পরস্পরের হৃদয়ের ক্ষত আরোগ্য করে, নয়নের দৃষ্টি খুলিয়া দেয় এবং জীবনের প্রসার মর্ত হইতে স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তারিত করে।' ('পরিচয়'—'পঞ্চভূত') কিন্তু তাঁর অন্বেষায় ছিল একালের বিজ্ঞাপন-বিপণনের সেই 'Complete Man' । 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' এর বহুবিধ নজির, বাংলা সমাজজীবনের পরিশ্রমী বিশ্লেষণ, বিশেষজ্ঞদের অভিমত সে-রকমই কথা বলে।

বাংলার তথাকথিত 'নবযুগ' বা 'রেনেসাঁস' এর চরিত্র নিয়ে তর্কাতর্কি বহুদিনের—— কাদের 'নবযুগ' বা 'জাগরণমঞ্চ' হয়ে উঠেছিল, তার সীমা-পরিসীমা কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল এ-সব কথা তো আছেই, সাম্প্রতিককালের ধৃতিকান্ত লাহিড়ি চৌধুরীর মতো বিদ্বজনেরাও যখন প্রশ্ন তোলেন, তথা মধ্যবিত্ত সমাজ তো দূর অস্ত, সেটা কী আদৌ সুতানুটির ভূগোল অতিক্রম করতে পেরেছিল? (২৮শে মে ২০০৫, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা)

উদ্যত প্রশ্নটি অধিকতর গুরুত্ব পেত যদি-না ১৩১৫ সালে মৈমনসিংহ থেকে প্রকাশিত কেদারনাথ মজুমদারের গবেষণা সমৃদ্ধ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, গ্রন্থটি দিলীপ মজুমদারের সুসম্পাদনায় সাম্প্রতিক সময়ে পুনর্মুদ্রিত হত। এই গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়ে কেদারনাথ ১৮১৭-১৮ থেকে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিশতাধিক সাময়িক পত্র-পত্রিকার একটি তালিকা দাখিল করেছেন। তালিকাটি অসম্পূর্ণ হলেও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দেরি হয় না— সুতানুটির ক্ষুদ্র পরিসর থেকেই শুধু নয়, কলকাতা ও কলকাতাকেন্দ্রিক মফস্বল থেকে শুরু করে বর্ধমান, শ্রীরামপুর, কৃষ্ণনগর হালিশহর, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, জয়নগর, ঢাকা, বরিশাল, আসাম, উৎকল থেকেও প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও ঠিকই পত্র-পত্রিকাগুলির গ্রাহক সংখ্যা ছিল অতিস্বল্পই। যেমন 'জ্ঞানান্বেষণ' এর মতো পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ছিল কুল্যে ৪৯ জন, 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার মতো জনসমাজে আলোড়ন পত্রিকাও কখন গ্রাহক ৭০০'বেশি পায়নি। তা সত্ত্বেও 'সুতানুটি কেন্দ্রিক জাগরণ' এর তথ্যটি খারিজ হয়ে যায়। নির্দ্বিধায় বলা যায় মেধা-মননের চর্চা নিয়ে চলমান জগৎ ও সভ্যতার আলোক পুট বা মজলিশ-সম্মিলনীর মধ্যে দিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছিল। নিখাদ তথ্য থেকেই জানা যায় সেকালের অনেক ধনকুবেররাই তাদের মজলিশ-মস্তির কেন্দ্রস্থল বাগানবাড়িতে এক-একটি নির্দিষ্ট দিনে সাহিত্য সম্মিলনীর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন। যেমন ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বাগানবাড়িতে 'সাহিত্য সমালোচনা সঙ্গ, নামে এক সভার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেখান থেকে আলাপ-আলোচনা তর্কাতর্কির ভিত্তিতে দ্বিভাষিক পত্রিকা 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রকাশিত হত। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে দর্জিটোলার নরনারায়ণ দত্তের বৃহৎ বাড়িতে 'বাঙ্গালা ভাষা অনুশীলনী সভা' নামের একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, যে-আসর থেকেই হাত মশ্‌কো করে বেরিয়ে আসেন সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা অক্ষয়কুমার দত্ত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিভা তো হট্টগোলে কবিওয়ালাদের আসরে আসরে অপচয়িত হয়েই যেত যদি-না পাথুরিঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদার অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা না-পেত। সংখ্যাগত পরিসংখ্যানের বিচার থেকে নয় সে-সব দিনের ঊণতা-ন্যূনতাকে পরিবর্তনের

গুণগত দিক থেকেই দেখতে হবে। কয়েক বছরের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অক্ষয়কুমার দত্তের যৌথ নেতৃত্বে তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাঙালির মননচর্চা ও সৃষ্টিশীলতার পরিমণ্ডলে যা এক যুগান্তরের সূচনা করে দেয়। ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার যখন সূচনা হয় তখনও রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়নি। তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথ কখন লেখালেখিও করেননি। কিন্তু তাঁর মানসিকতা গঠনে সমাজমনস্ক বৌদ্ধিক সত্তা গঠনে এই পত্রিকা মূল বনেদটাই যেন গঠন করে যায়। শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী থেকে শুরু করে নীহাররঞ্জন অবধি কৃতবিদ্যেরা যথার্থই উল্লেখ করেছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথকে সারাজীবন ধ্রুবতারার মতো আলো দেখিয়ে চলেছে. এখন সময় এসেছে পিতৃদত্ত সেই-আলোকের স্বরূপটিকে সম্যকরূপ বুঝে নেওয়ার, এবং সেই বুঝে নেওয়ার কাজে প্রবৃত্ত হতে হলে ঘুরে ফিরে আসবে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমারের যুগ্ম নেতৃত্বের কথা। তৎকালীন সারস্বতমণ্ডল তথা জ্ঞানানুশীলন তথা শিক্ষানবিশ পাঠক-লেখকদের একটা অয়স্কান্ত-মডেলই যেন তুলে ধরেছিল এই পত্রিকা। সূত্রাকারে বললে বলতে হয়,

(১) প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জ্ঞানের তথ্যবহুল প্রত্যয়নিষ্ঠ আলোচনার মহতী পরিমণ্ডল গড়ে তোলাই ছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সর্বপ্রধান প্রয়াস। যে কারণে জমিয়ে তুলেছিল বিতর্ক-বিজল্পের সঙ্গে নিবিড় আত্মচিন্তার পরিসর।

(২) ভালো লেখা লেখাতেই হবে। লিখতেই হবে। সেখানে কোন সুপারিশ বা পক্ষপাতিত্ব চলবে না। যে উদ্দেশ্য গঠিত হয়েছিল 'তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা প্রবন্ধ নির্বাচন সমিতি'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখকে নিয়ে যে কমিটির সদস্য ছিলেন আটজন। কম করে চারজনে ঐকমত্যে না-পৌঁছলে কোন লেখা মুদ্রিত করা যাবে না। প্রত্যেক পাণ্ডুলিপিতে নির্বাচক সমিতির সভ্যদের মন্তব্য সহ দস্তখত থাকতে হবে।

(৩) ব্যক্তির স্ফুরণ বা ব্যক্তির প্রভাব বৃদ্ধির জন্যে নয়, সামাজিক প্রয়োজনে নিয়োজিত করতে হবে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বিষয়ে যে-নজির সৃষ্টি করেছিলেন তা অনন্য। নিখাদ তথ্য থেকে জানা যায়, ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'জগবন্ধু' পত্রিকায় 'বেদ ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্র নহে' এই নামে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের বিরোধিতা করে মালিক-দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তকে একটি লেখা লিখতে বলেছিলেন, কিন্তু সে-লেখা অক্ষয়কুমার অস্বীকার করেন, কারণ তাঁর মত ছিল 'বেদ পৌরুষেয়'। অতঃপর সেই প্রবন্ধ লেখেন স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথই—— অক্ষয়কুমার মতাদর্শের সেই লড়াই থেকে সরে না-গিয়ে ব্রাহ্মসমাজের ব্যস্ত পরিসরে নিয়ে যান—— সমুজ্জ্বল বক্তৃতায় ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ সদস্যের মতকেও নিজের অনুকূলে টেনে আনেন—— দেবেন্দ্রনাথ অভিনিবিষ্ট নম্রতায় সে-মতের বিরোধিতা আর করেন না। মতান্বেষনী উদারতা ও চরিত্রের বলবত্তার এ এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। বাস্তবে তো দুজনের সম্পর্ক ছিল এক ধরনের শালিক-কর্মচারীরই। অক্ষয়কুমার দত্ত নিয়োজিত হয়েছিলেন ত্রিশ টাকা বেতনে, অবশেষে সেই বেতনই বাড়তে বাড়তে পৌঁছেছিল ষাট টাকায়, দুজনের মধ্যেকার মৌলিক বিরোধ কিন্তু এতটুকুও মন্দীভূত হয়নি। এ সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের সেই-স্বীকারোক্তিটি তো নিশ্চয় প্রত্যেকেরই জানা আছে, 'আমি কোথায় আর তিনি কোথায়? আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশপাতাল প্রভেদ। ফলতঃ আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি।'

প্রকৃতপক্ষে লেখক তৈরির সঙ্গে পাঠক তৈরির কাজও শুরু করে দিয়েছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যে-কারণে বিতর্ক-বিজল্পের ক্ষেত্রটিকে কর্ষিত রেখেছিলো। কোন গ্রাণ্ড ডিসকোর্স বা 'মহৎবাচন' তৈরি করে চিন্তাধারাকে প্রণালীবদ্ধ করতে চায়নি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবোধ পূর্ণতার পথে চলেছিল পিতৃদত্ত এই তিন গুণের সঞ্চালন

নিয়েই। প্রথমত নিবিষ্ট আত্মচিন্তার মধ্যে দিয়ে স্বরূপের ব্যাখ্যান বুঝে নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, ক্রমাগত সমন্বয় ও সংশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে অভিমুখ রচনা করে নিতে হবে, চেতনা-চিন্তার সম্যক ঋদ্ধি ও স্ফূরণের জন্যে দরকার ব্যাপক আত্মীয়করণ—— যাকে কোন ভাবেই অগ্রাহ্য করলে চলবে না, পৃথিবীর গঠনে সভ্যতার নির্মাণে, সত্তার সম্পন্নতায় একরৈখিকতার একশৈলিকতার কোন স্থান নেই। তৃতীয়ত পরমত বা ভিন্নমতকে সশ্রদ্ধায়, পরম মান্যতায় বিবেচনায় স্থান দেওয়া, যার আধুনিক নাম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, যা কিনা ভারতীয় জীবনধারারই প্রকৃষ্ট পরিচয়—— উল্লেখন নিয়ে প্রভাতকুমারের মতো মনীষী লেখকেরাও রবীন্দ্রনাথের জীবনে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিদাদার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতে মন্তব্য জুড়েছেন 'আমূল পরিবর্তনের হাওয়া বইয়ে দেওয়া' এই দুই-জ্যেষ্ঠের তথাকথিত নব্যপন্থার প্রতি প্রবল এক আকর্ষণবোধই রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ জীবনের দিগন্ত রেখা রচনা করে দিয়েছিল—— এ মন্তব্যে অতিশয়োক্তি আছে, দুই দাদার দ্বারা প্রবল ভাবে আকর্ষিত হলেও, পূর্বোক্ত সমন্বয়-সংশ্লেষণের পথ ধরেই জীবনের ছন্দিত রূপায়ণে আগ্রহী হয়ে চলেছিলেন। অথচ সেই কালবেলায় জীবনের নানাদিকের অনুশীলন-চর্চায় দেখেছিলেন অস্মিতাসর্বস্বতারই উন্মত্ত-উদ্দামতা। রাজনীতি তথা লোকমুক্তির ক্ষেত্রেও দেখেছিলেন সেই-উচ্চণ্ডতারই ফলিত প্রকাশ।

যে কারণে সেই সব দিনে সতত চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। ভারতীয় জীবনধারা তথা বঙ্গীয় জীবনধারা এ কোন দিকে চলবার জন্যে পাল তুলে দিয়েছে? অন্তরের গভীর সৌন্দর্যবোধ ও নিষ্কলুষ সমাজসচেতনতা থেকে সরে থেকে উচ্চনিনাদী পরমত অসহিষ্ণু অনিয়ন্ত্রিত অসুন্দর জীবনযাপন করা কী সম্ভব? যে ব্যথা রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রের অনেক পত্রেই গুঞ্জরিত হয়েছে। ছিন্নপত্রে' শহরের চেনা-ছকের বাইরে এসে দেশ দেখার একটা আনন্দ ব্যক্ত হয়েছে ঠিকই সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ তো ভাগ করে নেওয়ার সামগ্রী। দরকার প্রাণের সঙ্গী। যে-প্রাণ সহমত কথায় কথায় পোষণ না করলেও উদাত্ততার সঙ্গে ধৈর্যের সঙ্গে প্রেমের সঙ্গে নিজেকে নিরাভরণ ভাবে তুলে ধরে বা ধরবে। বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে চিঠি লেখেন, দিনপঞ্জি রচনার মতো করেই ইন্দিরা দেবীকে চিঠি লেখেন কিন্তু সঙ্গহীনতার বেদনা কী যায়। গল্প লেখার মালমশলা যত্রতত্র বটে, 'হিতবাদী' 'সাধনা' ইত্যাদি সাময়িকীর জন্যে লেখালেখির চাহিদাও আছে ঘনঘন তাগিদাও আছে কিন্তু তাতে প্রাণের তুষ্টি কী হয়? প্রাণের তুষ্টিসাধনে দরকার সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষজন। যাদের সঙ্গে নিরন্তর আলোচনা হবে, প্রবল তর্কাতর্কি হবে 'দেশের প্রতি ভালোবাসা' ও 'সমাজহিতৈষতার আদর্শ নিয়ে' 'মানব অস্তিত্বের বর্ণময় সমাহৃতি নিয়ে। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ১১ই অক্টোবর লোকেন পালিতের রাজশাহিতে জেলা-জজ হয়ে আসায় সে ধরনেরই এক আবেষ্টনী রচিত হয়ে যায়। রাজশাহি-নাটোরে তখন কিছু জ্ঞানী-গুণীদের বাসস্থল হয়ে উঠেছিল—— নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় তো ছিলেনই—— ছিলেন স্থানীয় আইনজীবী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়, কলকাতা থেকে প্রায়শই বায়ু পরিবর্তনে এসে থেকে যেন প্রমথ চৌধুরীও—— তর্কাতর্কির শুদ্ধ মজলিশ জমে উঠতে থাকে। কখনও আসর জমে উঠতে থাকে লোকেন পালিতের বাংলায়, কখনও বা নাটোরের মহারাজার হাভেলিতে। পঞ্চভূত-এর আইডিয়া গড়ে উঠতে থাকে। এখন রবীন্দ্রনাথের যত কথা বলার আছে, ততই কথা শোনারও আছে। পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী আলাপচারিতায় জানিয়েছেন পঞ্চভূতের 'জ্যান্ত ভূত'গুলির কথা—— একজন নাকি ছিলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, অন্যজন মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। বাকি তিনজনের মধ্যে তো থেকে যায় তিনটি নামই—— লোকেন পালিত, শরৎকুমার রায় এবং স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী মহাশয়।

এই প্রসঙ্গে কিছু তথ্য পাওয়া যায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের এক জায়গায়ঃ

"সত্যেন্দ্রনাথের (ঠাকুর) বাড়িতে জমে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সাহিত্যিকদের মজলিস। 'পারিবারিক স্মৃতি' নামে

এক খাতায় সাহিত্যিকরা লেখেন নানা বিষয় সম্বন্ধে নিজ নিজ মত ও মন্তব্য। একই বিষয়ে বহুজনের বহুমত হইতে পারে—পক্ষে ও বিপক্ষে; বিপরীত মত পোষণেও আপত্তি নাই, অদ্ভুত ঘটনাও লিপিবদ্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথ এই লেখকদের মধ্যে প্রধান—তাঁহার হাতে কোনো সাময়িক পত্রিকা নাই। নানা কথা নানা ভাবে মনে জাগে, এই খাতায় লিখিয়া যান আপনমনে; কেহ বা তার মধ্যে খুঁত ধরে, টিপ্পনী করে—তাহাতে বাদ-প্রতিবাদ হয়, লেখার উজ্জ্বল্য বাড়ে। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আছেন জ্যেষ্ঠদের মধ্যে; তা ছাড়া আসেন আশুতোষ চৌধুরী, তাঁহার ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র, কবি অক্ষয় চৌধুরী, সিভিলিয়ান লোকেন পালিত; ছোটদের মধ্যে আছেন সুরেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ। এই পাণ্ডুলিপিখানি ভালো করিয়া পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা মুখ্যত এই পাণ্ডুলিপির উপাদান ও আইডিয়া হইতে গৃহীত।"

২.৩ পঞ্চভূত : রচনারীতি

'পঞ্চভূত' গ্রন্থটি এক অভিনবরীতিতে উপস্থাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কথোপকথন আশ্রয়ী রচনা এটি। লেখক ছটি চরিত্রের পরিকল্পনা করে, সেই ছটি চরিত্রের একটি নির্দিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক আলোচনাকে আশ্রয় করে প্রবন্ধগুলি রচিত হয়েছে। তবে প্রবন্ধগুলি আবার কেবল ছটি চরিত্রের আলোচনার ধারাবিবরণী নয়। লেখকের পরিকল্পিত ছটি চরিত্রের মধ্যে পাঁচটি চরিত্র যে সকল তর্ক-বিতর্ক চালায় এবং অন্য চরিত্রটি এ আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ককে যে মীমাংসা বা সিদ্ধান্তের জায়গায় পৌঁছে দিতে চায় তা সরাসরি উপস্থাপিত হয়নি প্রবন্ধগুলিতে। একেকটি প্রবন্ধের মধ্যে উত্থাপিত আলোচ্য বিষয় ধরা পড়েছে ডায়েরিকে আশ্রয় করে। ভূত-সভার সভাপতি ভূতনাথবাবু তাঁর ডায়েরিতে উত্তমপুরুষের জবানিতে আলোচনাসভাটি যে-ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তা-ই হয়ে উঠেছে একেকটি প্রবন্ধ। ফলে 'পঞ্চভূত'-এর প্রত্যেকটি প্রবন্ধ যেন আলোচনাসভার আলোচ্য বিষয়বস্তুর বি-নির্মাণ।

বক্তব্যটি আরও একটু স্পষ্ট করা যাক। এ-জন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। গ্রন্থটির প্রথম প্রবন্ধ 'পরিচয়' ও ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। এই প্রবন্ধটিতে ডায়েরি সম্পর্কে কিছু অভিমত প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে। এর মধ্যে প্রবন্ধের 'আমি' অর্থাৎ ভূতনাথবাবুর বক্তব্য অনুসরণ করা যেতে পারে। ভূতনাথবাবু জানিয়েছেন—

(১) "ডায়েরি একটি কৃত্রিম জীবন। কিন্তু যখনই উহাকে রচিত করিয়া তোলা যায়, তখনই ও আমাদের প্রকৃত জীবনের উপর কিয়ৎ পরিমাণে আধিপত্য না করিয়া ছাড়ে না। একটা মানুষের মধ্যেই সহস্রভাগ আছে, সবকটাকে সামলাইয়া সংসার চালানো এক বিষম আপদ, আবার বাহির হইতে স্বহস্তে তাহার একটি কৃত্রিম জুড়ি বানাইয়া দেওয়া আপদ বৃদ্ধি করা মাত্র।" (পঞ্চভূত, 'পরিচয়')

(২) "আমি নিজেকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিতে চাহি না। ভিতরে একটা লোক প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা, নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিষ্কৃত নিয়মে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ডায়ারি লিখিয়া গেলে তাহাকে ভাঙিয়া আর একটি লোক গড়িয়া আর একটি দ্বিতীয় জীবন খাড়া করা হয়।" (ঐ)

দুটি উদ্ধৃতিই ডায়েরি সংক্রান্ত, আর প্রতিটি প্রবন্ধই (আলোচ্য গ্রন্থের) ডায়েরির অনুলিপি; শুধু তাই নয়, ডায়েরিসংক্রান্ত অভিমত যে প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে সেটিই 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধের প্রথম প্রবন্ধ। ফলে সব মিলিয়ে ডায়েরি সংক্রান্ত এই অভিমতগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। ডায়েরি লেখার কাজের মধ্যে আছে জোড়-মেলানো। সেখানে সমস্ত বিরোধ, বৈপরীত্যের মীমাংসা প্রদানের প্রচেষ্টা থাকে। যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর তাগিদ থাকে। ফলে ডায়েরিতে উঠে আসা বিচিত্র ভাবনা একটি নির্দিষ্ট অভিমুখে ধাবিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন 'পঞ্চভূত'-এর একেকটি প্রবন্ধকে ভূতনাথবাবুর লিখিত ডায়েরি বলতে চান তখন একদিক দিয়ে তা প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা, নানা কাজ গেঁথে যেভাবে একটি জীবন গড়ে উঠেছে তার ওপর 'দ্বিতীয় জীবন' খাড়া করা।

এর ফলে প্রবন্ধগুলি ভূতসভার সঠিক অর্থে ধারাবিবরণী থাকে না, হয়ে ওঠে ভূতনাথবাবুর ভূতসভা সম্পর্কিত অভিমতের অনুলিপি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য তা নয়। নয় বলেই ভূতনাথ জানান—"এমন কথা লিখিব যাহা আমাদের সকলের। এই আমরা যে-সব কথা প্রতিদিন আলোচনা করি—"। অবশ্য ভূতনাথ জানিয়ে দেন সে ডায়েরি সত্যের অনুরোধে লেখা হবে না, 'আমি তোমাদের মুখে কথা বানাইয়া দিব।' মুখে কথা বানিয়ে দেবার অধিকার থাকাতে ভূতনাথবাবুর নিজস্য অভিমত প্রকাশের সুযোগ বেশি পান সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানে মনে রাখতে হয়, এখানে কল্পনা করা হয়েছে আরও পাঁচটি চরিত্র, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের স্বতন্ত্র স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের কথা জানিয়েছেন, ফলে তাঁদের মুখের কথাকে সেই চরিত্রের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হতে হয়।

অর্থাৎ ডায়েরির মধ্যে যে ব্যক্তিগত স্বরের প্রাধান্য তাকে যেমন প্রয়োজনে ব্যবহার করছেন লেখক, আবার প্রয়োজনে তার সীমানাকে ভাঙছেনও। প্রতিটি প্রবন্ধই ভূতনাথবাবুর ডায়েরির অনুলিপি—এই ভাবনার মধ্যে আছে ব্যক্তিগত স্বরের প্রাধান্য। কিন্তু প্রতিটি প্রবন্ধই একটি নির্দিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক। বিষয় যেখানে নির্দিষ্ট হয়ে যায় সেখানে তা একান্ত ব্যক্তিগত থাকতে পারে না, বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার প্রবণতা এখানে জাগ্রত হয়। আবার সেই বিষয় সম্পর্কে কেবল ভূতনাথবাবুর অভিমত প্রকাশের সুযোগ নেই, আছে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের অভিমত প্রকাশের অবকাশ। ফলে প্রবন্ধের বিষয়বস্তুতে বিভিন্ন মাত্রা সংযুক্ত হয়, উঠে আসে বহুস্বর। আবার এই বহুস্বরকে যেভাবে ভূতনাথবাবু সজ্জিত করেন, যার ফলে একটি সিদ্ধান্তের অভিমুখে প্রবন্ধটি ধাবিত হয় বা পৌঁছয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভূতনাথবাবুর জবানিতেই তা শেষ হয়। তাতে ভাবনার বৈপরীত্য, অসামঞ্জস্যগুলি প্রবন্ধটির পর্বে পর্বে যেমন চেনা যায়, তেমনি ঐক্যের তানটিও ধরে নিতে পারি। প্রবন্ধের চেনা-আদল এইভাবেই অতিক্রম করে যায় 'পঞ্চভূত'।

২.৪ প্রবন্ধ দুটির নিবিড় পাঠ

২.৪.১ কৌতুক হাস্য

এক শীতের সকালে উপভোগ্য সমীর, ক্ষিতি আর ব্যোম—ভূত-সভার তিন পুরুষ সদস্য তখন সবেমাত্র একত্রিত হয়েছেন। সমীর চাপানে রত, ক্ষিতি খবরের কাগজ পাঠে নিবিষ্ট, আর ব্যোম এক উজ্জ্বল নীল-সবুজ মিশ্রিত গলবন্ধ মাথায় জড়িয়ে, হাতে একটা অস্বাভাবিক মোটা লাঠি হাতে উপস্থিত।

ঠিক এই সময় স্রোতস্বিনী ও দীপ্তি অল্পদূরে দরজার সামনে পরস্পরের কটিবেষ্টন করে কী একটা রহস্য প্রসঙ্গে বারবার হেসে উঠছিলেন। ক্ষিতি এবং সমীরের মনে হল ব্যোমের উৎকট রঙের গলাবন্ধ এই হাস্যরসোচ্ছ্বাসের কারণ। কিন্তু ব্যোম জানান অন্যকথা। ব্যোমের মতে তাঁদের এই হাসির পিছনে কারণ-অনুসন্ধান অর্থহীন, কারণ তাঁর মনে হয় মেয়েরা অল্প কারণে যেমন কাঁদতে জানে, তেমনি অকারণে হাসতে জানে। কারণ ব্যতীত কাজ না হওয়ার নিয়মটা কেবল যেন পুরুষদের বেলাতে খাটে, মেয়েদের নয়।

সমীর জানান যে কেবল মেয়েদের হাসি নয়, হাস্যরসটিই তাঁর কাছে মনে হয় অসংগতিসূচক। দুঃখে কাঁদা আর সুখে হাসা সহজবোধ্য ব্যাপার, কিন্তু কৌতুকে আমরা হাসি কেন? কৌতুককে তো ঠিক সুখ বলা যায় না। মোটা মানুষ চৌকি ভেঙে পড়লে আমরা সুখ অনুভব করি না, অথচ হাসির কারণ হয়ে ওঠে—এ কথা পরীক্ষিত সত্য।

কৌতুকে হাসি কেন,-এই প্রশ্নটি যেমন জরুরি তেমনি এরপরের প্রশ্ন হল এই যে, সে কারণেই হোক হাসি

কেন?—এ-কথা জানালেন ক্ষিতি। অর্থাৎ হাসির কারণ নয়, হাসি ব্যাপারটির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চেয়েছেন তিনি। একটা কিছু ভালো লাগার বিষয় আমাদের সামনে উপস্থিত হলেই গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে অদ্ভুত শব্দ, মুখের সমস্ত মাংসপেশি বিবৃত হয়ে বেরিয়ে পড়ে দাঁতের পাটি—এটিই হাসি। মানুষের মতো ভদ্রজীবের পক্ষে এটি এসংগত ব্যাপার এবং অবমাননাকরও। ইউরোপের সমাজে যেমন ভয়ের চিহ্ন, দুঃখের চিহ্ন প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ করে তেমনি প্রাচ্য সভ্যসমাজে আমরা কৌতুকের চিহ্ন প্রকাশ করাটিকে অসংযমের পরিচয় মনে করি।

সমীর ক্ষিতিকে সমর্থন করেই জানালেন ঃ কৌতুকে আমোদ অনুভব একদিকে অযৌক্তিক, অন্যদিকে ছেলেমানুষি। কৌতুকরসের সঙ্গে আমাদের সৌন্দর্যবোধ, বুদ্ধিবৃত্তির কোনও সম্পর্ক নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি জানিয়েছেন যে একটি গানের কথা। গানটিতে আছে : শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাভঙ্গের পর সকালবেলায় হুঁকা-হাতে রাধিকার রাধিকার কুটিরে আগুনের প্রার্থনাতে উপস্থিত হয়েছেন। হুঁকা-হাতে শ্রীকৃষ্ণের এই যে মূর্তি কল্পনা তা সুন্দর ও নয়, আনন্দজনকও নয়। সমীরের তাই মন্তব্য আমাদের হাসি ও আমোদের কারণ অদ্ভুত ও অমূলক। ক্ষিতি আবার সমীরকে সমর্থন করে জানান, সুখ এবং কৌতুকের মধ্যে শ্রেণিগত পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির গৃহিণীপনাই এরকম—এক হাসির দ্বারা সুখ এবং কৌতুক দুটি কাজই সেরে ফেলা হয়।

ব্যোম অবশ্য ক্ষিতির সঙ্গে সহমত প্রদর্শন করেন না। বরং তিনি জানান যে সুখের হাসি আর কৌতুকের হাসির মধ্যে পার্থক্য আছে। সুখের হাসি স্মিতহাসি, আর কৌতুকের হাসি উচ্চ হাসি। কারণভেদে যেমন একই ইথারে আলোক ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, ঠিক সেরকম সুখহাস্য ও কৌতুকহাস্য একই উৎসজাত, কিন্তু কারণ ভেদে ভিন্ন। ইচ্ছা সঙ্গে অবস্থার অসঙ্গতি প্রকাশ পায়। আবার ট্রাজেডিতেও ইচ্ছার সঙ্গে অবস্থার অসঙ্গতি প্রকাশ পায়। বলা যায় অসঙ্গতি দুই শ্রেণির—একটা হাস্যজনক, অন্যটা দুঃখজনক। অসঙ্গতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখন কৌতুক বোধ হয়, আর গভীরতর স্তরে আঘাত করলে দুঃখ বোধ হয়। ভূতনাথবাবু শেষপর্যন্ত তাই জানান,—"স্থূল কথাটা এই যে, অসংগতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।"

২.৪.২ কৌতুক হাস্যের মাত্রা

কৌতুকহাস্য সম্বন্ধে ডায়েরিতে লেখা আলোচনা পাঠ করে শ্রীমতী দীপ্তি ভূতনাথবাবুর কাছে একটি লেখা পাঠান। সেই লেখাটিকে আশ্রয় করে ভূতনাথবাবু নতুনভাবে কৌতুকহাস্য সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন। 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধটি সেই অভিমতের অনুলিপি।

দীপ্তি ভূতসভার পুরুষ-সদস্যদের হাস্যসম্বন্ধে সিদ্ধান্তকে বলতে চেয়েছেন যুক্তিহীন, অপ্রামণিক। ভূতনাথবাবু জানান, হাস্য সম্পর্কে তত্ত্ব নিষ্কাশনের পরিকল্পনা সেই আলোচনাতে ছিল না, এই আলোচনা ছিল মানসিক পায়চারি।

দীপ্তি প্রশ্ন তুলেছেন যে ভূতসভার চার সদস্যের সিদ্ধান্ত সত্য হলে চলতে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট খেলে, কিংবা রাস্তায় যেতে যেতে অল্পমাত্রায় দুর্গন্ধি নামে এলে আমাদের হাসি পাওয়া, অন্তত উত্তেজনাজনিত সুখ অনুভূত হওয়া উচিত।

ভূতনাথবাবু এর উত্তরে জানান যে এই প্রশ্নের দ্বারা তাঁদের মীমাংসা খণ্ডিত হয়না, সীমাবদ্ধ হয় মাত্র। এই প্রশ্ন থেকে বোঝাযায় পীড়নমাত্রেই কৌতুকের উত্তেজনার জন্ম দেয় না; ফলে কৌতুক পীড়নের বিশেষ উপকরণটির উৎস সন্ধান করতে হয়।

জড় প্রকৃতির মধ্যে করুণরস বা হাস্যরস কিছুই নেই। বড়ো পাথর ছোটো পাথরে গুঁড়িয়ে ফেললেও আমাদের

চোখের জল আসে না, সমতলক্ষেত্রে হঠাৎ পাহাড় দেখতে পেলেও হাসি পায় না। জড় প্রকৃতির বাধা বিরক্তিজনক পীড়াজনক হতে পারে, কিন্তু কোনো স্থলেই কৌতুকজনক হয় না। সচেতন পদার্থের খাপছাড়া ব্যাপার ছাড়া শুষ্ক জড়পদার্থে আমাদের হাসির উদ্রেক করে না।

কৌতুক এবং কৌতূহলবৃত্তির মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক আছে। কৌতুহলের একটি প্রধান অঙ্গ নতুনত্বের লালসা, কৌতুকেরও প্রধান উপাদান নতুনত্ব। অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিকত্বের মধ্যে যে বিশুদ্ধ অভিনবত্ব আছে, সঙ্গতি বা স্বাভাবিকত্বের মধ্যে তেমনি নেই। আবার প্রকৃত অসঙ্গতি মনের ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত জড়পদার্থের মধ্যে তা নেই। পরিষ্কার পথে চলতে চলতে হঠাৎ দুর্গন্ধ নাকে এলে বুঝতে হবে নিশ্চয় কোথাও দুর্গন্ধ বস্তু আছে। জড়প্রকৃতিতে কোনো কার্য নিয়ম ব্যতিরেকে ঘটতে পারে না। কিন্তু পথ চলতে চলতে যদি দেখা যায় যে একজন মান্য বৃদ্ধ ব্যক্তি খেমটা-নৃত্য করছে, তবে সেটা প্রকৃতই অসঙ্গতির লক্ষণ, কারণ তা অনিবার্য নিয়ম সঙ্গত নয়। জড়ের ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছামত কিছু ঘটে না, ফলে জড়ের পক্ষে কিছুই কৌতুকাবহ হতে পারে না। কিন্তু বৃদ্ধ ব্যক্তিটি ইচ্ছা করে নাচছে, ইচ্ছা করলে না নাচতে পারত। ফলে এই জন্যই তা অসঙ্গত, আর এই অসঙ্গতি কৌতুকাবহ।

কৌতূহল জিনিসটি যেমন অনেকক্ষেত্রে নিষ্ঠুর, তেমনি কৌতুকের মধ্যেও রয়েছে নিষ্ঠুরতা। এখানে উদাহরণস্বরূপ এসেছে সিরাজউদ্দৌল্লা প্রসঙ্গ। কথিত আছে যে সিরাজউদ্দৌল্লা দুইজনের দাড়িতে দাড়িতে বেঁধে নাকে নস্যি পুরে দিতেন এবং দুইজনেই যখন হাঁচতে আরম্ভ করতেন তখন সিরাজউদ্দৌল্লা আমোদ অনুভব করতেন। এখানেও ইচ্ছার সঙ্গে কাজের অসঙ্গতি। যাদের নামে নস্যি দেওয়া হচ্ছে তাদের ইচ্ছা নয় যে তারা হাঁচে, কিন্তু তবুও তাদের হাঁচতেই হয়। এইরকম ইচ্ছার সঙ্গে অবস্থার অসঙ্গতি, উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের অসঙ্গতি, কথার সঙ্গে কাজের অসঙ্গতি, এগুলির মধ্যে নিষ্ঠুরতা আছে।

ব্যোম এইজন্য আগেই বলেছিলেন যে কমেডি এবং ট্রাজেডি কেবল পীড়নের মাত্রাভেদ মাত্র। ভূতনাথবাবু তাই বলেন যে কমেডিতে যতটুকু নিষ্ঠুরতা প্রকাশিত হয় তাতে আমরা হাসি, আর ট্রাজেডিতে তা সে মাত্রায় পৌঁছয় যাতে আমাদের চোখের জল আসে।

অসঙ্গতি কমেডি এবং ট্রাজেডি উভয়েরই বিষয়। কমেডিতে আমেদ এবং কৌতুককে সমীর সুখ বলতে নারাজ, বরং তাঁকে বলতে চান নিম্নমাত্রার দুঃখ। স্বল্প পরিমাণের দুঃখ ও পীড়ন আমাদের চেতনাতে যে আঘাত তৈরি করে তা একধরনের সুখের জন্ম দেয়। চড়ুইভাতিতে আমরা নিয়মভঙ্গ করে, বহু কষ্ট সহ্য করে, অসময়ে অনেক 'অখাদ্য' গ্রহণ করি; কিন্তু ভাই আমাদের কাছে আমোদ। আবার হুঁকা-হাতে রাধিকার কুটিরে উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি আমাদের ধারণাকে আঘাত করে। এই আঘাত ঈষৎ পীড়াজনক, কিন্তু যেটুকু পীড়া দেয় তা কৌতুক সৃষ্টি করতে পারে।

ক্ষিতি জানান, কৌতুকে আমরা যে কেবল উচ্চহাস্য হাসি তা নয়, মৃদু হাসি, এমনকী মনে মনেও আমরা হাসি অনেক সময়। মূল কথাটি হল এই, কৌতুক হল মনে উত্তেজনার কারণ, আর মনের এই অনতিপ্রবল উত্তেজনা আমাদের কাছে সুখজনক।

ক্ষিতি, সমীর এবং ব্যোমের এই তর্ক-বিতর্কের শেষে ভূতনাথবাবু তাঁর অভিমত পেশ করেছেন। ভূতনাথবাবু জানালেন, মনের অনুভব ক্রিয়া মাত্রই সুখজনক, যদি না তার সঙ্গে 'কোনো গুরুতর দুঃখভয় ও স্বার্থহানি মিশ্রিত

থাকে।' ছেলেরা ভূতের গল্প শুনে যে হৃৎকম্পের উত্তেজনা অনুভব করে তাও আনন্দজনক। আবার রামায়ণে সীতাবিয়োগে রামের দুঃখ, লিয়রের মর্মযাতনা—আমাদের মনে বেদনা উদ্রেক করে। দুঃখের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য থেকে বেশি সমাদর করি। কারণ দুঃখের অনুভব আমাদের চিত্তে বেশি আন্দোলন উপস্থিত করে।

ক্ষিতি ভূতনাথবাবুর মতামত থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন—'আমরা বেশ বুঝিয়াছি যে, কমেডির হাস্য এবং ট্রাজেডির অশ্রুজল দুঃখের তারতম্যের উপর নির্ভর করে—'।

১.৬ প্রবন্ধ দুটির সাধারণ আলোচনা

'কৌতুকহাস্য' ও 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা পরস্পরের পরিপূরক প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধটিতে যে আলোচনার সূত্রপাত দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে সেই আলোচনাটিরই বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধটিতে অংশগ্রহণকারী সদস্য ছিলেন চারজন, আলোচনাটি ছিল কথোপকথন আশ্রয়ী। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি কথোপকথন-নির্ভর নয়, দ্বিতীয়টিতে ভূতনাথবাবু—যেন জবাবদিহি করছেন। এই জবাবদিহি শ্রীমতী দীপ্তির কাছে। আসলে কৌতুক হাস্য সম্পর্কে সার্বিক পরিচয় উপস্থাপনের জন্য রবীন্দ্রনাথ এ-জাতীয় কৌশল অবলম্বন করেছেন।

একটি সাধারণ প্রসঙ্গ অবলম্বন করে আলোচনার গভীরে যাওয়ার যে পদ্ধতি তা 'কৌতুকহাস্য' প্রবন্ধটিতে বিদ্যমান। স্রোতস্বিনী ও দীপ্তির হাসি লক্ষ করে একটি গূঢ় আলোচনাতে ঢুকে পড়েছেন চারজন সদস্য;—আমরা হাসি কেন?

লক্ষ করলে দেখা যাবে আলোচনাটির কয়েকটি স্তর আছে। উপস্থাপিত বিচ্ছিন্ন ভাবনাকে ক্রমানুসারে সাজালে বক্তব্যটি সহজেই ধরা পড়ে।

ভাবনাক্রম—১

দুঃখে কাঁদা, সুখে হাসা সহজবোধ্য ব্যাপার, কিন্তু কৌতুকে হাসার কারণ অজ্ঞাত। কৌতুক ঠিক সুখ নয়, হাস্যরসটিই অসঙ্গতিসূচক।

ভাবনাক্রম—২

কৌতুকে আমোদ অনুভব অযৌক্তিক এবং ছেলেমানুষি। কৌতুকরস আমাদের সৌন্দর্যবোধ, বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত। অথচ প্রকৃতির গৃহিনীপনাই এরকম, এক হাসির দ্বারা সুখ এবং কৌতুকের কাজ সেরে ফেলা হয়।

ভাবনাক্রম—৩

সুখের হাসি এবং কৌতুকের হাসির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। স্মিতহাস্য সুখের হাসি, উচ্চহাসি কৌতুকের হাসি। একই উৎসজাত হলেও দুই হাসির প্রকৃতি ভিন্ন।

ভাবনাক্রম—৪

আমোদ এবং কৌতুক সুখ নয়, স্বল্পমাত্রার দুঃখ। মনের উপর স্বল্প পরিমান আঘাত ও পীড়া থেকেই কৌতুকরস সৃষ্টি হয়। চড়ুইভাতির নিয়মভঙ্গজনিত ক্লেশ আমোদের জন্ম দেয়, হুঁকা-হাতে দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণমূর্তি ধারণাকে যে সামান্য আঘাত করে তা কৌতুকের জন্ম দেয়।

ভাবনাক্রম—৫

গুরুতর দুঃখভয় ও স্বার্থহানি জড়িত না থাকলে অনুভবক্রিয়ামাত্রই সুখের। কৌতুক মনের মধ্যে হঠাৎ আঘাত করে আমাদের সাধারণ অনুভবক্রিয়া জাগ্রত করে।

ভাবনাক্রম—৬

কমেডিতে রয়েছে অল্পপীড়া যা দেখে আমরা হাসি, ট্রাজেডিতে রয়েছে অধিক পীড়া যা দেখে আমরা কাঁদি।

‘কৌতুকহাস্যের মাত্রা’ প্রবন্ধটিকে ‘কৌতুকহাস্য’ প্রবন্ধের পরিপূরক এ-কথা আমরা আগেই জানিয়েছি। প্রথম প্রবন্ধটির মধ্যে যে বিপরীত যুক্তিগুলো জাগ্রত হচ্ছিল সেগুলির উপযুক্ত জবাব রবীন্দ্রনাথ তৈরি করেছেন দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে। কমেডি ও ট্রাজেডি সম্পর্কে অভিমতে প্রথম প্রবন্ধটি শেষ হল, আর দ্বিতীয় প্রবন্ধটিও রবীন্দ্রনাথ শেষ করেছেন ট্রাজেডি-কমেডির কথাতে। আসলে প্রথম প্রবন্ধটিতে ট্রাজেডি-কমেডি সম্পর্কে অভিমতে সামান্য অগত্যা প্রয়োগ ছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে যেন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলেন।

প্রথম প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে কৌতুকের উৎসে রয়েছে সামান্য পীড়ক। আর এই প্রবন্ধটিতে দীপ্তির লেখার মধ্য দিয়ে প্রশ্ন তুললেন, পীড়নমাত্রই কি কৌতুকের উত্তেজনার জন্ম দেয়? তাহলে, হঠাৎ হোঁচট খেলে, রাস্তার নাকে এলে হাসি পাওয়া উচিত ছিল।

এই সূত্রেই প্রাবন্ধিক আমাদের জানিয়ে দিলেন কৌতুকপীড়নের বিশেষ উপকরণটির উৎসসন্ধান না করে এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত আসা উচিত নয়। জড় প্রকৃতিজাত পীড়ন হাস্যরস তৈরি করতে পারে না। কেন না, জড় প্রকৃতিজাত পীড়ন হাস্যরস তৈরি করতে পারে না। কেন না, জড় প্রকৃতিতে কোনও কিছুই অকারণ ঘটতে পারে না। ফলে জড়প্রকৃতির বাধা পীড়াজনক হলেও কৌতুকজনক হতে পারে না।

কৌতুকের উৎসে আছে অসঙ্গতি। যা সঙ্গত, স্বাভাবিক তা কৌতুকের জন্ম দিতে পারে না। জড়জগৎকে যেহেতু নিয়মে ব্যাখ্যা করা সম্ভব ফলে সেখানে অসঙ্গতিসূচক বলে কিছু থাকতে পারে না। ফলে অসঙ্গতি মনের ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। অর্থাৎ এখানে আমরা বুঝতে পারলাম—প্রথমত পীড়মাত্রই কৌতুকের উত্তেজনা দিতে পারে না। জড়প্রকৃতিজাত পীড়ন কৌতুকের জোগানদার নয়। দ্বিতীয়ত এই পীড়ন যে কৌতূকের দিচ্ছে তার কারণ অসঙ্গতি, সেই অসঙ্গতি মনের ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ কৌতুকহাস্য ব্যাপারটি একান্ত মনোজগৎজাত।

অসঙ্গতির সূত্র ধরেই অন্য একটি পর্যায়ে পৌঁছালেন প্রাবন্ধিক। এখানে অসঙ্গতি হল ইচ্ছার সঙ্গে অবস্থার অসঙ্গতি, কথার সঙ্গে কাজের অসঙ্গতি, উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের অসঙ্গতি, এগুলির মধ্যে আছে নিষ্ঠুরতা। ফলে বলা যায় কৌতুকের মধ্যেও রয়েছে নিষ্ঠুরতা।

আমরা সাধারণত ট্রাজেডির সঙ্গে দুঃখকে ও নিষ্ঠুরতাকে সংযুক্ত করে দেখি। কিন্তু কমেডিরও উৎসে আছে নিষ্ঠুরতা, আছে দুঃখ। রবীন্দ্রনাথ কৌতুকহাস্যকে বিশ্লেষণের নতুন মাত্রা করেছেন তারই অনুষঙ্গে। আলোচ্য প্রবন্ধদুটির মূল অভীপ্সাও সেটাই।

২.৫ ‘কৌতুকহাস্য’ ও ‘কৌতুক হাস্যের মাত্রা’র বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা ও সামগ্রিক বিশ্লেষণ

আলোচনাটির শুরুতে রবীন্দ্রনাথ একটি মুখবন্ধের অবতারণা করেছেন। কবির ভাষায় না বলে সহজ সরল এ কালের গদ্যে বলতে হয়, শীতের কুয়াশা ধীরে ধীরে কেটে সূর্য উঠছে, সূর্যের আতপ্ত রোদে ভোরবেলাটা ক্রমশই বেশি বেশি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। সমীর চা খাচ্ছে, ক্ষিতি খবরের কাগজ পড়ছে, ব্যোম গলায় একটি নীল-সবুজের পশমি গলাবন্ধে গলাটা পাকে পাকে জড়িয়ে একটা বেখাপ্পা মোটা লাঠি নিয়ে মজলিশে এসে দাঁড়াল অন্যমনস্ক ভাবে। ‘অন্যমনস্ক’ হয়ে থাকাটা তার চিরচারিত স্বভাবের মধ্যেই পড়ে কেননা জগৎসংসার মিথ্যে এ ধরনের একটা বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত প্রায়শই দুর্লক্ষ্য অসীম অনন্তলোকের ভাবনাচিন্তা নিয়ে থাকে। কিন্তু আজকের সকালে

তার সেই ধ্যাননিবিষ্টতা বেশিক্ষণ কার্যকরী থাকে না। কেননা মজলিসের অন্য দুই চরিত্র ঘনিষ্ঠ সখী বা আশ্রমিকদের মতো 'স্রোতস্বিনী এবং দীপ্তি পরস্পরে কটিবেষ্টন করিয়া কী একটা রহস্য-প্রসঙ্গে বারম্বার হাসিয়া অস্থির হইতেছিল।' চরিত্রে ক্ষিতি ঘোরতর বস্তুবাদী, দৃশ্যমান জগতের কার্যকারণের পারস্পরিক যোগাযোগের তত্ত্বনির্ণয়ে সদাই সে ব্যস্ত থাকে। তার জীবনভর প্রয়াসই—কী করলে ক্রমশ আবশ্যকের সঞ্চয় এবং অনাবশ্যকের পতিহারের' মধ্যে দিয়ে জগৎ জীবনটাকে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়া যায়। সমীরও চরিত্র অনুযায়ী জাগতিক কার্যকারণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্ণয়ে প্রয়াসী থাকে তবে তার এই জগৎ চর্চায় স্থূল ধরাতলই থাকে না, অধরা অন্তর্জগৎ ও খালাদিগন্তের খোলা বাতাসও অংশ নিতে থাকে। সুতরাং দুজনেরই কৌতূহল বাড়তে থাকে—সখীরা হাসে কেন? কার্যকারণটি কী? 'উৎকট নীল-হরিৎ পশমরাশি-পরিবৃত সুখাসীন নিশ্চিন্তচিত্ত ব্যোমই ঐ হাস্যরসোচ্ছ্বাসের মূল কারণ' বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চায়। ব্যোমের সম্বিৎ ফিরে আসে। সে কিছুটা বুঝতেও পেরে যায় বন্ধুদের মনোভাবটি। সে তারই দূরীকরণে চরিত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা দিতে মনস্থ হয়ে ওঠে, 'পুরুষ-জাতিকে পক্ষপাতী বিধাতা বিনা কৌতুকে হাসিবার ক্ষমতা দেন নাই কিন্তু মেয়েরা হাসে কী জন্যে তাহা দেবা না জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। চকমকি পাথর স্বভাবত আলোকহীন, উপযুক্ত সংঘর্ষ প্রাপ্ত হইলে সে অট্টশব্দে জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে। আর মানিকের টুকরো আপনা আপনি আলোয় ঠিকরাইয়া পড়িতে থাকে। কোনো একটা সংগত উপলক্ষের অপেক্ষা রাখে না। মেয়েরা অল্প কারণে কাঁদিতে জানে এবং বিনা কারণে হাসিতে পারে ; কারণ ব্যতীত কার্য হয় না, জগতের এই কড়া নিয়মটা কেবল পুরুষেরই পক্ষেই খাটে।' সে স্পষ্টই জানিয়ে দেয় সখীদ্বয়ের হাসির এই উচ্ছ্রিক্তৃতার কারণ সে নয়।

আলোচনা মোড় নিতে পারত পুরুষ-নারীর প্রকৃতি ভিন্নতা নিয়ে। আলোচনায় বকলমে যদিও কোন একটি চরিত্রের নেপথ্যে প্রমথ চৌধুরী আছেন। যে-প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্য। উনিশ শতকী য়ুরোপীয় চিন্তা-চেতনার মধ্যেই আমাদের বিদ্বজনের রসবেত্তারা যখন আবদ্ধ হয়ে ছিলেন, তখন প্রমথ চৌধুরীই বলতে পেরেছিলেন য়ুরোপ আর উনিশশতকে বসে-দাঁড়িয়ে নেই, সে ছুটছে বিংশশতকের সঙ্গে তালমিলিয়ে নতুন সংস্কার্যের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত নারীবাদী দর্শন তো দূরন্ত নারীজাগরণের আলোকটাও সেই ভাবে দিগন্তে রূপোলি রেখাঙ্কিত হয়ে ওঠেনি।

সুতরাং আলোচনা 'কৌতুকহাস্য' নিয়ে তত্ত্ব নিবিষ্ট হয়ে ওঠে।

সমীর নিজস্ব আলোচনা ছড়িয়ে চলে—— হাস্যরসটাই আমার কাছে কিছু অসংগত থেকে। দুঃখে কাঁদি মুখে হাসি এইটুকু বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু কৌতুকে হাসি কেন? কৌতুক তো ঠিক সুখ নয়।' প্রশ্ন উঠে আসে 'কৌতুক' নামক সঞ্চারণশীল আবেগটি কীভাবে উত্থিত হয়? কোন সংজ্ঞায় কি বাঁধা যায়? সমাজ-সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে, সমাজ ভেদে মান্যমানতার কী হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে? তৃতীয় প্রশ্নটাই মতামতের আলোড়ন অধিক আলোড়িত হয়ে চলে। কেননা একথাতো ঠিক 'আমাদের সমাজের প্রবীণরা কৌতুকরসকে 'ছ্যাবলামি বলেই ঘৃণা করিয়া থাকেন'। বিজ্ঞ-জ্ঞানীদের যথার্থ উপযুক্ত নয় 'ছেলেমানুষরাই উপযুক্ত' বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। কেননা আবেগকে রাখাই সুসভ্য বিজ্ঞ মানুষের পরিচিতি। তবুও সে-আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা মধ্যে মধ্যে ভয়ংকর কষ্টসাধ্যই হয়ে উঠে। যেভাবে সমাজজীবনের চলিতযুক্ততা এবং ব্যবহারিক জীবচর্যার মধ্যে দিয়ে অসংগতি-বৈপরীত্য অদ্ভুত-অমূলক অনেক কিছু উঠে আসে তাতে আমরা আলোড়িত হয়ে উঠি। এই-ধরণের আলোড়ন অস্বাভাবিক না হলেও আমাদের কাম্যতা 'অনর্থক সামান্য কারণ ক্ষণকালের জন্যে হলেও' বুদ্ধির এই পরাভব 'স্থৈর্য্যে এরূপ সম্যক বিচ্যুতি' থেকে যৎপরোনাস্তি দ্রুততায় আমরা যেন নিজ নিজ ভূমিকায় সুস্থ হয়ে উঠতে পারি। আমাদের শিষ্ট সমাজ আমাদের জীবনযাপনের এই প্রণালীই বেঁধে দিয়েছিল আমাদের জন্যে। আমাদের রক্তধারার মধ্যে আমাদের

সংসারের মধ্যে গড়ে দিয়েছিল এক যথাযোগ্যতা যথাপরিমিতিতা চিরাভ্যস্ততার নিয়মশৃঙ্খলা।

স্থানুসমাজে 'যথাযোগ্যতা যথাপরিমিতিতা চিরাভ্যস্ততার নিয়মশৃঙ্খলা' অটুট থাকলেও জঙ্গামিত সমাজে মধ্যে মধ্যে অসংগতি বিসদৃশ পন্থায় উঠে আসে। যা আমাদের বুদ্ধির জগতে এক ধরনের পীড়নের-বোধ সৃষ্টি করে। কাম্য অবস্থার লঙ্ঘন ঘটায়, ফলে চেতনালোকে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। তরঙ্গের গুণগত ও পরিমানগত প্রবণতার উপরই নির্ভর করে সুখ দুঃখ এবং কৌতুক বা আমোদ। তরঙ্গ যখন অনুভবের পারদে সুমিতির মাত্রা ছাড়ায় না তখন তা স্মিত হাস্যে মুখাবয়ব ও ওষ্ঠাধরে কিঞ্চিৎ লাবণ্যের সঞ্চালন ঘটায়, যাকে বলা যেতে পারে আনন্দ; যখন মাত্রা ছাড়িয়ে দ্রুত আঘাতের পীড়নেবেগে উদগীর্ণ হয়ে উঠতে থাকে তখন তা কৌতুক বা আমোদ রসে পরিপ্লুতি পায়। যখন সেই পীড়নবেগের উদগীর্ণতায় ভোক্তার গুরুতর দুঃখভয় ও স্বার্থহানি জড়িয়ে থাকে তখন তা থেকে এক দুঃখভার বা বেদনাকাতরতায় আবিষ্ট হয়ে যেতে হয়।

সূত্রাকারে বলতে গেলে বলতে হয়, মূলে থাকে জগৎ জীবনের চলিষ্ণুতা সম্পর্কে এক ধরনের সচেতনতায়। যা থেকে এক অনুভব-ক্রিয়ার জন্ম হয়। অনুভবের অনুরণন তিন পদ্ধতিতে পরিব্যাপ্তি পায়। (ক) সুমিত স্পন্দনে (খ) প্রবল থেকে প্রবলতর উদগীর্ণতায়— কিন্তু এই-বিপর্যস্ততায় যদি ভোক্তা বা সংশ্লিষ্টজন কোন ভাবে যুক্ত না থাকে তবে তার রূপ হয় এক ধরনের। (গ) যদি সেই-উদগীর্ণতায় ভোক্তা বা সংশ্লিষ্টজনের স্বার্থের যোগ থাকে নিবিড়ভাবে এবং গুরুতর দুঃখভয়ের আশংকায় মন-প্রাণ উদ্রিক্ত হয়ে উঠতে চায় তবে তার রূপ হয় অন্য ধরনের।

প্রাসঙ্গিক ভাবেই অতঃপর উঠে আসে 'ট্রাজেডি'র মৌল চারিত্রিক সূত্র। 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' আলোচনাটি কৌতুকহাস্যেরই প্রলম্বিত রচনা। কৌতুকহাস্যের বীজতলার অঙ্কুরিত কথাঙ্কুরগুলিকেই আর একটু অঙ্কুরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত ক্ল্যাসিক ধাঁচের প্রবন্ধ কখনই রচনা করে যাননি, সৃষ্টিশীল অন্য ধারার সাহিত্যের মতোই এক্ষেত্রেও সততই পরীক্ষানিরীক্ষা করে গেছেন। কেবলই ফর্ম ভেঙেছেন। তাঁর প্রবন্ধকে ঠিক কতটা বাজারচলিত সংজ্ঞাগুলিতে বাধা যাবে তা নিয়েও মীমাংসায় পৌঁছানো যাবে না। মূল প্রস্তাবনা থেকে মধ্যেমধ্যেই সরে গিয়ে অন্যপ্রসঙ্গের অবতারণা, কথকতার চল নিয়ে লোকায়ত জীবনের সূত্রভাবনা নিয়ে মেজাজমজ্জিতে কবি হয়ে ওঠা, আবার কখনও বা তারই মধ্যে সমাজবিজ্ঞানীর নিরীক্ষা নিয়ে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রীগুলি নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে ওঠা। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধরচনার এ এক অনায়াস আচার হয়ে উঠেছিল। অথচ ইংরেজিতে যাকে বলে 'অ্যালেইগরি' রচনা তাও নৈব নৈব চ—— যেমনই স্থানে স্থানে গভীর গম্ভীর মন্ত্র ধ্বনিতে মন্ত্রিত তেমনই হাস্যোজ্জ্বল রসোজ্জ্বল স্ফটিক কঠিন তারল্যের সম্ভাবনা নিয়েও নিশানা-স্থির, নির্ভুলভাবেই লক্ষ্যকে বিদ্ধ করতে জানেন। নাই বা থাকল আর্নল্ড কথিত 'Pregision, Reason, Balance'.

প্রশ্ন উঠতেই পারে 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা'য় প্রথম প্রবন্ধটিকে তো তিনি পূর্ণতা দিতে চেয়েছেন। নতুন সংযোজন রূপে বলতে চেয়েছেন যে- অসংগতি বা প্রচলিত নিয়ম-রীতির গুরুতর ব্যত্যয় থেকে হাস্যরস উদ্রিক্ত হয়ে ওঠে, তা জড়প্রকৃতির ক্ষেত্রে খাটে না, খাটে সচেতন পদার্থের প্রতি। তাঁর উপমিত ভাষায়, "জড়প্রকৃতির মধ্যে করুণরসও নাই, হাস্যরসও নাই। একটা বড়ো পাথর ছোটো পাথরকে গুঁড়াইয়া ফেলিলেও আমাদের চোখে জল আসে না, এবং সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা খাপছাড়া গিরিশৃঙ্গ দেখিতে পাইলে তাহাতে আমাদের হাসি পায় না। নদী-নির্ঝর পর্বত-সমুদ্রের মধ্যে মাঝে মাঝে আকস্মিক অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়—— তাহা বাধাজনক, বিরক্তিজনক, পীড়াজনক হইতে পারে, কিন্তু কোনো স্থানেই কৌতুকজনক হয় না। সচেতন পদার্থ সম্বন্ধীয় খাপছাড়া ব্যাপার ব্যতীত শুদ্ধ জড়পদার্থে আমাদের হাসি আনিতে পারে না।" (কৌতুকহাস্যের মাত্রা ; পঞ্চভূত)

প্রাসঙ্গিকভাবে এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ জড় ও জীবনের মধ্যে একটি পার্থক্যকে সূচিত করে দেখিয়েছেন যা অসঙ্গতি, পীড়ন, নিয়মের ব্যত্যয় বা বৈপরীত্যে জীবনই উত্তেজিত হয়, পীড়িত হয়। কবির ভাষায় 'নীতি যেমন জড়ে নাই, অসংগতিও সেইরূপ জড়ে নাই। মনপদার্থ প্রবেশ করিয়া সেখানে দ্বিধা জন্মাইয়া দিয়াছে সেইখানেই উচিত এবং অনুচিত, সংগত এবং অদ্ভুত' এর জারক-রসে জারিত হয়ে আনন্দিত হয়। আহ্লাদিত হয়, দুঃখ কৌতুকের রসে নিজেকে প্রকাশ করতে দ্বিধান্বিত হয় না।

মানুষের মন চায় আবিষ্কার করতে, পরিচিত পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে থেকে নতুনকে খুঁজে নিতে। নতুনের জন্যে কৌতূহল মানুষের বরাবর, কৌতূতহলের পূর্ণ নিবৃত্তিতেও সে এক রকমের কৌতুক বা আমোদ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কৌতূহলের একটা প্রধান অঙ্গ নূতনত্বের লালসা, কৌতুকেরও একটা প্রধান উপাদান নূতনত্ব। অসংগতের মধ্যে যেমন নিছক বিশুদ্ধ নূতনত্ব আছে, সংগতের মধ্যে তেমন নাই।" ব্যক্তিগত জীবনের চলন-ধারায়, সামাজিক জীবনের চলন-প্রক্রিয়ায় এই-অসংগতির নানান রূপ কেবলই উচ্ছ্রিত হয়। মন তাকেই আবিষ্কার করে নেয়। যাপিত জীবনের পথে অসংগতিজনিত এই আবিষ্করণ--ক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই মানুষ হাসে-কাঁদে আমোদিত-আহ্লাদিত হয়। একই কার্যকারণের সব ভিন্ন ভিন্ন স্তরের উদ্ভেদ। অসংগতি যখন অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখন আমাদের কৌতুক অনুভূত হয়, যখন গভীর স্তরের উদঘাটন ঘটায় তখন হৃদয় তাপিত হয়, গভীরতর দুঃখের কাতরতায় অন্তঃকরণ বিদ্ধ হয়ে ওঠে। ভেদ ঘটায় মাত্রায় বা স্তরে। "শিকারি যখন অনেকক্ষণ অনেক তাক করিয়া হংসভ্রমে একটা দূরস্থ শ্বেত পদার্থের প্রতি গুলিবর্ষণ করে এবং ছুটিয়া কাছে গিয়া দেখে সেটা একটা ছিন্ন বস্ত্র খণ্ড, তখন তাহার সেই নৈরাশ্যে আমাদের হাসি পায়। কিন্তু কোনো লোক যাহাকে আপন জীবনের পরম পদার্থে মনে করিয়া একাগ্রচিত্তে একান্ত চেষ্টায় আজন্মকাল অনুসরণ করিয়াছে এবং অবশেষে সিদ্ধকাম হইয়া তাহাকে হাতে লইয়া দেখিয়াছে সে তুচ্ছ প্রবঞ্চনামাত্র, তখন তাহার সেই নৈরাশ্যে অন্তঃকরণ ব্যথিত হয়।"

অতঃপর অসংগতিজ্ঞাপক অনুভব-ক্রিয়ার লঘুত্ব ও গুরুত্বের তুল্যমূল্যতায় 'কমেডি' ও 'ট্রাজেডি'র ভেতরের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন "অসংগতি কমেডিরও বিষয়, অসংগতি ট্রাজেডিরও বিষয়। কমেডিতেও ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি প্রকাশ পায়। ফল্‌স্টাফ উইন্ড্‌সর-বাসিনী রঙ্গিনীর প্রেম-লালসায় বিশ্বস্তচিত্তে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দুর্গতির একশেষে লাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন ; রামচন্দ্র যখন রাবণবধ করিয়া, বনবাস প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া, রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া দাম্পত্যসুখের চরম শিখরে আরোহন করিয়াছিলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল—গর্ভবতী সীতাকে অরণ্যে নির্বাসিত করিতে বাধ্য হইলেন। উভয় স্থলেই আশার সহিত ফলের, ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি প্রকাশ পাইতেছে। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, অসংগতি দুই শ্রেণির আছে—একটা হাস্যজনক, আর-একটা দুঃখজনক। বিরক্তিজনক, বিস্ময়জনক, রোষজনককেও আমরা শেষ শ্রেণিতে ফেলিতেছি।"

শেষতক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আর দেরি হয় না সামাজিক ব্যবহারিক জীবনে যাকে আমরা চিহ্নিত করছি হাসি কান্না শোক তাপ আমোদ আনন্দ, সাহিত্যায়নের মধ্যে দিয়ে তার পরিচিত ঘটে 'কমেডি' তে। তা একই -তল থেকে উত্থিত হয়ে মাত্রাভেদের পরিবেশনায় এক এক নামে নামাঙ্কিত হয় মাত্র। মাত্রাভেদই মূল আধার।

কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বিষয় থেকে বিষয়ান্তর যাওয়া আসা। তবে সেই-যাওয়া আসার অবশ্যই একটা সময়োপযোগিতা থাকে। যে কারণে এই রচনার শেষ হয় ভাবসর্বস্ব-আধ্যাত্মসর্বস্ব ভারতীয় জীবনধারার প্রতি একটা অম্লমধুর কটাক্ষ হেনেই 'দুর্ভিক্ষে যখন দলে দলে মানুষ মরিতেছে তখন সেটাকে প্রহসনের বিষয় বলিয়া কাহারো মনে হয় না। কিন্তু আমরা অনায়াসে কল্পনা করিতে পারি। একটা রসিক শয়তানের নিকট ইহা পরম কৌতুকাবহ দৃশ্য। সে তখন এই-সকল অমর আত্মা-ধারী জীর্ণ কলেবরগুলির প্রতি সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া

বলিতে পারে, 'ঐ তো তোমাদের ষড়্দর্শন। তোমাদের কালিদাসের কাব্য, তোমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা পড়িয়া আছে, নাই শুধু দুই-মুষ্টি তুচ্ছ তণ্ডুলকণা, অমনি তোমাদের অমর আত্মা, তোমাদের জগদ্‌বিজ্ঞজয়ী মনুষ্যত্ব একেবারে কণ্ঠের কাছটিতে আসিয়া ধুক্‌ধুক্ করিতেছে। তবে কী কবিবচনের সেই ধ্রুবপদের তাৎপর্য 'অলি বার বার যায় অলি বার বার আসে' ধরে এই-রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যেতে পারে! তর্কাতর্কির কোন চরম বা পরম জবানি রচনার বদলে জ্ঞানতাত্ত্বিক চৌকাঠগুলিকে তিনি কেবলই ভাঙতে চেয়েছেন। নানান জ্ঞানদৃষ্টি এবং চিন্তন-মননের সমাহার নিয়ে মেলে ধরেন মানবিকীচর্চার বিশাল অঙ্গানে। জবানি ও পাল্টা-জবানির পরতগুলি খুলে খুলে জ্ঞানের অনুশীলনকে ক্রমশ করে তুলতে চান মুক্ত ও বিস্তৃত। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিংশশতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত আলোচনা ও প্রবন্ধ রচনার ত্রাসে আত্মসর্বস্ব দায়িত্বহীন যে গ্রন্থন-প্রক্রিয়া আমাদের চিন্তাচেতনার দিগন্তকে রুদ্ধ করে দিতে চেয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তারই বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছিলেন। তাই আলোচনার পরিসরে একই সঙ্গে স্থান করে নেয় বিপরীতমুখী জিজ্ঞাসা ; কাররই বলপূর্বক আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াস কার্যকরী হয় না। তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার মধ্যে দিয়ে তত্ত্বনির্ণয়ের প্রয়াস নিয়েও যেমন পরিহাস জোড়া হয় তেমনই 'নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ'কে প্রমাণসিদ্ধ করে তোলার বিতণ্ডাকেও সোপর্দ করা হয়। মানবপ্রকৃতির কূটস্থ নিয়েও বহুস্বরের সহাবস্থানকে স্থান দেওয়ার সচেতন প্রয়াসে কৃতসঙ্কল্প হয়ে উঠতে থাকেন। কেননা আলাপচারিতায় 'রক্তসঞ্চালন' দরকার। 'জ্ঞানসমুদ্রের খোলা হাওয়াকে' আমাদের 'কথোপকথন-সমাজে' অবাধে প্রবেশ করতে দেওয়ার সহিষ্ণুতাকে অভ্যাসসিদ্ধ করে তুলতেই এই রক্তসঞ্চালন। নাহলে আমরা সুস্থ হয়ে উঠতে পারব না। সময়োপযোগী হয়ে উঠতে হলে এর বিকল্প আর কিছু হয় না।

ভাবলে কী খুব অন্যায় হবে বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে য়ুরোপের দেশে দেশে 'নিরন্তর বাক্‌কেন্দ্রিকতা'র বিরুদ্ধে যে লঘুগুরু আলোচনার সূচনা হয়েছিল বাংলাসাহিত্যে 'পঞ্চভূত'এর মধ্যে দিয়ে তারই বীজতলা রচনা করে চলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

একক ৩ ❑ সুখ না দুঃখ? ঃ সৌন্দর্যবুদ্ধি ❑ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

৩.১ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যপরিচয়

৩.২ 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থটির সাধারণ পরিচয়

৩.৩ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মনন ও রচনারীতি

৩.৪ প্রবন্ধদুটির নিবিড়পাঠ

৩.৪.১ 'সুখ না দুঃখ?'

৩.৪.২ 'সৌন্দর্যবুদ্ধি'

৩.৫ 'সুখ না দুঃখ' ও 'সৌন্দর্যবুদ্ধি' প্রবন্ধদুটির বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা ও সামগ্রিক বিশ্লেষণ

৪.০ সামগ্রিক অনুশীলনী ঃ 'সাম্য' ❑ 'কৌতুকহাস্য' ❑ 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' ❑ 'সুখ না দুঃখ?' ❑ 'সৌন্দর্যবুদ্ধি'

৪.১ বিস্তৃত প্রশ্ন

৪.২ অবিস্তৃত প্রশ্ন

৪.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৫.০ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ ❑ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য-পরিচয়

রবীন্দ্র-পর্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক হলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪—১৯১০)। বাংলা প্রবন্ধকে বিজ্ঞানচেতনা ও দার্শনিক জিজ্ঞাসাতে পুষ্ট করে ভিন্ন ধরনের মাত্রা যোগ করেছেন তিনি। তবে বিজ্ঞান ও দর্শনকে অবলম্বন করলেও সাহিত্যকে রসাস্বাদী করে তুলবার প্রতি তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধ রচনার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গিয়ে একজন সমালোচক জানিয়েছেন—"কোন বিষয় সম্বন্ধে প্রথমেই তার মূল ও পারিপার্শ্বিকতার সন্ধান, লব্ধ তথ্যকে পুনরায় সুতীক্ষ্ণ মেধায় আত্মপর্যালোচনা এবং শেষ পর্যন্ত তুলনামূলক বিচারের মধ্য দিয়ে বিষয়টির আনুপূর্বিক গুরুত্বকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। বিষয় অনুসারে তাঁর বিশ্লেষণরীতি অত্যন্ত সতর্কভাবেই গভীর চিন্তার অনুসারী; চিন্তার ধারা অভ্রান্ত এবং সিদ্ধান্তের অনুকূলে নির্মোহ। আবার বিষয়ের গুরুত্বকে পাঠকমনে চিহ্নিত করবার জন্য প্রয়োজনে তা উদাহরণমুখী এবং রসপরিবেশনেও কার্পণ্য করেনি।" (ড. প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৮৫)

—সমালোচকের সঙ্গে সহমত প্রদর্শন করি আমরা। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর প্রবন্ধে মননমূলক জীবন-জিজ্ঞাসাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। পারিবারিক ঐতিহ্য, শিক্ষা, সর্বোপরি তাঁর সত্যান্বেষী মন এজাতীয় রচনাতে তাঁকে উৎসাহী করেছিল।

মুর্শিদাবাদের টেঁয়া গ্রামে-বৈদ্যপুরের ত্রিবেদী পরিবারে রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম। পিতামহ ব্রজসুন্দর এবং পিতা গোবিন্দসুন্দর দুজনেরই ছিল সাহিত্যানুরাগী। পিতামহ 'মাধব-সুলোচনা' নামে একটি নাটক এবং 'স্বর্ণসিন্দুর সিংহ' বা 'গৌরলাল সিংহ' নামে একটি প্রহসন লিখেছিলেন। পিতা গোবিন্দসুন্দর 'বঙ্গাবালা' নামে একটি উপন্যাস এবং 'দ্রৌপদীনিগ্রহ' নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র। পরে রিপন কলেজে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেছিলেন। তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়েছিল 'নবজীবন' পত্রিকায়। প্রকাশকাল ১২৯১ বঙ্গাব্দ, পৌষ সংখ্যা। রচনাটির নাম 'মহাশক্তি'। রামেন্দ্রসুন্দরের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল—প্রকৃতি (১৮৯৬), জিজ্ঞাসা (১৯০৪), 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬), কর্মকথা (১৯১৩), নানাকথা (১৯২৪)।

৩.২ ❑ 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থটির সাধারণ পরিচয়

'জিজ্ঞাসা' রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দ্বিতীয় গ্রন্থ। বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা, দর্শনচেতনা এবং শিল্প ভাবনার বিচিত্র সমন্বয় রয়েছে গ্রন্থটিতে। 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে মোট প্রবন্ধের সংখ্যা বাইশ। (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ অনুযায়ী। প্রবন্ধগুলির নাম, পত্রিকায় প্রকাশকালের একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে—

১। সুখ না দুঃখ?	সাধনা, মাঘ ১২৯৯
২। সত্য	সাহিত্য, জৈষ্ঠ্য ১৩০০
৩। জগতের অস্তিত্ব	সাধনা, আষাঢ় ১৩০০
৪। সৌন্দর্য-তত্ত্ব	সাধনা, ভাদ্র ১৩০০
৫। সৃষ্টি	সাধনা, অগ্রহায়ন ১৩০০
৬। অতিপ্রাকৃত—প্রথম প্রস্তাব	সাধনা, ফাল্গুন ১৩০০
৭। অতিপ্রাকৃত—দ্বিতীয় প্রস্তাব	বঙ্গাদর্শন আশ্বিন ১৩০১
৮। আত্মার অবিনাশিতা	সাহিত্য, আশ্বিন ১৩০১
৯। কে বড়?	ভারতী, চৈত্র ১৩০২
১০। মাধ্যাকর্ষণ	সাহিত্য, পৌষ ১৩০৩
১১। এক না দুই	ভারতী, মাঘ ১৩০৩
১২। অমঙ্গালের উৎপত্তি	সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩০৪
১৩। বর্ণ-তত্ত্ব	ভারতী, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩০৪
১৪। প্রতীত্যসমুৎপাদ	সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০৫
১৫। পঞ্চভূত	পুণ্য, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০৫
১৬। উত্তাপের অপচয়	ভারতী, ফাল্গুন ১৩০৫
১৭। ফলিত জ্যোতিষ	প্রদীপ, চৈত্র ১৩০৫
১৮। নিয়মের রাজত্ব	ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৫
১৯। সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি	প্রদীপ, মাঘ ১৩০৭
২০। মুক্তি	বঙ্গাদর্শন, মাঘ ১৩১০
২১। মায়া-পুরী	সাহিত্য, কার্ত্তিক ১৩১৬
২২। বিজ্ঞানের পুতুলপূজা	আর্য্যাবর্ত্ত, অগ্রহায়ণ ১৩১৭

—আমাদের পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ দুটি হল—'সুখ না দুঃখ' এবং 'সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি'। প্রথম প্রবন্ধটি দার্শনিক জিজ্ঞাসা সমৃদ্ধ প্রবন্ধ। জীবনের ক্ষেত্রে সুখ না দুঃখ কার পরিমাণ অধিক তা নিয়ে প্রাবন্ধিক তাঁর ভাবনা জানিয়েছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিকে শিল্পজিজ্ঞাসা প্রকাশিত হয়েছে। এই শিল্পজিজ্ঞাসাকেও তিনি বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেই মূল্যায়ন করবার চেষ্টা করেছেন।

৩.৩ ❑ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৪-১৯১৯) মনন ও রচনারীতি ঃ

রবীন্দ্রনাথের লিখিত 'শ্রীযুক্ত সতেন্দ্রনাথ বসু প্রীতিভাজনেষু' নিবেদিত 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রচনা। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী করে বিজ্ঞানচর্চার একেবারে প্রাথমিক বিষয়গুলি নিয়ে পাঠকদের বিজ্ঞান সম্পর্কিত কৌতূহলটি জাগিয়ে তোলাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। যদিও দায়িত্বটা প্রথমে তিনি দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক 'শ্রীমান প্রমথনাথ সেনগুপ্ত, এম এস্ সি' কে কিন্তু তিনি অচিরেই বুঝেছিলেন বিজ্ঞানের যথাযথ পাণ্ডিত্য নিয়ে এ গ্রন্থ রচনা করতে গেলে পারিভাষিক প্রতিবন্ধকতায় এ এমন বস্তু হয়ে হয়ে উঠবে যা গলাধঃকরণ করা যাবে না, এ জাতীয় রচনার জন্যে একান্তভাবে দরকার অন্ধবিশ্বাসকে মূঢ়তা জ্ঞান করে সাহিত্যরসিকের মেজাজ নিয়ে নব্যপ্রাকৃততত্ত্ব তথা বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্যে মনকে বিস্ফারিত করে তোলা। যার ফলে কৌতূহলী-মেধাবী ছাত্রদের পক্ষে 'বিজ্ঞানের আঙিনা'য় প্রবেশ করা সহজ হয়ে উঠবে। তিনি যে কিছুটা হলেও 'অনধিকার প্রবেশ' করছেন সে-সম্পর্কে সচেতন হয়েও বুঝতে পারছেন সময়ের অত্যাবশ্যক তাগিদা। এ কাল কোনভাবেই বিজ্ঞানচর্চার দীনতা নিয়ে আধুনিক যুগের প্রত্যন্তদেশে পড়ে থেকে অকৃতার্থ হয়ে দিনযাপন করতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের মতো সময়ের এই ডাক শুনতে পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও। তিনিও রচনা করেছিলেন 'বিজ্ঞান রহস্য'এর মতো গ্রন্থ সেই ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দেই। যার বিষয় ছিল প্রাথমিক প্রাকৃত কিছু বিষয়। যেগুলি মৌলিক রচনা তো নয়ই আবার অনুবাদও নয়, তরল না করে সরল সহজ ভাবে মূল লেখকদের 'মতাবলম্বন করিয়া লিখিত।' মূল লেখকেরা ছিলেন টিন্ডল, গ্লেসর, হাক্সলি, লায়েল প্রমুখেরা। রবীন্দ্রনাথের মতো বঙ্কিমচন্দ্রেরও যে দ্বিধা না-ছিল তা জোর দিয়ে বলা যাবে না কিন্তু জোর দিয়ে বলা যাবে সময়ানুবর্তিতাই বঙ্কিমচন্দ্রকে এ কার্য সমাধানে অস্থির করে তুলেছিল। 'ইউরোপীয়েরা বিজ্ঞান বলে এই ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, বিজ্ঞান বলেই ইহা রক্ষা করিতেছেন' সুতরাং বিজ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলনের এক শক্ত পাটাতনও আমাদের নির্মাণ করতে হবে অনতিবিলম্বেই। ১২৭৯-এর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার 'ভাদ্র' সংখ্যায় এই নিমিত্তেই তিনি 'ভারতীয় বিজ্ঞানসভার' একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছিলেন, যাতে দেশীয় ধনীরা যথাযথ ভূমিকা নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন, অন্যথায় বিড়ম্বিত বিপর্যস্ত সময়ের কালিমা সরবে না, এতদুদ্দেশে মহোদয় ইংরেজ পণ্ডিত ও শাসকদের প্রতিও যথাযথ প্রার্থনা করেছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও ছিলেন পূর্ববর্তী দুজনের মতো একই মনোভাবের শরিক। অধিকন্তু একটা আনুকূল্যও ছিল, ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বি এ পরীক্ষায় বিজ্ঞান-শাস্ত্রে প্রথম স্থান'ই শুধু অধিকার করেন নি, ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'এম এ পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাস্ত্রে প্রথম স্থান' অধিকার করেন এবং পরের বছর ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র নিয়ে প্রেমচাঁদ বৃত্তিও অর্জন করেছিলেন। তাঁর সে-সব বিষয়ের দক্ষতা নিয়েও পরীক্ষকসমাজ মুক্তকণ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন "The candidate who took up physics and Chemistry is perhaps the best student that has as yet taken up these subjects at this examination." রামেন্দ্রসুন্দর স্বাভাবিকভাবেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহারে উজ্জীবিতই হয়ে উঠেছিলেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বাংলা সাহিত্যের যশোকীর্তি অধ্যাপকের মতে, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পরই রামেন্দ্রসুন্দরের স্থান।

সত্যের খাতিরে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়ের এই স্থান-নির্ণয়ে রামেন্দ্রসুন্দরকে সম্ভবত আরও উঁচুতেই বসানো যেতে পারে কেননা 'প্রকৃতি' গ্রন্থে physics-এর দুরূহ বিষয়গুলি নিয়ে যেমন 'সৌরজগতের উৎপত্তি', 'আকাশ-তরঙ্গ', 'পৃথিবীর বয়স', 'জ্ঞানের সীমানা', 'প্রাকৃতসৃষ্টি', 'প্রকৃতির মূর্ত্তি', 'হর্ম্মান হেলমহোলৎজ', 'ক্লিফোর্ডের কীট',

‘প্রাচীন জ্যোতিষ, মৃত্যু’, ‘প্রাচীন জ্যোতিষ— দ্বিতীয় প্রস্তাব’, ‘আর্যজাতি’, ‘প্রলয়’, ‘আলোকতত্ত্ব’, ‘পরমাণু’—— ব্যাখ্যাবিজ্ঞান সহ এত সহজ সাবলীল ভাষায় আলোচনা করেছেন তা বাংলাসাহিত্যের অতুলনীয় ঐশ্বর্য হয়েই আছে। যদিও এ বিষয়ে তাঁর সাহিত্য-এষণা ও ভাষাজ্ঞান যথাযথ সাহায্যও করেছিল—— বয়ঃসন্ধির স্তর পর্যন্ত তাঁর একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল লেখক হবার। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্যও পুরোদমে পাঠ করতেন। নিজস্ব জীবন-কথায় জানিয়েছেন, ফার্স্ট আর্টস বা এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি আশানুরূপ ফল করতে পারেননি সাহিত্যপ্রীতির ফলেই। ভাষায় ছিল তাঁর অপরিসীম দখল। ভাবকে যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করার ব্যাপারে তাঁর ছিল এক তুলনারহিত ক্ষমতা। বিষয়ের সঙ্গে যুক্তবেণী রচনা করে যা পাঠককে অনায়াসেই আবিষ্ট করে দিতে পারত, যুক্তিতর্কের নির্মেদ সমুচ্চয়তা নিয়ে। “সত্য অর্থে যাহা আমাদের পক্ষে সত্য ; নিরপেক্ষ নহে— সাপেক্ষ ; পূর্ণ নহে আংশিক ; সার্ব্বভৌমিক নহে— প্রাদেশিক ; সমান নহে— তৎকালিক।” (সত্য) আবার “কিন্তু একটা কথা আছে, ভূয়োদর্শন ভূয়োদর্শনমাত্র; ভূয়ঃ শব্দের অর্থ ভূয়ঃ, চির নহে। ভূয়োদর্শন বহু কাল ব্যাপিয়া দর্শন ও বহু দেশ ব্যাপিয়া দর্শন ; উহা চিরকাল ব্যাপিয়া দর্শন বা সর্ব্বদেশ ব্যাপিয়া দর্শন নহে। চিরের সহিত তুলনায়, সর্ব্বের সহিত তুলনায়, ভূয়োও নগণ্য মাত্র। উভয়ের তুলনা হয় না। মাধ্যাকর্ষণের বর্ত্তমান নিয়ম, কাল ছিল । পরশু ছিল, শত বৎসর বা কোটি বৎসর আগেও ছিল, মানিলাম। কিন্তু চিরকাল ছিল, তাহার প্রমাণ কোথায়? আবার মাধ্যাকর্ষণের যে নিয়ম লোষ্ট্রখণ্ডে আছে, তাহাই চন্দ্রে আছে, পৃথিবীতে আছে, শনৈশ্চয়ের মেখলাতে আছে ও বরুণ গ্রহের পার্শ্বচরে আছে, লুব্ধক তারকা ও তাহার অনুচরে আছে ; কিন্তু সর্ব্বত্র আছে কে বলিল? ভূয়োদর্শনের দৃষ্টি তত দূর বিস্তৃত নহে ; সুতরাং এ প্রশ্নের উত্তর নাই। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের যে সার্ব্বভৌমিকত্ব বিশ্লেষণ দেওয়া যায়, তাহা অনেকটা গায়ের জোর মাত্র।” (সত্য)

বাংলাভাষার পরিচর্যায় তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন। বিষয়ের ন্যূনতা-ঊনতা তাঁর সম্পাদিত কর্মে যেমন স্থান পেত না, ভাষারও নিরর্থক দুর্বোধ্যতায় কোন প্রশ্রয় ছিল না, ‘বিষয় যখন বিজ্ঞান তখন পারিভাষিক কিছু বাধা তো থাকবেই’ এ যুক্তিকেও তিনি সর্বতোভাবে খণ্ডন করেছিলেন, “বাঙ্‌লা ভাষা এখনও বিজ্ঞান প্রচারের যোগ্য হইতে বিলম্ব রহিয়াছে; কিন্তু এই বিলম্ব ক্রমেই অসহ্য হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। মাতৃভাষাকে এতদর্থে সুগঠিত করিয়া লইবার জন্য যে যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক, আপনাদিগকেই তাহা করিতে হইবে। সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞানশাখা যদি বঙ্গভাষার এই অঙ্গের পুষ্টিসাধনে সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব নিরর্থক হইবে না।

আমাদের বাঙ্‌লা ভাষা বর্ত্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র এবং অস্পষ্ট হউক, উহা দ্বারা বিজ্ঞান বিদ্যার প্রচার যে একেবারে অসাধ্য তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহে। আমি আশা করি, এই সাহিত্য-সম্মিলনে যাঁহারা বিবিধ বিজ্ঞানের আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের কৃতকার্য্যতাই আমার বাক্য সমর্থন করিবে।” (১৩২০ সনের কলিকাতা টাউন হলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৭ম অধিবেশনে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি রূপে এই ভাষণটি দেন রামেন্দ্রসুন্দর)

শব্দচয়ন ও বাক্যগঠনের এই কুশলতার সঙ্গে তাঁর রচনারীতিতে মিশেছে স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা। কোন বিষয়েই শেষ কথা বলার বা মীমাংসা করার আস্ফালনময় উগ্রতা নেই, তিনি বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা জাগাতে পারেন মাত্র, ব্যাখ্যাবিশ্লেষণসহ অবতারণা করতে পারেন সমস্যাটির। আর কিছু নয়। বিতর্কিত বিষয়ে একেবারে তৌলদণ্ডেই এ-পক্ষ ও-পক্ষ সে-পক্ষের মতামতাগুলি সাজিয়ে দিয়ে নিজে নিরপেক্ষ থেকেছেন—— অন্তত থাকবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মানুষের পক্ষে কী সম্ভব সেই-নিরপেক্ষতা অবলম্বন? প্রবণতা বা পক্ষপাতিত্ব ঠিকই একদিকের পাল্লা ভারী করে দেয়। সেক্ষেত্রেও প্রবন্ধকার যথাযথ নম্রতায় সুধীজনের মার্জনা চেয়ে নেন। “মীমাংসা হইল না। নিরপেক্ষ ভাবে দুই দিক্‌ দেখাইতে গিয়া লেখক যদি অজ্ঞাতসারে কোন দিকে বেশী টান দিয়া থাকেন, পাঠকেরা

মার্জ্জনা করিবেন।” (সুখ না দুঃখ) এতদ্ বিষয়ে তাঁর এই মানসিকতা যা রচনাগত একটা স্টাইলে পর্যবসিত হয়েছিল তার বড়ো সাক্ষ্য দিতে পারে ‘বিচিত্র প্রসঙ্গ’ নামের গ্রন্থটি। অনেক বিদগ্ধজন মনে করেন Houston Stewart Chamberlain-এর 'Foundation of the Nineteenth Century' গ্রন্থের আদলে রামেন্দ্রসুন্দর রচনা করলেও Chamberlain-মানসিকতার দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তই ছিলেন—— Chamberlain ইউরোপের Culture-history লিখতে গিয়ে গায়ের জোরে তাঁর প্রিয় মতামতটি চাপিয়ে দেবার যে--প্রয়াস আদ্যন্ত করে গেছেন, ভারতীয় সভ্যতার কথকতায় সেই-গোয়ার্তুমির কোন পরিচয় দেননি, কোন ভাবেই dogmatic হয়ে যাননি।— রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী দীর্ঘজীবী ছিলেন না। মাত্র পঞ্চান্ন বৎসরের জীবনে তিনি দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই এক অনিন্দ্যসুন্দর বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। প্রথমটি ছিল রিপন কলেজ, দ্বিতীয়টি ‘বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ’। প্রথমটিতে অতিবাহিত করেছিলেন ১৮৯২ থেকে ১৯১৯। প্রথম বারো বছর অধ্যাপক রূপে, বাকি ১৬-১৭ বছর অধ্যক্ষরূপে। দ্বিতীয়টিতে পদার্পণ করেছিলেন ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে। আমৃত্যু ছিলেন পরিষদের সক্রিয় কর্মী হয়েই। কোন না কোন সময়ে সম্পাদক থেকে সভাপতি সব কটি পদেই কৃত হয়েছিলেন। কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কত নিবিড় ছিল সে নিয়ে অনেক কথাই আছে জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য, বিপিনবিহারী গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতিদের বিশদ লেখালেখিতে।

একালের পাঠকের পক্ষে সে-সব লেখন-সামগ্রীর মধ্যে দিয়ে লেখালেখির মূলে অর্থাৎ তাঁর চৈতন্য-মূলে পৌঁছাতে বিলম্ব ঘটে না। দুটো প্রতিষ্ঠানকেই তিনি যুক্ত করে নিয়েছিলেন তাঁর স্বদেশানুরাগ ও বাংলাভাষা প্রীতির মধ্যে দিয়ে। রিপন কলেজের তাঁর সহকর্মী-ছাত্রদের মুখ থেকে জানা গিয়েছে সেকালে তিনি পদার্থবিদ্যা-রসায়নের মতো বিষয়গুলির পাঠ দিতেন ইংরেজির সঙ্গে বাংলা ভাষার মাধ্যমেও। কেন বাংলা ভাষায় বিষয়গুলিকে গ্রহণযোগ্যতায় ছাত্রদের মগজের গভীরে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে না এই রকমের এক প্রতিজ্ঞা নিয়েই শ্রেণিকক্ষে পদচারণা করতেন, মুখে থাকত অনর্গল বাকবিভূতি। কীর্তিধ্বজ অধ্যাপক রূপে তাঁর নাম ছড়িয়েও পড়েছিলেন। দু’দুবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়-বিভাগে উপদেশক-অধ্যাপক রূপে আমন্ত্রিতও হয়েছিলেন। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, “রামেন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি নহে, এই জন্য বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাঙ্গালী শ্রোতার মজলিসে, রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি পান নাই। তিনি তৃতীয়বার অনুরুদ্ধ হইয়া লেখেন—— ‘ইংরেজি রচনায় আমি অভ্যস্ত নহি। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার অনুমতি দিলে আমি ‘বেদ’ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িতে পারি।’ তখনকার ভাইসচ্যান্সেলার স্যর ডাক্তার দেবপ্রসাদবাবু রামেন্দ্রসুন্দরকে সে অধিকার দান করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার অধিকারী হইয়াছেন। ইতিপূর্বে বাঙ্গালা কেতাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হইয়াছি বটে, কিন্তু আমরা বলিব, বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শুভ মুহূর্তের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার কোনও স্থান ছিল না।’ (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সাহিত্য-আশ্বিন-১৩২৬)

কলেজকে করে তুলেছিলেন আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র করেই— ছাত্র-অধ্যাপক সম্পর্কে, অধ্যাপকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে, অধ্যাপক-অধ্যক্ষ-ছাত্র-কর্মচারীদের শুভবুদ্ধিকে তিনি উদ্দীপিত করে দেশগঠনের জাতিগঠনের এক ক্লান্তিহীন প্রয়াসেই যেন তিনি মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। তবু তিনি বুঝেছিলেন পরীক্ষাকেন্দ্রিক পড়াশুনো, পাঠ্যসূচির বিষয়সর্বস্বতা, কর্তৃপক্ষের প্রতি মান্যমানতায় তিনি যা তিনি করতে চান ঠিক তা করা যাবে না—— সেই-পরিসরকেই নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ’-এর কর্মকাণ্ডে। স্বদেশানুরাগ ও স্বদেশপ্রিয়তার নৈবেদ্য রচনা করে করেছিলেন আলাপ-আলোচনা-বক্তৃতা-সম্বর্ধনার নানাবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। অথচ যার মধ্যে ছিল না প্রাদেশিক কোন উন্মাদনা, আঞ্চলিক সংকীর্ণতা, অন্য ভাষার প্রতি কোন বৈরিতা। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভাবৈশ্বর্যে আগামী প্রজন্মকে

শিক্ষিত-দীক্ষিত করে তোলার প্রয়াস। যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার-সাধনোদ্দেশে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে যে স্যাডলার কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল। সেখানে তিনি মনোবেদনা লিপিবদ্ধ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি "Western education has given us much ;we have been great gainas ; but there has been a cost, a cost as reyards culture ; a cost as regards respect for self and reverence for other, a cost as regards the noblity and dignity of life."

রামেন্দ্রসুন্দরের মনোজগতে শেষদিকে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। বিশেষত তাঁর কর্মপথের জিজ্ঞাসা নিয়ে, ডারউইন ক্লিফোর্ড হেল্মহোল্টস-প্রদর্শিত পথ কী সেই-বাসনা পূর্ণ করতে পারবে? ব্যবহারিক সত্য বা Pragmatic Truth ও শাশ্বত সত্য বা Absolute Truth একই চূড়ান্তে উপনীত করতে পারবে। তাঁর ভাষায় 'কিরূপ পথ দিয়া এতদূর আসিলাম, আমার গন্তব্য কি, গন্তব্যে পঁহুছিতে হইলে, আমার এ পথ দিয়া আরও যাওয়া উচিত, কি এ পথ ছাড়িয়া অন্য রাস্তা দেখা কর্ত্তব্য।' কেমন যেন সংশয়ান্বিত হয়ে উঠেছেন ক্রমশ বিজ্ঞানের জয়যাত্রা নিয়ে। সমষ্টির উত্তরণের জন্যে বিজ্ঞান প্রয়োজন। যে উন্নয়ন ভিন্ন মানবজীবন তার বনিয়াদ রচনা করতে পারে না। কিন্তু ব্যক্তিজীবনের সেই-চরম আকঙ্ক্ষা মুক্তি বাসনায় বিজ্ঞান কতদূর কী করতে পারে। রামেন্দ্রসুন্দর তাই শেষজীবনে প্রথম জীবনের সব চিন্তা-চেতনার কেমন যেন পুনশ্চিন্তায় রত হয়ে উঠেছেন, শনৈ শনৈ দার্শনিক হয়ে উঠেছেন। বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সংশয়মুক্ত হয়ে জীবনের মহত্তর-বৃহত্তর সত্যান্বেষণে তৎপর হয়ে উঠেছেন। যার সাক্ষ্য দেয় 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় জাতিগত উন্নয়নের প্রশ্নে, সমষ্টির ব্যবহারিক জীবনের সমস্যাগুলি সুরাহার প্রশ্নে তার দেশানুরাগ এতটুকু স্থানচ্যুত হয়নি। শাসক ইংরেজের শোষণ-শাসনের প্রতি অভিযোগের কোন স্খলন ঘটেনি। বরং বড়ো প্রাপ্তি হয়ে উঠেছিল তাদের নির্মমতা-শঠতা-প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও রসমার্গের অগ্রণীরাও শেষ অবধি রাস্তায় নামছে এই আশ্বস্ততায়। "রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের লোকান্তরের কয়েকদিন পূর্ব্বে 'নাইট' উপাধি বর্জন করিয়া নব-ভারতে ত্যাগের, দেশাত্মবোধের ও জাতীয় বেদনাবোধের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। শনিবার তাঁহার পদত্যাগ-পত্রের অনুবাদ 'বসুমতী'র অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশিত হয়। রবিবার রামেন্দ্রবাবু এই সংবাদ অবগত হন, এবং রবীন্দ্রবাবুর পত্রের অনুবাদ পাঠ করেন। রামেন্দ্রবাবু তাঁহার কনিষ্ঠকে দিয়া রবিবাবুকে বলিয়া পাঠান, 'আমি উত্থানশক্তি রহিত আপনার পায়ের ধুলা চাই। সোমবার প্রভাতে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রবাবুর শয্যাপার্শ্বে উপনীত হন। রামেন্দ্রবাবুর অনুরোধে রবিবাবু তাঁহাকে মূল পত্রখানি পড়িয়া শুনান। এ পৃথিবীতে রামেন্দ্রর এই শেষ শ্রবণ। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল আলাপের পর রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন ; রামেন্দ্রসুন্দর তন্দ্রায় মগ্ন হইলেন। সেই তন্দ্রাই মহা নিদ্রায় পরিণত হইল।" (সাহিত্য, আশ্বিন সংখ্যা ১৩২৬)

৩.৪ ❑ প্রবন্ধদুটির নিবিড় পাঠ

৩.৪.১ 'সুখ না দুঃখ?'

মানুষের জীবন অবিরত সুখ-সন্ধানী। সুখ সম্পর্কিত বোধের পার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু সে যেভাবেই বুঝুক না কেন প্রত্যেকেই সুখের অন্বেষণে রত। প্রত্যেক মানুষ এই যে নিজ নিজ লক্ষ্যের অভিমুখে চেষ্টা চালাচ্ছে তারই সমবেত ফলে জগৎ চলছে। জীবজগতে অভিব্যক্তি তারই ফলাফল।

তবে মনুষ্যমাত্রই সুখান্বেষণে রত থাকলেও মানুষের জীবনে সুখের ভাগ বা দুঃখের ভাগ বেশি তা স্থির হয়নি। কারও মতে জীবনে সুখের ভাগই অধিক, আবার কারও মতে দুঃখের পরিমাণ সুখের পরিমাণ থেকে চিরকাল বেশি।

প্রথম পক্ষের এ ব্যাপারে মূল কথাটি হল এই ঃ —জীবনে সুখের পরিমাণই বেশি, জীবনের অস্তিত্বই তার

প্রণাণ। আর তাছাড়া সুখ না থাকলে মানুষ বাঁচতে চাইবে কেন? মানুষ যে বাঁচতে চায়—এর মধ্যেই সুখের মাত্রাধিক্যের প্রমাণ আছে। "মোটের উপর মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বরক্ষার্থ প্রয়াসই বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে যথেষ্ট উত্তর।"

বিজ্ঞানের আলোকে ধর্মশাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করলে দুঃখের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। অভিব্যক্তিবাদের মূল কথা হল দুঃখের বিনাশ এবং সুখের বৃদ্ধি। আর দুঃখ না থাকলে সুখের বৃদ্ধির কথা আসত না, অভিব্যক্তি ঘটত না, যা সমাজের পক্ষে মোটের উপর সুখপ্রদ, তাই হল ধর্ম; আর যা দুঃখপ্রদ, তাই হল অধর্ম। ধর্মাধর্মের এই তাৎপর্য দিয়ে 'সুখ' শব্দটির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে প্রাবন্ধিক চাননি। 'সুখ' শব্দে কেবল নিম্নপর্যায়ের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিমূলক সুখ বলতেও প্রাবন্ধিক নারাজ। যা জীবনের উন্নতিবর্ধক তাই সুখ। মানুষের তথা সমগ্র মানবসমাজের উন্নতি ক্রমবর্ধমান ইতিহাস এ-কথা সমর্থন করে। আর তাহলেই মানতে হয় সুখের মাত্রাও ক্রমশ বাড়ছে। এই সুখ পরিপূর্ণ তা বলা যায় না, কিন্তু তাদের গতি পূর্ণতার দিকে। প্রাবন্ধিক জানান—".......সর্বক্ষণেই তদানীন্তন দুঃখের মাত্রা অপেক্ষা তদানীন্তন সুখের মাত্রা অধিক, নতুবা লোকে জীবন বর্দ্ধনের প্রয়াস না পাইয়া জীবনলোপের প্রয়াস পাইর্ত...."।

ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ দিয়ে জীবনকে বিচার করতে গেলে প্রাথমিকভাবে জীবনের সুখময়কে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ যোগ্যতমের জয়-এই ভাবনার দ্বারা বোঝা যায় হিংসা ও রক্তপাতের মধ্য দিয়েই উন্নতির পথে যেতে হয়। দুঃখ অস্তিত্বহীন এরকম কথা বললে জীবনদ্বন্দ্বমূলক অভিব্যক্তিবাদের আর কোনও ভিত্তি থাকে না। কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, প্রকৃতির সমুদায় কার্যধারা দুঃখ লাঘবের অভিমুখে ধাবিত।

দ্বিতীয় পক্ষের যাঁরা অর্থাৎ যাঁরা জীবনকে দুঃখময় মনে করেন, তাঁরা অন্যপক্ষের যুক্তিতর্কের কথা না শুনে সুখের পরিমাণ যে অধিক তার নিদর্শন দেখতে চান। যদি দারিদ্রকে দুঃখ বলা যায় তাহলে তা সংসারে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। আবার অজ্ঞানকে দুঃখ তাও জগৎসংসারে বহুলপরিমাণে প্রত্যক্ষ গোচর হয়। অধর্মকে দুঃখ বললে, পৃথিবীতে তো অধার্মিকই অধিক। জীবনচেষ্টা আমরা যাকে বলতে চাই তা আসলে দুঃখলোপের প্রয়াসমাত্র, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পণ্ডশ্রম মাত্র। ফলে বাঁচবার ইচ্ছা সুখের আকাঙ্ক্ষা বলা যায় না, দুঃখকে নিবারণের ইচ্ছা; কিন্তু নিবারণ ঘটে না। প্রাবন্ধিকের ভাষায়—"জীবন দুঃখময়, যেহেতু জীবন জীবন।"

জাতীয় উন্নতির সঙ্গে দুঃখ মাত্রা হ্রাস পাচ্ছে—এরকম বলা যাবে না। যার চেতনা নেই, তার কোনও দুঃখ নেই। অনুন্নত জীবের থেকে উন্নত জীবের অনুভূতি বেশি, সাধারণ মানুষের তুলনায় অসাধারণ মানুষের অনুভূতি তীক্ষ্ণ। এইজন্যই বলা যায়—"দুঃখনুভব শক্তির বিকাশের নামই উন্নতি বা অভিব্যক্তি।"

মানুষ বেঁচে আছে এবং বাঁচতে চায়, কিন্তু এর মধ্যে সুখের প্রমাণ হয় না। মানুষ অন্ধশক্তির হাতে পুতুলমাত্র। অথচ দুঃখ এড়াতে সে সদা তৎপর, দুঃখকে অতিক্রমই করতে গিয়ে আবার দুঃখে পড়ছে, তবুও তার জ্ঞান হয় না, তবুও সে বাঁচতে চায়।

দুঃখবাদীদের প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন শোপেনহাওয়ার ও হার্টম্যানের নাম। সভ্যতার প্রাগ্রসরমানতা এবং জ্ঞানের বিকাশ দুঃখ বাড়াবেই, ফলের সুখের আশা ত্যাগই শ্রেয়। কামনা-বাসনা নিবারণই মানুষকে দুঃখ এড়াতে সাহায্য করতে পারে।

এসেছে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও দুঃখকে বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা। বৈদিক আর্যরা দুঃখবাদী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জীবনে অতৃপ্তি ও বিতৃষ্ণার আবির্ভাব হয়। বৌদ্ধ ধর্মকে তারই পরিণতি বলেছেন প্রাবন্ধিক। দুঃখের নিগড় থেকে জীবলোকের মুক্তি প্রদানের চেষ্টাই বৌদ্ধধর্মের মূল কথা।

ভারতীয় দর্শনের অনুভবই ভারতীয় সাহিত্যে অনুসৃত হয়েছে—এরকম সর্বদা বলা যায় না। এর কারণ হয়তো কাব্যে প্রতিফলিত জীবন কবির আত্ম-অনুভবের প্রতিবিম্বন। কালিদাসের কাব্য পড়লে সুখ ও সৌন্দর্য ছাড়া কিছু

ভোগ করেছিলেন মনে হয় না। শোকাকুলা রতিকেও তিনি দেখেন বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী। আবার 'রামায়ণ মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুঃখ-সঙ্গীত'। কিন্তু দুঃখ আছে বলেই রামায়ণে বৈরাগ্যের উপদেশ নেই। বরং জীবনের কর্তব্য সম্পাদন, সমাজসেবা ইত্যাদি উপাদেশ রয়েছে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণে দেখলে দেখি,—প্রকৃতি নিষ্ঠুর, জাতীয় জীবনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যক্তির জীবন অহরহ উৎসর্গ করছে। আবার জাতীয় জীবনের বৃদ্ধিই যে প্রকৃতির উদ্দেশ্য, তাও জোর দিয়ে বলা যায় না। জীবের জাতীয় জীবনের পরিণাম বিজ্ঞান দেখিয়েছে, তাতে প্রকৃতির খেয়াল ছাড়া এর কোনও গভীর উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

কোনও মীমাংসাতে পৌঁছতে পারেননি প্রাবন্ধিক। আসলে জীবনকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এই মীমাংসা প্রয়োজনহীন। অন্তত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে সুখ বা দুঃখ—কোনও একটি দিকের প্রতি সহমত প্রদর্শন করছেন এমন বলা যায় না। প্রবন্ধের শেষে সেই উচ্চারণই লক্ষ করি,—"মীমাংসা হইল না। নিরপেক্ষভাবে দুই দিক্ দেখাইতে গিয়া লেখক যদি অজ্ঞাতসারে কোন দিকে বেশী ধ্যন দিয়া থাকেন, পাঠকরা মার্জ্জনা করিবেন।"

৩.৪.২ সৌন্দর্য-বুদ্ধি'

মানুষের সৌন্দর্য-বুদ্ধির বিকাশ কীভাবে হয়েছে—এর কোনও সন্তোষজনক মীমাংসাতে বড় বড় পণ্ডিতেরাও পৌঁছুতে পারেননি। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছেন—"বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে মাত্র, মীমাংসার কোনও চেষ্টা নাই।"

ইউটিলিটি অর্থাৎ হিতকারিতা বা উপযোগিতা দেখেই প্রাকৃতিক নির্বাচন অগ্রসর হয়। যা জীবনের পক্ষে হিতকর, জীবন-সংগ্রামে যা সাহায্য করে, জীব কালক্রমে তাই অর্জন করে। মানুষ দু-পায়ে ভর দিয়ে চলে, মানুষের হাত অস্ত্র নির্মাণের ও অস্ত্রসৃষ্টির উপযোগী, মানুষ দল বেঁধে বাস করে—এ সমস্তই মানুষের জীবনরক্ষার উপযোগী এবং অনুকূল। এইজন্যই প্রাকৃতিক নির্বাচনে এ সকল ধর্মই মানুষ ক্রমশ প্রাপ্ত হয়েছে।

মানুষের শারীরিক শক্তি কম, কাজেই বুদ্ধির জোরে শারিরীক শক্তির অক্ষমতাকে অতিক্রম করে। মানুষের এই বুদ্ধিমত্তা প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই ফল। গায়ের জোর অল্প বলেই মানুষ দলবদ্ধ জীব, দল বেঁধে আত্মরক্ষা, দলের অধীনতা স্বীকার তাকে করতে হয়। আবার মানুষ ভবিষ্যতের সুখ চেয়ে, সমাজের মুখ চেয়ে আত্মসংবরণ করে। এর ফলে ধর্মবুদ্ধির উদ্ভব হয়। এটিও প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলশ্রুতি। মানবধর্ম প্রাকৃতিক নির্বাচনে উৎপন্ন হয়েছে—একথা স্বীকার করে নিতে হয়। এমন একসময় ছিল যখন নরে ও বানরে তফাৎ ছিল না। প্রাকৃতিক নির্বাচনে নানাবিধ অভিব্যক্তির ফলে প্রকৃতই নরে বা মানবে পরিণত হয়েছে। সৌন্দর্য-বুদ্ধিই ঠিক সেরকমই মানবধর্ম।

মানবেতর জীবের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ আছে কি না, বলা জটিল। বাংলায় যাকে বলে সুকুমার কলা, ইংরেজিতে যাকে বলে ফাইন-আর্ট এখানে সেই সৌন্দর্যের কথা হচ্ছে।

তবে ইতরজীবের মধ্যেও একরকম সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা আছে, কিন্তু তা সাধারণ জীবধর্ম, একে বিশিষ্ট মানবধর্ম বলা যেতে পারে না। বিহঙ্গ গান গেয়ে বিহঙ্গীর মন ভোলায়, ময়ূর কলাপ বিস্তার করে নেচে নেচে ময়ূরীর মন জয় করে,—এই শ্রেণির সৌন্দর্যপ্রিয়তা জীবধর্মের অন্তর্গত।

ডারুইন আমাদের জানিয়েছেন যে যৌন নির্বাচনে এই সৌন্দর্যের উৎপত্তি হয়েছে। ময়ূরীর ময়ূরের কলাপবিস্তার করা নৃত্যরত সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ আছে বলেই ময়ুর সুন্দর হয়েছে। মানুষের মধ্যেও এরকম সৌন্দর্যপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়। নারীদেহের সৌন্দর্য এই যৌন নির্বাচন থেকেই উৎপন্ন। "চম্পক-অঙ্গুলের প্রতি খঞ্জন-নয়নের প্রতি পুরুষের অকস্মাৎ অনুরাগ থাকায় নারী চম্পক-অঙ্গুলির এবং খঞ্জন-নয়নের অধিকারিণী হয়েছেন।" কিন্তু জবা, শেফালি ছেড়ে কেন চাঁপার প্রতি এবং প্যাঁচা, হাড়গিলা ছেড়ে কেন খঞ্জন-নয়নের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ হল, তা

বোধগম্য হয় না। 'মনুষ্য যেখানে সেখানে অহেতুক সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়।'

অবশ্য সাধারণ মানুষ যেখানে মুগ্ধ হবার বা আপ্লুত হবার কোনও কারণ দেখে না, সেখানে কবি ও ভাবুক মুগ্ধ হন। এই যে সৌন্দর্যবুদ্ধি, তার জীবনরক্ষার ক্ষেত্রে কোনও কার্যকর ভূমিকা আছে তা প্রমাণ করতে কেউ বোধহয় তৎপর হবেন না।

প্রাবন্ধিকের বক্তব্য যে এই সৌন্দর্যবুদ্ধি স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বরং প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে। বরং যাঁরা এই সৌন্দর্যপ্রিয়তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ চিত্রশিল্পী, কারুশিল্পী বা অন্যজাতের শিল্পী যাঁরা তাঁদের সাংসারিক বুদ্ধি সবসময়ই অত্যন্ত প্রশংসনীয় নয়। সৌন্দর্যবোধের উৎপত্তির প্রাকৃতিক কারণ নির্দেশ একরকম প্রায় অসম্ভব।

আলফ্রেড রসেল ওয়ালশ আমাদের জানাচ্ছেন যে মানুষের সৌন্দর্যবোধের হেতু প্রাকৃতিক নির্বাচনে ব্যাখ্যা করা যায় না। যৌন নির্বাচনেও এর উৎপত্তি নয়। অথচ সৌন্দর্যবোধ মানবত্বের প্রধান লক্ষণ। সৌন্দর্যবুদ্ধি বিবর্জিত মানুষকে পূর্ণ মানবত্ব আখ্যা দেওয়া যায় না। ফলে পূর্ণ মানবত্ব যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল একথাও ঠিক স্বীকার করা যায় না।

ওয়ালশের বক্তব্যের সঙ্গে সকলে সহমত প্রদর্শন করেননি। কিন্তু যেহেতু সৌন্দর্য-বুদ্ধির জীবনসংগ্রামে কার্যকারিতা নেই তখন প্রাকৃতিক নির্বাচনেই সৌন্দর্যবুদ্ধি জন্মাতে পারে, একথাও স্পষ্ট করে কেউ বলতে পারেননি।

জীববিদ্যার পণ্ডিতেরা কেউ কেউ বলতে চান, "এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা একটা bye-product of evolution—জাতীয় অভিব্যক্তির একটা আকস্মিক আগন্তুক আনুষঙ্গিক ফল মাত্র।" জীবনরক্ষার অনুকূল বিভিন্ন মানবধর্মের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাক্রমে এই বুদ্ধিটা সৃষ্টি হয়েছে। এই বুদ্ধিটি মানুষকে বিনা কারণে খানিকটা আনন্দলাভের উপায় ঘটিয়েছে।

মানুষের সৌন্দর্যানুরাগ আসলে একধরনের নেশা। এর কোনও প্রত্যক্ষ উপকারিতা নেই। বরং সময়ে সময়ে এই নেশা সাংসারিক জীবনে অপকারও করে। তবে একথাও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—"তবু ভাল যে সংসারের সকলেই এই মদের মাতাল নহে। সকলেই সংসারের কাজ ছাড়িয়া জোনাকি, আর ফুল, আর ভ্রমর, আর বিরহ লইয়া জীবন কাটায় না।"

বিশুদ্ধ সৌন্দর্য আসলে উপভোগের সামগ্রীমাত্র। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য দেয় নির্মল আনন্দ। এইজন্যই প্রবন্ধের শেষে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বক্তব্যঃ "এই আনন্দ কোন কোন কাজে লাগে, জীবনযাত্রায় কাহারও কোন রকমে হিত করিতে পারে, এরূপ কল্পনা করিতে গেলেও উহার বিশুদ্ধি নষ্ট হয়; উহা যেন মলিন হইয়া যায়।"

৩.৫ ❑ 'সুখ না দুঃখ?' ও 'সৌন্দর্যবুদ্ধি' প্রবন্ধ দুটির বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা ও সামগ্রিক বিশ্লেষণ

'সুখ না দুঃখ' প্রবন্ধটি প্রথম মুদ্রিত হয় 'সাধনা' পত্রিকার ১২৯৯-এর মাঘ সংখ্যায়। পরবর্তীকালে 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে সংকলিত হয়। 'সৌন্দর্য-বুদ্ধি' প্রবন্ধটিও প্রথম প্রকাশিত হয় মাসিক 'প্রদীপ' এর ১৩০৬-এর মাঘ সংখ্যায়। এবং যথারীতি 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রবন্ধ দুটি তো বটেই গ্রন্থের বাকি কুড়িটি প্রবন্ধেরও যথেষ্ট সমাদর হয়েছিল সমকালীন বিদ্বজন ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে, যে-কারণে ১৩২১ অর্থাৎ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ ঘটে।

প্রবন্ধকার এই আলোচনায় প্রয়াসী থেকেছেন 'সুখ' ও 'দুঃখে'র একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দান করে একটি আলোচনার পরিসরকে উৎসাহিত করতে—জীবনপ্রবাহে ও সভ্যতার বর্ধমানতায় সুখ না দুঃখ কার ভার বেশি? কে পরম্পরিত ধারায় জীবন ও সভ্যতার চলিষ্ণুতায় গতি সৃষ্টি করে চলেছে? প্রকৃতপক্ষে দু'য়ের মধ্যে কে হয়ে উঠেছে নিয়ন্ত্রা-শক্তি? কোন 'মীমাংসায়' তিনি পৌঁছতে চাননি। প্রশ্নটি নিয়ে তিনি তিন-দিকের মান্য মতগুলির সারসংক্ষেপ নিয়ে পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত করতে চেয়েছেন—তিন-দিকগুলি যথাক্রমে, বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্য। তিন-

দিকেরই তাঁর পারঙ্গামতা নিয়ে সমকালীন বিদ্বজনদের মধ্যে কোন মতান্তর ছিল না, অনিন্দ্যসুন্দর এক গ্রহণযোগ্যতা ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখেরা পূর্বাপর ঐকমত্যেই ছিলেন, বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শনের তিন বেদীতে অধিষ্ঠিত থেকে বাংলা সাহিত্যের সেবা করে যাবার সামর্থ্য সে-সময়ে তাঁর মতো আর কারও ছিল না।

সন্দর্ভ বা আলোচনাটির প্রাসঙ্গিকতায় চার্লস ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ বা বিবর্তনবাদের (Theory of Evolution) এর কিঞ্চিদধিক উল্লেখ থাকলেও সত্যের খাতিরে বলতে হয় পটভূমিটিই রচনা করে দিয়েছে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের লিনিয়াম সোসাইটির পত্রিকায় জীবনের বিবর্তনক্রিয়া নিয়ে ওয়ালেম—ডারউইনের যুগ্মগবেষণায় বৃহৎ যে-পত্রটি (paper) প্রকাশিত হয়ে বছরেই অর্থাৎ ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পাওয়া 'The Orign of Species' মহৎ গ্রন্থটি, যা অনতিবিলম্বে বিজ্ঞানী-গবেষক হাক্স লে, আর্নস্ট হেকেল প্রমুখদের সংযোজন-সংশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে 'ডারউইনবাদ' (Darwinism) নামে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেয় প্রথাসিদ্ধ সনাতনী চিন্তা-চেতনার রাজত্বে—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য সৃষ্টির মূলে কোন শক্তিধরের লীলাচাঞ্চল্য বা কারু বাসনা নেই, আছে প্রকৃতি-জলবায়ু-পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া অধিকতর কর্মণ্যদের অভিযোজন-ক্ষমতার গুণাগুণ, আদিমকাল থেকে নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তনের মাধ্যমেই সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি ঘটছে। যার যতিভঙ্গ এখনও ঘটেনি।

প্রশ্ন উঠেছে 'সুখ' এর সংজ্ঞা কী? যাতে তুষ্টি ঘরে, যার দ্বারা 'জীবন বর্ধিত' পরাক্রম প্রাপ্ত হয়। যে জীবনযাপনের বাতাবরণে 'আধিব্যাধি, সর-যাতকনা নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস, প্রণয়ে কৃত্রিমতা, ধর্ম্মের নিপীড়ন, নিরীহের পেষণ, সকলের উপর ধর্মের মুখোশ-পরা অধর্ম্মের জয়জয়াকার, এ সব নাই এমন নহে ; তবে স্নেহ দয়া ভক্তি মমতা সরলতা প্রেম, ইহারাও আকাশকুসুম বা ভাষার কল্পিত অলঙ্কার নহে' এই জীবন-ধারারই এক একটি Unit বা এককের নাম এক একটি সুখ। এই সুখেরই 'ভালরূপ বন্দোবস্তে' মানুষেরা ব্যাপৃত হয়। সুখ দুই প্রকার (ক) ইন্দ্রিয়জ (খ) জীবনবর্ধক।

ইন্দ্রিয়জ সুখ নিম্নপর্যায়ের। যাতে ক্রমশ 'জীবনবর্দ্ধনের প্রয়াস না পাইয়া জীবনলোপের প্রয়াস' পায়। জীবন-বর্ধক সুখই সামাজিক চলিষ্ণুতায় গতি সৃষ্টি করে ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সঙ্গাতি স্থাপন করে বৃহত্তর-মহত্তর একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। যা একই সঙ্গে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করে—— 'মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব এবং সেই অস্তিত্বরক্ষণার্থ প্রয়াস'কে বলশালী করে তোলে। অতএব দুটি সূত্র নির্ণীত হতে পারে।

- "নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য এবং জীবনের প্রবাহ সেই উদ্দেশ্যের মুখেই চলিতেছে বলিয়াই সামাজিক উন্নতি।'
- "মনুষ্যজীবনের ও মনুষ্যসমাজের উন্নতি ক্রমশঃ হইতেছে। ইতিহাস যদি ইহা সমর্থন করে তবে সুখের মাত্রা ও উৎকর্ষ ক্রমেই বাড়িতেছে বলিতে হইবে। কখনও পূর্ণতা না হইতে পারে কিন্তু গতি পূর্ণতার দিকে।'
- প্রকৃতির সমুদয় বিধানই দুঃখের লঘুকরণের অভিমুখী।

  অতঃপর আলোচনায় দুঃখবাদী দার্শনিকদের চিন্তাভাবনার উল্লেখ করেছে।
- 'যার দুঃখভোগের ক্ষমতা অধিক, যে ভুগিতে জানে, অতএব ভোগে। যাহার চেতনা নাই, তাহার দুঃখ নাই। নিকৃষ্ট জীবের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানুষের অনুভূতি তীক্ষ্ম। সুতরাং দুঃখানুভবশক্তির বিকাশের নামই উন্নতি বা অভিব্যক্তি। যেখানে উন্নতি অধিক, সেখানেও দুঃখ অধিক। .... জীবনে সুখ থাকা অসম্ভব, এবং জীবনের উদ্দেশ্য সুখ নহে। মানুষ বাঁচিয়া আছে ও বাঁচিতে চায়, তাহাতে সুখের প্রমাণ হয় না, তাহাতে প্রাকৃত শক্তির নিকটে মানুষের পূর্ণ অধীনতা সপ্রমাণ করে মাত্র। মানুষ অন্ধ শক্তির বশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে ; ফাঁদ

এড়াইতে গিয়া ফাঁদে পা দিতেছে ; দুঃখ এড়াইতে গিয়া দুঃখে পড়িতেছে ; তথাপি তাহার জ্ঞান হয় না ; তথাপি সে বাঁচিতে চায়। প্রকৃতির হাতের ক্রীড়াপুতুল মানুষ। ইহাই প্রধান রহস্য।"

- "জীবনচেষ্টা যাহাকে বল, সে ত কেবল জীবনরক্ষার বা দুঃখলোপের প্রয়াস মাত্র। কিন্তু হয়, অধিকাংশ স্থলে সেই প্রয়াস কি পণ্ডশ্রম মাত্র নহে? আবার মানসিক জীবনের সমুদয় কার্য্য ; বুদ্ধি, কি চিন্তা কি অন্যান্য মানসিক বৃত্তি ত কানারই ভরণপোষণ ও পরিচর্য্যাকার্য্যে নিযুক্ত। সেই কামনার অর্থ কি? বর্ত্তমান অভাবের, বর্ত্তমান ক্লেশের দূরী করণের প্রবৃত্তি। অর্থাৎ জীবন মূলেই দুঃখময়, অভাবময়। অভাবময়তা না থাকিলে কামনা থাকিত না, জীবনের প্রয়োজন থাকিত না। জীবনের সজ্ঞাই যেখানে দুঃখময়তা হইল, দুঃখময়তার ক্রমিক প্রবাহই স্রোত হইল, দুঃখময়তার দূরীকরণের নিষ্ফল প্রয়াসেই জীবনের সমাপ্তি হইল, সেখানে জীবনদুঃখময়, কি সুখময় তাহা প্রশ্ন করা বাতুলতা। যেখানে অভাবের শেষ, সেইখানে জীবন-প্রবাহ রুদ্ধ ; অভাবের পরম্পরাতেই জীবলীলা। বাঁধিবার ইচ্ছা, সুখের ইচ্ছা নহে, উহা দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির ইচ্ছা, তবে নিষ্কৃতি ঘটে না। জীবন দুঃখময়, যেহেতু জীবন—জীবন।'

স্পষ্টতই পর্যায়ক্রমে দুঃখবাদকে অকারণে পল্লবিত না করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুটি মূল নির্বন্ধের উপস্থাপন ঘটিয়েছেন। দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসই বলে না দুঃমবাদের সব চেয়ে দুই বড়ো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধধর্মকেও যেমন কেন্দ্র করে, তেমনি শোপেনহাওয়ারকে কেন্দ্র করে।

এর পরেই রামেন্দ্রসুন্দর আলোচনাকে নিয়ে গেছেন জাতিগত চরিত্র ও সামাজিক-রাষ্ট্রিক অবস্থান্তরের মধ্যে দিয়ে কীভাবে এক-একটি তত্ত্ব বা নির্ণয় পল্লবিত হয়ে কর্ষিত হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয় সেই-ঐতিহাসিকতাতেই।

- "স্ফূর্তিমান ইংরেজ যে মোটের উপর সুখবাদী হইবেন বুঝা যায় ; কিন্তু বলদৃপ্ত জ্ঞানদৃপ্ত জন্মনিতে কিরূপে দুঃখবাদের প্রাদুর্ভাব হইল, ভাল বুঝা যায় না।

এদেশের দার্শনিকদের মুক্তিবাদ বা নির্ব্বাণবাদ এই চিরচন্তন দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের আকঙ্ক্ষার ফল। বৈদিক আর্য্যগণের দুঃখবাদী হইবার বড় অবসর ছিল না।....

পরবর্ত্তীকালে জ্ঞানের আকাঙক্ষার সহিত জীবনে অতৃপ্তি ও বিতৃষ্ণার আবির্ভাব দেখা যায়। বৌদ্ধপন্থায় তাহার পরিণতি। দুঃখপাশ হইতে জীবলোকের মুক্তি প্রদানের চেষ্টাই ভগবান বুদ্ধদেবের জীবন। তারপর হইতে হিন্দুশাস্ত্র নানাভাবে একই কথা বলিয়াছে ; মুক্তিলাভের নানা উপায় আলোচনা করিয়াছে, যিনি যখন বুদ্ধগৌতমের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কর্ম্মসংস্কারে হাত দিয়াছেন, তখনই তাঁহার মুখে সেই পুরাতন কথা ; কামনা নিরোধ কর, কর্ম্ম ভস্মসাৎ কর, মুক্তি লাভ করিবে। আধুনিক ভারতবাসীর অস্থিমজ্জায় এই ভাব মিশান রহিয়াছে।"

উদ্ধৃতাংশে দেখা যায় রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের চমৎকারিত্ব! সামাজিক রাষ্ট্রিক-অর্থনৈতিক প্রগতি-আধোগতি-বন্ধ্যাত্বই তো গড়ে দেয় একই সঙ্গে ব্যষ্টি এবং সমষ্টির মনঃস্তত্ত্ব। প্রত্যয়ে কখনও করে তোলে কর্মবীর উদ্যমী প্রত্যয়ী কখনও দহনে-দাহনে ন্যুব্জ কুব্জ কূটকচালে। ইংরেজ তো 'স্ফূর্তিমান জাতি' হবেই, ১৭৪০-৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যেভাবে দেহটা বড়ো যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে বড়ো-মাঝারি-ছোটো বাণিজ্য-উৎপাদন বিপণনের সঙ্গে জড়িয়ে উন্নতির শিখরে উঠে গেল। তাতে আত্মপ্রত্যয়ে প্রথাসিদ্ধতার সব কিছুকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পৃথিবীটাকে নতুন করে গড়ে তোলার আগ্রহে উদীপ্ত হতেই তো পারে। জার্মানি তো তা পারে না, য়ুরোপের জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর্যজাতীয়ত্বের অহংকার থাকলেও তারা তো সেই-জাত্যভিমানে নিজেদের স্বতন্ত্রতা ভুলে এক হতে পারেনি। সাড়ে তিনশো জাতিগোষ্ঠীকে বিসমার্ক চেষ্টা করেও সেভাবে এক করতে পারেনি। অধিকন্তু সমুদ্রযাত্রায় দেশ-মহাদেশ পাড়ি দিয়ে উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজনও সেভাবে সময় থাকতে বোঝে নি,

খনিজ সম্পদে প্রাণীজ সম্পদে প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পন্ন থেকেও নিজেকে সময় থাকতে সেভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, অধিকন্তু নিজেদের মধ্যে বিরোধ নিয়ে, চিরশত্রু ইংরেজদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে কেবলই দগ্ধেছে, এই-বাতাবরণে দুঃখবাদের জয়জয়াকার তো ঘটতেই পারে না। (বস্তুত ইংরেজ শাসকরা সতর্ক ছিল জার্মান জাতি সম্পর্কে। কোনভাবে উপনিবেশে তাদের প্রভাব যেন না বেড়ে যায় এ সম্পর্কে তীক্ষ্ণভাবেই সচেতন ছিল। ফলে জার্মান জাতি সম্পর্কিত কোন তথ্যই প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে এসে পৌঁছতো না। ফলে রামেন্দ্রসুন্দরকে মন্তব্য করতে হয় 'বলদৃপ্ত জ্ঞানদৃপ্ত জর্ম্মাতিতে কিরূপে দুঃবাদের প্রাদুর্ভাব হইল বুঝা যায় না।' যে-কারণে ব্রাহ্মণ্যবাদী যুগের প্রচ্ছায়ের মধ্যেই বৌদ্ধ-ধর্মের শূন্যবাদ ভারতবাসীকে গ্রাস করে নেয়। নির্বাণতত্ত্বের মূলে না গিয়েই সরলীকরণ-তরলীকরণের মধ্যে দিয়ে তাকে মনে-প্রাণে বরণ করে নেয়। সাধারণের পরম্পরিত জীবধারায় যে দহন-দাহন তথা যন্ত্রণাময়তার লঘুকরণ কখনও ঘটে না। বরং তীব্রতা বেড়েই যায়—— এক শাসক যায়, অন্য শাসক আসে কিন্তু শোষণের কোন ব্যত্যয় ঘটে না। ফলে বিমর্ষতা-অবসাদ-নঞর্থকতা ভারতবাসীর 'অস্থিমজ্জায়' মিশে যায়।

এর পরেই প্রবন্ধকার আলোচনাকে নিয়ে গেছেন সুখ-দুঃখের তুল্যমূল্যতায় বিশ্বসাহিত্যের প্রশস্ততায়। সংক্ষিপ্ততর সংহত থেকে সংহততর মন্তব্যে—— সমকালীন ইংরাজি সাহিত্য বাংলাসাহিত্য থেকে শুরু করে মধ্যযুগের ইংরাজি সাহিত্য তা বটেই ভারতীয় সাহিত্যের সেই-সে-চিরায়ত অংশগুলির আলোচনায় যে-আলো বিকীর্ণ করে তুলেছেন তা উৎকীর্ণ মণিমুক্তোরই সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছে। যেমন,

- 'রামায়ণ মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুঃখ-সঙ্গীত।'
- 'কালিদাস যে কখনও সুখ ও সৌন্দর্যছাড়া আর কিছু ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না।'
- 'সেক্সপীয়রের মনঃ কল্পিত পরীরাজ্যের চঞ্চল স্ফূর্ত্তিমত্তা মনে পড়ে, যাহা এলিজাবেথের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত সমান টানে ফুটিয়া আসিতেছে। কিন্তু যেখানেই সেক্সপীয়র জীবনের রহস্যভেদের প্রয়াস পাইয়াছেন, সেখনেই প্রীতির নৈরাশ্য, ধর্ম্মের অবমাননা ও জীবনের নিস্ফলতায় উষ্ণ শ্বাস ফেলিয়াছেন।'
- 'বন্ধু-শোকার্ত্ত টেনিসন বিশ্বলীলায় প্রকৃতির উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধির ঠাহর না পাইয়া হতাশ্বাস হইয়াছেন।'
- 'বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষীণপ্রাণা অসহায়া কুন্দনন্দিনীর মৃতদেহের সহিত জগৎ-সংসারের বিষবৃক্ষকেও দগ্ধ দেখিতে পারিলে শান্তির আশা কখনও বা জন্মিতে পারে। কৃতবিদ্য বাঙালি রামায়ণ-মহাভারত ইলিয়ড-অডিসি পড়বেন, কালিদাস-শেক্সপীয়র পড়বেন এ তেমন কিছু প্রশংসনীয় নয়, কিন্তু তা বলে সমকালীন 'Poet Laureate' টেনিসন? যে টেনিসন ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে বন্ধ হ্যাল্মের মৃত্যুজনিত বিয়োগব্যথা নিয়ে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে 'In Memoriam' লিখেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর বিশ্লেষণে সেই টেনিসনের 'In Memoriam' এরও সশ্রদ্ধ উল্লেখ রেখেছেন! কবি-সমালোচক একটি লেখার প্রমথ চৌধুরীর প্রশস্তি রচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন—— দেশ-বিদেশের সাহিত্যের সাম্প্রতিকতম খোঁজখবরে প্রমথ চৌধুরী ছিলেন অদ্বিতীয়। এখন দেখা যাচ্ছে সেই-শিরোপার দাবিদার রামেন্দ্রসুন্দরও হতে পারেন। সঙ্গে তাঁর মুকুটে বাড়তি একটি পালকও যুক্ত হতে পারে, যার নাম হৃদয়বত্তার সৌকুমার্য—— তা না হলে বঙ্কিচন্দ্রর 'বিষবৃক্ষ'এর সপ্রশংস উল্লেখনে নির্মল-হৃদয়ের একবোঝতা কী মেশানো যায়?

রামেন্দ্রসুন্দরের একটি বিখ্যাত প্রবন্ধের নাম 'সত্য'। সেখানে তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানিয়েছেন 'মানবজীবনের সহিত সত্যের সম্বন্ধ'। যে-সত্যের কর্ষণা করতে হয় ব্যক্তিগত শ্রীবৃদ্ধি ও মর্যাদা অর্জনের জন্যে নয়। যে-সত্যের মন্থনে সুখদুঃখ সম্পর্কে সমান নির্লিপ্তি-নিরাসক্তি ভাব নিয়ে কাজ করে যেতে হয়। অহরহ কাজ 'পুরস্কারের আশা নাই; ভাল ছেলে হও ত বিহিত বিধানে জীবনের কাজ কর। বৈরাগী হইও না ; প্রকৃতির এই উপদেশ।' রামায়ণ থেকেও তিনি

নিজে এই জীবন-বাণী আহরণ করেছেন 'সংসারে দুঃখ আছে ; নিস্তারের উপায় নাই ; কিন্তু জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন কর। সমাজের সেবা কর। বৈরাগী হইও না।

'সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি' প্রবন্ধটিও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জ্ঞানন্বেষণের তীব্র ব্যাকুলতার স্বাক্ষর হয়ে আছে। এখানে তিনি আলোচনার বিষয়বস্তু করেছেন 'মানুষের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির বিকাশ হইল কি রূপে? 'যাহা কিছু কাজে লাগে, যাহা জীবনের পক্ষে হিতকর, যাহা জীবনসংগ্রামের অনুকূল। কোন না-কোন রূপে জীবন সংগ্রামে যাহা সাহায্য করে, জীব কালক্রমে তাহাই অর্জন করে'—অর্জিত এই সব উপচারগুলিকেই রামেন্দ্রসুন্দর এক কথায় বলেছেন 'মানবধর্ম'। 'সৌন্দর্য-বুদ্ধি মানবধর্ম।" রামেন্দ্রসুন্দরের বেশির ভাগ প্রবন্ধের যা বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের মিশে যাওয়া, এই প্রবন্ধের মধ্যেও তার কোন অপহ্নব ঘটেনি। কেননা যে-বিষয়টি নিয়ে তিনি আলোচনা করতে চেয়েছেন সেখানে বিজ্ঞানের নজির পাওয়া কঠিন—মানুষ পৃথিবীতে বাস করছে এক মিলিয়ন বৎসরেরও বেশি, অথচ সেই-বসবাসের ধরনধারণের লিখিত ইতিহাসে বড় বেশি হলে পাঁচ হাজার বছর সন্নিবেশিত হয়েছে। ডারউইনের বিবর্তনবাদে মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার মূল সূত্রটি উদঘাটিত হলেও তথ্য-নজির নিয়ে 'সেই-হয়ে ওঠার' ক্রমপর্যায়গুলি আলোকিত হয়ে উঠতে পারেনি। বিশেষত নৃ-বিজ্ঞানীদের অভিমত অনুযায়ী সবচেয়ে ন্যূন-ঊন মানুষের যে-স্তর 'পিথেকান্‌থ্রোপাস' এবং সর্বাপেক্ষা উন্নত যে স্তর 'অ্যান্‌থ্রোপয়েড'—— এই দু'য়ের মধ্যে কয়েক লক্ষ বছর শূন্যতা সৃষ্টি করে আছে। এই শূন্যস্থান ভরাট করতে পারে একমাত্র 'ঐতিহাসিক-বৈজ্ঞানিক কল্পনা। যে-কল্পনায় গর্ডন চাইল্ড লিখেছেন 'Man Makes himself', পরবর্তী সময়ে জে ডি বার্নাল লিখেছেন 'Social Function of Science' সেই একই মেধাবী-কল্পনায় রামেন্দ্রসুন্দর আলোকসম্পাত করে গেছেন মানুষের পরম্পরা কীভাবে জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে নেয় কীভাবে 'আত্মরক্ষা'র জন্যে, 'বংশরক্ষা'র জন্যে, 'জাতিগত জীবনরক্ষা' জন্যে 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনগুলি'র সাহায্য নিয়ে সভ্যতার পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে হয়। প্রাবন্ধিকের ভাষায়, 'যাহা কিছু কাজে লাগে, যাহা জীবনের পক্ষে হিতকর, যাহা জীবন সংগ্রামে অনুকূল, কোন না-কোন রূপে জীবনসংগ্রামে যাহা সাহায্য করে, জীব কালক্রমে তাহাই অর্জন করে। মানুষ দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে, মানুষের মাথায় একরাশি মস্তিষ্ক আছে, মানুষের হাত দুইখানা অস্ত্রনির্মাণের ও অস্ত্রপ্রয়োগের উপযোগী, মানুষ ঘর বাঁধিয়া বাস করে, মানুষ স্পষ্ট ভাষায় কথা কহিয়া পরস্পর মনোভাব জ্ঞাপন করে, এ সমস্তই মানুষের জীবনরক্ষার উপযোগী ও অনুকূল। অতএব প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে এ সকল ধর্ম্মই মানুষ ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইয়াছে।" (সৌন্দর্য-বুদ্ধি) ধর্ম বলতে প্রাবন্ধিক বোঝাতে চেয়েছেন প্রকৃতিগত উপাদানকে—— যা স্বতই অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায়, দিনচর্যার মধ্যে দিয়ে যা ক্রমশই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা আকারপ্রাপ্ত হয়ে ওঠে।

- কান্ট তাঁর 'Critique of pure Reason' গ্রন্থে 'পূর্বতঃ সিদ্ধতা' বলতে যা বুঝিয়েছেন, বাংলা চলতি কথায় যাকে বলা যায় স্বতঃসিদ্ধতা। সেই 'সার্বিক-বচন' থেকেই অতঃপর তিনি আলোচনার গভীরে গিয়েছেন 'সৌন্দর্য-বুদ্ধি মানবধর্ম'। মানবধর্মের সঙ্গে এক্ষেত্রে জীবধর্মের সঙ্গে এক করে দেখলে চলবে না। মানবধর্ম মানুষকে সামাজিকত্বের স্তরে উন্নীত করে। যে কারণে 'পরের মুখ চাহিয়া ও ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া মানুষকে আত্মসংবরণ করিতে হয় ; বর্ত্তমান কামনা, বর্ত্তমান বাসনা, বর্ত্তমান লালসা, বর্ত্তমান প্রবৃত্তি দমনে রাখিতে' প্রয়াসী হতে হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায় এই-প্রয়াসের নামই ধর্মবুদ্ধি। যা মানুষকে স্থূল কার্যকারিতার অঙ্ক কষা থেকে বিরত করে। এই প্রয়াসই সৌন্দর্য-সন্দর্শনের প্রেরণা দেয়। এই প্রেরণা 'মানবেতর জন্তুর' হয়ত বা নেই। 'ইতর জীবের সৌন্দর্য্যবোধ আছে কি না বলা কঠিন। ইংরাজীতে যাহাকে ফাইন আর্ট বলে, বাঙ্গালাতে যাহাকে সুকুমার কলা বলা হয়েছে। সেই ফাইন আর্টের যে সৌন্দর্য্য লইয়া কারবার, আমি সেই সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছি। ইংরাজীতে যাহাকে ইস অথেটিক বৃত্তি বলে, বঙ্কিমবাবু যাহার চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি নাম দিয়াছেন, তাহারই সহিত এই সৌন্দর্য্যের কারবার।

- সৌন্দর্যবোধ বা সৌন্দর্যবুদ্ধির সঙ্গে অতঃপর যৌনতার সম্পর্ক বা 'যৌন নির্ব্বাচনের' আলোচনাটিকে উত্থাপন করেছেন। প্রকারান্তরে যাকে 'সাধারণ জীবধর্ম্ম'ও বলা যেতে পারে। যার বলে 'বিহগা গান গাহিয়া বিহগীর মন ভুলায় ; কপোত মণিতানুকারী ধ্বনির দ্বারা কপোতীর মন ভুলায় ; ময়ুর কলাপশোভা বিস্তার করিয়া কেকা-রব সহকারে নাচিয়া নাচিয়া ময়ূরীর মন ভুলায়।' যে-কারণে সহজ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় 'নারীদেহের সৌন্দর্য এই যৌন নির্ব্বাচন হইতেই উৎপন্ন। চম্পক-অঙ্গুলির প্রতি ও খঞ্জন-নয়নের প্রতি পুরুষের অকস্মাৎ অনুরাগ থাকায় নারী চম্পক-অঙ্গুলির ও খঞ্জন নয়নের অধিকারিণী হইয়াছেন।'
- তবু এই যৌনতা বা সৌন্দর্যের কার্যকারিতা নিয়ে মানুষের মানবত্বের সার্বিক ধর্ম নয়। মানুষের মধ্যে অহেতুক সৌন্দর্য দেখার একটা ঝোঁক আছে। স্থূল কার্যকারিতার ঊর্দ্ধে ওঠার একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে। অনেকের মতে 'মানবত্বের প্রধান লক্ষণই শুধু নয়, সর্ব্বপ্রধান লক্ষণও বটে।' এর সঙ্গে আপতভাবে 'জীবনরক্ষা' ও 'বংশবৃদ্ধি'র ব্যবহারিক লাভালাভ বা উপযোগিতা কিছু নেই, ব্যবহারিক দিক থেকে 'অর্থ ও তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না। মনুষ্য যেখানে সেখানে অহেতুক সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়।' যদিও সব 'মনুষ্য নয়' কোন কোন মনুষ্য। তাদের 'এই সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির জীবন রক্ষার কোন কার্যকারিতা আছে, তাহাও বোধ হয়। কেহ সপ্রমাণ করিতে যাইবেন না। বরং ইহাতে জীবনের প্রতিকূলতা করে। যিনি এইরূপ সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার সাংসারিক বিষয়বুদ্ধি সর্ব্বতা প্রশংসনীয় হয় না। চিত্রশিল্পী পটের উপর পাঁচরকমের বর্ণের বিন্যাসকরিয়া অপরূপ রূপের সৃষ্টি করেন, কলাবৎ নানারকমের স্বরবিন্যাস দ্বারা বিবিধভাবের উদ্বোধন করিয়া আনন্দের সৃষ্টি করেন ; কারুশিল্পী প্রস্তরে পাঁচ রকম দাগ কাটিয়া সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা দেখান। এই সকল সুন্দর পদার্থের সৌন্দর্য্য কোথা কিরূপ কি উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হইল, তাহা কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে না। এই সকল বস্তুর কোথায় সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তাহার আবিষ্কারেও সকলে সমর্থ হয় না ; অথচ যিনি ভাবগ্রাহী বা সমঝদার, তিনি এই সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিয়া পুলকিত ও মোহিত হইয়া পড়েন।'
- এখানে তিনি আর একটি নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন,—— এই সৌন্দর্য-বুদ্ধি সবাই পায় না, কেউ কেউ পায়। ব্যক্তিগত চয়ন বা অর্জন। অব্যহিত সময়ে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যার 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথ এই-আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'কেকাধ্বনি'। সেখানে রামেন্দ্রসুন্দরের বাস্তব-জীবনে অকার্যকারী এই সৌন্দর্য-বুদ্ধিকেই চিহ্নিত করেছেন বৌদ্ধিক বা মননজাত সৌন্দর্য বলে। স্পষ্টতই সৌন্দর্যের শ্রেণি নির্ণয়ে দুই শ্রেণির সৌন্দর্যকে চিহ্নিত করেছেন (ক) ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্য (খ) মননজাত সৌন্দর্য বা বৌদ্ধিক সৌন্দর্য। প্রথম ধারার সৌন্দর্যটি আসে জৈবিকতার সূত্রে, জীবন ধারণের সহজ ও সরল ধারায়। দ্বিতীয় ধারার সৌন্দর্যটি আসে না—তাকে অর্জন করে নিতে হয়, যেখানে প্রয়োজন কোন ভূমিকা নিতে পারে না, যার তথাকথিত ইন্দ্রিয়সুখ পূরণের কোন ক্ষমতাই নেই।
- রবীন্দ্রনাথের 'কেকাধ্বনি'র মতো রামেন্দ্রসুন্দরও তাঁর এই প্রবন্ধে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন "বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য কেবল উপভোগের সামগ্রী—ইহার ফল বিশুদ্ধ নির্ম্মল আনন্দ। এই আনন্দ কোন কোন কাজে লাগে ; জীবনযাত্রায় কাহারও কোন রকমে কোন হিত করিতে পারে, এরূপ কল্পনা করিতে গেলেও উহার বিশুদ্ধ নষ্ট হয়, উহা যেন মলিন হইয়া যায়। কোনরূপ লাভের, কোনরূপ হিতের সম্পর্ক আনিতে গেলে উহার শুদ্ধতা থাকে না। কোন প্রাকৃতিক কারণে এই আনন্দের উৎপত্তি নির্দ্দেশই বোধ হয় অসম্ভব।"
- 'বোধহয় অসম্ভব।' রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল বলেই এই-সংশয়টি শেষাবধি রেখে আলোচনার যতি টেনেছেন। কেননা যে পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ-সংশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়,

কোন একটি উদ্ভাবন পরবর্তীকালে উক্ত-সিদ্ধান্তকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে। বিজ্ঞানের সেই-চলিষ্ণুতা আছে। 'জীবন রক্ষার যে কিসে কিরূপে সাহায্য করে, তাহা সাহস করে বলা কঠিন। এই বিষয়টাকে আমার কোন উপকার হয় নাই, কখনও উপকার হইতে পারে, ইহা জোর করিয়া বলা নিতান্ত দুঃসাহসিকের কাজ। সৌন্দর্য-বুদ্ধিও মানব-জীবনে কোনরূপ আনুকূল্য করে না, ইহা বলাও দুঃসাহসের কাজ ; এবং যদিও মানব-জীবনে ইহার কোনরূপ উপকারিতা খুঁজিয়া বাহির করা যায়' তাহলেই সিদ্ধান্তের রদবদলের আবশ্যিকতা এসে পড়ে।

সমসাময়িক সময়ে সৌন্দর্যের ভেতর-বাইর নিয়ে ব্যাপক চর্চা চলেছিল। সৌন্দর্য কী? কোথা থেকে আসে? তা কতখানি ভোগের, কতখানি-বা ভোগাতিরিক্ত সংবেদনার? স্থূল প্রয়োজন বা যৌনতাই কী মানবজীবনের চালিকাশক্তি। রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরি'তে খোলাখুলি সে-সব প্রশ্নই তুলেছেন। প্যারিস একজিবিশনের ফরাসীশিল্পী কারোল্যু-দ্যুরাঁরার আঁকা নগ্নিকা দেখে মুগ্ধ মতামত জানাচ্ছেন : 'চিত্রশালায় প্রবেশ করে কারোল্যু ডুঁরা নামক একজন বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর রচিত একটি বসনহীনা মানবীর ছবি দেখলুম। কি আশ্চর্য সুন্দর! সুন্দর মানব শরীরের মত সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে আর কিছু নেই। আমরা প্রকৃতির সকল শোভাই দেখি। কিন্তু মর্ত্তের সেই চরম সৌন্দর্য্যের উপর, জীব-অভিব্যক্তির এই সর্ব্বশেষ কীর্ত্তিখানির উপর, মানুষ স্বহস্তে একটি চির-অন্তরাল টেনে রেখে দিয়েছে। এই ছবিখানি দেখলে চেতনা হয় পশুমানুষ বিধাতার স্বহস্তরচিত একটি মহিমাকে বিলুপ্ত করে রেখেছে, এবং চিত্রকর মনুষ্যরচিত অপবিত্র আবরণ উদঘাটন করে সেই দিব্য সৌন্দর্য্যের আভাস দিয়ে দিলে।' ('য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরী')

'পশুমানুষ' এবং 'পশুত্ব-বিবর্জিত মানুষ'এর ধর্মাধর্ম নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সেই-সময়ের অন্যতম জ্ঞানানুশীল ললিতকলা চর্চার অন্যতম বিষয়ই হয়ে উঠেছিল— যে কারণে নবীন যুবক বলেন্দ্রনাথকেও 'ভারতী ও বালক' এর ১২৯৬-এর পৌষ সংখ্যায় লিখতে হয় 'নগ্নতার সৌন্দর্য্য' নামক প্রবন্ধ। সেক্ষেত্রে কাব্য-বিজ্ঞান-দর্শনের ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দরকে কী তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে থাকলে চলে। 'সৌন্দর্য-বুদ্ধি'র পরেও তাঁকে তাই লিখতে হয় 'সৌন্দর্য-তত্ত্ব' নামক প্রবন্ধটি। পাঠকদের উদ্দেশে জানিয়ে রাখা ভালো প্রকাশের দিক থেকে 'সৌন্দর্য-তত্ত্ব' আগে প্রকাশিত হলেও (১৩০০, ভাদ্র সংখ্যা, সাধনা) রচিত হয়েছিল 'সৌন্দর্য-বুদ্ধি'র পরে, অনেকটা পরিপূরক হিসেবেই।

❑ সামগ্রিক অনুশীলনী

বিস্তৃত প্রশ্ন :

'সাম্য' ◻ ১. "কমুনিজ্‌ম সেই বৃক্ষের ফল, ইন্টারন্যাশনাল সেই বৃক্ষের ফল।"—এই মন্তব্যটির প্রসঙ্গোল্লেখ করে এর সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করুন।

২. "সাম্যাবতার যীশুখ্রীষ্ট"—এই মন্তব্যটি কোন্ প্রসঙ্গে করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র? এই সূত্রে তাঁর খ্রীষ্ট সম্পর্কিত ধারণারও পরিচয় দিন।

৩. 'সাম্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র রুশো এবং ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন সেগুলির যৌক্তিকতা নির্ণয় করুন।

৪. 'সাম্য' প্রবন্ধ অবলম্বন করে প্রাবন্ধিক-বঙ্কিম সম্পর্কে আপনার অভিমত দিন।

৫. 'সাম্য' নিবন্ধটির একটি আনুপূর্বিক ভাবসংক্ষেপ রচনা করুন।

'কৌতুক হাস্য'/
'কৌতুক হাস্যের মাত্রা' ◻ ১. 'পঞ্চভূত' কি ডায়ারি-ধর্মী রচনা, না একে রম্য রচনা বা belle-letter বলা যায়? 'কৌতুক-হাস্য' এবং 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' অবলম্বনে এই প্রশ্নের উত্তর দিন।

২. কৌতুকের হাসি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার স্বরূপটি নির্ণয় করুন।

৩. "মাত্রাভেদের তারতম্যতেই হাসিকান্না উদ্রিক্ত হয়"। এই অভিমতের যাথার্থ্য যাচাই করুন।

৪. 'কৌতুকহাস্য' এবং 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধদুটিতে বিষয়গত সাদৃশ্য থাকলেও উপস্থাপনার পার্থক্য আছে কি-না, বিচার করে দেখান।

৫. 'কৌতুকহাস্য' এবং 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' নিবন্ধদুটির মূল প্রতিপাদ্য কী-কী, নিজের কথায় ব্যক্ত করুন।

'সুখ না দুঃখ'/
'সৌন্দর্যবুদ্ধি' ◻ ১. 'সুখ না দুঃখ' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সুখবাদী এবং দুঃখবাদীদের অভিমত স্বতন্ত্রভাবে যে-যে যুক্তিপরম্পরায় বিন্যস্ত করেছেন, তার পরিচয় দিন। সেই সূত্রেই মানুষের জীবনে সুখ ও দুঃখের মধ্যে কোন্‌টির আধিক্য আছে, নিজের যুক্তিসহ সেই আলোচনা করুন।

২. "সুখান্বেষণের চেষ্টার ফলেই জৈবিক অভিব্যক্তি"—রামেন্দ্রসুন্দরের এই মন্তব্য কতটা যথার্থ, আলোচনা করুন।

৩. "সৌন্দর্যবুদ্ধি মানবধর্ম"—রামেন্দ্রসুন্দরের এই কথার তাৎপর্য নির্ণয় করুন।

৪. মানুষের সৌন্দর্যবুদ্ধির বিকাশ কীভাবে হয়েছে, রামেন্দ্রসুন্দরের অনুসরণে তার পরিচয় দিন।

৫. 'সুখ না দুঃখ' এবং 'সৌন্দর্যবুদ্ধি' প্রবন্ধদুটির অবলম্বনে প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দরের পরিচয় দিন।

অবিস্তৃত প্রশ্ন :

'সাম্য' □ ১. "তুমি আমি দেশের কয়জন?"—এই কথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কী?

২. যে বৈষম্য প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন তাই প্রকৃত বৈষম্য।—কেন, সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলুন।

৩. "তৃতীয় সাম্যাবতার রুশো।"—আগের দুজন কে-কে? বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যের তাৎপর্য কী?

৪. 'পরাণ মণ্ডল' কে? তাঁর অনুষঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কী বক্তব্য উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন?

৫. সমাজে "ধনসঞ্চয়" কীভাবে সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিয়েছিল?—সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৬. পুরুষ ও নারীর অধিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কী-কী প্রস্তাব করেছেন?

৭. বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরকালে সাম্যভাবনাকে পরিত্যাগ করেছিলেন কেন?

৮. "বুদ্ধ্যপজীবী" বলতে বঙ্কিমচন্দ্র মূলত কাদেরকে বুঝিয়েছেন?

'কৌতুকহাস্য' /

'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' □ ১. "মেয়েরা অল্প কারণে কাঁদিতে পারে এবং বিনা কারণে হাসিতে পারে।"—এটি কার কথা? এর গূঢ়ার্থ কী?

২. "কমেডিতে পরের অল্প পীড়া দেখিয়া আমরা হাসি এবং ট্র্যাজেডিতে পরের অধিক পীড়া দেখিয়া আমরা কাঁদি।"—এই তত্ত্বর সারবত্তা কতখানি সংক্ষেপে বলুন।

৩. "নারীর হাসি অকারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা অনেক মন্দাক্রান্তা, উপেন্দ্রবজ্রা, এমন-কি শার্দুল বিক্রীড়িতচ্ছন্দ অনেক ত্রিপদী, চতুষ্পদী এবং চতুর্দশপদীর আদিকারণ হইয়াছে শুনা যায়।"—এই মন্তব্যের তাৎপর্য কী?

৪. "অসংগতি" কীভাবে কমেডি এবং ট্র্যাজেডি, দুয়েরই বিষয় হতে পারে, বলুন।

'সুখ না দুঃখ?/

সৌন্দর্যবুদ্ধি □ ১. "সর্বক্ষণেই তদানীন্তন দুঃখের মাত্রা অপেক্ষা তদানীন্তন সুখের মাত্রা অধিক"—কেন? সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলুন।

২. মানুষ অন্ধশক্তির হাতের পুতুল মাত্র।—এই ধারণা কতদূর যথার্থ?

৩. ডারুইনের মতানুসারে, কীভাবে সৌন্দর্যের উৎপত্তি হয়েছে ব্যাখ্যা করুন।

৪. রামেন্দ্রসুন্দর সৌন্দর্যের শ্রেণিনির্ণয় কীভাবে করেছেন, দেখান।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

'সাম্য' □ ১. বাংলার সারস্বত সমাজে সাম্যচিন্তার পথিকৃৎ কে ছিলেন?

২. 'Govinda Samanta' গ্রন্থ কে লিখেছিলেন?

৩. 'Property is theft' কে বলেছিলেন?

৪. "মানুষ্যে মানুষ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ" কে বলেছিলেন?

৫. 'Le Contrat Sociel' কার লেখা?

৬. বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতে "শ্রমোপজীবী"-দের অবনতির কারণ কী-কী?

৭. "পত্নীবিযুক্ত পতি এবং পতিবিযুক্ত পত্নী" কিসের অধিকারী?

৮. হিন্দু মহিলাদের কোন্ "কুৎসা" বঙ্কিমচন্দ্র 'সহ্য করিতে" পারেন না?

৯. "ইন্টারন্যাশনাল" কোন্ "বৃক্ষের ফল"?

১০. "সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দুর্দশায় ...." —উদ্ধৃতিটি সম্পূর্ণ করুন।

কৌতুকহাস্য' /

'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' □ ১. "বাসরঘরে" হাস্যরস বলে "বঙ্গসীমন্তিনীগণ" কী কী ব্যাপারকে স্থির করেন?

২. "বিচিত্রবর্ণের নাগপাশবন্ধন" বস্তুটি কী?

৩. ব্যোমের লাঠিগাছাকে ক্ষিতি কী বলে অভিহিত করেছিল?

৪. নিউটন "জ্ঞানসমুদ্রের কূলে" কেবলমাত্র কী কুড়িয়েছিলেন?

৫. ফলস্টাফের "দুর্গতির একশেষ" লাভের হেতু কী ছিল?

৬. দুর্ভিক্ষ কার কাছে "পরম কৌতুকাবহ"?

'সুখ না দুঃখ? /

'সৌন্দর্যবুদ্ধি' □ ১. 'সুখ না দুঃখ?' এবং 'সৌন্দর্যবুদ্ধি' প্রবন্ধদুটি কবে, কোথায় প্রথম প্রকাশিত হয়?

২. রামেন্দ্রসুন্দর "মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব" এবং তার "রক্ষাপ্রয়াস"-কে কী বলে ভেবেছিলেন?

৩. "জীবন দুঃখময়' কেন?

৪. "মনুষ্য যেখানে সেখানে" কী "দেখিতে পায়"?

৫. "বিশুদ্ধ সৌন্দর্য" কিসের "সামগ্রী"?

৬. "চম্পক অঙ্গুলির ও খঞ্জন নয়নের অধিকারিণী" কে, কেন?

❑ গ্রন্থপঞ্জি ঃ

চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র ঃ ভবতোষ দত্ত

বঙ্কিমবরণ ঃ মোহিতলাল মজুমদার

বঙ্কিমসরণি ঃ প্রমথনাথ বিশী

Bankimchandra Chattapadhyay : Sri Aurobindo

বঙ্কিমচন্দ্র ঃ আধুনিক মন ঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত।

রবীন্দ্র সরণি ঃ প্রমথনাথ বিশী।

বাংলা সাহিত্য হাস্যরসের ধারা ঃ অজিতকুমার ঘোষ।

রবীন্দ্রজীবনী ঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসাহিত্যের মূলসূত্র ঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের একদিক ঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ঃ জানকীনাথ ভট্টাচার্য।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ঃ বিপিনবিহারী গুপ্ত।

ঊনিশ-বিশ ঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্যসাধক চরিত মালার

‘সত্তর’ সংখ্যক পুস্তিকা ঃ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা (পঞ্চম পত্র)

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পর্যায় ঃ ২ ঃ শৈলীবিজ্ঞান

একক ঃ ১ - ৫

একক ১ ❑ শৈলীবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব

১.১ স্টাইল : রীতি না শৈলী
১.২ শিকড়ের খোঁজে—ভারতীয় রীতিবাদে
১.৩ শৈলীর সংজ্ঞা ও অস্তিত্ববিচার
১.৪ ভসলার, ক্রোচে, স্পিৎজার : কৃতি ব্যাখ্যান
১.৫ রাশিয়ান ফর্মালিজম্
১.৬ সাহিত্যিক অবয়ববাদ
১.৭ নব্য-সমালোচনা বা নব্য-অবয়ববাদ (নিউ ক্রিটিসিজম/নিও-স্ট্রাকচারালিজম)
১.৮ অবয়ববাদ : প্রাগ-গোষ্ঠী
১.৯ শৈলীবিজ্ঞান : নানা মহল
১.১০ উপলক্ষের মানক (কনটেক্সট প্যারামিটার)
১.১১ আমাদের মতামত : নূতন পথ
উল্লেখসূচী
উৎস গ্রন্থ ও প্রবন্ধ
ওড়িয়া
ইংরেজি

১.১ ❑ স্টাইল : রীতি না শৈলী

প্রতিদিনের কথাবার্তায় যখন 'স্টাইল' শব্দটা আসে, তখন তা অনেক হালকাভাবে বলা হয়। আবার লেখক-আলোচকমহলে শব্দটি গভীর অর্থ বয়ে আনে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, সাধারণ আলাপে আর পণ্ডিতি আলোচনায় শব্দটির লক্ষ কিন্তু একদিকে। দুপক্ষই ব্যক্তি বা লেখার বৈশিষ্ট্য বোঝাতে চাইছেন।

শব্দটির ইংরেজিয়ানা নিয়ে কারোর সন্দেহ নেই। কিন্তু এটি কি একান্ত ইংরেজি শব্দ? অভিধানের সাক্ষ্য ধরে সময়ের দিক থেকে আরেকটু পিছিয়ে যেতে পারি। লাতিনে একটি শব্দ আছে—'স্টিলোস'। স্টিলোসের মানে হল মোমের চৌকো টুকরোর উপর লেখার জন্য ছুঁচলো কলম। পরে সাহিত্যকৃতি বা রচনা সম্বন্ধে 'স্টাইল' শব্দের ব্যবহার শুরু হল। আবার এখন স্টাইল বলতে পুরো সাহিত্যকর্ম বা রচনাকে বোঝায় না। একজন বা একটি গোষ্ঠীর লেখার স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়। অর্থাৎ একটা ব্যক্তিত্বের ছাপকল্পনা, স্টাইল বলা বা লেখার সময় সক্রিয় থাকে।

স্টাইলের সংজ্ঞা, অস্তিত্ব, তত্ত্বধারণা এবং স্টাইলিস্টিকসের কথা বলার আগে একটা পারিভাষিক বিতর্ক তোলা যেতে পারে। স্টাইলের বাংলা পরিভাষা কি হবে, এ নিয়ে মতান্তর আছে। একদল শব্দটি স্বরূপে রাখতে চান। অন্যদলের মতে এর বাংলা হবে 'রীতি'। প্রথম দলের কাছে বাংলা পরিভাষার প্রয়োজন নেই। অতি-পরিচিত শব্দটির বাংলা লিপ্যন্তর করে তাঁরা খুশি হন। দ্বিতীয় দলের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু এঁদের মত অনুযায়ী স্টাইলের বাংলা রীতি নয় কেন, এ নিয়ে ভাবা যেতে পারে।

এঁরা ভুলে যান যে, বাংলায় রীতি শব্দটি একার্থক নয়, নানার্থক। যেমন, (ক) প্রণালী, পদ্ধতি বা ধরন (চিকিৎসার রীতি, কথা বলা বা লেখার রীতি); (খ) প্রথা, ধারা বা দস্তুর (সামাজিক রীতি-নীতি, বিবাহের রীতি, পূজার রীতি); (গ) প্রকৃতি, স্বভাব বা আচরণ (ভদ্রতা বা ভদ্রলোকের রীতি, এমনকি গানে 'পিরীতির এ কি রীতি'-ও শুনি)।

রচনাস্বাতন্ত্র্য বোঝাতে এঁরা 'রীতি' পরিভাষার পক্ষপাতী। অথচ স্টাইল অর্থে রীতি ব্যবহারের অন্য অসুবিধাও আছে। একটি বাধা হল, সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে রীতিবাদের ধারণা। বাংলায় স্টাইল অর্থে 'রীতি'-ব্যবহারকারীদের মনে সংস্কৃত রীতিবাদ অলক্ষে ছায়া ফেলেছে। হয়তো সেই 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' বা 'বিশিষ্টা পদরচনা রীতি' ধরনের শব্দগুচ্ছ বা তার আড়ালের ধারণা এখানে সক্রিয়। অথচ সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বে রীতিধারণা এক নয়, অনেক। কখনও তা বিশেষ পদান্বয়ের (সিনট্যাক্স) কৌশল, কখনও তা মার্গ (টাইপস্ অব রিজিওনাল লিটারারি ল্যাংগুয়েজ)।

প্রথম বক্তব্যে পদান্বয় কৌশল স্থান পেলেও সমস্ত ভাষিক কৌশল সেখানে স্থান পায়নি। দ্বিতীয় সূত্রে বলা গৌড়ী, লাটীয়া, বৈদর্ভী, পাঞ্চালী ইত্যাদিতে আঞ্চলিক সাহিত্যধারণাই প্রবল হয়েছে। এদের কোনটাই স্টাইল নয়। ইংরেজি সমালোচনার সাধারণ পড়ুয়াও জানেন, স্টাইল বলতে এছাড়া আরও কিছু বোঝায়। আবার রীতিবাদে রসবাদ মাঝে মাঝে প্রভাব ফেলেছে। কুন্তকের মতো সচেতন রীতিবাদীও ধ্বনিবাদের মায়াবী কুহক এড়াতে পারেননি। রীতিকে কাব্যের আত্মা বলা আর অভীষ্ট ভাবপ্রকাশের তন্ময় (অবজেক্টিভ) সৌন্দর্যঘোষণা এক হতে পারে না। রীতির মূলে যে গুণের (লিটারারি এক্সসেলেন্স) কথা বলা হয়েছে, তাও বাক্যকে ছাড়িয়ে যায়। স্টাইল বলেত একালে যে তন্ময় উপাদান সমাহার [ধ্বনি-শব্দ-বাক্য-অর্থ এবং সমগ্র কৃতি (টেক্সট) ও লেখকব্যক্তিত্ব] বুঝি, মন্ময় (সাবজেক্টিভ) গুণ তা থেকে অনেক দূরের ব্যাপার। অন্যদিকে ধ্বনি ও রসবাদের আলো রীতিবাদের বস্তুবাদী বিশ্লেষণ-কর্মে চিরকালই বাধা দিয়েছে।

সংস্কৃত রীতিবাদের অপূর্ণতা-অস্পষ্টতা এবং বাংলায় রীতির নানা অর্থ মনে রেখে অন্য পারিভাষিক শব্দ বাছতেই হয়। 'শৈলী' শব্দটি এমন কোনো জটিলতা আনে না। তাছাড়া গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন সাহিত্যালোচনা, এমনকি সংবাদপত্রেও দেখা যাচ্ছে 'রীতি'র চেয়ে 'শৈলী'র প্রচলন বাড়ছে। 'রীতি' বলার পক্ষপাতী পণ্ডিতেরাও পাশাপাশি শৈলী ব্যবহার করছেন দ্বিধায় পীড়িত হয়ে। আসলে 'শৈলী' শব্দের পৌনঃপুনিকতা (ফ্রিকোয়েন্সি) রীতির চেয়ে অনেক বেশি। কাজেই এই আলোচনার সব জায়গায় এখন থেকে স্টাইলের বদলে শৈলী শব্দটির ব্যবহারে আশা করি কেউ আপত্তি তুলবেন না।

১.২ ❑ শিকড়ের খোঁজে—ভারতীয় রীতিবাদে

একটু আগে পরিভাষার সন্ধান অংশে ভারতীয় রীতিবাদের কথা এসেছে। এবারে গভীরভাবে দেখা যাক, ভারতীয় রীতিবাদে শৈলীধারণার (নোশন অব্ স্টাইল) কোনো অস্তিত্ব আছে কি না? বেশ কিছু আলোচক ভারতীয় রীতিবাদে শৈলীধারণা আছে বলে মনে করেন। এ জাতীয় সিদ্ধান্তের মূলে সত্য ততটা নেই, যতটা আছে 'যা নেই, ভারতে, তা নেই ভারতে' গোছের বিশ্বাসের ব্যাপার। এই বিশ্বাস যে কতটা অন্ধ, তা যুক্তির পথে রীতিবাদের ব্যাখ্যায় বোঝা যাবে। কাব্যসংজ্ঞা লিখতে গিয়ে আলংকারিকরা অনেকেই ব্যাকরণের পরিভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। কাব্যজগতের বিচিত্র রহস্যকে ভেদ করার জন্যে এই ব্যাকরণমান্যতা শৈলীর সামান্য ধারণা দেয়। প্রশ্ন ওঠে, এই সব চিন্তা পরিণামে কি দিয়েছে।

এই ধরনের সাহিত্য-সংজ্ঞা প্রথম দিলেন ভামহ। তিনি লিখলেন 'শব্দার্থসহিতৌ কাব্যম্'। শব্দ ও অর্থ সহিত বা মিলিত হলে কাব্য হয়। ব্যাকরণের বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ এখানে গৃহীত হয়েছে। এই মতের লক্ষ্য ছিল—রচনার ব্যাকরণগত বিশুদ্ধি, যথার্থ প্রয়োগ এবং সম্বন্ধের ঔচিত্য। ব্যাকরণগত বিশুদ্ধতা (গ্রামাটিক্যাল পিওরিটি) এবং উপলক্ষের বাঁধন (কোহেশন অব্ কনটেক্সট) ভামহ প্রথম উচ্চারণ করলেন। কিন্তু ব্যাকরণগত বিশুদ্ধি সার্থক রচনার প্রাণ নয়। হয়তো ভামহ সেকালের রচনায় ব্যাকরণগত অশুদ্ধির বন্যা দেখে এমন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য কাব্যাঙ্গে দেখতে চেয়েছিলেন। নইলে ব্যাকরণের মাপকাঠি নিয়ে কাব্যের আশ্চর্য জগৎ যে গড়া যায় না, এটি তিনি বোঝেননি, এমন অলীক কথা বলতে হয়।

ভামহের পর এ ধরনের বক্তব্য উচ্চারণ করলেন দণ্ডী। তাঁর 'কাব্যাদর্শ'-এ মার্গধারণা আছে। এটি হল সাহিত্যভাষার রূপভেদ (টাইপস অব্ লিটারারি ল্যাংগুয়েজ)। এর আগে গুণ অলংকারশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছিল। দণ্ডী দেখালেন যে, গুণ এবং অলংকার সমান নয়। গুণকে একেবারে খারিজ না করেও তিনি মার্গের লক্ষণবিচারে তা প্রয়োগ করেছেন। কাব্যরচনার কৌশলকে বৈদর্ভী এবং গৌড়ী—এই দুভাগে দণ্ডী বিভক্ত করেছেন। গুণকল্পনা থাকলেও দণ্ডী ও বামন এদের সংজ্ঞার্থ বদলেছেন। তবু দণ্ডীর রচনাতেই মার্গ তথা রীতিবাদের শুরু হল, একথা বলতে পারি। সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বে এভাবে রীতিধারণার তিনটি স্তর ভাবা যায় :

১. আঞ্চলিক ভাষাদর্শ বা ঔপভাষিক রচনার সমালোচনা

২. আঞ্চলিক ভাষাদর্শের ধারণার বদলে একই পদ্ধতিতে আদর্শীকৃত রীতিধারণার সূচনা

৩. কুন্তকের রীতিব্যাখ্যানের নবীনতা—কবিচারিত্র নিয়ে প্রথম সচেতন অনুসন্ধানের শুরু।

দণ্ডীর পরে বামন প্রথম রীতি শব্দটি প্রয়োগ করেন। তাঁর কথায়, "রীতিরাত্মা কাব্যস্য। বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ। বিশেষো গুণাত্মা। সা ত্রেধা বৈদর্ভী গৌড়ী পাঞ্চালী চেতি। বিদর্ভাদিষু দৃষ্টত্বাৎ তৎ সমাখ্যা। সমগ্রগুণা বৈদর্ভী।" অর্থাৎ "রীতি হল কাব্যের আত্মা। রীতির অর্থ বিশিষ্ট পদরচনাভঙ্গি। এই বিশিষ্টতার আত্মা হল গুণ। এভাবে বৈদর্ভী গৌড়ী পাঞ্চালী নামে তিনটি রীতি আছে। এর মধ্যে বৈদর্ভী হল 'সমগ্রগুণা' বা সমগ্র গুণের আকর।"

রীতির এই ধারণার মূলে আঞ্চলিক ভাষারূপ (রিজিওনাল ডায়ালেক্ট ফর্ম) প্রাথমিকভাবে সক্রিয় ছিল। পরে তা আঞ্চলিক সাহিত্যভাষার প্রকারভেদ (টাইপস অব্ রিজিওনাল লিটারারি ল্যাংগুয়েজ) হয়ে দাঁড়ায়।

সাহিত্য না অলংকার কোন্ গুণে বৈদর্ভী সে সময় সুখ্যাতি পেয়েছিল? বামন একে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যভাষার শিরোপা দিয়েছেন। বামনের কাছেও গুণ বড়ো। তবু সাহিত্যভাষার পদান্বয় তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

রুদ্রট তাঁর 'কাব্যালংকারসূত্র'-এ আরেকটি মার্গ কল্পনা করলেন। সেটি হল লাটীয়া। এখানে মার্গ বা রীতির সংজ্ঞা পালটাল। রীতি তাঁর কাছে সমাসবতী বৃত্তি (নেচার অব্ কম্পাউন্ডিং)। সংস্কৃত সাহিত্যে সমাসবদ্ধতার বিন্যাস ও সমাহার রুদ্রটের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। তাই সমাসবদ্ধতার বিভিন্ন ছককে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন।

রাজশেখর 'কাব্যমীমাংসা'য় ব্যাকরণের বাচ্য-বাচক ছাড়া কিছু সাহিত্য-আলোচনায় ভাবতে চাননি—এরকম আলোচনা শোনা যায়। কিন্তু 'কাব্য-মীমাংসা'তেই 'পাক' বলে এক নতুন ধারণা ছিল। 'পাক' বলতে তিনি ভাষানৈপুণ্য বুঝেছেন। ব্যাখ্যাকার মঙ্গালের কথায়, পাক হল বিশেষ্য-ক্রিয়ার সম্মিতি (এগ্রিমেন্ট)। রাজশেখরের 'পাক'-ব্যাখ্যান ছিল ভাষার নিপুণ ব্যবহারকে কেন্দ্র করে। মঙ্গাল তা সংকীর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা করলেন। রুদ্রটের মতে, মঙ্গাল সাহিত্যভাষার ব্যাকরণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি একচক্ষু ছিলেন। বিশেষ্যক্রিয়ার সম্মিতি তো যে-কোনো রচনার সাধারণ ব্যাপার। এই ধরনের রীতি-ব্যাখ্যান বেশ মামুলি। বামন রীতির আলোচনা শুরু করলেও বিস্তৃত স্পষ্ট ব্যাখ্যা তিনি দেননি। ক্ষেমেন্দ্র 'কবিকণ্ঠাভরণ'-এ ঔচিত্য, স্বজ্ঞা (ইনট্যুশন), উদ্দেশ্য ও উপলক্ষকে এনে রীতিবাদকে সামান্য উজ্জ্বলতা দিয়েছিলেন।

রীতিবাদ স্পষ্টতর, বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষায় ছিল। কুন্তকের 'বক্রোক্তি-জীবিত' রচনার আগে রীতির খণ্ড আলোচনাই বেশি করা হত। দীর্ঘ আলোচনা করলে চিন্তার শিকল যুক্তিপ্রবাহকে বেঁধে ফেলবে, এমন ভয়ে খণ্ড আলোচকরা তা করেননি। ব্যাকরণের নানান প্রভাব এবং আলোচকদের ব্যক্তিগত পক্ষপাত এর জন্য দায়ী ছিল।

কুন্তক বক্রোক্তিজীবিতে রীতিবাদের সীমা শুধু বাড়ালেন না, অগ্রজ রীতিবাদীদের খণ্ড চিন্তার সমালোচনাও করলেন। তাই কুন্তকের বক্রোক্তিবাদ একদিকে রীতিবাদের সমালোচনা এবং ভাষ্যকর্মের মিলিত ফল। অতীতের রীতিবাদের সমালোচনা কুন্তক এইভাবে করলেন :

১. অলংকার বা রীতিভেদ করতে গিয়ে যদি আঞ্চলিক ভাষাকে মানক ধরি, তাহলে সংজ্ঞায় অতিব্যাপ্তি দোষ আসে। অঞ্চল যদি হয় রীতিবিভাগের মানদণ্ড, তাহলে গণনাহীন রীতি কল্পিত হবে। রীতির ভৌগোলিক মানচিত্র এভাবে বিফল ও নিয়মহীন হয়ে পড়ে।

২. আঞ্চলিক সাহিত্যভাষার মধ্যে একটি মান্য (বা অতি-চর্চিত) রূপ অর্জন করে। এই আদর্শ সাহিত্যভাষা অঞ্চলের বেড়াজাল পেরিয়ে সর্বজনীন হতে পারে। যে-কোনো অঞ্চলের সাহিত্যিকই এর অনুসরণ করেন বলে সাহিত্যভাষার একাধিক আঞ্চলিক দাবি মেনে নেওয়া যায় না।

৩. রীতি যদি কাব্যের আত্মা হয় এবং তারও নানা ভাগ থাকে, তাহলে তার শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা পক্ষপাতিত্বের পরিচায়ক। এই মতের বশে আগের রীতিবাদীরা গৌড়ী, পাঞ্চালীতে সার্থক কাব্য রচনার সম্ভাবনাকে বাতিল করেছেন। সমাজে গুণ-কর্মের বিভাগে চাতুর্বর্ণের উপযোগিতা থাকলেও রীতির ক্ষেত্রে বৈদর্ভীর অগ্রাধিকার-প্রস্তাব (সাজেশন অব প্রেফারেন্স) খানিকটা জোর করে করা।

কুন্তক রীতিবাদের বাঁধা পথ মানলেন না। তাই তিনি আঞ্চলিক ভাষাধারণানিরপেক্ষ কবিচিত্তবৈশিষ্ট্য খুঁজলেন।

বাঁধা পথ এখানে একেবারে ছাড়া যায়নি। বরং তা এক বাঁধনহীন গ্রন্থির সূচনা করল। স্রষ্টার মনোগহনের অন্ধকারে আলো ফেলার চেষ্টা শুরু হল। তাহলে কি সাহিত্যের পরম অর্থ নিয়ে তিনিই প্রথম চিন্তক? কুন্তক এমন দাবি করলেও তা মানা কঠিন। অথচ কবিদের 'অন্তরামোদমনোহারিত্ব' তাঁর কাছে নূতন ব্যাখ্যা প্রার্থনা করল, এটা অস্বীকার করা যায় না। কুন্তকের সাহিত্যতত্ত্ব ব্যাখ্যানের অভিনবত্ব এইখানে যে, তিনি সাহিত্যকে অলৌকিক প্রকাশভঙ্গি মনে করলেও তার ন্যূনতা এবং অতিরেকবর্জিত মনোহারী শোভা ও রূপের কল্পনা করতে পেরেছিলেন।

কুন্তক রাজশেখরের সহিতত্ব ব্যাখ্যা মানলেন। আবার তার তন্ময় বিশ্লেষণও করলেন। তিনি মাত্রাজ্ঞানের উপর জোর দিলেন। শব্দ ও অর্থ মিলিত হবে সমতা রেখে, এমন সংযম তাঁর কাছে প্রার্থনীয় মনে হয়েছিল। শব্দ ও অর্থ কেউ কারোর চেয়ে বড়ো অথবা ছোটো হবে না। তারা হবে একে অপরের সমান অথচ রমণীয় (পরস্পর-স্পর্ধিত-রমণীয়)। সার্থক কাব্যে শব্দ ও অর্থের যথাযথ মিলন ঘটে। শুধু শাব্দিক সৌন্দর্য কানকে পরিতৃপ্ত করে। আর প্রকাশভঙ্গিহীন মহান ভাবনা তাঁর কাছে নিষ্প্রাণ মৃতদেহের মতো। প্রকাশভঙ্গি সুন্দর অথচ বিষয়বোধছিন্ন রচনাকে তিনি ঘৃণ্য রোগের মতো মনে করেছেন।

এই কাম্য অবস্থা কবি কীভাবে সৃষ্টি করবেন? কুন্তক এই জায়গায় বক্রতা বলে কবিব্যাপার কল্পনা করেছেন। ছটি বক্রতাব্যাপার কুন্তকের চোখে ধরা পড়েছে :

১. বর্ণবিন্যাসবক্রতা—বর্ণের বিশেষ প্রয়োগ (এ কি অনুপ্রাসের নামান্তর?)

২. পদপূর্বার্ধবক্রতা—একার্থক শব্দ, প্রচল শব্দ, শব্দের গৌণার্থ, বিশেষণ, গূঢ়োক্তি, সমাস, অনুসর্গ, ধাতু, লিঙ্গ এবং ক্রিয়ার বিশেষ প্রয়োগ

৩. পদপরার্ধবক্রতা—কাল, কারক, বচন, বাচ্য, পুরুষবাচক সর্বনাম, অব্যয় এবং বিভক্তিহীন শব্দের বিশেষ প্রয়োগ

৪. বাক্যবক্রতা—সমস্ত অলংকার বিশেষত অর্থালংকার প্রয়োগ

৫. প্রকর্ণ-বক্রতা—বিভিন্ন অধ্যায়ের রচনা ও অবয়বকৌশল

৬. প্রবন্ধ-বক্রতা—সমগ্র কৃতির মধ্যে অভিনব সৌন্দর্যসৃষ্টির নিপুণতা

কুন্তকের বক্রতাব্যাপার সমালোচনার আগে তাঁর নির্দেশিত তিন জাতের কবিস্বভাব ব্যাখার দাবি রাখে। সুকুমার, মধ্যম এবং বিচিত্র বলে তিন ধরনের কবিস্বভাব আছে। সুকুমার কবিমনের অধিকারী প্রায় নিরলংকার রচনায় সহজাত শক্তিতে কবিত্ব সঞ্চার করেন। হৃদয়সংবাদ সেখানে এত স্বাভাবিক যে, অলংকার সেখানে প্রয়োজন হয় না। সমাসের বাড়াবাড়ি বা জটিলতা সেখানে নেই। শুধু স্নিগ্ধ প্রসাদগুণে সে রচনা প্রাণ পায়। একে সুকুমার বললেও, উঁচু দরের কবিত্ব এখানে আছে বলে এর অপর নাম 'অভিজাত'। মিডলটন মারীর বলা শৈলীর চূড়ান্ত অনুভব এই রীতিতে পাই যেখানে বিশেষ ও নির্বিশেষ একাকার হয়ে যায়। দ্বিতীয় জাতের কবিস্বভাব হল বিচিত্র। এখানে হৃদয়ের অনুভবের চেয়ে বুদ্ধি-বৈদগ্ধ্যের ঝলকই বেশি। কবি এখানে পরিশ্রমী। কিন্তু শব্দ-অর্থ সম্মিত নয়। মারীর বলা প্রকাশকৌশল (টেকনিক অব্ এক্সপ্রেশন) এখানে থাকলেও কাব্যসিদ্ধি ঘটে না। শেষ রীতি হল মধ্যম বা মিশ্র। এখানে সুকুমার ও বিচিত্র রীতি মিলে-মিশে যায়। মধ্যম রীতির কবিরা

মহান কবিদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত বলে এই রীতি বেছে নেন। কালিদাস হলেন সুকুমার রীতির কবি। বাণভট্ট-ভবভূতি বিচিত্র কবিস্বভাবের এবং মাতৃগুপ্ত হলেন মধ্যম রীতির কবি।

কুন্তকের বক্রতাকল্পনায় ভাষাতাত্ত্বিক তন্ময় উপাদান থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা ধ্বনি বা রসবাদকে ছাড়িয়ে যায়নি। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বক্রতাকল্পনায় রসবাদ প্রভাব ফেলেছে। ধ্বনিকে স্বীকার করে, আনন্দবর্ধনের অনেক শ্লোককে নিজের ব্যাখ্যাকর্মে যোগ করে কুন্তক তাঁর বক্রতাধারণাকে প্রকাশ করেছিলেন। কুন্তক অর্থের ব্যাখ্যা দেন এভাবে :

‘কবির অভিপ্রেত অর্থের বিশেষভাবে প্রকাশের ক্ষমতাই বাচকত্ব বা শব্দের লক্ষণ।......পদার্থসমূহ কবিপ্রতিভায় তৎকালোচিত এক বিশেষ পরিস্পন্দ দ্বারা পরিস্ফুরিত হয়। প্রকৃত বস্তুর উপযুক্ত এক বিশেষ উৎকর্ষ দ্বারা তাদের স্ব-ভাব সমাচ্ছাদিত হয়। কবির অভিপ্রায় প্রকাশ করতে পারে বলেই তা অর্থ বলে কথিত হয়।’

কুন্তকের এই অর্থ-ব্যাখ্যানের পাশে তাঁর পানক-রসের উপমাটি মনে পড়ে। ‘অর্থের উপলব্ধি হলে পদ ও বাক্যের অর্থ ছড়িয়ে তা সুধীদের মনে পানক-রসের আস্বাদের মতো অনির্বচনীয় কিছুর আস্বাদ দান করে।’ অর্থের ক্ষেত্রে ‘এক বিশেষ পরিস্পন্দ’ আর পানক-রসের অনির্বচনীয়তা রসবাদের কাছে পৌঁছে দেয়। এই একই ঘটনা ঘটেছে ওয়াল্টার পেটারের শৈলী আলোচনায়। পেটারও বলেছেন : *‘দা ওয়ান ওয়র্ড ফর দা ওয়ান থিং, দা ওয়ান থট, অ্যামিড দা মালটিচুড অব্ ওয়র্ডস টার্মস দ্যাট মাইট জাস্ট ডু;......দা ইউনিক ওয়র্ড, ফ্রেজ, সেন্টেন্স, প্যারাগ্রাফ, এসে অর সং অ্যাবসলিউটলি প্রপার টু দা সিংগল মেন্টাল রিপ্রেজেন্টেশান অব্ ভিশন উইদিন’ (অ্যাপ্রিশিয়েশনস, পৃ. ১৯)।*

কুন্তক ধ্বনিবাদবিরোধী নন। তাঁর বক্তব্যে রস, স্ব-ভাবের আলোচনা কিংবা আনন্দবর্ধনের ঔচিত্যবাদের ছায়া আছে। ধ্বনিকে চূড়ান্ত অস্বীকার তিনি করতে পারেননি। নায়কের মহত্ত্ব বাড়াতে অক্ষম বিষয়গুলি বর্জন এবং কবির রচনা বস্তু বা কাহিনি দ্বারা সজীব হয় না, রসের নিশ্ছিদ্র প্রবাহ দ্বারা হয়—এমন বক্তব্য রসবাদকে মেনে নেওয়ারই পরিণাম। যদিও কবির ক্ষমতা এবং দক্ষতাকে তিনি মর্যাদাদান করেছিলেন।

কুন্তকের বক্রতা ব্যাপারকে যাঁরা আধুনিক শৈলীচিন্তার সঙ্গে এক করে ফেলেন, তাঁরা একালীন ভাবনাকে সেকালে আরোপ করেন। কুন্তকের বক্রতা-ব্যাপারের সঙ্গে পশ্চিমের প্রথাগত শৈলীচিন্তার আংশিক মিল আছে। রীতিবাদের একালীন ব্যাখ্যা তারা ভুলে যান যে, সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বে রীতি হল কাব্যের নির্যাসকারী। একটি পুরো ছবি যেমন কয়েকটি রেখায় ফুটে ওঠে, তেমনি কাব্যও রীতি দ্বারা প্রকাশ পায়। ফলে গুণ নিত্য, অলংকার অনিত্য। তবে রীতিবাদের ব্যাকরণঘেঁষা আলোচনা এবং কবিব্যাপারভাবনায় কিছুটা তন্ময় রূপদানের প্রয়াস আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না।

১.৩ ❑ শৈলীর সংজ্ঞা ও অস্তিত্ববিচার

শৈলী যদি ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের রীতি না হয়, তাহলে শৈলী বলতে কী বোঝায়? শৈলী কি রচনার তন্ময় উপাদান ও লেখকব্যক্তিত্বের সমাহার? এসব প্রশ্ন এবার পশ্চিমী তত্ত্বে দেখা যাক। কেননা এর আগে শৈলীকে প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারেনি।

শৈলী শব্দটি প্রায় হাজার বছর ধরে পশ্চিমী আলোচনায় ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ এর দ্বারা কি বোঝানো হয়, তা নিয়ে ওদেশে বিতর্কের অন্ত নেই। সাহিত্যের কিছু পারিভাষিক শব্দ আমাদের প্রিয় হলেও তাকে সংজ্ঞার বাঁধনে বাঁধা এক কঠিন কাজ।

আরিস্টটল তাঁর 'রিটোরিকস'-এর তৃতীয় খণ্ডের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে মুখের ভাষার তিনটি শৈলীভাগ করেছিলেন। এগুলি হল :

১. সমুচ্চ শৈলী (গ্র্যান্ড স্টাইল) : আদালতে জুরিদের সামনে অলংকৃত ভাষণ,

২. মধ্যম শৈলী (মিডল স্টাইল) : জুরিদের বিশ্রামের সময় পারস্পরিক কথাবার্তা,

৩. নিম্ন শৈলী (লো স্টাইল) : সাধারণ স্নানাগারে নাগরিকদের সংলাপ।

আরিস্টটল জানতেন যে, এখানে রচনা নয়, উক্তির ধরন দেখানো হয়েছে। এরা মানুষের বাচিক ব্যবহারের তিনটি খণ্ডাংশ। এরা সমান্তরালভাবে প্রযুক্ত হয়, না মাঝে মাঝে এদের মিল ঘটার সম্ভাবনা থাকে—এই বিষয়ে তিনি 'রিটোরিকস্'-এ নীরব। অথচ তাঁর 'পোয়েটিকস্' বইয়ে এর ব্যাখ্যান আছে।

পোয়েটিকসের উনিশ অধ্যায়ে তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে, ওপরের স্টাইল-ধারণা বা উক্তির ধরন অন্য জাতের আলোচনার বিষয় হলেও কাব্যের ভাষার মধ্যে পড়ে না। অক্ষর, সিলেবল, সংযোজক শব্দ, বিশেষ্য, ক্রিয়া, বিভক্তি বা কারক এবং বাক্য ও খণ্ডবাক্যের সামান্য আলোচনা করে তিনি কাব্যভাষার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে জোর দিয়েছেন। শব্দের বিভাগ করতে গিয়ে তিনি প্রচল, বিচিত্র বা রূপকায়িত, অলংকৃত, নব-গঠিত, প্রসারিত, সংকুচিত ও পরিবর্তিত ধারণা এনেছেন।

প্রচল বা যথার্থ শব্দ বলতে তিনি জনতার ব্যবহৃত শব্দকে ভেবেছেন। বিচিত্র শব্দ হল অন্য দেশের শব্দ। একটি শব্দ একসঙ্গে প্রচল ও বিচিত্র হতে পারে, কিন্তু একই মানবগোষ্ঠীর মধ্যে নয়। রূপক হল সাদৃশ্য বা জাতি থেকে ব্যক্তি বা ব্যক্তি থেকে জাতিতে অর্থান্তরিত শব্দগুলি। যেমন, 'সন্ধ্যা' হল 'দিনের বৃদ্ধ বয়স'। আবার বার্ধক্য হল 'জীবনের সন্ধ্যা', এমপেডোক্লেসের ভাষায় 'জীবনের অস্তায়মান সূর্য'। শব্দের প্রসারণে স্বরের দীর্ঘায়ন এবং সিলেবলের আগম ঘটে বলে তিনি ভেবেছেন। শব্দসংক্ষেপে এর কোনো অংশ বাদ দেওয়া হয়।

ঐ বইয়ের বাইশতম অধ্যায়ে শৈলীর কথা এসেছে। শৈলীর পূর্ণতা অর্থ ছাড়াই স্পষ্ট হয়। স্বচ্ছতম শৈলীতে প্রচল এবং যথার্থ শব্দেরা স্থান পায়। আবার স্বাভাবিক বাগ্‌ধারা থেকে দূরে সরে গিয়ে অপ্রচল, রূপকায়িত, প্রসারিত শব্দেরা এক অস্বাভাবিক শৈলী গড়ে তোলে। এই শৈলীতে শব্দেরা ধাঁধা কিংবা নিরর্থক বাক্য গড়ে তোলে। রূপকের ফলে আসে ধাঁধা আর অপ্রচল শব্দের ফলে নিরর্থকতা। শৈলীরচনায় এদের সংমিশ্রণ ঘটবে না, এমন নয়। এরা সাধারণ ভাষা থেকে শৈলীকে উন্নত করবে, অর্থগর্ভ করবে। আবার যথার্থ শব্দেরা একে প্রাঞ্জল করবে। বিশেষ ক্ষেত্রে সাধারণ বাগ্‌ধারা থেকে ভাষা সরে গিয়ে বিশিষ্টতা পাবে, আবার লোকব্যবহারের সঙ্গে আংশিক সংযোগ সুস্পষ্টতা দান করবে। সব কিছুই ব্যবহৃত হবে ঔচিত্যবোধের দ্বারা। রূপকের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ দরকার। তুলনার দৃষ্টিকে সঠিক রেখে প্রতিভাবান ভালো রূপক সৃষ্টি করেন। সমাস ডিথ্রাম্বিক রচনায়, অপ্রচল শব্দ বীরগাথায় এবং রূপক আয়াম্বিক ছন্দে সবচেয়ে সুপ্রযুক্ত হয়। আয়াম্বিক পদ্যে উপযুক্ত শব্দ পরিচিত উক্তি, এমনকি গদ্য থেকেও উঠে আসে। এইসব শব্দেরা প্রচল বা যথার্থ, রূপকায়িত এবং অলংকৃত শব্দ।

আরিস্টটলের এই শৈলীব্যাখানে তাঁর মূল বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হলেও ভাবোদ্দীপক। যেমন :

১. প্রতিদিনের ভাষা ও কাব্যভাষার পার্থক্য

২. শৈলীর প্রাণবিন্দু হল প্রাঞ্জলতা

৩. অস্বাভাবিক শৈলী

৪. ঔচিত্যধারণা ও উপযুক্ত শব্দকোষ

জোনাথান সুইফট ইংরেজি সাহিত্যের এক বড়ো শিল্পী। তাঁর এক তরুণ ধর্মযাজক বন্ধুকে লেখা চিঠিতে তিনি শৈলীর সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—‘প্রপার ওয়র্ডস ইন প্রপার প্লেসেস, মেকস দা ট্রু ডেফিনিশন অব্ আ স্টাইল (stile)।’ উপলক্ষ (কনটেক্স ট) নিয়ে আরও ভাবার দরকার, তিনি লিখেছেন। শ্রোতাদের কাছে যাজকের অপ্রচল পরিভাষা ব্যবহারকে তিনি নিন্দা করেছেন। রাজপুত্র বা পার্লামেন্টের আলোচনার ভঙ্গি আর নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে বলা সহজ উপদেশের ভঙ্গি এক হয় না। এই অবধি মনে হতে পারে যে সামাজিক পরিস্থিতিতে বাগ্‌বিনিময়ের কথাই তাঁর বলার বিষয়। কিন্তু একই চিঠিতে একটু বাদে তিনি লিখেছেন :

> ‘হোয়েন আ <u>ম্যানস</u> থটস আর ক্লিয়ার, দা প্রপারেস্ট <u>ওয়র্ডস্</u> উইল জেনারালি অফার দেমসেলভস ফার্স্ট; অ্যান্ড হিজ ওন <u>জাজমেন্ট</u> উইল ডাইরেক্ট হিম ইন হোয়াট <u>অর্ডার</u> টু প্লেস দেম, সো অ্যাজ দে মে বি বেস্ট আন্ডারস্টুড।’ (নিম্নরেখ শব্দগুলি বড়ো হাতের লেখায় ছিল)

সুইফটের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি মূল্যবান কথা জানা যায় :

১. যখন মনের চিন্তা স্বচ্ছ থাকে, তখন যথার্থ শব্দেরা ভাষায় স্থান পায়।

২. লেখক বা বক্তা সচেতন বিচারবুদ্ধিতে এদের সাজান।

৩. তাঁদের লক্ষ্য থাকে শব্দেরা যাতে বক্তা-শ্রোতা-পাঠকের সঙ্গে সংপ্রেষণ (কম্যুনিকেশান) করতে পারে।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানও সুইফটের এই ধারণাকে সমর্থন করে। যে-কোনো মানুষের সামনে একই বিষয় প্রকাশের জন্য অনেক শব্দার্থের উপায় থাকে (মাল্‌টিপল চয়েজ অব এক্সপ্রেশনস)। দুজন মানুষ কখনও এক বিষয়ে এক কথা বলে না। এমনকি প্রথমবারে তার বলা বা লেখা দ্বিতীয় বারে পালটে যায়। সুইফ্‌ট প্রথম একটি রচনার সঙ্গে উপলক্ষের সম্পর্ক দেখালেন। তাঁর সংজ্ঞা অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি যে, মানুষ তার সহজাত বিচারশক্তি এবং স্বচ্ছ চিন্তার বলে বিভিন্ন উপলক্ষে আলাদা আলাদা শৈলী ব্যবহার করে থাকে।

আর বুফোঁর প্রদত্ত শৈলীসংজ্ঞাকে সুইফটের পাশে রাখতে পারি। বুফোঁর শৈলীসংজ্ঞা বোধহয় সবচেয়ে প্রচলিত এবং সহজতম। তিনি বলেছিলেন, ‘স্টাইল ইজ দা ম্যান হিমসেল্‌ফ।’ বাংলা সাহিত্যালোচনায় এর শেষের শব্দটি প্রায়ই অকারণে বাদ দেওয়া হয় (বাহুল্যবর্জন না অজ্ঞানতার জন্য, তা বলা কঠিন)। বুফোঁ শৈলীর সঙ্গে নির্বাচনরীতির সম্পর্ক এবং লেখকব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছেন। অথচ কেন এক একটি শৈলী একেক প্রকারের, এ কথার উত্তর তিনি দেননি। একজন লেখক নানা সময়ে নানা শৈলী নিতে পারেন। এমনকি তাঁর একই রচনায় মিশ্র শৈলীও থাকতে পারে। একজন মানুষকে সরলরেখার ঋজুতায় মাপা যায় না। তেমনি

শৈলীও একরৈখিক নয়। বুফোঁর শৈলীধারণার সবচেয়ে বড়ো দিক হল লেখকের ব্যক্তিত্ব অনুসন্ধান। শৈলী লেখকজীবনের বাস্তবতাকে ঘিরে গড়ে ওঠে।

বুফোঁর শৈলী-আলোচনা অনেককে খুশি করলেও ঔপন্যাসিক গুস্তাভ ফ্লবেয়ার এতে আপত্তি জানিয়েছেন। প্রতিভাবানের জীবনে পরিশ্রম এবং ধৈর্যের স্থান নেই বলে বুফোঁ জানিয়েছিলেন। ফ্লবেয়ার সেই অনায়াসলব্ধ প্রতিভাকে ধিক্কার জানিয়ে লিখেছেন :

'হোয়াট বুফোঁ সেইড্ ইজ আ বিগ ব্লাসফেমি : জিনিয়াস ইজ নট লং-কন্টিনিউড পেসেন্স।'

তিনি লেখকের কঠোর সাধনাকে এভাবে ভেবেছেন :

'সিক', ইরিটেটেড দা প্রে আ থাউজেন্ড টাইমস আ ডে অব ক্রুয়েল পেইন, আই কন্টিনিউ মাই লেবর লাইক আ ট্রু ওয়ার্কিং ম্যান, উইথ শ্লীভস টার্নড আপ ইন দা সোয়েট অব্ হিজ ব্রাউ, হিটস্ অ্যাওয়ে অ্যাট হিজ এনভিল, নেভার ট্রাবলিং হিমসেলফ হোয়েদার ইট রেইনস অর ব্রোজ, ফর হেইল অর থান্ডার।'

ফ্লবেয়ার প্রকাশকৌশলের চরমতা ও অনন্যতাকে শৈলী ভেবেছেন। তাঁর কাছে প্রকরণ ছিল কৃতির নামান্তর। শৈলী যদি হয় মানুষেরই স্ব-প্রকাশ, তবে সমস্ত রঙ্ ও অনুভবের গভীরতা-বৈচিত্র্য নিয়ে প্রকৃত অর্থে তা নৈর্ব্যক্তিক (ইম্পার্সোন্যাল), এটা মনে রাখা প্রয়োজন।

ইংরাজ সমালোচক-প্রাবন্ধিক ওয়াল্টার পেটার আদর্শ সৌন্দর্য ও প্রকরণের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর 'অ্যাপ্রিশিয়েশনস্' বইয়ে পরে শৈলী নিয়ে একটি নিবন্ধ যুক্ত হয়। সাহিত্য-শিল্পের কথায় পেটার প্রয়োজনের শিল্পের (সার্ভিসেবল আর্ট) সঙ্গে সৌন্দর্যের পার্থক্য টেনেছেন। তাঁর ভাষায় :

'লিটারারি আর্ট, দ্যাট ইজ, লাইক অল আর্ট ইজ ইন এনি ওয়ে ইমিটেটিভ অর্ রিপ্রোডাক্টিভ অব্ ফ্যাক্ট—ফর্ম, অর্ কলার, অর্ ইনসিডেন্ট—ইজ দা রিপ্রেজেন্টেশান অব সাচ ফ্যাক্ট অ্যাজ কানেক্টেড উইথ সোল, অব্ আ স্পেশিফিক পার্সোন্যালিটি, ইন ইটস প্রেফারেন্স, ইটস্ ভলিশন অ্যান্ড পাওয়ার।'

('অ্যাপ্রিশিয়েশনস্', পৃ. ৫)

তাই লেখকের চেয়ে তার তথ্যের অনুভূতি কাম্য এবং রমণীয় হয়ে ওঠে। সাহিত্যিককে বিদগ্ধ হতে হবে। তাঁর বৈদগ্ধ্য বিদগ্ধ বিবেকের উপর নির্ভর করে। বৈদগ্ধ্যের এক বিশেষ ব্যাখ্যা পেটার দিয়েছেন। ভাষার নিজস্ব বর্জন (এলিমিনেশন) এবং অগ্রাধিকার-নিয়ম (ল অব্ প্রেফারেন্স) সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক সারভূত উপলব্ধি হল বৈদগ্ধ্য। লেখক যে উপকরণ ও মাধ্যম নিয়ে সৃষ্টিকর্ম করবেন, তার স্বাভাবিক বর্জনের প্রকৃতিতে শিল্প সংহত হয়। সংক্ষিপ্তি, অতিশয়িত বিশদতা (এক্সাজারেটেড ডিটেইলিং) কিংবা অশিক্ষিতদের জন্য অতিসরলীকরণে তিনি মনোযোগী হবেন না। নিজস্ব পদ্ধতিতে তিনি শব্দভাণ্ডার সাজাবেন। নিজের ভাষাবোধের দ্বারা তিনি শব্দচয়ন করবেন, পণ্ডিতের মতো নয়। শিলার তাই বলেছিলেন, 'শিল্পীকে তার বর্জনকৌশলেই জানা যায়।' সাহিত্যিক স্থাপত্যকর্মে দূরদৃষ্টি থাকবে সূচনায়। আবার সৃষ্টিকালে ছাঁদ (প্যাটার্ন) বিস্তৃত হবে। সমস্ত অস্বাভাবিকতা, আকস্মিক চমক এবং পশ্চাৎচিন্তা একটা সমগ্রবোধের অধীনে থাকবে। সংযতভাবে সৃষ্টির অনুপ্রেরণাকে প্রতি স্তরে এমনভাবে তিনি বিন্যাস করবেন যাতে পাঠকমনে স্বাভাবিক প্রগতিবোধ (সেন্স অব্ (প্রোগ্রেশন) জেগে ওঠে। সৃষ্টিশীল এষণা হল কল্পনারই একটি রূপ।

পেটারের শৈলীব্যাখ্যানের মধ্যে অবয়ববাদী (স্ট্রাকচারালিস্ট) দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা সক্রিয় হয়েছে। পেটারের কিছু মন্তব্য নির্দেশমূলক (প্রেশক্রিপ্‌টিভ) হলেও রচনার প্রকরণ সম্পর্কে ভাবনার পরিচায়ক। কিন্তু একতম মান্য শব্দের উপলব্ধি ভাববাদের ইঙ্গিত দেয়। তিনি বুফোঁর সংজ্ঞাকে আরেকটু যুক্তিশাসিত করে জানালেন :

'দা স্টাইল, দা ম্যানার, উড বি দা ম্যান, নট ইন হিজ আনরিজনজ অ্যান্ড রিয়ালি আনক্যারাক্টারিস্টিক ক্যাপ্রিসেজ, ইনভলান্টারি অর্ এফেক্টেড, বাট ইন অ্যাবসলিউটলি সিনসিয়ার অ্যাপ্রিহেনশন অব্ হোয়াট ইজ মোস্ট রিয়াল টু হিম।'

(অ্যাপ্রিশিয়েশনস্ পৃ. ২৪)

শৈলী তাই ব্যক্তিত্বের শিকড় থেকে উঠে এলেও শেষাবধি ব্যক্তিক নয়।

মিডলটন মারী আলাদাভাবে শৈলীকে দেখেছেন। মারীর অনুসরণে তিনটি বাংলা বাক্য নেওয়া যাক যাতে তাঁর শৈলীধারণার আভাস দেওয়া যায়।

১. বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত লেখকনামহীন রচনাটির শৈলী দেখে মনে হয়, এটি বঙ্কিমেরই রচনা।

২. ওঁর বিষয় নূতন হলেও লেখার কোনো শৈলী নেই।

৩. সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে পদান্বয় দুরূহ, অপ্রচল তৎসম শব্দও কম নেই। তবু স্বীকার করতে হবে তাঁর শৈলী আছে।

প্রথম বাক্যে 'শৈলী' বলতে লেখকের প্রকাশস্বাতন্ত্র্য (ইডিওসিনক্রেসি অব্ এক্সপ্রেশন) বোঝানো হয়েছে। বাগ্‌বিন্যাস এবং জীবনদৃষ্টিতে তার পার্থক্য ধরা পড়ে। একজন মানুষকে যেমন তার কিছু বিশেষত্বের জন্য আরেকজন থেকে আলাদা করা যায়, তেমনি একজনের শৈলী অপরের থেকে পৃথক।

দ্বিতীয় বাক্যে শৈলী এসেছে প্রকাশকৌশল (টেকনিক অব্ এক্সপ্রেশন) রূপে। নূতন ভাবনা থাকলেও ভাবনা-পরম্পরার সহজ সম্পর্ক, প্রকাশের স্বচ্ছতা, সংপ্রেষণের ক্ষমতা না থাকায় সেখানে শৈলীর চিহ্ন চোখে পড়ে না। গদ্যের গঠন সম্পর্কে উদাসীনতা কিংবা সংপ্রেষণহীনতার জন্য এই লেখক শৈলীহীন।

তৃতীয় বাক্যে শৈলী চূড়ান্ত অর্থে (স্টাইন ইন অ্যাবসলিউট সেন্স) এসেছে। সর্বজনীন ধারণাকে ব্যক্তিক এবং বিশেষীকৃতভাবে প্রকাশ করাকেই শৈলী বলা হয়েছে।

শৈলীর এই তিন ধরনের বিভাগ সমালোচনার কাজকে জটিল করে। সমালোচক কখন কোন্ সংজ্ঞা ভেবে আলোচনা করছেন, তা পাঠকের কাছে স্পষ্ট থাকে না। মারীও শৈলীর একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন :

'স্টাইল ইজ আ কোয়ালিটি অব্ ল্যাংগুয়েজ হুইচ কমিউনিকেটস প্রিসাইজলি ইমোশনস অর্ থটস্, অর্ আ সিস্টেম অব ইমোশনস অ্যান্ড থটস্, পিক্যুলার টু দা অথর।'[২]

(দা প্রব্লেম অব স্টাইল, পৃ. ৬৫)

পেটারের কবিদৃষ্টির মতনই মারীর রোমান্টিকতা শৈলীর সংজ্ঞাদানকে শেষ পর্যন্ত আবেগমুক্ত করতে পারেনি। মারীর এই সংজ্ঞার পাশে আরও মন্ময় ও আবেগী (ইমোশন্যাল) সংজ্ঞার কথা পাঠকের মনে পড়তে পারে। এইসব উদাহরণে সংজ্ঞার ভাষা মোহিনী হলেও ধারণার শিথিলতা সেখানে গোপনে সক্রিয় থাকে।

শৈলীর পশ্চিমী ব্যাখ্যানে সুইফট আর বুফোঁ ভিন্নপথগামী। একজন লেখকের বিশেষ শব্দচয়ন-বুনোটের ব্যাখ্যা করে তা চিহ্নিত করা শব্দ-সংখ্যা-তাত্ত্বিকের (লেক্সিকো-স্ট্যাটিসসিয়ান) কাজ। এঁদের পুরোগামী হলেন বুফোঁ। আবার শৈলীর সামাজিক ব্যাখ্যাতাদের অগ্রগামী ছিলেন জোনাথান সুইফ্‌ট। প্রথম পদ্ধতি যদি হয় বর্ণনাত্মক (ডেসক্রিপটিভ), দ্বিতীয় পদ্ধতি তাহলে ব্যাখ্যানমূলক (এক্সপ্লেনেটরী)।

আরিস্টটল থেকে মারী পর্যন্ত কোনো সমালোচক শৈলী নিয়ে শেষ কথা বলেননি। এইসব সংজ্ঞায় কিছু সত্য ও যুক্তি আছে। কিন্তু সেগুলি ধ্রুব এবং একার্থক নয়। সমালোচক স্থির সংজ্ঞার জন্য ব্যস্ত হন। সৃষ্টির রাজত্বকে শাসনের মোহে; সাহিত্যিক পরিভাষার অর্থ খুঁজতে গিয়ে তিনি বিশৃঙ্খলার জগতে পৌঁছান। আর আমরা পড়ুয়া ও পণ্ডিতেরা বিপন্ন বিস্ময় অনুভব করি।

বেনিসন গ্রে তাঁর 'স্টাইল : দা প্রব্লেম অ্যান্ড ইট্‌স সল্যুশনস' রচনায় এই সমস্যা থেকে অন্যভাবে মুক্তি খুঁজেছেন। তিনি মনে করেন, শৈলী বলে কিছু নেই। শৈলী হল উলঙ্গ রাজার অদৃশ্য পোশাকের মতো যা 'সত্যই অতীব সূক্ষ্ম, চোখে/পড়ছে না যদিও, তবু আছে,/অন্তত থাকাটা কিছু অসম্ভব নয়' (উলঙ্গ রাজা, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)। কিংবা তা হল প্রাচীন পদার্থবিদ্যার ঈথারের মতো একটা মাধ্যম (পদার্থ নয়) যা শূন্যতাকে ভরাট করে রাখে এবং তড়িৎ-চুম্বকস্রোত পাঠায়। ঈথারের শব্দমূলে গ্রীক 'aither' আছে। তার মানে স্বর্গ যা মানুষের কল্পনায় আছে, প্রত্যক্ষ দেখায় নেই।

তাহলে শৈলী আছে কেন মনে করা হয়? কারণ, বেশিরভাগ মানুষ একে দেখতে চান। আবার সৃষ্টির বহু রহস্যকে সহজ, সর্বমান্য শৈলীর আড়ালে লুকোনো যায় বলে এর অস্তিত্বের ধারণা সক্রিয়। তিনি (গ্রে) মনে করেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আসলে শৈলীর বস্তু নয়। ভাষা, বিষয়, উপলক্ষ এবং পরোক্ষ উল্লেখকর্ম (ইনডিরেক্ট রেফারেন্স) শৈলীর উপাদান। সুইফ্‌টের মতো শৈলীকে নির্বাচনের রকমফের বলতেও তিনি চান না। কেননা লেখকের মনের কর্মশালার সবটুকু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নয়। গ্রে-র বক্তব্য হল :

> *'ইন এভরি কেস অব্ দা ইউজ অব্ দা ওয়র্ড 'স্টাইল'......দা ইউজার হ্যাজ ফাউন্ড ইট নেসেসারি টু গো আউটসাইড দা ওয়র্ক টু এস্টাব্লিশ দা এগজিসটেন্স অব স্টাইল, অ্যান্ড ইন এভরি কেস হি হ্যাজ হ্যাড টু গো সামথিং ফর হুইচ দেয়ার এগজিস্টস নো এভিডেন্স বাট দা পার্টিকুলার ওয়র্ক হুজ স্টাইল হি উইশেস টু ডিসকাস।'*

[গ্রে (১৯৬৯), পৃ. ১০৭)]

বেনিসন গ্রে একজন গোঁড়া ঐক্যবাদী (অর্গানিস্ট)। তাঁর কাছে সাহিত্যকৃতি এক এবং অবিভাজ্য। প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, শৈলী ও প্রকাশকৌশল, পদ্ধতি ও ফলাফলের মধ্যে কোনো বিরোধিতা নেই। শুধু গ্রে কেন, কোনো আলোচকই শৈলীর কথায় উপসংহারে পৌঁছতে পারেননি।

শৈলীর একটা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা আমাদের সাহিত্যালোচনায় বিশেষ প্রয়োজন। অথচ দু-চার কথায় তাকে প্রকাশ করা যাচ্ছে না। এই সমস্যা আমাদের বিজ্ঞানের ইতিহাসে পৌঁছে দেয়। বিজ্ঞানের দার্শনিকরা সংজ্ঞার দুটি বিভাগ করেছে—১. বিষয়ী (সাবস্ট্যানটিভ্), ২. অঙ্কপাতনিক (নোটেশনাল)। আইডিয়ার বিরাট বদল না হলে বিষয়ী সংজ্ঞা পাল্টায় না। আংকপাতনিক সংজ্ঞায় সংক্ষিপ্তি, সংহত প্রকাশই মূল কথা। এ অবধি পাওয়া শৈলীর সংজ্ঞাগুলি সবই অঙ্কপাতনিক। যুরোপীয় লেখকরা শৈলীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সর্বত্রই ভাষার জয়ধ্বনি করেছেন।

শৈলী অঙ্কপাতনিক বা বিষয়ী যাই হোক না কেন, তাকে সমালোচনায় নিষেধের তর্জনী দেখাতে পারি না। এমনকি একে অবাঞ্ছিত বলে ফতোয়া দেওয়া যায় না। ঐক্যবাদে অর্থ ও নান্দনিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে রচনার অখণ্ড সমগ্র রূপ ভাবা হয়, সেখানে শৈলীও বাদ পড়ে না।

বেশ কিছুদিন হল পাশ্চাত্যে শৈলীবিজ্ঞান (স্টাইলিস্টিক্স্) বলে এক সমালোচনাশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। কৃতি বিশ্লেষণ করে, নানা পদ্ধতিতে তার ভাষিক উপাদানকে চিহ্নিত করে সমস্ত রচনার ফল এবং ব্যক্তি-অনুভবের সমবায়কে প্রতিক্রিয়ার কারণরূপে খোঁজা এক উঁচু দরের বৈধ সমালোচনা পদ্ধতি। শৈলীর জনপ্রিয় (পপুলার) সংজ্ঞাদান কঠিন কাজ হলেও কোনো বিশেষ পদ্ধতির এ জাতীয় প্রয়োগ সমালোচনার ইতিহাসে এক নূতন শাস্ত্রের সূচনা করেছে। একে বলতে পারি স্টাইলিস্টিক্স্ বা শৈলীবিজ্ঞান।

শৈলীবিজ্ঞানের বয়স বেশি না হলেও এর উৎসমূলে ভসলার-ক্রোচে-স্পিৎজারের চক্রতত্ত্ব, রাশিয়ান ফর্মালিজম, অবয়ববাদ, নব্য-অবয়ববাদ (নিওক্রিটিসিজম বা নিওস্ট্রাকচারালিজম), প্রাগ্ গোষ্ঠীর অবয়ববাদ, ভাষাবিজ্ঞানের নানা মহল সক্রিয় ছিল। এসব আলোচনা করে আমরা শৈলীবিজ্ঞানের নানা মহলে পৌঁছতে পারি।

১.৪ ❑ ভসলারস, ক্রোচে, স্পিৎজার : কৃতি ব্যাখ্যান

ভসলার, ক্রোচে, স্পিৎজার প্রমুখ ভাববাদীরা ভাষাবরণের অন্দরমহলে প্রবেশের জন্য বিভিন্ন উপায় বা পথ খুঁজেছিলেন। ভসলার ভাষার বিশদতার আড়ালে জাতীয় সংস্কৃতির সূত্র সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। ক্রোচে ভাষাকে সৃষ্টি বলে মনে করে একে নন্দনতত্ত্বের শাখা মনে করেছেন। বেনেদিত্তো ক্রোচের 'ঈসথেটিক' বইয়ে তাঁর বিশেষ ভাবনার পরিচয় পাই :

> *'দা ইনট্যুশন অ্যান্ড এক্সপ্রেশন টুগেদার অব্ আ পেইন্টার আর পিকটোরিয়াল; দোজ অব্ আ পোয়েট আর ভার্বাল, বাট বি ইট পিক্টোরিয়াল, অর ভার্বাল, অর মিউজিক্যাল ক্যান এক্সপ্রেশন বি ওয়ান্টিং বিকজ ইট ইজ অ্যান ইনসেপারেবল পার্ট অব ইনট্যুশন।'*

এই নিষ্পন্ন হওয়ার সূত্রকে আরও ব্যাখ্যা করে ক্রোচে লিখেছেন অলংকার ও প্রকাশকৌশলের সম্পর্কের কথা।

একালে লিও স্পিৎজারও অনেক কৃতির তুলনামূলক আলোচনায় সংস্কৃতি ও প্রকাশভঙ্গির সম্পর্ক দেখিয়েছেন। তিনি বলতে চান যে, ধাপে ধাপে না এগিয়ে গোড়াতেই লেখকের ব্যক্তিত্বলক্ষণ দেখা দরকার। এই লক্ষণ লেখকের অন্য রচনাতেও দেখতে হবে। যদি তা পাওয়া যায়, তবে সন্ধান সার্থক হবে। আর তা না পেলে অন্য লক্ষণে মনোযোগ দিতে হবে। এই হল স্পিট্জারের চক্রধারণা (স্পিট্জারিয়ান সার্কেল)। স্বজ্ঞা বা উপলব্ধির দ্বারা শৈলীবৈজ্ঞানিক ধারণা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা স্পিৎজার করেছিলেন। কিন্তু স্পিৎজারীয় অন্তর্দৃষ্টি সাধারণ আলোচকরা কোথায় পাবেন? তাই এর চেয়ে স্থূল, বহিরঙ্গ পদ্ধতি তাঁদের কাছে কাম্য হয়ে দাঁড়ায়।

ভসলার, ক্রোচে, স্পিৎজার—সকলেই এক বড়ো পরিপ্রেক্ষিতে শৈলীসন্ধান করেছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিত হল সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিত। এদের তত্ত্বানুসন্ধানের কাল ও পরিবেশ বিচার করলে দেখা যাবে জাতীয়তাবাদের

এক আদর্শবাদী বহিরাবরণ এদের সংস্কৃতি সম্পর্কে উৎসাহিত করেছিল। আবার সংস্কৃতিসূত্রে আসা জৈবিক ঐক্যের ধ্রুপদি অস্পষ্ট ধারণাটি এদের মনে আদর্শবাদের বীজ বুনেছিল। ফলে স্বজ্ঞা বা উপলব্ধির মন্ময়তার দিকে এরা গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। এদের সৌন্দর্যতত্ত্ব ও প্রকাশব্যাখ্যান আমাদের রসতত্ত্বের মায়াবাদের মতো। এই তত্ত্ব আলেয়ার মতো বিশ্লেষণের পথ থেকে আমাদের সরিয়ে আনে।

১.৫ ❑ রাশিয়ান ফর্মালিজম্

ক্লদ লেভি-স্ত্রোস একটি প্রবন্ধে (১৯৬৪) মন্তব্য করেছিলেন যে, ‘একবিংশ শতক হয় সামাজিক বিজ্ঞানের যুগ হবে অথবা কিছুই হয়ে উঠবে না।’ সাহিত্যালোচনাকে বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্তিগুণের অধিকারী করে তোলার এই স্বপ্ন ১৯২০ নাগাদ রাশিয়ান ফর্মালিস্টদের মনেও জেগেছিল। স্বপ্নকামনা ভালো। আমরা (সচেতন আলোচকরা) অনুমান, মন্ময়তা, ব্যক্তিগত পক্ষপাত আর ছদ্ম-বিজ্ঞাননির্ভর রচনায় ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। কীভাবে সেই মর্মজ্ঞান লাভ করব, সেই প্রশ্ন মনে জেগে ওঠে।

অনেকের বিশ্বাস আছে যে, সামাজিক বিজ্ঞানকে যথার্থ করতে গেলে আঙ্কিক নির্ভুলতা দরকার। অঙ্ক এবং সংখ্যাতত্ত্ব আমাদের মর্মজ্ঞানের অন্দরমহলে ছাড়পত্র দেবে। এই ‘যথার্থ সত্য’ ধারণা পূর্ণ সত্যের আংশিক উদ্ভাসন ঘটালেও এই পথে পথিকের সংখ্যা কম নয়।

অনুবাদ কম হলেও রাশিয়ান ফর্মালিজমের কথা আমাদের হাতে ধীরে ধীরে পৌঁছচ্ছে। বাংলায় শৈলী আলোচনায় এই মতবাদকে ভুলে গিয়ে সকলেই অবয়ববাদ (স্ট্রাকচারালিজম), নব্য-অবয়ববাদ প্রসঙ্গ তুলেছেন। ফলে আমাদের আলোচনায় একটা কালপরম্পরার শূন্যতা তৈরি হয়েছে। এই পর্ব বাদ দিয়ে অবয়ববাদে যাওয়া অসম্ভব। বাংলায় রাশিয়ান ফর্মালিজম নিয়ে বিস্ময়কর নীরবতা সাম্যবাদী দেশ ও রচনা সম্পর্কে বিদ্বেষভাবনাজাত কিনা, তা বিচারের অপেক্ষা রাখে।

বিশের দশকে সোভিয়েত রাশিয়ার ওপোয়াজ IPOYAZ (দা সোসাইটি ফর দা স্টাডি অব্ পোয়েটিক ল্যাংগুয়েজ) এক তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। প্রতীকবাদের ধর্মীয় ও দার্শনিক ব্যাখ্যায় ফর্মালিস্টদের উৎসাহ ছিল না। কেননা এই প্রতীকবাদের শিকড় নানা অপব্যাখ্যান এবং জটিলতার জন্য ক্রমে দূষিত হয়ে উঠছিল। আন্দ্রে বেলির কাছে সৌন্দর্যতত্ত্ব ও যথার্থ বিজ্ঞানের মর্মজ্ঞান শিল্পের নিরাকরণের উপর নির্ভর করে, এমন মনে হয়েছিল। বিষয়মুক্ত শিল্পপ্রকরণের মধ্যে সত্যকারের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। রুদলফ স্টাইনারের আধ্যাত্মিক সংগতিধারণাকে তিনি অঙ্কশাস্ত্রের আড়ালে আক্রমণ করলেন।

রোমান য়াকোবসন পঞ্চাশ বছর পরে রাশিয়ান ফর্মালিজমকে ধিক্কার দিয়ে বলেছেন, ‘১৯২০-এর রাশিয়ান ফর্মালিজম হল অবয়ববাদের শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা’। এই য়াকোবসনই ওপোয়াজের সদস্যরূপে একসময় লিখেছিলেন :

‘একজন ভাষা বা শিল্পের ক্ষেত্রে কাজ করবে, অথচ অবয়ববাদী ধারণা বুঝবে না—তা কেমন করে হয় আমি বুঝি না। যারা অন্যরকমে আলোচনা করে, তারা অবৈজ্ঞানিক অলস আলাপনে নিজেদের ব্যস্ত রাখে।’

য়াকোবসনের মোহভঙ্গ ঘটেছিল। হয়তো আরও অনেকের সত্যদর্শন ঘটেছিল। কিন্তু অবয়ববাদের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে যে, রাশিয়ান ফর্মালিজমের তাত্ত্বিক সম্পদ সাহিত্যিক অবয়ববাদের উৎসমুখ।

ওপোয়াজের সভ্যরা বেলি, বেলিনস্কি, দব্রুল্যুবভ সবাইকে অস্বীকার করলেন। প্রতীকবাদ, আদর্শবাদ, মন্ময়ধারণা এবং মনস্তাত্ত্বিক সৌন্দর্যধারণার বিরোধী ওপোয়াজের মূলমন্ত্র ছিল—'প্রতীকবাদের ক্রমবর্ধমান দার্শনিক ও ধর্মীয় প্রবণতার শৃঙ্খল ভেঙে শব্দকে মুক্তিদান করা' (আইখেনবাউম)।

তাহলে ফর্মালিস্টরা কি এক নৈর্ব্যক্তিক সমালোচনার জগৎ তৈরি করলেন? নৈর্ব্যক্তিকতার সন্ধান তাঁরা পেলেও শব্দার্থের মূল্যবান সম্পদ তাঁরা হারালেন। 'সংখ্যাতত্ত্ব এবং অঙ্কশাস্ত্র জগতের সমস্ত উপাদানের একমাত্র ব্যাখ্যাপত্র' বলে তাঁরা ঘোষণা করলেন। ব্যঞ্জনবর্ণের সংস্থানের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সেই মুক্তির উপায় এল।

মরোজভ 'স্টাইলোমেট্রিক' রীতিতে শিল্পে কুশীলকবৃত্তি এবং মৌলিকতা আবিষ্কার করলেন। মরোজভ সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে শিল্পশৈলীর বিচার করেছিলেন। কিন্তু এভাবে অগ্রজদের অমান্য করতে গিয়ে নিজেরাও স্বতোবিরোধিতায় ভুগলেন। শব্দকে অর্থের বাঁধনমুক্ত করার ইচ্ছা তাঁদের জেগেছিল। তাঁদের কাছে সাহিত্যগবেষণা হল কৌশলের (ডিভাইস) বিশ্লেষণ। একটি সাহিত্য-কৃতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিরর্থক বাক্‌ক্রীড়ারূপ দেখা হল। তাঁরা বললেন, 'শিল্পের সঙ্গে জীবন, স্বভাব বা মনস্তত্ত্ব কোনো যুক্তির শৃঙ্খলে বাঁধা নেই' কিংবা 'কবিতার ইতিহাস হল বাচিকভাবে গঠিত কৌশলের ইতিহাস।'

এই আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মীরা য়াকোবসনের মতো পরে নিজেদের ভ্রান্তির দর্শনকে বুঝতে পেরেছিলেন। ভিক্টর শ্‌কোলোভস্কি তাঁর 'বোস্ট্রীং' বইয়ে লিখেছেন—

'যখন আমরা শিল্প থেকে অনুভূতি বা আদর্শবাদকে বাদ দিই, তখন ভাবময় অভিজ্ঞতায় পাওয়া প্রকরণের প্রাঞ্জলতা এবং আশঙ্কার জগৎকেই বাদ দিয়ে ফেলি।'

[বোস্ট্রীং (১৯৭০), পৃ. ১২]

ফর্মালিজমের মূল কথা শিল্পের অচিরস্থায়িত্ব। অঙ্ক ও সংখ্যাতত্ত্ব দ্বারা সাহিত্যবিশ্লেষণ বুদ্ধির ব্যায়ামরূপে চিহ্নিত হয়ে রইল। প্রকরণকে চূড়ান্ত বলতে গিয়ে, বিষয়-ইতিহাস-মানবীয় জ্ঞানের জগৎকে অস্বীকার করতে গিয়ে তাঁরা নিরাকার শব্দের কঙ্কালে পৌঁছলেন। পুশকিন একটি কবিতার এই অবস্থাকে এভাবে কাব্যরূপ দিয়েছেন—

'মিউজিক আই,
ডিসেক্টেড লাইক আ কর্পস।
প্রুভড ইটস হার্মনিজ বাই ম্যাথমেটিকস্‌।'

এদের সমালোচনা প্রজ্ঞার অভাবে লক্ষ্যহীন হয়েছিল। জীবনানন্দের লেখা আধুনিক মানুষের ভাষাব্যবহারের কৃত্রিমতার প্রসঙ্গ এখানে ব্যাপারটিকে আরও স্পষ্ট করে—

‘মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া; বিশেষণ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল
জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।’

(১৯৪৬-৪৭, জীবনানন্দ দাস, বেলা-অবেলা-কালবেলা)

ফর্মালিস্টদের এই অতিরিক্ত প্রকরণচেতনার মূলে সেকালের রুশ সাহিত্যচর্চার প্রতিক্রিয়া দায়ী ছিল। সে সময়ে রুশ সাহিত্যচর্চায় জটিল এবং দুর্বোধ্য রচনার পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। আন্দ্রে বেলির পথে ইভেগেনি জাম্যাটিন, বোরিস পিলজ্যাক ‘স্কাজ (skaz)’[৩] ভাবনার সঞ্চার করেছিলেন। অপ্রচল শব্দ, আঞ্চলিক ও প্রাচীন বিন্যাসকলার মোহজাত এক ছদ্ম-রোমান্টিক বিশৃঙ্খলা এবং ইমপ্রেশনিজমের আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল। এই বিশৃঙ্খলার হাত এড়াতে, মোহাবরণ ভাঙতে ফর্মালিস্টরা যে পথ বাছলেন, তা সঠিক নয়। কিন্তু ঐ সময় এর বেশি আশা করা কঠিন ছিল।

রাশিয়ান ফর্মালিস্টরা শৈলী ও বিষয়ের সম্পর্ক এবং আদর্শ ভাষাধারণা (নর্ম) থেকে বিচ্যুতির (ডেভিয়েশন) উপর মন্তব্য করেছেন। এদের লক্ষ ছিল শিল্পদক্ষতার পরিকল্পনার প্রতি, বিষয়ের প্রতি নয়। সাহিত্যপাঠকের মনে ‘কি’-এর বদলে ‘কি করে’ সঞ্চারিত করা হল। ফর্মালিজম কয়েকজন ব্যক্তির সমবায়ে গড়ে উঠলেও সকলে শৈলীর বহিরঙ্গ প্রকাশে মনোযোগ দিয়েছেন। রোমান য়াকোবসন সাহিত্যিক ও রূপক-নির্ভর গদ্যের পার্থক্য দেখিয়েছেন। তিনজানভ কবিতার বিভিন্ন ভাগের সঙ্গে সেই স্তরের সংলাপের বৈসাদৃশ্য দেখিয়েছেন। জারমুনস্কি ও আইখেনবাউম রচনার বিষয়কেও শৈলীর আলোচনার অন্তর্গত করেছেন। ১৯৩০ নাগাদ যখন তলস্তয়, ফেদিন এবং ওলগা ফর্মের লেখা ‘আমরা কেমন করে লিখি’ (‘হাউ উই রাইট’) প্রকাশিত হল, তখন ফর্মালিজমের গতিবেগ অনেকটাই কমেছে। য়াকোবসনের মতো ভিনোগ্রাদফও ফর্মালিজম থেকে সরে এসেছিলেন। মার্ক্সীয় প্রত্যয় থেকে তিনি সাহিত্যকৃতিকে দ্বান্দ্বিক সমাবেশের উপায়রূপে দেখার প্রস্তাব দিলেন। ভাব, বিষয় এবং সাহিত্য-অবয়ব একটি কৃতির ভাষাতলের নির্মাণকর্মে ক্রিয়াশীল শক্তি। তাই ভাষাবিজ্ঞান-নির্ভর শৈলীবিজ্ঞান (লিংগুইস্টিক স্টাইলিস্টিক্‌স্) মূল শৈলীবিজ্ঞানের একটি অংশ। তা সাহিত্যসমালোচনা ও ভাষাবিজ্ঞানের উপশাখা নয়। একটি কৃতির অবয়বী গুরুত্বদানের এই ফর্মালিস্ট প্রয়াস থেকে এ যুগের অবয়ববাদের যাত্রা শুরু হল।

১.৬ ❑ সাহিত্যিক অবয়ববাদ

সাহিত্যিক অবয়ববাদ আলোচনার আগে অবয়ববাদের সামান্য কথা জানা দরকার। পশ্চিমী দেশে এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি থাকলেও বাংলায় এ বিষয়ে সামান্য আলোচনাই হয়েছে। অথচ এ যুগের বিখ্যাত তত্ত্বগুলির মধ্যে অবয়ববাদের স্থান রয়েছে।

অবয়ববাদকে একটি পদ্ধতি হিসাবে অনেকেই মানতে চান না। তাঁদের কাছে এটি হল জগৎ ও জীবনকে দেখার একটি দৃষ্টিভঙ্গি। এই মত অনুসারে অবয়ববাদে একটি রচনাকর্মের নির্বস্তুক সম্পর্কগুলির একটি রীতি আছে। অবয়ব বা স্ট্রাকচার কোনো বিষয় বা বস্তুর সামগ্রিক গঠন বোঝায়। বিচ্ছিন্ন ঘটনা, বস্তু, ধারণা নয়—সবকিছুর পারস্পরিক সম্পর্কনির্ণয় অবয়ববাদের লক্ষ্য। অবয়ব-উপাদানগুলির বিন্যাস-শৃঙ্খলা

থাকে। এই শৃঙ্খলা অচল বা স্থাণু নয়। গতি এবং রূপান্তর হল অবয়বের ধর্ম। অবয়বের আপন নিয়মেই এই পরিবর্তন ঘটে। সেজন্য অবয়বকে ব্যাখ্যার জন্য এর বাইরে যাবার দরকার নেই।

সমগ্রতা (টোটালিটি), অভ্যন্তরীণ বিন্যাস-শৃঙ্খলা (ইন্টার্নাল কম্বিনেশন চেইন), গতিশীলতা (মোবিলিটি) এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা (সেল্ফ সাফিসিয়েন্সি)—এই নিয়ে হল অবয়বধারণা (স্ট্রাকচারালিজ্ম)। এই বিশেষ জ্ঞান সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সব শাখাতেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। অন্যদিকে ভাষাবিজ্ঞান-নির্ভর অবয়ববাদে সংকীর্ণ অর্থে অবয়ব খোঁজা হয়। যেমন, ফার্দিনান্দ দা সোস্যুর ভাষার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ধারণা এনে অবয়ববাদের প্রয়োগ করলেন। দা সোস্যুর ভাষাবিজ্ঞানকে চিহ্নবিজ্ঞানের (সেমিওলজি) অন্তর্গত মনে করলেন। নৃতত্ত্বে লেভি-স্ত্রোস দেখালেন যে, মানুষের সামাজিক আচরণ ভাষার মতো সুনির্দিষ্ট এবং অবয়ব-নির্ভর। উপজাতি সমাজে আত্মীয়তা সূত্র ভাষার ন্যায় ক্রিয়াশীল। মানুষের 'মাইথোলজি' যদি অবয়বী পদ্ধতিতে সাজানো যায়, তাহলে গল্পের বিন্যাস ছাড়াও বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক ব্যাকরণের মতো সাজানো যাবে। এই সম্পর্কের বিন্যাস কাল-নিরপেক্ষ এবং সমলয়-নির্ভর (সিনক্রনিক)। মীথের অবয়বকে লেভি-স্ত্রোস শেষাবধি যুগ্ম বৈপরীত্য রূপে (বাইনারি অপোজিশন) দেখেছেন।

ভাষাবিজ্ঞানের মহল থেকে শুরু করে নৃতত্ত্ব অবধি নানা বিষয়কে স্পর্শ করে অবয়ববাদ সাহিত্যালোচনায়ও গভীর প্রভাব ফেলেছে। ভাষার ব্যাকরণের মতো গল্পেরও ব্যাকরণ আছে বলে ধরা হয়। কবিতার বিভিন্ন আলোচনায় ধ্বনি, অর্থ, ব্যাকরণের জটিল বিন্যাসকে অবয়ববাদী দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। এসব দেখার মূলে আছে একটি নান্দনিক বোধ—এক বিশেষ জাতের কলাকৈবল্য, সাহিত্যকে আলাদা চিহ্নপদ্ধতিরূপে (সেমিওটিক্স্) দেখে তার নিজস্বতা ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা।

অবয়ববাদীর এই চিন্তার সঙ্গে নৈয়ায়িক ধ্রুববাদের (লজিকাল পজিটিভিজমের) মিল আছে। এইচ. জে. উলদাল এ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

'বিজ্ঞানের চোখে পৃথিবী বস্তু বা পদার্থ দ্বারা গঠিত নয়। বস্তুর অন্তর্নিহিত অপেক্ষকের সমষ্টি (টোটাল অব্ ফাংশনস) হল জগৎ। অপেক্ষকদের মিলনবিন্দুতে বস্তুরা স্বীকৃতি পায়। ... তাই বৈজ্ঞানিক ধারণায় পৃথিবী রেখাচিত্রের মতো, পুরো ছবির মতো নয়।'

[আউটলাইন অব্ গ্লসিমেটিক্স্ (১৯৫৭)]

এইরকম চরম ধারণা থেকে লেভি-স্ত্রোসও কিছুটা সরে এসেছিলেন। তাঁর রুশোপন্থী মোটিফ ধারণাকে (আদিম সমাজের আদর্শীকরণ, আধুনিক সভ্যতার সমালোচন, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বিরোধিতা) আদি অবয়ববাদের সঙ্গে মেলানো কঠিন। সাহিত্যিক অবয়ববাদের মূলে এইসব চেতনা ছাপ ফেলেছে। বিশেষ করে রাশিয়ান ফর্মালিজম্ এবং ভ্লাদিমির প্রপের ছায়া সবচেয়ে প্রগাঢ়।

ভ্লাদিমির প্রপ রাশিয়ান লোককাহিনীকে অসংলগ্ন উপাদানের সমাহার ভেবেছেন। তিনি একত্রিশটি বিষয়-উপাদানে এদের ভাগ করেছেন। যেমন—গল্পের কোনো একটি চরিত্র তখন ছিল না (অনুপস্থিতি), নায়ক বাড়ি ছাড়ল (প্রস্থান), নায়ক অলৌকিক বা ঐন্দ্রজালিক শক্তির সাহায্য পেল (রসদ বা সাহায্য)। তিনি মনে করলেন যে, লোককাহিনী অপূর্ব বস্তু নয়, ঐসব জাগতিক বিষয়ের নির্বাচন বা সমাহার। চরিত্রের ক্ষেত্রে তিনি সাতটি

ভাগ করলেন : দুর্বৃত্ত, সাহায্যকারী, দাতা, দূত, নায়ক, খলনায়ক আর উদ্দিষ্ট ব্যক্তি। শৈলীকে যদি বিষয়ের সঙ্গো সম্পর্কিত ভাষাবৈচিত্র্য ধরা যায় এবং সাহিত্যিক অবয়ব-উপাদানগুলিকে উপলক্ষের শ্রেণীবৈশিষ্ট্য বলা যায়, তাহলে প্রপের ব্যাখ্যান ভাষাবিজ্ঞান-নির্ভর শৈলীবিজ্ঞানের অন্তর্গত।

প্রপের পরে সাহিত্যিক অবয়ববাদ এক নূতন বাঁক নিয়েছে। সেই পর্বান্তরের নাম হল নব্য-সমালোচনা বা নব্য-অবয়ববাদ। এই মতের বিস্তৃত আলোচনায় একই সঙ্গো আমরা অবয়ববাদী সাহিত্য-সমালোচনার প্রতিফলন দেখতে পাব।

১.৭ ❑ নব্য-সমালোচনা বা নব্য-অবয়ববাদ (নিউ ক্রিটিসিজম/নিও স্ট্রাকচারালিজম)

রাশিয়ান ফর্মালিজম্ কি সত্যি সমালোচনার জগৎ থেকে হারিয়ে গেল? মনে হয় না। ১৯৬৮-তে একজন সমালোচক জানাচ্ছেন যে, 'সাহিত্যের নির্যাস বিষয়ে নয়, পদ্ধতির মধ্যে।' রোলাঁ বার্ত, লোৎমন, তোদোরফ, সেমুর চ্যাটম্যান, আর. পি. ওয়ারেন, জে. সি. র‍্যানসম, সি. ব্রুকস, উইলিয়ম এম্পসন একত্রে না হলেও এই নব্য-সমালোচনার প্রয়োগ করলেন। বুর্জোয়া সাহিত্য-সমালোচনার সবচেয়ে প্রভাবশীল ধারা হল এই নব্য-সমালোচনা। এটি বহুমতের রীতি হলেও ফর্মালিজম্ এবং অবয়ববাদের মৌলিক সূত্র এখানে অবহেলিত নয়।

মতের পার্থক্য সত্ত্বেও নব্য-সমালোচনার মূল কথা হল : 'শিল্প একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জমাট-বাঁধা বস্তু। শিল্পের সঙ্গো বাস্তবের সম্পর্ক নেই।' মাইকেল দুফ্রেঁ অবয়ববাদী সমালোচনা প্রসঙ্গো বলেছিলেন, 'এর লক্ষ্য হল উপাদান ও উপাদানের বিন্যাসকে পৃথক করা; .... অর্থহীনতা থেকে অবয়বের মাধ্যমে অর্থের সৃষ্টি করা।' এখানে ইতিহাস, সমাজ, বাস্তব উপেক্ষিত হল।

বাস্তব জগতের তথ্যসংবাদরূপে একটি শিল্পকর্ম কিংবা সাহিত্য-বিশ্লেষণকে এঁরা বললেন 'বাস্তবের কুহক।' এঁদের কাছে সাহিত্য হল বীজগাণিতিক সমীকরণ। দুফ্রেঁর ভাষায়, 'জগতের সঙ্গো লেখকের মাধ্যমে কৃতির যে জন্ম-নাড়ির বাঁধন, সমালোচনা তাকে ছিন্ন করে।' তাই নব্য-অবয়ববাদী সমালোচনা হল বিশেষভাবে সমকাল-লয়ে বাঁধা (ডীপলি সিনক্রনিক), শিল্পকৌশল ও শিল্পকর্মের অন্তর্নিহিত অবয়বের অনুপুঙ্খ পরীক্ষা, অবয়বের বিশেষত্ব নির্ধারণকর্ম।

এদের একটি মত হল, গল্প ও আলোচনার (ডিসকোর্স) মিলিত ফল কাহিনি। কালচেতনা, দৃষ্টিকোণ আর কাহিনির প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে লেখক-পাঠকে আলোচনা চলে। গল্পকে কয়েকটি ছোটো ঘটনার এককে (ইউনিট) ভাগ করা যায়। এদের বলা যায় অপেক্ষক (ফাংশন)। দ্বিতীয় স্তরের অপেক্ষকরা হল 'মর্মস্থল' (কার্নেল)। গল্পের শাখা বিস্তারের এসব কেন্দ্রে প্রয়োগবৈচিত্র্যের বাছাই চলে। কিংবা এরা হল 'অনুঘটক' (ক্যাটালিস্ট) যারা ঐ প্রয়োগবৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা করে। তৃতীয় স্তরের অপেক্ষকরা হল 'সূচক' (ইনডাইসেস)। এরা ঘটনার সঙ্গো যুক্ত নয়, কিন্তু চরিত্র ও পরিবেশকে নির্দেশ করে। যেমন, একজনের কোমরে বাঁধা তরোয়াল একটি অনুঘটক। যদি গল্পে তা ব্যবহৃত হয়, তবে তা সূচক। মর্মস্থল, অনুঘটক এবং সূচকের অনুপাত লেখকের কাহিনিগত বৈশিষ্ট্য বোঝায়। সেদিক থেকে এটি তাঁর বর্ণনার শৈলীবোধ। নব্য-

অবয়ববাদীরা তত্ত্বগতভাবে মর্মস্থল, অনুঘটকের ভাষার সঙ্গে সূচকের ভাষার পার্থক্য লক্ষ করেছেন। এইসব অপেক্ষককে প্রকাশের জন্য লেখক বিভিন্ন শৈলীর আশ্রয় নিতে পারেন—এই নূতন দিকটি এদের সমালোচনায় স্থান পেয়েছে।

যুরি লোৎমন নব্য-সমালোচনার একজন প্রধান স্থপতি। তাঁর মতে, অবয়বধর্মী ব্যাখ্যানে বিষয়ের গুরুত্ব কমানোর প্রশ্ন ওঠে না। "কোনো বিমূর্ত অবয়ব 'এক্স'-কে 'ধারণা' এবং 'কাব্যিক বাস্তবতার ধারণার বিকল্প' বলা চলে না। আমাদের 'ধারণা' (নোশন) এবং 'কাব্যিক বাস্তবতার ধারণার' (পোয়েটিক নোশন অব রিয়ালিটি) অবয়ববিচার প্রয়োজন।" লোৎমন প্রত্যক্ষতা, ধারাবাহিকতা এবং ফর্মালিজমের সঙ্গে অবয়ববাদের সম্পর্ক মানলেন না। লোৎমনের ভাষায়, 'শিল্প হল স্বাভাবিক ভাষার প্রতিরূপ পদ্ধতি (মডেলিং সিস্টেম)। এর নিজস্ব ভাষা আছে।'

লোৎমনের বক্তব্যে একটা অসংগতি এবং দ্বৈধ বক্তব্যের আভাস আছে। একটি কৃতিকে প্রসঙ্গাচ্ছিন্ন সমগ্ররূপে বিচার করার কথা তিনি ভেবেছেন। অন্যদিকে কৃতির নিবিড়তাকে ছিন্ন করেছে, এমন উপাদান আলোচনার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন। একদিকে কৃতি অচিরস্থায়ী, অন্যদিকে ধারণাতত্ত্বের সাহায্যে অবয়ব নির্ণয়—এভাবে তাঁর তত্ত্বে বিমূর্ত ও মূর্ত অবয়বের বিরোধিতা চোখে পড়ে।

লোৎমন নিজেও এই স্ব-বিরোধিতার দায় এড়াতে শিল্পের 'অচিরস্থায়ী অর্থ'-এর কথা বলেছেন। যেমন, রুশোর জনগণকে তাঁর মানুষ-যুক্তি-নৈতিকতা এবং সমতাতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। লোৎমনের মতে শিল্প যদি 'অনন্ত জগতের প্রতিরূপ' হয়, তাহলে শিল্প নিশ্চয়ই তন্ময় বাস্তবতাকে প্রতিরূপদান করে। আবার প্রতিরূপ তার অচিরস্থায়ী নিয়মে বাঁধা বলে বাস্তবতাচ্ছিন্ন বলা যায় কি? বিশেষ করে প্রতিরূপ-অপেক্ষকের (মডেলিং ফাংশন) অর্থ তাঁর কাছে সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক-সামাজিক প্রসঙ্গ থেকে কৃতিকে স্বতন্ত্র করে দেখানো।

অনুভবের স্বতঃস্ফূর্ততা আর প্রতিরূপ অবয়বধারণার মাঝখানে একটা শূন্যতা বিরাজ করেছে। নিঃশব্দ শূন্যতা কখনও প্রিয় হলেও এখানে তা মারাত্মক। কেননা আমরা লোৎমনীয় দৃষ্টিতে তন্ময় জগতের প্রতিরূপ দেখতে গিয়ে দেখি পড়ে আছে নীরক্ত কাঠামো। অঙ্ক যাকে ছাড়পত্র দেয়, সৃজনশীল শিল্পে তার প্রবেশ নিষেধ হতে পারে। অবয়ববাদীরা এবং অঙ্ক-সংখ্যাতত্ত্বের দিকে ঝোঁকা সাহিত্য-আলোচকরা শিল্পে একটি বস্তুকে আমল দেননি, তা হল সৃজনশীল ব্যক্তির ভূমিকা। শিল্পী মানে তিনি জানবেন রচনা কেমন করে নির্মিত হয় এবং নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন মত বেছে নেবেন—এমন একটি দুঃসাধ্য তত্ত্বে তাঁরা পৌঁছেছিলেন।

তাই লোৎমনের তত্ত্বকে সরিয়ে রেখে অন্য একটি নব্য-অবয়ববাদী তত্ত্ব তৈরি হল। একে বলা যেতে পারে 'দৃষ্টিকোণের' (পয়েন্ট অব্ ভিউ) তত্ত্ব। আমেরিকান নব্য সমালোচক পার্শি লাবক, এম. শোরার, অ্যালান টেট এবং এন. ফ্রায়েডম্যান এভাবে সাহিত্যালোচনা করলেন। দৃষ্টিকোণের তত্ত্ব মানলে উপন্যাসের উপাদান সম্পর্কে কিছু মূল্যবান মন্তব্য আমরা পেতে পারি। কিন্তু অবয়ববাদী সাহিত্যবিচারে কৃতির অন্তরঙ্গ নিয়মের সঙ্গে দৃষ্টিকোণের সম্পর্ক মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। লোৎমন এই বিষচক্র থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুক্তি পাওয়া দূরে থাক, নিয়মের শৃঙ্খল তাঁকে আবার বন্দি করল।

লোৎমনের মতো রোলাঁ বার্তের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় একেবারে কম বললেই চলে।[৪] প্রতীচ্যে এমন নবীন সাহিত্যালোচক মেলা কঠিন। বার্তের রচনার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ যুক্তি এবং উপলব্ধিগুণ সবই আছে। কিন্তু তিনি তাঁর ভাবনার প্রকাশে খণ্ড রচনার পক্ষপাতী। কেননা, চিন্তার শিকলি নাকি অখণ্ড রচনায় ভাবনার বাধা সৃষ্টি করে। খণ্ড রচনার মধ্যেও কি সেই বাধার সৃষ্টি হয় না?

বার্ত ভাষা, শৈলী এবং লিখনের মধ্যে সীমানা টেনেছেন। নানা সর্বজনীন নিয়ম এবং অভ্যাসের যোগফল হল ভাষা। লেখকের জৈব অস্তিত্ব, অতীতের ছবি, বাগ্‌ভঙ্গি আর বিশেষ শব্দভাণ্ডার যখন শিল্পের স্বয়ংক্রিয়তায় (অটোমেশন) পরিণত হয়, তখন তা শৈলী হয়ে ওঠে। ভাষা আর শৈলীর মাঝখানে থাকে লিখন। ভাষা ও শৈলীতে লেখক স্বাধীন নন, লিখনে তিনি স্বাধীন।

বার্ত অন্যদের মতো দেশকালকে উপেক্ষা করলেন না। তিনি বললেন, লিখনের সঙ্গে সমাজের অভ্যন্তরীণ ইতিহাসের একটা সম্পর্ক আছে। সৃষ্টিশীল রচনায় বাচনিক সংস্থান করতে গিয়ে লেখক নিজের ও জগতের অবয়ব হারিয়ে ফেলেন। এখানে ‘লেখা’ এই ক্রিয়াটি অকর্মক। অন্যদিকে ‘লিখিয়ের’ কাছে এই ক্রিয়াটি সকর্মক। বচনের মাধ্যমে তিনি অভিজ্ঞতার সমর্থন বা ব্যাখ্যা করেন এবং শিক্ষাদান করেন। তিনি মনে করেন, তার বচন জগতের জ্ঞানান্ধকার দূর করবে। লেখক এবং লিখিয়ে—দুপক্ষই একটি সাধারণ লিখন নির্বাচন করেন। এইজন্য তাঁদের শৈলী বিচিত্র নয়। শুধু উপভাষা পার্থক্য সৃষ্টি করে। বার্তের কাছে উপভাষা হল মতবাদ বা জ্ঞানচর্চার বিষয় (প্রতীকবাদ, অস্তিত্ববাদ, ধর্ম ইত্যাদি)। এই কালে লেখক এবং লিখিয়ের পার্থক্য কমে যাচ্ছে। রচনাকার একসঙ্গে বিবেক এবং জনতার দায়িত্ব পালন করছেন। সমাজ এই সময় কোন্ ভূমিকা পালন করে? সমাজ সাহিত্যের জনমুখী চরিত্র দেখে পণ্যবস্তুরূপে কেনে। অথচ সমাজ লেখককে আপন করে না, তার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে। সমাজে লেখক বুদ্ধিজীবী হিসাবে প্রয়োজনীয়, অথচ সে ব্রাত্য।

বার্তের সাহিত্য-ভাষা-শৈলীর বিভাগ চমকপ্রদ, সন্দেহ নেই। তাঁর ভাষার সংজ্ঞায় আমরা একমত হলেও শৈলী ও কৃতির বিচারে আমরা আস্থাহীন। ভাষা যদি হয় আকাশের সীমানা, তাহলে রচনাকার সেই সীমানা ভেঙে কোথায় পৌঁছবেন? কোনো নবতর মহাকাশে অথবা দিগন্তে যেখানে সে পৃথিবীকে চুম্বন করে, সেই মাটির পৃথিবীতে? অথবা তিনি সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের খণ্ডাকাশ, পটাকাশ এবং ঘটাকাশের মতো বলতে চান যে, শৈলী ও কৃতি দুইই ভাষাকাশের প্রতিবিম্ব? আমরা যেমনভাবে তাদের দেখতে চাই, সেভাবেই উপলব্ধি করে থাকি।

রচয়িতাকে বুফোঁ যে নবমূল্য দিয়েছিলেন, এ যুগে তা অচল। রচয়িতার গুরুত্ব কমে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে, সত্যিকারের রচয়িতা আজ মৃত। আসলে সাহিত্যে লিখনের ঐশ্বর্য লেখকে নেই, আছে পঠন ও পাঠের মধ্যে। রচয়িতার কাজ হল প্রকরণ নিয়ে পরিশ্রম করা। আর ভাষা ব্যবহারে সেই পরিশ্রম করতে হবে।

বার্তও অবয়ববাদী। তিনি মনে করেন, সাহিত্যকৃতি হল ভাষাব্যবহার। তা সময় ও যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রচল অবয়বের মধ্যে এর তাৎপর্য অনুস্যূত হয়ে থাকে। সমালোচকের কাজ হল সাহিত্যকৃতির পুনর্বিন্যাস নয়, অবয়বতন্ত্রকে বিশদ করা। সমালোচক তাই এক অধিভাষার (মেটাল্যাংগুয়েজ) সৃষ্টি করেন। তা তার

আলোচনার বিষয়কে সংহত গাণিতিক পরিপূর্ণতা দেয়। গদ্যের ক্ষেত্রে শৈলীকে বিদায় জানালেও কবিতায় তিনি শৈলীকে অগ্রাহ্য করেননি। আধুনিক কবিতায় লিখনের অস্তিত্ব নেই, আছে শৈলী।

বার্ত অবয়ববাদী হলেও তাঁর প্রাথমিক তত্ত্ব থেকে সরে এসেছেন। ভাষাবিজ্ঞানীর মতো বার্তও আখ্যানের নিহিত শৃঙ্খলাপ্রণালীকে জানতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন, 'রচনাগুলি থেকে একটি বা কয়েকটি ছাঁদ বের করা দরকার। তাহলে ঐ ছাঁদের দিকে উঠে গিয়ে আবার অবরোহী পদ্ধতিতে সাহিত্যকৃতিতে নামা যাবে' (কণ্ঠস্বরের ফসল)। কিন্তু নিৎসে, লাকাঁ ও দেরিদা পড়ে তাঁর মনে হয়েছে, 'পুনরাবৃত্তি, বাঁধা ছক, সাংস্কৃতিক ও প্রতীকী বার্তাবিধির (কোড্) দ্বারা আবৃত হলেও প্রতিটি পাঠ্য তার স্বাতন্ত্র্যে অনন্য।' প্রতিটি রচনা যেমন অনন্য, তেমনি তার মধ্যে বহুত্বও আছে। বার্তের কাছে তাই শেষ পর্যন্ত বার্তাবিধির বয়ন (টেক্সচার অব্ কোড) গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বার্তের মত পুরোপুরি মানা যায় না। তিনি নিজেও তা অস্বীকার করেন। লেখক-পাঠক-সমাজের সম্পর্ক, লেখার সামাজিক মূল্যায়ন, সাহিত্যচিন্তায় ভোগসুখবাদ এবং সর্বোপরি রচনার বহুত্বগুণের মধ্যে অনন্যতার সন্ধান বার্তের সমালোচনাকে নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ভূমির অস্বীকারে এক সংকীর্ণ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

১.৮ ❑ অবয়ববাদ : প্রাগ-গোষ্ঠী

শ্কোলোভস্কি লেনিনের শৈলী আলোচনা করতে গিয়ে কতকগুলি গুরুতর কথা উচ্চারণ করেছিলেন :

১. স্থির গদ্যরূপ এবং প্রচল শৈলীর বিরুদ্ধে লেনিন সংগ্রাম করেছিলেন।

২. লেনিনের গদ্যশৈলী বুঝতে গেলে একে একটা প্রতিষ্ঠিত ঘটনারূপে ভাবা চলবে না, চলিত গদ্যশৈলী থেকে সরে আসা (শিফ্‌ট) রূপে দেখতে হবে।[৫]

স্বাভাবিকভাবে এই নূতন বিচারে ওপোয়াজের দুটি বক্তব্য প্রতিষ্ঠা পেল :

(ক) বিষয়ানুবন্ধতা (অটোম্যাটিজেশন) : বিষয়কে যথাযোগ্যরূপে এবং অভিপ্রেতভাবে প্রকাশের জন্য শৈলীকে সমর্থ করা (পবিত্র সরকার, ১৯৮৯, 'রীতি থেকে রীতিবিজ্ঞান', পৃ. ৫৯)।

(খ) বিস্ময়ীকরণ ('মেকিং স্ট্রেঞ্জ') : বিষয় থেকে স্বাধীনতার বোধ, লেখকের নিজস্ব শৈলীর আকর্ষণীয়তা।

প্রাগ-স্কুলের তাত্ত্বিকরা ওপোয়াজের এই দুটি সূত্র ধরে একটি আলোচকমহল গড়ে তোলেন। একে আমরা অবয়ববাদীদের প্রাগ-গোষ্ঠী (প্রাগ স্কুল অব্ স্ট্রাকচারালিস্টস্) নাম দিতে পারি। কবিতার শৈলী নিয়ে অন্যান্য অবয়ববাদীরা ততটা ভাবেননি। প্রাগ-গোষ্ঠী কবিতার ভাষা নিয়ে নানা ভাবনা ভাবলেন। প্রাগ-গোষ্ঠীর মতামত ছিল একান্তভাবে ভাষাবিজ্ঞান নির্ভর।

ভাষায় দুটি শৈলী থাকে—(১) সংপ্রেষক (কমিউনিকেটিভ), অন্যটি হল নান্দনিক (ঈস্‌থেটিক)। প্রথমটিতে মানুষের জ্ঞানসংবাদ জানানোর চেষ্টাই প্রধান। এই কাজ দুটি পদ্ধতিতে করা হয়—(১) স্পষ্টতাদান (ইনটেলেকচুয়ালাইজেশন) বা যুক্তিদান (র‍্যাশনালাইজেশন)। যুক্তি ও তত্ত্বের বিষয়কে স্পষ্টতা দেওয়ার জন্য ভাষার

শব্দকে সুনির্দিষ্ট এবং একার্থকরূপে ব্যবহার করা হয়। পূর্বে আলোচিত (ক) বিষয়ানুবন্ধতা হল দ্বিতীয় পদ্ধতি। এই দুইয়ে মিলে আমাদের সংপ্রেষণকর্মকে সহজ করে। সাধারণ কথা ও লেখায় স্পষ্টতা জরুরি নয়। বিষয়ানুবন্ধতা লাগে সংপ্রেষণকে স্পষ্টতা দিতে গেলে। এখানে বিষয়ের কাছে শৈলী নতজানু। অথচ শৈলী যখন নান্দনিক হয়ে ওঠে, তখন সে বিষয়ের পৃথিবী ছেড়ে স্বাধীন আকাশ চায়। এখানে শৈলী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

কিন্তু কীভাবে শৈলী এমন আকর্ষক রূপ লাভ করে? এটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাভ্রানেক একটি নূতন পদ্ধতির কল্পনা করলেন, তা হল প্রমুখণ (ফোরগ্রাউন্ডিং, পবিত্র সরকার; সম্প্রতি কেউ কেউ একে মঞ্চন নামে অভিহিত করতে চান)। কবিতা এবং সাহিত্যের কাজ হল প্রকাশ (এক্সপ্রেশন)। তাই ভাষা এখানে বিষয়কে ছাপিয়ে যায়। বাক্যের শরীর অর্থের চেয়ে বেশি মনোযোগ কাড়ে এই প্রমুখণে। সাহিত্যের সব শাখার মধ্যে কবিতায় প্রমুখিত অংশের সংখ্যা বেশি। তাই জাঁ মুকারোভস্কি বলেছেন :

> 'ইন পোয়েটিক ল্যাংগুয়েজ ফোরগ্রাউন্ডিং অ্যাচিভস্ ম্যাক্সিমাম ইনটেনসিটি টু দা এক্সটেন্ট অব্ পুশিং কমিউনিকেশন ইনটু দা ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাজ দা অবজেকটিভ অব্ এক্সপ্রেশন অ্যান্ড অব্ বিইয়িং ইউজ্‌ড্ ফর ইটস্ ওন সেক; ইট ইজ নট ইউজ্‌ড্ ইন দা সার্ভিসেজ অব্ কমিউনিকেশন, বাট ইন অর্ডার টু প্লেস ইন দা ফোরগ্রাউন্ড দা অ্যাক্ট অব্ এক্সপ্রেশন, দা অ্যাক্ট অব্ স্পীচ ইটসেলফ।'

(দা স্ট্যান্ডার্ড ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড পোয়েটিক ল্যাংগুয়েজ)

প্রমুখণ যদি হয় সাহিত্যের বিশেষত কবিতার মৌল ধর্ম, তাহলে তা কীভাবে করা হয়? প্রাগ-গোষ্ঠীর মতে, ভাষার আদর্শ-রূপ থেকে সরে আসাই (আ ডিভিয়েশন ফ্রম দা নর্ম) হল প্রমুখণ। ব্যাকরণে ভাষার আদর্শ-রূপের একটা আদল দেওয়া থাকে। এগুলি নিয়ম বলে নিয়ম ভাঙার সুযোগ নেই। এই নিয়মের বন্ধন প্রত্যেক লেখকই নিজের স্বভাবমতো ভাঙতে চান। মুক্তি চাইলে আর ব্যাকরণের প্রতিটি সিঁড়িতে পা পড়ে না, একটা নূতন চলন আসে।

তাই প্রমুখণ হল ভাষার আদর্শ-বলয় থেকে লেখকের সরে আসার প্রক্রিয়া। প্রতিদিনের কান্না-হাসির ছোঁয়া লাগা ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, খণ্ডবাক্য, প্রবাদ এভাবে কাব্যের সংসারে আলাদা ভাব পায়। বাংলায় 'নোনা' শব্দের প্রয়োগ এভাবে দেখা যেতে পারে। বিশেষ্যে এর অর্থ দুটি—১. আতাজাতীয় ফলবিশেষ, ২. মাটির লবণজাতীয় উপাদান। ক্রিয়ার অর্থ হল—মাটির লবণজাতীয় উপাদানের প্রতিক্রিয়া (নোনা লাগা)। বিশেষণ হলে হয় লবণাক্ত (নোনা জল)। কিন্তু জীবনানন্দের 'নোনা মেয়ে মানুষ' ব্যাখ্যা করব কীভাবে? নারীকে সংসারের পুরুষ হাত স্বাদহীনরূপে পরিণত করেছে। সাধারণ সংলাপে এভাবে 'নোনা' আসে না। এভাবেই শব্দটি কবিতায় প্রমুখিত (ফোরগ্রাউন্ডেড) হল।

এই সরে আসার সীমানা-সরহদ্দ কতটা? অনেক সময় ভাষার আদর্শরূপ থেকে সরে আসা নেই। অথচ একটা আলাদা সংগঠিত বাণীরূপ পাই। তাই কাব্যভাষা আদর্শ ভাষা বা মৌখিক ভাষার সমাহার ও বিন্যাসে ভাষানিয়ম ভেঙে ফেলবে, এমন আশা করা যায় না।

রোলাঁ বার্তের ধারণায় 'লিখনের শূন্যাঙ্ক' (জিরো ডিগ্রি অব্ রাইটিং) ছিল; প্রাগ-গোষ্ঠীর ধারণা এরই পূর্বসূরি। প্রথমে একটি রচনারীতি অভিনব, বিচ্যুত (ডেভিয়েটেড) এবং নান্দনিক থাকে। সাহিত্যে প্রচলন ঘটে

গেলে ঐ রীতি নান্দনিক কার্যাবলী থেকে সরে গিয়ে সংপ্রেষণের কাজেই ব্যবহৃত হয়। নান্দনিকতা এভাবেই বিদায় নেয়।

প্রাগ-গোষ্ঠীর এই প্রশ্নও ছিল যে, এই ভাষাকে কী চোখে দেখব। কাব্যভাষাকে যদি বলি সংগঠিত বাণী, তাহলে অবয়ববাদের প্রশ্ন আড়ালে থাকে না। শৈলীবিজ্ঞানের কাজ হল, সংস্থানের নীতিগুলো আবিষ্কার করে শৈলীবৈশিষ্ট্য দেখানো। 'লেভি স্ট্রোস অবয়ববাদের অন্য নাম' বাক্যটা একটু অত্যুক্তি হলেও তিনি নৃতাত্ত্বিক অবয়ববাদের সূত্র ট্রুবেৎসকয়, য়াকোবসনের মধ্যে পেয়েছিলেন। ট্রুবেৎসকয় স্ট্রোসকে আকর্ষণ করেছিলেন এই কারণে যে তিনি ভাষাবিজ্ঞানে পদ্ধতিগত অবয়ববাদ এবং সর্বজনীনবাদকে স্বীকার করে পরমাণুবাদকে খারিজ করেছিলেন। প্রাগের এই মহল ছিল ভাষাবিজ্ঞানের উপর একান্ত নির্ভরশীল। ভাষার উপাদানগত বিশ্লেষণসংস্থান এবং গতিশীলতা বিজ্ঞানের অন্য শাখায় অবয়ববাদীদের মনোযোগী করেছিল।

কিন্তু এইসব অবয়ববাদীরা ভাষাবিজ্ঞানের কোন্ পথ বেছেছিলেন? প্রতিটি ভাষাই যেহেতু অনন্য, সুনির্দিষ্ট এবং বিশেষ পদ্ধতিরূপ, তাই তাদের একক উপাদানকে একটা সম্পর্কের সূত্র ধরে চিনতে হবে। ধ্বনি, শব্দ, অর্থ এইভাবে ভাষার একেকটি একক (ইউনিট), আবার সকলে একটি জটিল সূত্রে জড়িত।

সাহিত্যের ভাষা তো সাধারণত ভাষিক ব্যাপার নয়। তাই অসাধারণ ভাষার মধ্যে সম্পর্কের সূত্র কীভাবে খুঁজব? এদের সম্পর্কিত অস্তিত্বের ধারণা জোনাথান কালারের মতে দুশ্রেণীর—বিয়োজক এবং সংযোজক (ডিসট্রিবিউশনাল, ইনট্রিগ্রেটিভ)। যেখানে উপাদানেরা একজাতীয় সেখানে সম্পর্ক হল—আন্বয়িক (সিনট্যাগমেটিক) এবং নির্বাচিত (প্যারাডিগমেটিক)। সব মিলিয়ে এই ধারণায় খণ্ড এবং অখণ্ডের কল্পনা আছে। অন্যদিকে খণ্ডের সঙ্গে খণ্ডের এবং খণ্ডের সঙ্গে অখণ্ডের একটি সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে।

অবয়ববাদের এই নব-ব্যাখ্যানে ব্যক্তিগত রুচির প্রভাব কমল। প্রচল সমালোচনার উচ্ছ্বাসভরা অস্পষ্ট উচ্চারণের বদলে এল সাহিত্যভাষাকে বোঝার কঠিন পরিশ্রমী আরোহী সিদ্ধান্তপ্রবণতা। ভাষাশৈলীর এই অবয়ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস এখানেই শেষ হল।

এরপর আমরা খুঁজতে চাই, শৈলীবিজ্ঞানের নানা মহল কী কী? আমরা এই দীর্ঘ আলোচনা এই কারণে করলাম যে শৈলী নিয়ে নানা দর্শন-প্রস্থান সক্রিয় ছিল। এই ভাবনা অখণ্ড নয়। আবার কালবিচারে এর মধ্যে পারম্পর্য সর্বত্র নেই। নানা চিন্তার টুকরো দর্শন ও ভাষাতত্ত্ব ঘিরে যে শৈলীকে খুঁজতে চেয়েছে, তারই একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আঁকার প্রয়াস করা হল এযাবৎ আলোচনা অংশে।

১.৯ ❑ শৈলীবিজ্ঞান : নানা মহল

শৈলীর অস্তিত্ব থাকলেও সংজ্ঞার মধ্যে তাকে ধরা যায়নি। শৈলীবিজ্ঞান এমনতরো সমস্যার মুখোমুখি করে না। কারণ হাজার বছরের শৈলী-আলোচনায় ব্যক্তিগত নানা দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে। আর শৈলীবিজ্ঞান ঐ হাজার বছরের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষাচর্চার পথ ধরে একটি ধারণাকে জানায়। জে. ডব্লিউ. টার্নার বলেন :

'লিংগুইস্টিক ইজ্ দা সায়েন্স অব্ ডেসক্রাইবিং ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড শোয়িং হাউ ইট ওয়র্কস; স্টাইলিস্টিক্স্ ইজ দ্যাট পার্ট অব লিংগুইস্টিকস হুইচ কনসেনট্রেটস্ অন ভেরিয়েশন ইন দা ইউজ অব্

লাংগুয়েজ, অফেন, বাট নট এক্সক্লুসিভলি, উইথ স্পেশাল অ্যাটেনশন টু দা মোস্ট কনশাস অ্যান্ড কমপ্লেক্স ইউজেস ইন লিটারেচার।'

(স্টাইলিস্টিক্‌স্, পৃ. ৭)

স্টাইলিস্টিক্‌স্ বা শৈলীবিজ্ঞানে শৈলীর চর্চা করা হয়। এই চর্চা বৈজ্ঞানিক অথবা পদ্ধতিগত (মেথডোলজিক্যাল) হতে পারে। যেহেতু এটি ভাষার (সাহিত্যভাষা) চর্চা, তাই ভাষাবিজ্ঞানকে আলোচনার আওতা থেকে বাদ দেওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে মনে, সফল সমালোচনা করতে গেলে সাহিত্যকে ভাষানির্মিতিরূপে দেখব না সমগ্র কল্পনার মূর্তিরূপে দেখব। কেননা অনেক সময় ভাষার নিয়ম মেনেও একটি রচনা নূতন আবেদন জানাতে পারে। এখানে একটা সমগ্র অবয়বকল্পনা আছে, ভাষাও যার মধ্যে পড়ে।

শৈলী শব্দটির অর্থ হল ভাষাবৈজ্ঞানিক রূপান্তরকর্ম (যা কৃতি ও পরিস্থিতির উপলক্ষকে যুক্ত করে)। লিংগুইস্টিক স্টাইলিস্টিক্‌স্ (বা স্টাইলো-লিংগুস্টিকস্) সেই শৈলীবিজ্ঞান যা ভাষাবৈজ্ঞানিক ধারণার সাহায্যে উদ্দীপকদের আবিষ্কার ও বর্ণনের কাজ করে। ভাষাবৈজ্ঞানিক ধারণাকে শৈলীবিজ্ঞানের লক্ষ্য ছাড়িয়ে যেতে পারে। অবয়ববাদী, সাহিত্যিক ও ইতিহাসমুখীভাবে একটি কৃতি বা ভাষার চর্চাও তার লক্ষ্য হতে পারে।

শৈলীবিজ্ঞানের এই ভাষাবৈজ্ঞানিক মহলের কয়েকটি তত্ত্ব এখানে উপস্থিত করা হচ্ছে :

১. দুটি রচনায় যদি ভাষার উপাদানের ঘনত্বের (ডেনসিটি) বেশি ফারাক দেখা যায়, তাহলে সেইসব বৈশিষ্ট্যকে শৈলীবৈশিষ্ট্য (স্টাইল মার্কারস্) বলতে পারি। এই দুটি রচনার একটি হল কৃতি, অন্যটি হল আদর্শ ভাষারূপ (স্ট্যান্ডার্ড ল্যাংগুয়েজ নর্ম)। আদর্শ ভাষারূপ হল যেসব রচনার সঙ্গে আমরা কৃতির তুলনা করি। যদি কৃতি ও আদর্শ ভাষারূপের বৈশিষ্ট্যের ঘনত্বের পার্থক্য কম হয়, তাহলে তাকে বলব শৈলীগতভাবে স্বাভাবিক (আনমার্কড্ অর্ নিউটারাল)। কিন্তু এই তৌলনকর্ম এবং বিচারে পরস্পরবিরোধিতা দেখা যায়। কেননা বিভিন্ন আলোচক কৃতিকে নানা আদর্শ ভাষারূপের সঙ্গে মেলাতে চাইতে পারেন। তখন শৈলীবৈশিষ্ট্যের বিভাজন অর্থহীন হয়ে পড়ে।

২. ভাষাবিজ্ঞানে সাহিত্যপ্রথা নিজের জোরে প্রবেশ করতে পারে। কেননা কৃতির সঙ্গে আদর্শ ভাষারূপের তুলনার ক্ষেত্রে প্রসঙ্গবিচারে তারা অংশীদার। তাই ভাষাবিজ্ঞান, শৈলীবিজ্ঞান ও সাহিত্যালোচনার পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন।

৩. আমরা শৈলীবিজ্ঞানের টার্নার-কৃত সংজ্ঞায় আস্থা রেখে একে ভাষাবিজ্ঞানের উপ-শাখাও ভাবতে পারি। সাহিত্যকৃতির বৈচিত্র্যবিচার এর একটি অনুসন্ধান-কর্ম হতে পারে। সাহিত্যালোচনার উপশাখারূপে একে ভাবা যায়, যেখানে ভাষাবিজ্ঞান মাঝে মাঝে অবলম্বন করা হয়। একে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি ভাবা যায় যেখানে প্রয়োজনে ভাষাবিজ্ঞান এবং সাহিত্যালোচনার শরণ নেওয়া যায়।

এদের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে ভালো, এমন বলা যায় না। তিনটিরই দোষ-গুণ আছে। এমন হতে পারে যে, একটির প্রয়োজন কখনও অন্যের তুলনায় সুফল দেয়। শৈলীকে ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যরূপে ভাবা আর সাহিত্যের কারণে (লিটারারি কজ) একটি রচনার শৈলী বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। শৈলী-ভাষাবিজ্ঞানের পাশে সাহিত্যিক শৈলীবিজ্ঞানের নানা ভঙ্গির কথা আমরা আগের আলোচনায় ধরার চেষ্টা করেছি।

৪. ব্যাকরণের পথে শৈলীব্যাখ্যার সুবিধা এবং অসুবিধা দুইই আছে। সোস্যুরের লাং বা পারোল কিংবা চোমস্কীয় কম্পিটেন্স ও পারফর্মেন্স—এই দুটি তত্ত্ব একটি জায়গায় একমত। তা হল ভাষার নিয়ম-বাঁধা পদ্ধতি

এবং ভাষার বিশাল প্রয়োগবৈচিত্র্য। আমরা যদি প্রচল ব্যাকরণের মধ্যে শৈলীকে আনি, তাহলে প্রথমে আমাদের নিয়মগুলোর শৈলীবৈজ্ঞানিক উপযোগিতা স্থির করতে হবে। তাহলে দেখব যে, দু-ধরনের শৈলীব্যাকরণগত নিয়ম সৃষ্টি হচ্ছে—(১) সুনিশ্চিত (ক্যাটাগরিক্যাল), (২) পরিবর্তক (ভেরিয়েবল)।

এবার একটি সমস্যা আসে। মুকুন্দরাম, মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের শৈলীকে কি বাংলা ভাষার উপশাখারূপে ভাবব, না তাদের আলাদা ভাষার ব্যাকরণরূপে চিহ্নিত করব? এখানে ব্যাকরণের নিয়ম কাজে লাগে না। যদি আমরা এদের জন্য তিনটে ব্যাকরণ আলাদা করে লিখি, তাহলে ব্যাখ্যান অমিতব্যয়ী হবে। কেননা অনেক মন্তব্য বারবার বা পৌনঃপুনিকভাবে স্থান করে নেবে। এভাবে শৈলী-আলোচনা এক কঠিন, অবাস্তব বস্তুকর্মের অভিজ্ঞান হয়ে দাঁড়াবে। আমরা তাহলে এমন একটা ব্যাকরণ লিখি না কেন, যেখানে মৌলিক, শৈলীবিজ্ঞাননিরপেক্ষ জ্ঞান পরিবেশিত হবে (যাকে বলা যায় শূন্যাঙ্কের ব্যাকরণ)? সেখানে শৈলীবিজ্ঞাননিরপেক্ষ এবং শৈলীবিজ্ঞানঘেঁষা আলোচনা থাকবে। কিন্তু প্রথম তিনটি ব্যাকরণ লেখার চেয়ে এই কাজ আরও দুরূহ।

৫. শৈলীর ব্যাকরণ লিখলে তাতে শৈলীবৈজ্ঞানিক তথ্য কতটা প্রয়োজনীয়, তাও ভাবা দরকার। আমরা কি সবচেয়ে গুরুতর শৈলীবৈজ্ঞানিক স্তর বাছব না অনেক শৈলীর আলোচনা সাজাব? এভাবে শৈলীর সংখ্যা অনন্ত হয়ে দাঁড়ায়। সবচেয়ে বড়ো কথা, এইসব নিয়মগুলি কেমন হবে। সেখানে উপলক্ষের মানক এবং নিয়মের প্রয়োগকুশলতা বড়ো হবে।

১.১০ ❑ উপলক্ষের মানক (কনটেক্সট প্যারামিটার)

আরিস্টটল বলেছিলেন যে, প্রতিটি অলংকারের নিজস্ব উপযুক্ত শৈলী আছে; কথ্য ও লেখ্য শৈলী আলাদা। আগে আমরা বলেছিলাম যে, শৈলীর সীমান্ত এখানে অস্পষ্ট; তার মেলামেশার বিন্দুটি অব্যাখ্যাত রইল। তাই উপলক্ষের স্থির তালিকা মানে শৈলীরও স্থির তালিকা বোঝায়। কিন্তু সমাজে উপলক্ষের মানক অনেক জটিলতম বলে শৈলীর মানক জটিলতা পায়।

উপলক্ষের শ্রেণীবিচারে দেখতে হবে কোন্‌গুলি শৈলীবিজ্ঞানিকভাবে প্রয়োজনীয় আর কোন্‌গুলি অতিরেক বা অপ্রয়োজনীয় (রিডানডেন্ট)। একংভিস্ট-স্পেন্সার-গ্রেগরী তাঁদের 'লিংগুইস্টিকস্ অ্যান্ড স্টাইল' (১৯৬৪) গ্রন্থে উপলক্ষ-বৈশিষ্ট্যের বিস্তৃত তালিকা দিয়েছিলেন :

কৃতিগত উপলক্ষ

ভাষাবৈজ্ঞানিক কাঠামো :

ধ্বনি (স্বরের মাত্রা) উপলক্ষ

ধ্বনিতা উপলক্ষ

রূপগত (মেয়েটি যায়/সে গিয়েছিল/সে যাবে) উপলক্ষ

অন্বয়গত (বাক্যের দৈর্ঘ্য এবং জটিলতা) উপলক্ষ

শাব্দিক উপলক্ষ,

যতিচিহ্নাবলী।

রচনাগত কাঠামো :

সময়

উক্তি, সাহিত্যিক প্রকৃতি, বিষয়ের শ্রেণী;

বক্তা/লেখক

শ্রোতা/পাঠক

বক্তা/শ্রোতা, লেখক/পাঠকের সম্পর্ক (লিঙ্গ, বয়স, পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা, শিক্ষা, সামাজিক শ্রেণী, ও মর্যাদার স্তর, সমজাতীয় অভিজ্ঞতার সূত্রে বিচার্য)

পরিস্থিতি ও পরিবেশ প্রসঙ্গ :

অঙ্গভঙ্গি ও শারীরিক ক্রিয়া

উপভাষা ও ভাষা

এছাড়া একটি কৃতিকে তার যথার্থ ঐতিহাসিক ও ঔপভাষিক পরিবেশে দেখতে হবে। তারপর তিনটি উপলক্ষ-মানকের (কার্যক্ষেত্র, ধরন এবং উদাত্ত সুর) দৃষ্টিতে দেখতে হবে। কার্যক্ষেত্র (ফীল্ড) হল প্রসঙ্গের সঙ্গে কথোপকথনের যোগ। দীর্ঘ কৃতিতে কার্যক্ষেত্র বদলায়। উপন্যাসে লেখক অনেক কার্যক্ষেত্র নির্মাণ করেন। ধরন (মোড) বলতে তাঁরা কথ্য ও লেখ্য কথোপকথনের ফারাক বুঝিয়েছেন। ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার স্বাভাবিক উক্তির একটা বিভ্রম তৈরি করেন। লিখিত ও অলিখিত উক্তির পার্থক্যও দেখতে হবে। উদাত্ত সুর (টেনর) হল বক্তা-লেখকের সঙ্গে শ্রোতা-পাঠকের আনুষ্ঠানিকতার সম্পর্ক। এদের বক্তব্যে উপলক্ষ-বিভাগের সঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক ধারণা জড়িয়ে আছে।

ক্রীস্টাল ও ডেভি পরিস্থিতিগত নিয়ন্ত্রকের (সিচুয়েশনাল কনস্ট্রেইন্ট) একটি পদ্ধতি লক্ষ করেছেন :

১. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

উপভাষা

কাল

২. কথোপকথন :

ক. (সরল/জটিল) মাধ্যম (বাচন, লেখন)

খ. (সরল/জটিল) অংশগ্রহণ (একোক্তি, সংলাপ)

৩. কোনো পেশাগত, বৃত্তিগত কাজ বা বিদ্যার সঙ্গে সম্বন্ধ (প্রভিন্স),

সামাজিক স্তর (স্ট্যাটাস) এবং উদ্দেশ্য (মোডালিটি)

সংপ্রেষণের রূপ ও মাধ্যম (চিরকুট, পোস্টকার্ড, টেলিগ্রাম, প্রতিবেদন, বক্তৃতা ইত্যাদি)

অভাষিক (নন-ভার্বাল) সাময়িক ও ব্যক্তিগত মুদ্রাদোষ (সিংগুলারিটি)

ভিনোগ্রাদফ এবং কস্টোমারফ ১৯৬৭ নাগাদ এই অপেক্ষক-বিন্যাসকে অস্বীকার করে পাঁচটি যুগ্ম-বৈপরীত্যের (বাইনারি অপোজিশন) শ্রেণী ভেবেছিলেন। এগুলি হল :

১. সংপ্রেষণের মাধ্যম—বাচন, লিখন, অঙ্গাভঙ্গি

২. সঙ্গীর উপস্থিতি/অনুপস্থিতি

৩. তথ্যের একমুখী/দ্বিমুখী প্রবাহ

৪. ব্যক্তিগত/সমষ্টিগত সংপ্রেষণ

৫. নৈকট্য/দূরগত সংপ্রেষণ।

এই পাঁচটির সম্ভাব্য সমাহার হল বত্রিশটি।

মানকগুলোর আরও স্পষ্ট সংজ্ঞা চাই, একথা এংকভিস্ট বলেছিলেন। যেমন, দুজন উকিল চায়ের দোকানে আড্ডা মারলে তাদের কথাবার্তা আইনঘেঁষা হবে না। অর্থাৎ আইনের কথাবার্তাকে এখানে আনুষ্ঠানিক রীতি (ফর্মাল টাইপ) মনে করছি। বৈশিষ্ট্য আলোচনার সময় এই আনুষ্ঠানিক এবং তার অতিরেক বিবেচনা করা দরকার। সংস্কৃতির আসরে এই উপলক্ষ মানকগুলির বিচলন এবং বিমিশ্রণ লক্ষ করি। কোথাও কোথাও ব্যক্তিগত মুদ্রাদোষকে মান্য বা উৎসাহিত করা হয়।

৬. তাই শৈলীর ব্যাকরণ লেখার প্রধান বাধা উপলক্ষ। কেননা ভাষাবিজ্ঞানের পথে উপলক্ষ নির্দেশ করলেও জাতি-দেশ-কালগত সংস্কৃতির বিভিন্নতাকে উপেক্ষা করা যায় না। ভিনোগ্রাদফের মত এই ব্যাপারে অনেক বেশি গ্রহণীয়। কিন্তু সংপ্রেষণকর্মের আরও গভীর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ভাষিক সংপ্রেষণের একটা তাত্ত্বিক শিকড় খোঁজা হলেও অবাচিক বা অঙ্গাভঙ্গির সংপ্রেষণ (জেশ্চার ল্যাংগুয়েজ বা ফেটিক কমিউনিকেশন) নিয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্যে আলোচনা ভীষণ কম। আবার অ-বাচিক বলে গোঁড়া ভাষাবিজ্ঞানীরা একে ভাষার অন্দরমহলে স্থান দিতে এখনও অরাজি (কিংবা নিমরাজি বলতে পারি)।

৭. এ বিষয়ে রূপান্তরী ব্যাকরণ (ট্রান্সফর্মেশনাল গ্রামার) পিছিয়ে নেই। রিচার্ড ওহ্‌মান বীজ-বাক্যগুলির (কার্নেল সেন্টেন্স) পুনর্নির্মাণ করলেন। এর মধ্যে স্বেচ্ছামূলক (অপশন্যাল) রূপান্তরগুলির তালিকা গণনা করে বীজ-বাক্য ও কৃতির উপরিতলের (সারফেস স্ট্রাকচার) ব্যাখ্যান করলেন। ফকনার, হেমিংওয়ে, লরেন্স, হেনরী জেমসের শৈলী বিচার করে তিনি দেখালেন যে, পৌনঃপুনিকতার ছাঁদে প্রত্যেক লেখক বিশেষ স্বেচ্ছামূলক রূপান্তর ব্যবহার করেন। এই রূপান্তরগুলিকে বহিরঙ্গ এবং স্পষ্ট শৈলীচিহ্ন বলতে পারি। চোমস্কি এবং ষাটের দশকের রূপান্তরী ব্যাকরণ আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছে। আদর্শরূপ বহু সময় জটিলতা আনে। তাই শৈলীবিজ্ঞানের প্রয়োগকারী নিজের প্রয়োজনমত ব্যাকরণ-আদর্শ অনুসরণ করবেন।

৮. এম. এ. কে. হ্যালিডে এবং আরও অনেকে প্রণালীবদ্ধ ব্যাকরণ (সিস্টেমিক গ্রামার) ভেবেছেন। ভাষা চারটি স্তরে সক্রিয়তা দেখায় : একক, অবয়ব, শ্রেণী, প্রণালী। একক দিয়ে. গঠিত অবয়বকে প্রণালীবদ্ধভাবে ব্যাখ্যানই তাঁদের অন্বিষ্ট। একে বলা যায় প্রণালীর প্রণালী। হ্যালিডের এই তত্ত্বে ক্রম (স্কেল) এবং নির্বাচনও (চয়েস) উপেক্ষিত নয়। নির্বাচনের সম্পর্কের আবার উপ-প্রণালী আছে। রূপান্তরী ব্যাকরণের চেয়ে এতে সুবিধা হল, উপপ্রণালীগুলিকে লক্ষ করা যায়।

৯. কৃতির জটিলতা এবং পাঠযোগ্যতা (কমপ্লেকসিটি অ্যান্ড রিডেবিলিটি) মিলার ও কোলম্যানের কাছে উল্লেখ্য শৈলীবৈশিষ্ট্যরূপে বিবেচিত হয়েছে।

এই দুটি বিষয় তাঁরা এভাবে আলোচনা করেছেন :

ক. শব্দভাণ্ডারের সহজতা ও কাঠিন্য

খ. বাক্যাংশ বা বাক্যগঠনের সহজতা ও কাঠিন্য

গ. অন্তর্বাক্যের সংগতি ও যোজনার ছাঁদ

ঘ. উল্লেখ (অ্যালিউশন), অলংকারের প্রকৃতি ও ঘনত্ব

১০. শৈলীভাষাবিজ্ঞানের প্রতিরূপ হিসাবে এরিক এংকভিস্ট তাই পাঁচটি প্রয়োজনকে চিহ্নিত করেছেন :

ক. পরিবর্তক এবং উপলক্ষের আলোচনা করতে হবে।

খ. প্রতিরূপে সংগতি থাকবে।

গ. প্রতিরূপকে পর্যাপ্ত (অ্যাডিকোয়েট) ব্যাখ্যাযোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

ঘ. নির্দিষ্ট এবং সম্ভাব্য নিয়মগুলি স্থান পাবে।

ঙ. প্রয়োগগতভাবে বাস্তব এবং স্পষ্ট সংজ্ঞাধারণা থাকবে।

যতক্ষণ না আমরা মূল ভাষা-অংশে শৈলীবিজ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছি, ততক্ষণ কোনো সমস্যা নেই। একটি পদ্ধতিকে কঠোরভাবে গ্রহণ করা এখনও ভাষাবিজ্ঞানে যায় না। একে বলা যায় বিজ্ঞানেরই অসুবিধা। কাজেই একটি পদ্ধতি শৈলীভাষাবিজ্ঞানে অনেক সময় মামুলি ব্যবহারে পরিণত হতে পারে।

এই পদ্ধতির প্রয়োগে কেউ কেউ সংখ্যাতত্ত্বের উপর নির্ভর করতে চান। কিন্তু ভাষিক এবং উপলক্ষনির্ভর নানা উপাদানের সংখ্যা সবসময় সংখ্যাতাত্ত্বিক সাধারণীকরণে সাহায্য করে না। শব্দের সংখ্যাগণনা বিপুল পরিশ্রমের সাক্ষ্য বহন করলেও একটি বস্তুর সাহিত্য-মাধ্যমরূপে বিচার অস্পষ্ট হয়ে যায়। পাঠকও ক্লান্ত হন আলোচকের বৈজ্ঞানিক মানসিকতায়। আর যে গুণে এক রচনা সাহিত্য হল তা অনালোচিত থেকে যায়। এদের সাহায্যে যন্ত্রগণক এবং সংখ্যাতত্ত্ব সক্রিয় থাকলেও সাহিত্য-পাঠকের মনে তা অক্রিয় থেকে যায়।

১.১১ ❑ আমাদের মতামত : নূতন পথ

শৈলীবিজ্ঞানকে একান্তভাবে ভাষাবিজ্ঞাননির্ভর আলোচনার অনুগামী করার বাধা এক নয়, অনেক। আমরা সব কিছুকে যথাযথ, সংক্ষিপ্ত এবং বৈজ্ঞানিক করার কুসংস্কারে ভুগি। বিজ্ঞানীর সত্য যদি অভ্রান্ত এবং শেষ কথা না হয়, তবে শৈলীবিজ্ঞানকে চূড়ান্তরূপে একবর্গীয় করে দেখার মধ্যে একটা ভ্রান্তির দর্শন আছে। কেননা আমরা জানি, শুধু বাচিক নয়, অ-বাচিক মানবীয় আচরণেও শৈলী আছে। এই ভাষাতিরিক্ত আচরণ অনেক সময় বক্তা বা লেখকের বিশেষ সামাজিক শ্রেণী, সংকেত-ভাষারূপ ব্যাখ্যা করে দেয়। অনেক সময় নীরবতা একটি রচনা বা কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। চারপাশের জনতার কোলাহলে যে ব্যক্তি বধির, নির্বাক কিংবা অন্ধ, তার আচরণের বিশেষ ভূমিকা আছে। লেখককে শৈলী নির্বাচন করতে গিয়ে এর কথাও মনে রাখতে হয়। কবিতায়

মাঝে মাঝে এমন ফাঁক থাকে, যার সম্পর্কে 'নিঃশব্দের তর্জনী' কথাটি খাটে। এই শূন্যতার পূরণে পাঠককে সচেতন করার তাগিদ কবির থাকে। কিন্তু এর ব্যাখ্যা ভাষাবিজ্ঞানে মেলে না।

আবার অবয়বগত কয়েকটি দিক এই শৈলীভাষাবিজ্ঞানে বিশেষ আলোচিত নয়। যেমন, বাক্যের পরম্পরা তাঁরা মানেন। কিন্তু এই পরম্পরা সাজানোর কৌশল (সমান্তরালতা, বিপ্রতীপ, অনুচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, অধ্যায়) একেকজন লেখকের ক্ষেত্রে একেকরকম। কয়েকজন আবার অনুচ্ছেদ-পরিচ্ছেদ-অধ্যায় সাজানোর ব্যাপারে ছাপার সুবিধা-অসুবিধা কিংবা ভুলের কথাও তোলেন। কিন্তু দুটি বাক্যে অনুচ্ছেদ আর ত্রিশটি বাক্যে অনুচ্ছেদ সাজানোর দায়িত্ব কি একা মুদ্রক নেন? 'লিপিকা'র মুদ্রণপ্রমাদ ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার পরিবর্তন চাননি। ঐ মুদ্রণপ্রমাদের ফলে বাংলায় কাব্যশৈলীর একটি নূতন রূপ দেখা দিয়েছিল, এমনকি রবীন্দ্র-সাহিত্যেও। মাঝে মাঝে লেখক পরিচ্ছেদ না এনে অনুচ্ছেদের মধ্যে পরিচ্ছেদের মতো সময়, ঘটনাস্থলকে পালটে একটা বৈচিত্র্য আনেন। পাঠক সচেতনভাবে বোঝে কাহিনি, চরিত্র এবং সময়ের মোড় ফিরছে। একে পরিচ্ছেদ বলতে পারি না, উপ-পরিচ্ছেদ (সাব-চ্যাপ্টার) বলতে পারি। এই ধারণার বিস্তার ভাষাবিজ্ঞানের সাধ্যের বাইরে।

কখনও কখনও একটি রচনায় দুটি কাল বহমান থাকে। লেখক এই স্রোতকে দুভাবে দেখেন—প্রকৃত (রিয়াল টাইম), আপাত (অ্যাপারেন্ট)। বাইরের দিক থেকে চেতনাপ্রবাহ বা কথনরীতিতে কয়েক ঘণ্টা বা দিনের হিসাব পাই। অথচ অন্তরঙ্গে দেখি একটি মানুষের দীর্ঘকালীন সময় স্থান পেয়েছে। এর প্রথমটি আপাত, দ্বিতীয়টি হল প্রকৃত। শৈলীভাষাবিজ্ঞানীরা সময়কে তাদের মানক তালিকায় উল্লেখ করলেও এই বিভাজনে যে শৈলীর রকমফের হয়, সে বিষয়ে নীরব।

এইসব বিষয় কি শৈলী-অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য? আমাদের তা মনে হয় না। কেননা একটি কৃতির বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গে ছড়ানো এইসব বৈশিষ্ট্যের স্তর আলোচনা করলে কৃতি ও লেখকমনের প্রতি সুবিচার করা হয়। একটি কৃতিতে কত ভাবনার জট মেলা আছে, তার হদিশ কি শৈলীবিজ্ঞানী নেবেন না? রোলাঁ বার্তের তত্ত্ব পুরোটা মেনে নিতে পারি না। কিন্তু লেখক-পাঠকের সংপ্রেষণকর্মের এসব জটিলতার সন্ধান এযাবৎ করা হয়নি। উপন্যাসের মতো সবচেয়ে জটিল সাহিত্যরূপ কিংবা নাটকের মতো বিমিশ্র (কম্পোজিট) রূপকর্মে লেখকের প্রকাশকৌশল বিচিত্র হয়ে থাকে। এমনকি একজন লেখকের একটি কৃতিতে ভাষাতিরিক্ত উপাদানগুলির সমাহার-বিন্যাস লক্ষ করা দরকার। গভীরভাবে এই সমাহার-বিন্যাসের অভিনবত্ব একজন বিশেষ লেখকের ক্ষেত্রে একইরকম নাও হতে পারে। তিনি বিষয়-প্রকরণের একরৈখিক বিন্যাস রচনা করেন না। করলে তাঁর লেখার পাঠক এক দশক অবধি সংগৃহীত হয়। পরে ঐতিহাসিক গুরুত্বে তিনি আলোচিত হন। এঁরা লেখক বটে, রচয়িতা নন। নানা প্রাতিষ্ঠানিক দাক্ষিণ্যে এঁরা বিকশিত হন। শিল্পগুণের নির্মিতির চাবিকাঠি এঁদের হাতে থাকে না। এঁদের রচনায় কল্পনার স্ফুরণ নেই, আছে প্রকাশহীনতার ছাপ।

প্রসঙ্গ (সাবজেক্ট ম্যাটার) প্রথম দিকের কিছু শৈলীভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টি কাড়লেও পরে তাঁরা সকলেই ভাষিক দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। অথচ লেখক কী প্রকাশ করতে চান অথবা তাঁর সংপ্রেষণের বিষয়ভূমি কী, এই বোধ স্পষ্ট না হলে অবয়বের সমগ্রধারণা বিনষ্ট হয়ে যায়। লেখক কীভাবে এবং কী বলেন—দুটোই সমান জরুরি।

এই বিষয়ধারণা প্রচলিত সাহিত্যালোচকরা যে ভালোভাবে আয়ত্ত করেছিলেন, তাও বলা যায় না। একটি সামাজিক শ্রেণির একটি চরিত্রকে নিয়ে লিখলেই যে শ্রেণিসাহিত্য বা সামাজিক সাহিত্য (ক্লাশ অর সোস্যাল লিটরেচর) গড়ে ওঠে না, এ কথা তাঁরা বোঝেন নি। এ কথা না বুঝে কখনও জাতিবিচারের ঝোঁকে, কখনও 'দলীয় ভক্তির অদ্ভুত দৈবে' চরিত্রকেন্দ্রিক রচনাকে সামাজিক আখ্যা দিয়েছেন। আবার সমাজের সমস্যা থাকলেও একটি পরিবারের বিশেষ গড়নে তা পারিবারিক হয়ে ওঠে। এই সামান্য ব্যাপারটি প্রচল সাহিত্যালোচনায় অনেক সময় একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত টানতে বাধ্য করেছে মাঝারি মাপের আলোচকদের।

একটি স্থানীয় বা আঞ্চলিক মানবজীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে উপভাষার বোধ লেখকের থাকা প্রয়োজন। কিন্তু উপভাষী অঞ্চলের ছবি রচনা স্থানীয় রং (লোকাল কালার) ব্যবহার করতে গিয়ে উপভাষা রচনার ক্ষতি করে। সংপ্রেষণকর্ম সেখানে উপলব্যথিতগতিতে চলে। উপভাষাকে যে আদর্শ চলিত পাঠকের কাছে পাঠযোগ্য করতে হবে এ কথা তাঁরা ভুলে যান। রচনাটি উপভাষাপ্রয়োগের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। লেখক আবার পাঠককে বোঝানোর জন্য সংখ্যা বা তারকাচিহ্ন যোগ করে পাদটীকা লেখেন। আমরা কবিতা বা রচনাটি পড়তে চাই, উপভাষী মানুষদের জানতে চাই—এই কৌতূহলকে পদে পদে উপভাষাশব্দাবলি বাধাদান করে। তাই উপভাষা প্রয়োগের একটা মাত্রা থাকা উচিত। নইলে তা উপভাষী মানুষের হৃদয়সংবাদ হলেও ব্যাপক পাঠকের কাছে নির্দয়সংবাদ। এই মাত্রাজ্ঞান ভাষিক হলেও সামাজিক। অর্থাৎ শৈলীবিজ্ঞানীকে ভাষার সামাজিক ব্যাকরণজ্ঞান অর্জন করতে হবে।

কখনও লেখক একটি রচনায় আদর্শ ভাষারূপ থেকে শুধু সরেই আসেন না, বহু দূরে চলে যান। বাইরের দিক থেকে ভাষার ঠাট বজায় থাকলেও তার বৈপরীত্যবোধ এবং নিয়মভঙ্গ আমাদের ভাবায়। আমরা নিয়ম গড়তে চাই। এখানে দুর্বোধ্যতার প্রশ্ন আসে। আগে-বলা উপভাষা বা প্রাচীন ভাষাসূত্রে আসা এই বিশেষত্ব কি লেখকের ইচ্ছাকৃত না তার মন ও মননে কোথাও এর বীজ ছিল? লেখক কি প্রচলিত ভাষাবিন্যাসে তার বক্তব্য ফোটাতে পারবেন না বলে মনে করেন? তিনি কেন গূঢ়-ভাষার (এস্টোরিক ল্যাংগুয়েজ) আশ্রয় নেন? এই আশ্রয় নেওয়ার কারণ কি ঐতিহ্যচেতনার সঙ্গে ইচ্ছাকৃত সংযোগহীনতা? ব্যক্তিবচনে এইসব রচনা, কবিতা দীপ্ত হলেও এই নৈরাজ্য, শব্দার্থের বিশৃঙ্খলাকে লেখক কতদূর আঁকড়ে থাকতে পারেন, সেটা দেখা প্রয়োজন। আধুনিক কবিদের মধ্যে এই প্রবণতা চরমে উঠেছে। অথচ লক্ষ করি এই দুর্বোধ্যতার চীনা দেওয়াল ভেঙে মুক্ত প্রান্তরের ভাষা তাঁদের অজানা ছিল না। রচয়িতার এই দুর্বোধ্যতাকে সত্যরূপে শৈলীবিজ্ঞানী বিচার করবেন। একটা অসম্ভব ঘটনাকে এঁরা অনেক সম্ভব করেছেন। ঐ দুর্বোধ্যতার মধ্যে ক্রিয়া-প্রবাদের লৌকিক বুনোট ছড়িয়ে আছে। এই বুনোটটির ব্যাখ্যান প্রয়োজন।

প্রাচীন কাব্যকে একালের মতো করে বলার কাজ সাহিত্যের একটি প্রজাতি (জঁর) গড়ে তুলেছে। এই ক্ষেত্রে পুনর্নির্মাণের প্রশ্ন আসে। অথচ এর প্রকৃতি একমাত্রিক নয়। একালীন অনুবাদক বা অনুসারক সবসময় ই. ভি. রিউর বলা 'সম প্রভাব নীতি' (ইকুয়াল এফেক্ট থিওরী) মেনে চলেন না। বরং বলা ভালো মানা যায় না। প্রাচীনকালে কাব্যটি পাঠকদের যেভাবে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল, একালে তেমনভাবে প্রভাবিত করবে কী করে? শুধু সম? এখানে বদলায়নি, মানসিকতা-কাব্যপুরুষের ভেদ ঘটে গেছে। তাই প্রাচীনের অনুবাদের

অনেকগুলো পথ দেখি—মূলের অনুসরণ (বাচিক বা ছন্দগত), মূলের সঙ্গে সংযোজন, মূলের রূপান্তর। প্রথম কাজটি কঠিন। একালীন ভাষায় লিপ্যন্তরকর্ম একটা আড়ষ্ট, অস্পষ্ট রচনার জন্ম দেয়। সংযোজনে আর কিছু না হারালেও মূল ভাষ্য বদলায়। আর রূপান্তরে লেখক স্বাধীনতাকামী। তিন জায়গাতেই মূলের প্রসঙ্গ-প্রকরণ অক্ষুণ্ণ থাকে না। তা থাকতে পারে না। কেননা মূল ভাষা থেকে একালীন ভাষা, মূল যুগ থেকে এ যুগের ভাবনার মধ্যে অপার ব্যবধান। শৈলীবিজ্ঞানী ভাষাতিরিক্ত আলোচনায় এগুলি ধরবেন।

ছাত্রদের আমরা গুরু-চণ্ডালীর জন্য দোষ দিই। আবার শ্রেষ্ঠ লেখকরা এই ত্রুটিমুক্ত নন। তাদের ক্ষেত্রে যা আর্য প্রয়োগ, আমাদের মতো সাধারণজনের পক্ষে তা কি অনার্য প্রয়োগ? একে লেখকের অনিচ্ছাকৃত ভুল বলতে পারব কি? আসলে সাধু-চলিতের ভেদরেখা আমরা টানতে পারিনি। অর্থনীতির মাপকাঠিতে সমাজবর্ণন চলে। কিন্তু মানুষের ভাষার মধ্যে শ্রেণিভেদ যতটা, শ্রেণিমিশ্রণও ততটা। বহু লেখা চলিতে লিখিত, অন্তরঙ্গে ভাষাগুণ সাধুর। আবার বিপরীতক্রমও দেখি। ভাষার লেখ্যরূপের সঙ্গে জানুসের মন্দিরের একটা মিল আছে—সেখানের দুটি বিপরীতমুখী দরজার মতো সাধু-চলিত দুজনেই সহজভাবে আসে। তাই সাধু-চলিতের যে ব্যবধান টেনে বৈয়াকরণরা তৃপ্ত, তার মূল্য শৈলীবিজ্ঞানী সবটা স্বীকার করতে পারেন না। শিল্পীর রচনায় কেন এরা পাশাপাশি থেকে যায়, তার বিচার করা এখনও হয়নি।

সাহিত্যের নানান শাখায় আলোচনার (ডিসকোর্স) একটা বিভ্রম তৈরি করা হয় বলে শৈলীভাষাবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। অনেক সময় এই বিভ্রম-ধারণাকে সরিয়ে পাত্র-পাত্রী লেখকের মতো আলোচনা করতে থাকে। তাদের আলোচনাকে তখন লেখক থেকে আলাদা করা কঠিন। যদিও একটি কৃতিতে সমস্ত আলোচনাই লেখকের সৃষ্টি, তবু তাতে পরিবর্তক (ভেরিয়েবল) আছে। এই চলনধর্ম (ভেরিয়েবিলিটি) অস্বীকার করে যদি তাতে ধ্রুবকের অপরিবর্তনীয়তা আরোপ করা হয়, তবে আলোচনাগুলির স্বাতন্ত্র্য থাকে না। তাই রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় নাটক উপন্যাসে লেখকের কণ্ঠস্বর নানা চরিত্রে শুনতে পাই। এখানে চরিত্রগুলির স্বাতন্ত্র্য এক নির্বিশেষ নিরপেক্ষ বা ধ্রুবকে স্থান পায়। এখানে নিয়ম ভাঙা হল বা নূতন নিয়ম গড়া হল, এ বক্তব্য শৈলীবিজ্ঞানী ছাড়া কে বলবেন?

বহু ক্ষেত্রে লেখক বাক্য পুরো লেখেন না। বাক্যাঙ্গে অপূর্ণতা দেখতে পাই। একে শুধু ব্যাকরণ-ভাঙা না লেখকের সংপ্রেষণের বিশেষত্ব বলব, এ নিয়ে তর্ক হতে পারে। লেখক এখানে অপূর্ণ বাক্য এইজন্য সাজান না যে, চরিত্রগুলি যা বলছে, সে সম্পর্কে তারা নিশ্চিত নয়। বরং পাঠকমনে লেখক একটা সম্ভাব্যতার সংকেত ছড়িয়ে দিতে চান। বর্ণনাতেও এই কৌশল দেখি। সেখানে লেখক একটা অনিশ্চিতির আশঙ্কা বুনে দেন। এইসব অপূর্ণ (শুধু রূপগত নয়, অর্থগতও) বাক্য কীভাবে রচনাকে প্রকাশযোগ্য করল, পাঠকের কাছে এরা বাধা সৃষ্ট করে কিনা, তা এযাবৎ ভাবা হয়নি। চেতনাপ্রবাহধর্মী রচনায় (যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে) এজাতীয় অপূর্ণ বাক্য দেখতে পাই। শুধু পূর্ণ বাক্য নয়, এমন অপূর্ণ বাক্য কেন, এ প্রশ্নেরও উত্তরসন্ধান করতে হবে।

কোনো কোনো কৃতিতে দেখি লৌকিক প্রবাদ, বাক্যাংশ, ক্রিয়ার বিশেষ প্রয়োগ। এ কি স্বদেশিয়ানা অথবা নিজের বিষয়কে পৌঁছে দেবার স্বাভাবিক প্রয়াস? যে দুর্বোধ্যতার দায়ে প্রাচীন-আধুনিক লেখকরা সমালোচকের দরবারে শাস্তি পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে লোকভাষার এই প্রভাব কেন? বক্তব্যের নূতনত্ব বজায়

রেখেও তাঁরা কবিতার অঙ্গে লোকভাষা ধারণ করেছেন। সাধারণের ভাষা (ল্যাংগুয়েজ অব দা মাসেস) তাঁদের রচনায় একটা বহমানতা এনেছে, একথা বলা যায়। সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে এমনকি মধুসূদনের রচনায় কবিরা নিজেদের কাঠিন্যের দায় থেকে কীভাবে মুক্তি খুঁজেছেন? বাংলা ভাষার ঐসব লোক-বিশেষত্ব চারপাশের জীবনের ভাষা থেকে এদের রচনায় উঠে এসেছে, এ কথা বলা যায়। এই অনুসন্ধান এখনও অসমাপ্ত আছে।

গদ্যরচনায় একটা মাঝারি ভঙ্গি অনেকে নিয়েছেন। সেখানে সাধু-চলিত নয়, মাঝখানের এক পথ আবিষ্কৃত হয়। আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের গদ্যলেখকরা এইজন্য সময় পেরিয়ে আমাদের কাছে প্রিয় হয়ে আছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ যাঁরা এই মধ্যম শৈলীর অনুসারী, তাঁরা সাধু-চলিতের চরমতা থেকে মুক্ত। এই শৈলীতে দর্শন-বিজ্ঞানের জটিলতম বিষয় অনায়াসে এঁদের গদ্যে রূপ পেয়েছে। এঁদের গদ্যে বিষয় ও প্রকাশের স্পষ্টতা চোখে পড়ে। কখনো ক্রিয়াসর্বনাম বা তৎসম শব্দের ঘনত্ব সাধু ভাষার মতো নয়, আবার চলিত ভাষার সর্বাঙ্গীণ আদর্শপালন নেই। কালবৈগুণ্যে আমরা বিদ্যাসাগরকে সাধু ভাষার জনক মনে করি। কিন্তু মধ্যম শৈলীর গদ্য বিদ্যাসাগরী গদ্যেও বিরল নয়। এখানে অনেকে বিষয়ানুবন্ধতার প্রশ্ন তুলতে চান। কিন্তু এঁদের রচনার আকর্ষণ বিষয়ানুবন্ধতা অথবা সংপ্রেষণের সহজ কৌশলে, তার ব্যাখ্যা বাংলায় এখনও হয়নি।

ইংরাজ রোমান্টিকদের নাম বাঙালি কবিদের বিশেষণে যোগ করে আমরা এককালে কাব্যালোচনায় পরিতৃপ্ত হতাম। যেমন, বাংলার শেলী (রবীন্দ্রনাথ) বাংলার বায়রন (নবীনচন্দ্র সেন)। ইদানীং বিশ্বসাহিত্য পড়ার সূত্রে বাঙালি গদ্যলেখকদের য়ুরোপীয় মনীষীদের সঙ্গে তুলনার প্রবণতা বাড়ছে। এভাবে স্পেংলার, এলিঅট বাঙালি গদ্যলেখকের বিশেষণে কিংবা গদ্যবিচারে ফরাসি বা জার্মান গদ্যের প্রভাবের কথা আসছে। যাঁরা এই অযথার্থ কথা ব্যবহার করেছেন, তাঁদের লেখায় ফরাসি বা জার্মান গদ্যের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ নেই। আবার এর বিপরীতে সংস্কৃতানুসারিতার অভিযোগ শোনা যায়। সেখানেও সংস্কৃত গদ্যগঠনের নিয়মাবলি অনালোচিত থাকে। এসব সমালোচকরা দায়িত্বহীন। একটি লেখকের গদ্যে স্বদেশি বা বিদেশি গদ্যের প্রভাব বলতে গেলে ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে। বিশেষ করে সেখানের দুই ভাষার তুলনার নিয়মাবলিগুলোর ক্ষেত্রে।

আমরা এখানে যে শৈলীবিজ্ঞানকে গ্রহণ করছি, তা বাচিক (ভার্বাল) ব্যবহারকে গুরুত্বহীন মনে না করেও একটি সাহিত্যকৃতির (লিটারারী টেক্সট) বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হবে। কাজেই এই বইয়ের আলোচনা মানুষের সমস্ত ভাষিক এবং অভাষিক স্তরের শৈলীব্যাখ্যান হয়ে উঠবে না। একটি কৃতি, এক বা একেক ধরনের লেখকের লিখিত রচনাই এখানে বিশ্লেষিত হবে। তাই একে পূর্ণ শৈলীবিজ্ঞান না বলে সাহিত্যিক শৈলীবিজ্ঞান (লিটারারি স্টাইলিস্টিকস্) বলা ভালো। এই আলোচনায় একটি সাহিত্যকর্মকে বোঝার চেষ্টা থাকবে। শুধু ধ্বনি-বাক্য-অর্থ কিংবা ভাষাবৈজ্ঞানিক উপাদান বিচার করলে শিল্পের ব্যবচ্ছেদই করা হয়। আবার পূর্ণতা, রসধারণা সক্রিয় থাকলে উপাদানের শিল্পগুণ আড়ালে চলে যায়। সাহিত্যের বিশেষ ভাব ভাষার মাধ্যমে যে শিল্পসৌন্দর্য লাভ করে, সেই সৌন্দর্যবিচারকে বুঝতে সাহায্য করে শৈলীবিজ্ঞান—এমন একটা ব্যাপক ধারণা আমরা দিতে চাই।

রসবাদ, ভাববাদ, এমনকি কঠোর ভাষাশৈলীবিজ্ঞান আমাদের অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর দেয় না। তাই

ভিনোগ্রাদফের বলা শৈলীবিজ্ঞানের একটি মহল আমাদের বিশ্লেষণের পক্ষে উপযোগী মনে হয়েছে। সেটি হল স্বাধীন শৈলীবিজ্ঞান (ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টাইলিস্টিকস্)। এই শৈলীবিজ্ঞান স্বাধীন এই কারণে যে তা প্রয়োজনমতো ভাষাবিজ্ঞান এবং সাহিত্যালোচনা থেকে সাহায্য নেবে। এই কাজ কঠিন সন্দেহ নেই। অথচ সমালোচক যদি নিজের গঠন, সাহিত্যবোধ এবং ভাষাবিজ্ঞানের সংমিশ্রণে সচেতন হন, তবে এই কাজ সুসম্পন্ন হবে। আমরা একটি কৃতির শৈলীবৈজ্ঞানিক উদ্দীপকগুলোর সন্ধান করতে চাই যা লেখক-পাঠককে সম্পর্কে বাঁধে। আবার একই সঙ্গে এই কাজ একটি কৃতির সামগ্রিক আবেদনের ফলাফলকেও ব্যাখ্যা করতে পারে। এখানে অধিকারীভেদের প্রশ্ন উঠতেই পারে। অধিকার অর্জন করতে গিয়ে সাহিত্যবোধ ও সমালোচনার মন হারিয়ে যাবে না, এমন কথা কি কেউ বলতে পারে? তাই মধ্যবিত্ত সমালোচকের পুঁজি নিয়ে আমরা এই শৈলীবিজ্ঞানের প্রায়োগিক কুশলতাকে পরবর্তী অংশে প্রকাশের চেষ্টা করব।

এই আলোচনা-পর্ব খানিকটা 'ওমনিয়াম গ্যাদারাম' জাতীয়। তাই 'সংজ্ঞা ও তত্ত্বের খোঁজে' অংশটিকে বিভিন্ন মতের সংকলনকর্ম বলতে বাধা নেই। কেননা বহুজ্ঞানী পাঠক জানেন, এসব কোন্‌খান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। যদিও আমরা সাধ্যমতো ব্যাখ্যানেরও চেষ্টা করেছি। আমাদের ইচ্ছা ছিল শৈলীর সংজ্ঞা, অস্তিত্ব, শৈলীবিজ্ঞানের নানা মত সংগ্রহ করে একটি মালা গাঁথা। যুক্তির সুতো সেই কাজকে সম্ভবপর করে তুলেছে কিনা, তা বিজ্ঞজনেরা বিচার করবেন। উৎসাহী পাঠক আরও জানার নেশায় উল্লেখপঞ্জির মূল বইগুলি পাঠ করবেন। সংক্ষেপে, শৈলীবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কথাবার্তার সঙ্গে বাঙালি পাঠকের অপরিচয়ের ব্যবধান কমিয়ে আনাই এই আলোচনার লক্ষ্য ছিল।

উল্লেখসূচি

১. 'রীতি কনসিস্টস এসেনসিয়ালি অব্ দা অবজেকটিভ বিউটি অব্ রিপ্রেজেন্টেশন (অব দা ইনটেনডেড আইডিয়া), অ্যারাইজিং ফ্রম আ প্রপার ইউনিফিকেশন অব্ সার্টেইন ক্লিয়ারলি ডিফাইন্ড এক্সসেলেন্সেস, অর্ ফ্রম অ্যান অ্যাডজাস্টমেন্ট অব সাউন্ড অ্যান্ড সেন্স। ইট ইজ, নো ডাউট, রেকগনাইজড দ্যাট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আইডিয়াজ শুড ফাইন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এক্সপ্রেশন। বাট অ্যাট দা সেম টাইম, দা রীতি ইজ নট, লাইক দা স্টাইল, দা এক্সপ্রেশন অব পোয়েটিক ইনডিভিজুয়ালিটি, বাট ইট ইজ মেয়ারলি দা আউটওয়ার্ড প্রেজেন্টেশন অব্ ইটস বিউটি কলড ফোর্থ বাই আ হার্মোনিয়াস কম্বিনেশন অব্ মোর অর লেস ফিক্সড লিটারারি এক্সসেলেন্সেস। অব্ কোর্স, দা এক্সসেলেন্সেস আর সাপোজড টু বি ডিসার্নেবল ইন দা সেন্স অব ইমপোর্ট, অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইন দা ভার্বাল অ্যারেঞ্জমেন্ট, বাট দিস সাবজেকটিভ কনটেন্ট ইজ নট ইকুয়াভ্যালেন্ট টু দা ইনডিফাইনেবল ইলিমেন্ট অব ইনডিভিজুয়ালিটি হুইচ কনস্টিটিউটস দা চার্ম অব গুড স্টাইল।

(দা হিস্ট্রি অব্ স্যাংস্ক্রিট পোয়েটিকস, রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

২. মারীর এই উদ্ধৃতিটির বাকি অংশ এইরকম

'হোয়ার থট প্রিডোমিনেটস; দেয়ার দা এক্সপ্রেশন উইল বি ইন প্রোজ, হোয়ার ইমোশন প্রিডোমিনেটস, দা এক্সপ্রেশন উইল বি ইউডিফারেন্টলি ইন প্রোজ অর পোয়েট্রি, একসেপ্ট দ্যাট ইন দা কেস অব ওভারহোয়েলমিং ইমিডিয়েট পার্সোনাল ইমোশন, দা টেনডেন্সি ইজ টু ফাইন্ড এক্সপ্রেশন ইন পোয়েট্রি। স্টাইল ইজ পারফেক্ট হোয়েন দা কমিউনিকেশন অব দা থট অর ইমোশন ইজ এগজ্যাক্টলি অ্যাকমপ্লিশড; ইটস পজিশন ইন দা স্কেল অব অ্যাবসলিউট গ্রেটনেস, হাউএভার, উইল ডিপেন্ড আপন দা কমিপ্রিহেন্সিভনেস অব দা সিস্টেম অব ইমোশনস অ্যান্ড থটস টু হুইচ দা রেফারেন্স ইজ পারসেপ্টেবিল।'

৩. 'স্কাজ'—এক ধরনের কাহিনি যার ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশেষত্ব সহজেই পাঠককে অনুমতি কথক এবং গ্রন্থকারের মধ্যে পার্থক্য চিনিয়ে দেয়।

৪. শুভা দাশগুপ্ত 'কালক্রম' পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, নবপর্যায় (১৯৮৬)-এ 'সাহিত্যসমালোচক রোলাঁ বার্ত' বলে একটি মনোজ্ঞ নিবন্ধ লিখেছেন পুষ্কর দাশগুপ্তের সহায়তা নিয়ে।

৫. ক্রীস্টাল, ডেভিড অ্যান্ড ডেভি, ডেরেক (১৯৬৯), 'ইনভেস্টিগেটিং ইংলিশ স্টাইল', ইন্ডিয়ানা য়ুনিভার্সিটি প্রেস, ব্লুমিংটন।

৬. ভিনোগ্রাদফ, ভি. ভি. (১৯৬৩) ক. 'সাবজেক্ট অ্যান্ড স্টাইল', মস্কোভা; খ. স্টাইলিস্টিকস : থিওরি অব্ পোয়েটিক্স, মস্কোভা।

উৎস গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

বাংলা

আশিসকুমার দে (১৯৮০), 'শৈলী ও শৈলীবিজ্ঞান', 'ভাষা' পত্রিকা, ২ : ২।

উদয়নারায়ণ সিংহ (১৯৮৭), 'কবিতার ভাষাতত্ত্ব ও আজকের বাংলা কবিতা', গাঙ্গোয়, কবিতার ভাষা (বিশেষ সংকলন)।

পবিত্র সরকার (১৯৮১), 'বাংলা গদ্য রীতিগত অনুধাবন', বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা (সংকলন), সমতট প্রকাশনী।
(১৯৮৫), গদ্যরীতি পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক।

(১৯৮৭), শৈলীবিজ্ঞানী স্ট্রাকচারালিস্ট প্রাগ্‌ভূমিকা, গাঙ্গোয়, কবিতার ভাষা (বিশেষ সংকলন)।

শুভা দাশগুপ্ত (১৯৮৬), 'সাহিত্যসমালোচক রোলাঁ বার্ত', কালক্রম ১ : ১, নবপর্যায়, কলকাতা।

সুধীরকুমার দাশগুপ্ত (১৯৭৯), 'কাব্যালোক', পঞ্চম সংস্করণ, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং।

ওড়িয়া

গগনেন্দ্রনাথ দাশ ও পঞ্চানন মহান্তি সম্পাদিত (১৯৮৯), 'শৈলীবিজ্ঞান', ওড়িয়া গবেষণা পরিষদ, কটক।

ইংরেজি

১. বারবাশ, য়ুরি, (১৯৭৭), 'ঈস্‌থেটিকস অ্যান্ড পোয়েটিকস', প্রোগ্রেস পাবলিশার্স।

২. চ্যাপম্যান, রেমন্ড (১৯৭৩), 'লিংগুইস্টিকস অ্যান্ড লিটরেচর', এডওয়ার্ড আর্নল্ড পাবলিশার্স।

৩. চ্যাটম্যান, সেম্যুর (সম্পাদিত, ১৯৭১), 'লিটারারি স্টাইল, আ সিম্পোসিয়াম', অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস।

৪. ক্রীস্টাল, ডেভিড অ্যান্ড ডেভি, ডেরেক (১৯৭৯), 'ইনভেস্টিগেটিং ইংলিশ স্টাইল', ইন্ডিয়ানা য়ুনিভার্সিটি প্রেস।

৫-৬. এংকভিস্ট, নিলস এরিক এট অল (১৯৬৪) 'লিংগুইস্টিকস অ্যান্ড লিটারারি স্টাইল', ও. ইউ. পি.। (১৯৭৩), 'লিংগুইস্টিক স্টাইলিস্টিকস', মোটন।

৭. ফ্রিম্যান, ডোনাল্ড সি. (সম্পাদিত, ১৯৭০), 'লিংগুইস্টিকস অ্যান্ড লিটারারি স্টাইল', হোল্ট, রাইনহার্ট অ্যান্ড উইন্সটন।

৮. ফ্রায়েড, ভি. (সম্পাদিত, ১৯৭২), 'দা প্রাগ স্কুল অব লিংগুইস্টিকস অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ টিচিং', অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

৯. গারভিন, পল এল, (সম্পাদিত ও অনূদিত, ১৯৬৪), 'এ প্রাগ স্কুল রিডার অন ঈস্‌থেটিকস : লিটারারি স্ট্রাকচার অ্যান্ড স্টাইল'।

১০. গ্রে, বেনিসন (১৯৬১), 'স্টাইল : দি প্রব্লেম অ্যান্ড ইটস সল্যুশনস্‌', মোটন।

১১. মুখার্জী, রমারঞ্জন, 'হিস্ট্রি অব সাংস্ক্রিট লিটারারি ক্রিটিসিজম'।

১২. মারী, মিডলটন (১৯৬১), 'দা প্রব্লেম অব্‌ স্টাইল', রিপ্রিন্ট এডিশন, অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস।

১৩. পেটার, ওয়াল্টার (১৯৬৭), 'অ্যাপ্রিসিয়েশনস উইথ অ্যান এসে অন স্টাইল', রূপা এডিশন।

১৪. সেবক, টমাস এ. (সম্পাদিত, ১৯৬০), 'স্টাইল ইন ল্যাংগুয়েজ', দা এমন, আই. টি. প্রেস, ম্যাসাচুসেটস।

১৫. স্পিৎজার, লিও (১৯৭৬), 'লিংগুইস্টিকস অ্যান্ড লিটারারি হিস্ট্রি', প্রিন্সটন য়ুনিভার্সিটি প্রেস, প্রিন্সটন।

১৬. টার্নার, জে. ডব্লিউ. (১৯৭৩), 'স্টাইলিস্টিকস', পেঙ্গুইন বুকস, মিডিলসেক্স।

১৭. উলমান, স্টিফেন (১৯৬৪), 'ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড স্টাইল', বেসিল ব্ল্যাকওয়েল।

১৮. জিস, আভনের (১৯৭৭), 'ফাউন্ডেশন অব্‌ মার্কসিস্ট ঈস্‌থেটিকস্‌', প্রোগ্রেস পাবলিশার্স।

একক ২ ❑ কবিতার শৈলীবিচার

২.১ আমাদের দৃষ্টি

২.২ কবিতার শৈলী

২.৩ গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব

২.৪ জীবনানন্দ দাশের 'পরস্পর'

২.১ ❑ আমাদের দৃষ্টি

এই অংশে আমরা শৈলীবিজ্ঞানের প্রয়োগসামর্থ্য দেখাতে চাই। সাহিত্যের মাধ্যম এক নয়, অনেক। তাই কবিতা, গদ্য, ছোটোগল্প ও উপন্যাসের শৈলী ক্রমান্বয়ে আলোচিত হবে। এদের শৈলীমানকগুলি (স্টাইলিস্টিক প্যারামিটারস) একজাতীয় নয় বলে প্রতিটি সাহিত্যমাধ্যমের শৈলী আলোচনার গোড়ায় এদের শৈলীবৈশিষ্ট্য সন্ধানের উপায় আলোচিত হবে। পরে একটি বিশেষ রচনার মধ্যে আমরা বিশ্লেষণের আলো ফেলব।

এ পর্যন্ত লেখা শৈলী ও শৈলীবৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রতীচ্য গাঢ় এবং অশুভ প্রভাব ফেলেছে। একটি বিদেশি শৈলীবৈজ্ঞানিক প্রতিরূপকে বাংলা রচনা বিশ্লেষণের আদর্শ করলে ভুল বাড়তে বাধ্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিজস্ব ধর্মকে অমান্য করে বিদেশি ছাঁচে তার সমালোচনা একান্ত দূরের, কৃত্রিম ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আমরা প্রতীচ্যের ধারণা মনে রেখেও যে প্রতিরূপগুলি নেব, তা স্বদেশি চেহারা নেবে। প্রতীচ্যের সাহিত্যিক শৈলীবিজ্ঞান সাহিত্যকে দেখার নূতন দৃষ্টিকোণ উপস্থিত করেছে। আমাদের আলোচনায় সেই দৃষ্টিকোণ রাখতে গিয়ে সতর্কতা দরকার। নইলে শৈলীবিজ্ঞানের মানকগুলির সঙ্গো সমঝোতা করে সমালোচনার উৎপত্তি হবে।

একটি কৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি যে বাঁধা ছক মেনে চলে না, এটা মনে রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া সে যে নূতন শৈলীবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য জানাবে না, এমনটি কখনও বলা যায় না। কাজেই সমালোচনার শৈলীবৈশিষ্ট্যগুলি নিরূপণ করার প্রয়োজনীয়তা পূর্বাহ্ণে থাকবে। পোশাকের মাপে যেমন চেহারা হয় না, তেমনি মানকের মাপকাঠি কৃতির আগে থাকবেই, এমন নয়। এখানে গোঁড়া শৈলীবিজ্ঞানীরা আপত্তি তুলবেন। কিন্তু তাঁরা তো এও জানেন যে, শৈলীবিজ্ঞান এখনও একটি সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি হয়ে দাঁড়ায়নি। এর প্রায়োগিক সফলতা এখনও অনুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয়নি। আপাতত এটি কৃতির ভাষাগত প্রকাশের নান্দনিক ক্রিয়াকে গভীরভাবে লক্ষ করেছে।

আবার ভাববাদী সমালোচনায় ধোঁয়াটে, অগভীর ব্যাখ্যানে আমরা ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নূতন সমালোচনা পদ্ধতি এলেই সমালোচক এবং রচয়িতা মহলে 'সব কিছু ধ্বংস করা হচ্ছে' এরকম ধারণা জাগে। বাংলায় তন্ময় সমালোচনার পরিমাণ কম। মন্ময় সমালোচনা আমাদের নূতন চোখে সব কিছু দেখতে নিষেধ করে। এই সময়

সমালোচনার চাপে যখনই লেখক-সমালোচক সাহিত্য-কৃতির ব্যাখ্যা করেন, তখনই নিয়তিকৃতনিয়মরহিত অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞার কথা উচ্চারিত হয়। রস, পূর্ণতা, অখণ্ড সৌন্দর্য, প্রতিভা—এসব শব্দের আড়ালে বিশ্লেষণের অপূর্ণতাকে (কিংবা অক্ষমতাকে) লুকানো যায়। রচক কীভাবে তাঁর প্রকাশকৌশলের বিন্যাস-সমাহারে আমাদের মনে দ্বিতীয় ভুবন জাগিয়ে তোলেন, তার একটা হদিশ দেওয়া আমাদের লক্ষ্য। আমরা মনে করি, রচকের সৃষ্টিশীল মন ভাষার বহিরঙ্গ উপায়ে এবং উপায়ের নবীনতায় এই কাজ সম্ভবপর করে তোলে। সাহিত্য-সমালোচনাকে যদি শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সক্রিয় করা যায়, তাহলে অনেক অযথার্থ কথা এড়ানো যাবে। আবার স্রষ্টার মনের অন্তরালের গভীরতার পরিমাপও সম্ভব হবে।

এই কাজে তাই প্রচলিত সমালোচনার সদর্থক (পজিটিভ) ধারণা এবং সাহিত্যিক শৈলীবিজ্ঞানের মিশ্রণ একান্ত আবশ্যক। রক্ষণশীল লেখক এবং সমালোচক এই বলে আপত্তি জানাতে পারেন যে এখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রজাপতির পাখনা বা রামধনুর রং-কে দেখা হচ্ছে। আসলে এই খণ্ড করে দেখার মধ্যে অখণ্ড প্রাপ্তির সম্ভাবনা বেশি। সাহিত্যকৃতি পাঠককে যদি বিস্ময়রসে অবিষ্ট করে রেখে দেয়, তাহলে দুপক্ষেরই ক্ষতি। কেননা বিস্ময় প্রাথমিকভাবে মনকে অসাড় করলেও জগতে সেই বিস্ময়ের প্রকৃতি ও কারণ খোঁজা মানুষেরই কর্তব্য। এই বিস্ময় যে অনিয়মিত নয়, লেখক যে প্রথম ভুবনের ভিত্তিতে দ্বিতীয় ভুবন গড়েন—এই প্রতিপাদ্য অস্বীকারের উপায় নেই। তাই আমরা এই পর্বে স্রষ্টার মনোগহনের জটিলতা অনুভব করতে চাই যৌক্তিক দৃষ্টিকোণে। এখানে সাহিত্যবোধ হল প্রথম শর্ত। যৌক্তিক প্রবাহের খাতিরে সাহিত্যবোধের বিসর্জন নয়, নবতর উদ্বোধনই আমাদের কাম্য।

২.২ ❑ কবিতার শৈলী

এই উপ-শিরোনামটি (সাব-হেডিং) নিজেই একটি বড়ো বইয়ের বিষয় হতে পারে। আমাদের লক্ষ্য মনে রাখলে এখানে কবিতার সার্বিক বিশ্লেষণে আমরা মনোযোগী হতে পারি না। বরং নবীন আলোচকের মনে কিছু প্রশ্ন সঞ্চার করতে পারি। এসব প্রশ্নের সমাধান আমরা দেখাতে চাই না। শুধু এই সমস্যা এবং প্রশ্নাবলি আমাদের প্রচল কাব্যসমালোচনায় উঠুক, এই কামনাই করি।

১. গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব

প্রচল আলোচনায় গদ্য-পদ্যের সীমারেখা টানা হয়। এই সীমানা টানা শৈলীর প্রয়োজনে কতটা লাগে? শৈলীর সাধারণ অভিজ্ঞতা বলে যে, গদ্য-পদ্যের সেভাবে ভেদরেখা নেই। সুবোধ্য এবং সুসঙ্গত অভিজ্ঞতার ধরন গদ্য বা পদ্য যে-কোনো রূপ নিতে পারে। এই রূপগ্রহণ কতকগুলো পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল, যাকে পরিস্থিতির সমাপতন (কো-ইনসিডেন্স অব সারকামস্ট্যান্সেস) বলা ভালো। এখানে যুগের হাওয়া সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে। একটা যুগে শৈল্পিক এবং সাহিত্যিক কিছু আঙ্গিক শিল্পীদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। শিল্পী সেই চাপকে অমান্য করতে পারেন না। কারণ,

১) তাঁকে জীবনধারণ করার জন্য লেখকবৃত্তি বেছে নিতে হয়। তাঁর লেখা পণ্য বলে যুগের আদেশ মানতে হয়;

২) বেশিরভাগ শ্রোতা বা পাঠকের কাছে পৌঁছতে হলে যুগ-প্রচল প্রকরণকে বরণ করে নিতে হয়।

বাংলা সাহিত্যের পুরানো পৃষ্ঠা ওলটালে দেখা যাবে যে, এই ভবিতব্যকে বরণ করার জন্য লেখককে কত আত্মত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন যে, মুকুন্দরাম এ যুগে জন্মালে ঔপনাসিক হতেন। অনিবার্যভাবে তাঁর বাস্তবতাবোধ, বিশদতাজ্ঞান (সেন্স অব্ ডিটেইলিং), চরিত্রচিত্রণে নৈপুণ্য, সংলাপ-বয়ন এবং জীবনদৃষ্টি সমালোচককে এমনতরো বাক্য উচ্চারণে উৎসাহিত করেছে। মুকুন্দরাম এ যুগে একজন ঔপন্যাসিক না হলেও সার্থক গদ্যকার যে হতেন, এতে সন্দেহ নেই। অথচ চণ্ডীমঙ্গলের লোকমান্য কবিরূপেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। মুকুন্দরাম যুগের দাবি কবিভাষার প্রভাব অগ্রাহ্য করে গদ্যভাষায় লেখার চেষ্টা করেননি। অথচ সে যুগে গদ্য ছিল না, এমন নয়। কিন্তু তার সাহিত্যিক ব্যবহারযোগ্যতা স্বীকৃত হয়নি।

অন্য দিকে কৃষ্মদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত পদ্যে লিখলেও এক নৈয়ায়িক, গদ্যচারী মন তাঁর রচনার সর্বাঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। মুকুন্দরাম-কৃষ্মদাস কেউই পদ্য ছাড়া গদ্যসাধনা করেননি। পদ্যের ছন্দোবন্ধন, মিলের প্রকৃতি, বিশেষ কবিভাষ্য কৃষ্মদাসের রচনার অন্তর্নিহিত গদ্য-সম্ভাবনাকে আড়ালে রাখতে পারেনি। এমনকি এই ধরন অন্য কয়েকজন কবির ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। গোঁড়া সমালোচক বলবেন, এখানে কাব্যের অপূর্বত্ব এরা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু আমরা দেখি এসব জায়গায় মানুষের মুখের ভাষা, যুক্তির রীতি, জীবন-বিশ্লেষণ একটা গদ্যের ভাব জাগিয়েছে। একটি অনুভবের চূড়ান্ত মুহূর্তে নয়, একে যুক্তি-তর্কের বাঁধনে তারা বেঁধেছেন, যেমনটি সচরাচর জীবনে ঘটে থাকে। দুটি উদ্ধৃতি এই বক্তব্যের সমর্থন জানায় :

১. কিংবা প্রেম রসময় কৃষ্মের স্বরূপ।
তার শক্তি তার সহ হয় একরূপ॥

২. শেষলীলায় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥

গদ্য-পদ্যের দ্বন্দ্বে আরেকটি কথা উচ্চরিত হয়। তা হল সাহিত্যের আদি মাধ্যম হল পদ্য, গদ্য পরে এসেছে। রবীন্দ্রভাষায় 'গদ্য এল অনেক পরে'।

তাহলে এখানে মেনে নেওয়া ভালো যে, সমস্ত প্রকাশকে ছন্দোবন্ধনে বাঁধা গেল না দেখে গদ্যের ব্যবহার শুরু হল। গ্রিকরা অনেক আগেই বুঝেছিলেন যে, ছন্দোবন্ধনে যুক্তবদ্ধ চিন্তার যথাযথ ভাব অনুসরণ করা সম্ভব নয়। মানুষ দেখেছে যে, বৌদ্ধিক যুক্তি হল যুক্তির নৈয়ায়িক অবয়ব। গদ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজগুলোর সংপ্রেষণ-কর্ম সম্ভব হলেও নান্দনিক হয়ে উঠতে সময় লেগেছে। বাংলা গদ্যের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয়। বাংলা গদ্যে বিষয়ানুগ ভাব কাটিয়ে সাহিত্যযুগ দরকারের জগৎ থেকে অদরকারের জগতে তাকে পৌঁছে দিয়েছে।

এই প্রশ্ন থেকে আরেকটি প্রশ্নের জন্ম হয়। শুধু গদ্যের কি কোনো আলাদা বিষয় আছে এবং কবিতারও? ধরা যাক, একটি চিন্তার যথাযথ রূপ দিতে গেলে গদ্যেরই প্রয়োজন। ছন্দ, স্পন্দ এবং মিল এ বিষয়ে বাধা। কিন্তু গদ্য যথাযথ চিন্তার ভাষারূপেই নয়, বর্ণনার ক্ষেত্রে এই কাজ করে থাকে। একটি বর্ণনা তা রাস্তা, শোবার

ঘর, অরণ্যভূমি কিংবা একজন জেলখাটা আসামীর যাই হোক না কেন, তা গদ্যেই সম্ভব। এর সঙ্গে জড়িত মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলি তার বর্ণনার বাইরের বিষয়। কিন্তু এ ধরনের গদ্য শৈলী-আলোচনায় অতিরেক (রিডানডেন্ট)। কেননা এখানে যথাযথতা থাকলেও কল্পনার উদ্দীপন নেই। এবারে তাই মানসিক প্রতিক্রিয়ার মূল খুঁজে দেখা যাক একটি গদ্যান্বয়ী কবিতা থেকে :

সাপমাসী উড়ে যায়; দাঁড়কাক অশ্বত্থের নীড়ের ভিতর
পাখনার শব্দ করে অবিরাম; কুয়াশায় একাকী মাঠের ঐ ধারে
কে যেন দাঁড়ায়ে আছে; আরো দূরে দু-একটা স্তব্ধ খোড়ো ঘর

পড়ে আছে; খাগড়ার বনে ব্যাং ডাকে কেন—থামিতে কি পারে;
(কাকের তরুণ ডিম পিছলায়ে পড়ে যায় শ্যাওড়ার ঝাড়ে।)
মানুষের ব্যথা আমি পেয়ে গেছি পৃথিবীর পথে এসে—হাসির
আস্বাদ পেয়ে গেছি.....

এখানে গদ্যকাব্যের প্রভাব বেশি বর্ণনভঙ্গিতে। কিন্তু শেষ দুটি লাইনে কবির মানসিকতা বর্ণনা থেকে রচনাটিকে কাব্যে উত্তীর্ণ করেছে। এখানে গদ্য ও পদ্যের সহাবস্থান ঘটেছে প্রয়োজন অনুযায়ী।

গদ্য-পদ্যের দ্বন্দ্ব নিয়ে তৃতীয় সমস্যা হল, এই গদ্যান্বয়ী ভাব কবিতা ও পদ্যাকৃতি রচনার কোন্ কোন্ বিশেষ স্থলে আসে, তা স্থির করা যায় কিনা। প্রথমে দেখি নাটকীয় সংলাপের মুহূর্তগুলি যেখানে চরিত্ররা নিজেদের বক্তব্য বলতে গিয়ে দেখছে যে, পদ্যরূপের গঠনে তাকে ধরার উপায় নেই। সেখানে প্রতিদিনের জীবনে বলা ও শোনা গদ্য অনিবার্যভাবে ক্রিয়াশীল হচ্ছে। যেমন :

এ কি ফাঁকি? না কি বুজরুকি? কোথায়
সূর্য? এরই জন্য এই শীতে এলুম নাকি?
আরে দাঁড়াও, এক্ষুণি দেখবে।
পিছনে চোখ রেখো, দেখছো এভারেস্ট?
কাঞ্চনজংঘা কী গ্র্যান্ড!

(টাইগার হিল-এ সূর্যোদয় : নুতন পাতা, বুদ্ধদেব বসু)

আবার যেখানে ধর্ম-দর্শন-আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যার প্রয়োজন, সেখানেও কবিতা গদ্যাকৃতি ধারণ করেছে। মিল এখানেও আছে হয়তো। কিন্তু তা কবিতার বাইরের ঠাট বজায় রাখার জন্য। বিপ্রতীপরূপ (ইনভার্সন) বা কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার বিপর্যাসও একই কারণে স্থান পায়। অর্থাৎ লেখার জগতেও বক্র কবিভাষার চেয়ে প্রত্যক্ষ, সংপ্রেষক গদ্য বেশি কার্যকর রূপ নিয়েছে। যেমন :

বউও উঠানে নাই—পড়ে আছে একখানা ঢেঁকি;
ধান কে কুটিবে বল—কত দিন সে তো আর কোটে নাকো ধান.....
ভাঁড়ারে ধানের বীজ কলায়ে গিয়েছে তার দেখি,
তবুও সে আসে নাকো, আজ এ দুপুরে এসে খই ভাজিবে কি?

(রূপসী বাংলা : জীবনানন্দ)

গদ্যভাষার লিখিত রূপের কোনো উপভাষা নেই—একথা ঠিক। কিন্তু একেবারে গদ্য এবং গদ্যান্বয়ী কবিতার মধ্যে ফারাক আছে। এখানে গদ্য-পদ্যের এক আপোষকামিতা দেখা যাচ্ছে।

এসব উদাহরণে কবি বাঁধা সড়ক থেকে সরে আসছেন—এমন অভিযোগ করা যায় না। বরং কবি ভাষার সুপ্রয়োগের ধারণাটি যথার্থ বলবৎ করছেন, এমন বলা চলে। ভাব এখানে উপযুক্ত ভাষা খুঁজছে। তাই তা কবিতার গণ্ডি না পেরোলেও গদ্যরূপকে হেলাফেলা করতে পারছে না।

আলোচ্য অংশের শেষ প্রশ্ন গদ্যকবিতা নিয়ে। ওপরের অবস্থাগুলো কী কী গদ্যকবিতার আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করেছে? এর উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কেননা সাহিত্যে পদ-কবিতারূপের পরে গদ্যের সূচনা হল (অন্তত লিখিতরূপে)। কবিতার ক্ষেত্রে গদ্যকবিতা এল আরও পরে। কবিতার প্রচলিত পথে কিছু কথা বলা অসম্ভব কিংবা কবিরা নূতন সাহিত্যরূপের কামনা করেছিলেন? পদ্যছন্দকে সরিয়ে দিয়ে গদ্যকে আশ্রয় করা ছন্দের বন্ধনমুক্তি নয়। ছন্দোমুক্তি হল পর্ব-সুষমার বন্ধনকে ভাঙা।

কেউ কেউ আবার কবিতার চর্চা করেছিলেন গদ্যের জগতে বসেই। সেখানে ছন্দোমুক্তির প্রশ্ন অবান্তর। আসলে তাদের মনে হয়েছে গদ্য সরাসরি বা একটু বেশ পালটে কবিতায় আসতে পারে। গদ্যকবিতায় সবচেয়ে বড়ো হল—সংক্ষিপ্ত বাক্‌পর্ব, দ্রুত-নিয়মিত যতিপাত, সঘন শ্বাসাঘাত, মূল গদ্যের থেকে আলাদা এক স্পন্দনের সঞ্চার। এ কাজ করতে গিয়ে বিপ্রতীপ বাক্য, ক্রিয়াহীন বাক্য এবং সমান্তরালতা গঠনের প্রয়োজন আছে। এই কাজ কোনো আধুনিক কবিও স্বস্তির সঙ্গে করে উঠতে পারেন না। আসলে কবিতার প্রথম আর শেষ শর্ত হল, কবিতা হয়ে ওঠা। যদি প্রশ্ন ওঠে, তা কি করে বুঝব? উত্তর—আগের পড়া কবিতা যেভাবে মনকে আনন্দিত, যন্ত্রণার্দ্র, রক্তাক্ত করেছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে। প্রাক্তন কাব্যপাঠের অভিজ্ঞতা হল পরশপাথর। নূতন কাব্যরচনা সোনা না গিল্টি, তার স্পর্শেই তা বুঝতে পারা যায়।

আমরা শৈলীবিজ্ঞানের তত্ত্বালোচনার সময় কবিতায় আদর্শ ভাষার শব্দ এবং অন্যান্য স্তরের শব্দ নিয়ে আলোচনা সাধ্যমতো করেছিলাম। কবিতার শৈলী অংশে এ বিষয়ে বিশদ হওয়ার সুযোগ আছে। কাব্যভাষাকে আদর্শ ভাষার একটি প্রতিরূপ বলা যায় না, জাঁ মুকারোভস্কি বলেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, ইতর শব্দমেশানো কবিতায় শাব্দিক উপাদান আদর্শ ভাষা থেকে নেওয়া হয় না। যেমন, মরকুটে, থ্যাঁতানো, উজবুক। আবার কবিতার বর্ণনা অংশে আদর্শ ভাষারূপের মধ্যে নূতন উপভাষা বা ইতর সংলাপ পাশাপাশি থাকে। কাব্য-ভাষার নিজস্ব শব্দ এবং বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ থাকে, এমনকি ব্যাকরণগত রূপও। যাকে শাদা কথায় বলতে পারি কাব্যিকতা (পোয়েটিজম)। আদর্শ ভাষারূপ শক্তিশালী থাকলে, এর নিয়মভঙ্গ বিচিত্র হবে। এই সূত্র ধরে কবিতার সৃষ্টি সম্ভবপর হয়ে ওঠে। ভাষাগত উপাদানের জোরালো প্রমুখণ ছাড়া কবিতা হয় না। হাব্রানেক বলেছিলেন : "বাই ফোরগ্রাউন্ডিং...উই মিন দা ইউজ অব দা ডিভাইসেস অব ল্যাংগুয়েজ ইন সাচ আ ওয়ে দ্যাট দিস ইউজ ইটসেলফ অ্যাট্রাক্টস অ্যাটেনশন অ্যান্ড ইজ পারসিভড্ অ্যাজ আনকমন, অ্যাজ ডিপ্রাইভড অব অটোমেটিজম, সাচ অ্যাজ আ লাইভ পোয়েটিক মেটাফর।"

(স্ট্যান্ডার্ড চেক অ্যান্ড দা কালটিভেশন অব গুড ল্যাংগুয়েজ, বহুশ্লাভ হাব্রানেক, ১৯৩২)

কবিতাকে কবিতারূপে চেনার পরও পাঠকের কাছে সমস্যার সংখ্যা কমে যায় না। যেমন :

প্রমাবিরহিত
অন্ধবিশ্বাসের বশে তখন মানুষ খোঁজে ফের
অশক্ত বা অসম্পৃক্ত অধিদৈবতের
পুরাতন পদপ্রান্তে সংগতি বা পৈত্রিক অমিয়,
কার্যত যদিও
ঐকান্তিক, শূন্য তারে করে বিশ্বম্ভর;
কারণ তখন বায়ু অনিলে মেশে না, অবস্কর
ভস্মান্ত হয় না, অনুব্যবসায়ী ক্রতু

(বোঝে সন্তাপেও ব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের বীতাগ্নি বেপথু, সংবর্ত : সুধীন্দ্রনাথ)

'সংবর্ত' কবিতার এই অংশ পড়ে পাঠকের প্রথম প্রতিক্রিয়া জাগে দুর্বোধ্যতার। দুর্বোধ্য বললেই সব দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না। কেননা 'দুরূহতার দুটো দিক আছে, একটা পাঠকের দিক, একটা লেখকের দিক। যে দুরূহতার জন্ম পাঠকের আলস্যে তার জন্য কবির উপরে দোষারোপ করা অন্যায়।' এই দোষারোপ ন্যায়-অন্যায় যাই হোক, বর্তমান কালে পাঠকেরা বহুজ্ঞানী রূপের পক্ষপাতী। পাঠকের কাছে কবিতা হাতের মুঠোয় আমলকীর মতো সহজলভ্য হবে, এটা কবিরা মানেন না। কেননা একালে জ্ঞানের সীমানা অনেক প্রসারিত। সেখানে শুধু ছন্দমিল, সামান্য কথার বিলসন তাদের কাছে শক্তির অপব্যয়।

আধুনিক যুগের জটিল পরিচয়কে প্রকাশ করার ধরন পালটে গেছে। পুরোনো কাব্যিক শব্দেরা এখন নিষ্প্রাণ। তাই কবিকেও ভাষা-পাথরের বুকে সন্ধান চালিয়ে তক্ষণ করে খুঁজেনিতে হয় নিজের বলার কৌশল। এই কৌশল গ্রহণে কবি যেমন শ্রমশীল, পাঠককেও তেমনি পরিশ্রমী হতে হবে। আলোচ্য অংশে যে দুরূহতা জাগে, তা আপাত। কঠিন শব্দের অর্থ উদ্ধার করে পাঠক দেখেন তার চারপাশের অভিজ্ঞতাকেই আঁকা হয়েছে। কিন্তু সেই ছবির রং তার চেনাজানা রংয়ের বিন্যাস থেকে আলাদা।

এ তো গেল শাব্দিক দুরূহতার দিক, যেখানে শব্দার্থের খোলশ ছাড়িয়ে কাব্যের সার গ্রহণ করা যায়। কিন্তু অনেক সময় কবিরা বহুপঠনের অভ্যাসে এমন সব উল্লেখ, উদ্ধৃতি, প্রসঙ্গ তোলেন, তা তাঁর একান্ত হলেও পাঠকের কাছে বাধাস্বরূপ। এখানে সংপ্রেষণের চেয়ে নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞানতৃষ্ণা, পঠনাভ্যাস এবং একটা চেষ্টিত উপমা যেন সক্রিয় হয়ে ওঠে। যেমন :

উভয়ত তুমি সেতুবন্ধনে চিরবনবাসী স্বপ্ন—
সনাতন এক অবাকশাখায় মিলিত দুই সুপর্ণ।
তাই ক্ষোভ নেই অকালের অনুতাপ,
কারণ তোমার বাস্তবতাই যেন দৈনিক অন্ন
তদু নাত্যেতি বচন
বুভুক্ষু দেশে জীবনের মূল সত্যে।

(উজ্জীবনের স্বপ্ন সদ্য চক্ষে, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত : বিষ্ণু দে)

এখানে প্রাচীন সাহিত্যের উল্লেখ উজ্জ্বল উদ্ধার নয়। সমস্ত কবিতাটি পড়লে পাঠক দেখবেন এক অপার

কাঠিন্য ছড়িয়ে আছে। কবিতাটির আবেদন আমাদের কাছে পৌঁছনোর পথে প্রবল বাধা হল এসব উল্লেখের অবারিত প্রাচুর্য। দুর্বোধ্যতার আরেকটি কারণ হল অবয়বী (স্ট্রাকচারাল)। এখানে দুরূহ উল্লেখ, শাব্দিক কাঠিন্য কম। অথচ অবয়ব থেকে কবিতার অর্থ বোঝা দুরূহ। এখানে প্রকরণের অতি-সচেতনতা পাঠককে অসুবিধায় ফেলে :

বিকালে মসৃণ সূর্য মূর্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ।
মন্দভাগ্য বার্সিলোনা রেস্তোরাঁতে মন্দ লাগবে না।
সাম্য অতি খাসা চিজ!—অনুচিত কিন্তু রাজদ্রোহ।

‘জীবন বিস্বাদ লাগে!’—ইত্যাদিতে ইতস্তত দেনা
এবার আত্মাকে, বন্ধু করা যাক প্রত্যাহার (অহো!
সম্প্রতি মাঘের দ্বন্দ্বে ছত্রভঙ্গ দক্ষিণের সেনা।
সদলে বসন্ত তাও পদত্যাগ-পত্র পাঠাবে না?)

(ভিলানেল, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার : বিষ্ণু দে)

এখানে একটি আপাত-মিল কাজ করেছে—ক গ, খ ঘ, গ গ গ। অথচ পারম্পর্যহীনতা, একটু যেন চেষ্টিতভাবে দুরূহ করার প্রবণতা কবির আছে। এই ভাবের উল্লম্ফন অনেক সময় কবিতায় দুরূহতা আনে।

২.৪ ❑ জীবনানন্দ দাশের ‘পরস্পর’

কবিতার শৈলীতে তাই আমরা গদ্যান্বয়ী অংশ, দুর্বোধ্যতা, মূল সুর, লেখকের চিত্রকল্প, প্রকরণের সঙ্গে প্রসঙ্গের মিল-অমিল, উল্লেখের বৈচিত্র্য, অলংকারের পরিমাণ, বাক্যের গড়ন এবং সর্বোপরি অবয়বজ্ঞান লক্ষ করব। কবিতার শরীরে লেখকের মন কতটা ধরা পড়েছে, এটা জানা দরকার। এই কাজ করতে গেলে খুব পরিচিত একটা কবিতা বাছলে ভালো হত। আমরা একটি অল্প-চেনা কবিতা নির্বাচন করেছি। কবিতাটির নাম ‘পরস্পর’, লেখক জীবনানন্দ দাশ। কবিতাটি গড়ন, বক্তব্য এবং যুগের ছবিতে আমাদের ভাবিয়েছে। এই ভাবনা কেন জাগল, তার উত্তর খুঁজতেই আমাদের আলোচনা চলবে। এখানে বলা ভালো কবিতাটি দীর্ঘ। কারোর কারোর মতে দীর্ঘ কবিতা আসলে খণ্ড কবিতারই মালা। একটি কবিতার শৈলীবিচার সম্ভব হলেও দীর্ঘ কবিতায় তা সম্ভব নয় বলে তাঁরা মনে করেন। দুটি মতামতই চরম।

জীবনানন্দের ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’র এই কবিতাটি কাব্যরসিক মহলে প্রায় অনালোচিত। অথচ কবিতাটিতে বক্তব্য ছাড়াও শৈলীর বিচিত্র প্রকাশ দেখতে পাই। এমনকি জীবনানন্দের বিশেষ প্রবণতা বোঝাতে এই কবিতাটির মূল্য আছে। কবিতার কথা জানতে গেলে জীবনানন্দের সুখ্যাত কবিতাগুলির পাশে এটির মূল্য আছে। জীবনানন্দের কাব্যিক জীবনের প্রাথমিক ভাঙচুরের কথাও এই কবিতা থেকে জানতে পারি। অন্যদিকে এটি সংক্ষিপ্ত নয়, দীর্ঘ কবিতা। এর মধ্যে কাহিনি বয়নের ঢং আছে। প্রাচীনকালের নারী থেকে একালীন পণ্যার মধ্যে নারীচেতনার একটা পরিবর্তনস্রোত লক্ষ করা যায়। সংলাপ আছে। আসলে এটি ছোটোগল্প না হয়ে কীভাবে কবিতা হল,

বিষয়ানুবন্ধতার দায় এড়িয়ে প্রমুখণ কৌশলে আমাদের কাছে জীবন্ত রূপক হল, তা এক আকর্ষণীয় ব্যাপার। এই ব্যাপার কীভাবে কবিমনে ও লেখনে প্রকাশ পেয়েছে, তার হদিশ এবার নেওয়া যাক।

কবিতাটির শুরুতে এক গল্পের আসর, যেখানে কবিই কথক। তিনি রূপকথা শোনান উপস্থিত সকলকে, এমনকি রূপকথার নায়ক (রাজ)কুমারকেও। একটি নিঃসাড় পুরী, পাহাড়, পালংকে শোয়া রাজকন্যার শরীর—রূপকথার সব আয়োজনই তিনি করেছেন। কিন্তু রূপকথার গল্পে লেখকের নিজের কথা থাকত না। একজন রূপসীর সন্ধানে পৃথিবীর পথে ঘুরে ঘুরে সেই রাজকন্যার সন্ধান তিনি পেয়েছেন। রাজকন্যা ঘুমের অতলে। কবি তার পাষাণের মতো হাতে প্রাণ জাগাতে পারেননি। এমনও সংশয় জেগেছে যে, হৃদয় থাকলেও তা কবির জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই বিনতি জাগে যদি রাজকুমার তার হাত ধরে হৃদস্পন্দন জাগান। এখানে প্রথম গল্প বা অংশের সমাপ্তি। এ যুগের লেখক রূপকথার জগতে প্রাণের স্পন্দন শুনতে পেলেন না। তার কারণ তিনি বুঝেছেন যে ঐ জগৎ আগেকার, সেখানে আধুনিক মানুষের হাত দিয়ে দ্বার খোলার উপায় নেই। আবার ঐসব অসাধারণ রূপবতীদের রূপ থাকলেও জীবন্ত ছিল না।

রাজকন্যার রূপচিত্রটি উদ্ধার করা যাক :

মসৃণ হাড়ের মত শাদা হাত দুটি,
বুকের উপরে তার রয়েছিল উঠি।
আসিবে না গতি যেন কোনদিন তাহার দু'পায়ে;
পাথরের মত শাদা পায়ে
এর যেন কোনদিন ছিল না হৃদয়

মসৃণ হাড়ের মতো শাদা হাত, পাথরের মতো গা আর যাই হোক জীবনের নয়। এই শুভ্রতা আমাদের কাছে প্রশংসনীয় নয়। যেমন বাংলায় আছে ক্যাটক্যাটে সাদা। আবার হাড় এবং পাথরের তুলনা একটা কাঠিন্য এবং নিষ্প্রাণতা সঞ্চার করেছে রাজকুমারীর ছবিতে।

(রাজ)কুমার দ্বিতীয় গল্পের কথক। তার চোখে নারীর অন্য রূপ ফুটে ওঠে। সেও ঘুমন্ত। এখানে পাহাড় নেই, নিস্তব্ধতা নেই, নদী আছে। সে নারী মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার মতো নয়, 'কিংবা—হবে তাই'। বসন্তের আহ্বানে তাকে দেখেছিলেন নদীর কিনারে 'জমানো ফেনার মত'। এ নারীও অচেতন। হাতির দাঁতের মতন শাদা হাতে শাদা স্তন ঢেকে সে শুয়ে আছে। এই দেখাও মায়াবী। নিবু-নিবু জ্যোৎস্নায় এই ছবি, স্বপ্নের এই প্রাণহীন প্রতিমা দিন বা বাস্তবতার প্রখর আলোয় মুছে যায়। রাজকুমার তার সন্ধান করেন। এ তো গেল প্রসঙ্গের কথা। নদীর দেশ বলতে গিয়ে যাতে আমরা বাস্তবের পরিচিত নদীর সঙ্গে তাকে মেলাতে না যাই, সেজন্য জীবনানন্দ তাঁর বিশেষ ধরনে জানান :

(পদ্মা-ভাগীরথী-মেঘনা—কোন্ নদী যে সে,—
সেসব জানি কি আমি!—হয়তো বা তোমাদের দেশে
সেই নদী আজ আর নাই—
আমি তবু তার পাড়ে আজো তো দাঁড়াই!)

বিরামচিহ্নগুলি এভাবে প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এক যুক্তির শৃঙ্খলা চোখের আড়ালে থাকে না। আবার 'ঘুম ফেঁসে যায়', 'ঘুম খসা'-র মতো ইতর শব্দ ব্যবহার করেছেন রূপকথার জগৎ আঁকতে। তবু বুঝি এ নারী

স্বপ্নে এলেও এর মধ্যে বাস্তবতার বীজ আছে। একটি বাস্তবতা, আবার ভিতরে অবাস্তবতার, কল্পনার সুর বোনা হল। বাসন্তী নারীর স্বপ্ন দর্শন রাজকুমারীর রূপের থেকে আলাদা। লক্ষণীয় যে অতীতের ধূসরতা, নিষ্প্রাণতা বোঝাতে শাদা বিশেষণটিকে কবি ছেড়ে দিতে পারেননি।

তৃতীয় গল্প আসে। এখানে পটও বদলে যায়। উত্তর সাগরের জল মেয়েদের কথা ওঠে। পাহাড়-নদীর প্রেক্ষিত বদলে সাগরের জলে এদের ভাসমান ছবি কবি আঁকেন। স্থল এখানে নেই। তাই বাস্তবের রক্তমাংসের সজীবতা (কাঁকরের রক্ত) সে দেখেনি।

এদের শরীর আগের দুই নারীর মতোই আবছা রহস্যময়তায় ঢাকা। এদের স্তন ঠান্ডা, শাদা বরফের কুচির মতন। ফেনার শেমিজের মধ্যে সারা শরীর পিছল। এদের চুল রূপোর কুচির মতো উজ্জ্বল। কাচের গুঁড়ির মতো শিশিরের জল চাঁদের বুক থেকে সাগরের বুকে ঝরে পড়ে দৃশ্যটিকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে। সমস্ত পরিবেশ আবছা, আর্দ্র এবং শীতল হয়ে যায়। এই শীতল জগতেও প্রাণ নেই। তারাও ফেনার মতো ঠান্ডা আর শাদা। এই অংশেও সাগরকন্যাদের (মারমেইড?) রূপ আঁকতে গিয়ে সাধারণ শব্দের ব্যবহার কমে নি (বরফের কুচি, শেমিজ, পিছল, ঝিকমিক, মুক বুক ভিজে ইত্যাদি) পাশাপাশি 'কাচের গুঁড়ির মত শিশিরের জল' অংশটি দুবার আবৃত্ত হয়েছে। কবি উপমায় তাদের রহস্যঘেরা আবহাওয়া ফুটিয়ে তুলবেন, এমন বাসনাই কাজ করেছে। আবার সমুদ্রের জল যেমন তরঙ্গিতভাবে বয়ে চলে, তেমনিই পুরো অংশ এক বহমানতা বজায় রেখেছে।

তিনটি গল্প, নাকি আরও হয়? সব কথা থেমে গেলে কবির মনে জীবনের নশ্বরতা, অনাগত কবির আবির্ভাব কথা জাগে। রূপকথার রূপসীর ছবি প্রাচীন কাল থেকে যেমন আঁকা হয়েছে, নূতন কবিও (যিনি তন্ময় অথচ শৌখীন) বসন্তের গান গাইবেন। একটি নারীর রূপচিত্র আসে। এই নারী নিথর হলেও কবিমনে প্রতিক্রিয়া জাগাবে। এর শরীর ছুঁলে দেখা যাবে পাথরের মতো হাত, শরীরে ননীর ছিরি (শ্রী)। অথচ তা হিরের ছুরির মতো শাণিত, চুল মেঘের মতো। এরই টানে কত মৃত মানুষের হাড় পাহাড় গড়েছে। অর্থাৎ এই রূপসীকে কেন্দ্র করে মানুষে-মানুষে লড়াই বেঁধেছে। প্রশ্ন ওঠে :

> হাড়েরই কাঠামো শুধু—তারি মাঝে কোনদিন হৃদয়-মমতা
> ছিল কই?

নারীর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। বাকি রূপবর্ণনা মনে হয় মিথ্যা। কেননা সেই নারী ভাষাহারা, নিথর। নূতন কবি যুগপ্রথাবশে সেই পাথর থেকে নারীহৃদয় গড়ে তুলতে পারবেন কি? শুধু প্রশ্নবাক্যের মালা সাজানো এখানে। সংশয় উদ্বেগ কাজ করে গেছে। চারজন নারীই যে জীবন্ত মানবী নয়, 'শুধু পটে লিখা'—এমন আমরা বুঝতে পারি।

সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ গল্পে একটা নূতন দিক সঞ্চারিত হল নারী নিয়ে যুদ্ধের প্রসঙ্গে। নারীকে কামনার ধন জেনে নিজের সর্বস্ব সমর্পণের, আত্মবিসর্জনের অতীত এবং বর্তমান রচিত হল।

এই নারীরূপ বাস্তবের নয় বলে শ্রোতাদের একজন (নাকি সে কবিরই অন্য চেহারা?) ঐ গল্পগুলিকে 'তেপান্তরে' বলে উপহাস করল। সে অনুমান কল্পনার বিরোধী :

হয় তো অমনি হবে—দেখিনিকো তাহা,
কিন্তু শোনো,—স্বপ্ন নয়,—আমাদেরি দেশে কবে, আহা!—
যেখানে মায়াবী নাই,—জাদু নাই কোনো,—
এ দেশের—গাল নয়,—গল্প নয়, দু-একটা শাদা কথা শোনো!

এই গল্পে পাহাড়, নদী, সাগরের উল্লেখ নেই। একটি রোদে-পোড়া লাল দিনের কথা আছে জ্যোৎস্না, তারার আলোর বদলে। ঘুমভাঙানিয়া চোখে 'ছেঁড়া করবীর মত মেঘের আলোকে' এক রূপসীকে তিনি দেখেন খাটের উপর (পালংকে নয়) শায়িত অবস্থায়। অনেক রূপকথার গল্পে পড়া ঘুমন্ত কন্যার স্মৃতির সঙ্গে একে মেলাতে চান। কিন্তু দেখেন যে :

এ ঘুমানো মেয়ে
পৃথিবীর,—মানুষের দেশের মতন;
রূপ ঝরে যায়, তবু করে যারা সৌন্দর্যের মিছা আয়োজন
যে যৌবন ছিঁড়ে ফেড়ে যায়,
যারা ভয় পায়
আয়নায় তার ছবি দেখে!—

এর শরীরে নিষ্প্রাণতা নেই। কিন্তু পৃথিবীর স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে, তাতে ঘুণ ধরে গেছে। বুকের মধ্যে এদের ক্ষুধা নেই, আছে ব্যর্থতা। সাধহীন, সুখহীন এদের দিন কাটে। আরও চোখে পড়ে এদের চোখে ঠোঁটে অসুখের আক্রমণের চিহ্ন। কী যেন এদের কুরে কুরে খেয়েছে। এদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী দেবতা, গন্ধর্ব, নাগ, পশু ও মানুষ। এই নারীর ছবি পণ্যা নারীর। অথচ একে মেনে নিতে, (বাস্তবকে) অন্য শ্রোতারা অস্বীকার করল। এ নারী কথা বলে দ্বিতীয় সন্ধ্যা কাটানোর আমন্ত্রণ জানায়।

এ নারী নীরব নয় বলে সংলাপ আসে। এ নারী জীবন্ত তাই :

কালো খোঁপা ফেলিত খসায়ে,—
কি কথা বলিতে গিয়ে থেমে যেত শেষে
ফিক্ করে হেসে।....
খোঁপা বেঁধে ফের খোঁপা ফেলিত খসায়ে,—
সরে যেত দেয়ালের গায়ে
রহিত দাঁড়ায়ে

কবির সহানুভূতি জাগে। এখানে দৃষ্টির সংযোগহীনতার কথা আসে। তবু কান্নাভেজা চোখ দুটি বেদনা দেয়। তার আমন্ত্রণ আবার আসে। সংলাপের মালা তৈরি হয়। আগের বর্ণনাধর্মিতা ছেড়ে সংলাপের মধ্যে এই গল্প এগোয়। কবি দেখা দিলে সে আত্মপরিচয় দেয় :

বলিল সে, 'তোমার বকুল—
মনে আছে'—এগুলো কি? বাসি চাঁপাফুল?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে',—'ভালোবাস'?—হাসি পেল—হাসি!

গণিকার আবার ভালবাসা অথবা তাকে ভালবাসার প্রশ্ন এই সৌন্দর্য তান্ত্রিকের মনে হাসির সঞ্চার করে। মেয়েটি বোঝে যে, ভালবাসার প্রশ্ন এই জীবনে অর্থহীন। তাই ফুলের সঙ্গে তুলনা করে জানায় :

'ফুলগুলো বাসি নয়,—আমি শুধু বাসি!'

নারীর পণ্যারূপের আড়ালে এভাবেই তার হৃদয় নির্মম স্বীকারোক্তি জানায়। আমরাও আবেগে অভিভূত হয়ে পড়ি।

কবি পাঠকের বিচলনের কথা ভেবে বাস্তবতার শেষ আঘাত হানেন :

জটার মতন খোঁপা অন্ধকারে খসিয়া গিয়াছে,—
আজো এত চুল!
চেয়ে দেখি,—দুটো হাত, কখানা আঙুল
একবার চুপে তুলে ধরি
চোখ দুটো চূণ-চূণ—মুখ খড়ি-খড়ি
থুতনিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি
সব বাসি—সব বাসি,—একেবারে মেকি!

রুক্ষ চুল, বিবর্ণ চোখ-মুখ স্বপ্নের নারীকে বাস্তবে আছড়ে ফেলে। আগের নারীরা ছিল নিষ্প্রাণ। এ নারীর প্রাণ আছে। কিন্তু লোভী মানুষ একে 'ফোঁপরার মতে করে' শুষে নিয়েছে। নারীর এই অমানী রূপ আমাদের বেদনার্ত করে।

এই কবিতাটিতে কথিকা-গল্পের একটা ঢং আছে। কিন্তু তারা এসেছে যুগে যুগে নারীকল্পনার অবাস্তবতা বোঝাতে। বাস্তবের নারী যখন আসে, তখন তার মধ্যে প্রেমহীনতা কিংবা প্রেমকে পণ্য করার রূপ স্পষ্ট হয়। জীবনানন্দ দাশ ক্রমান্বয়ে পাঠকের সামনে নারীর নানা রূপ ফুটিয়ে তোলেন। শেষ পর্যন্ত নারীর পণ্যা রূপে যুগের কৃত্রিম সৌন্দর্যঘোষণাকে উপহাস করেন। তাই প্রথম দিকের শব্দ-আয়োজন অনেক বেশি তৎসমবহুল। আর পণ্যা নারীর ছবি ও সংলাপ সাজাতে আশ্রয় নেন কথ্য গদ্যের এবং দেশি-ইতর শব্দের—ছেঁড়া ফাড়া যৌবন, শরীরের ঘুণ, অসাধ, খেয়ে নেওয়া, ফোঁপরার মত শোষা, খাটের উপরে পড়ে থাকা, ফিক্ করে হাসা, খোঁপা খসিয়ে ফেলা, চোখাচোখি, বাসি, আঁচলের খুঁট, চূণ-চূণ চোখ, খড়ি-খড়ি মুখ, মেকি। জীবনের রুক্ষতা বোঝাতে এই শব্দগুলি অনিবার্য ছিল।

আবার সংলাপ অংশে জীবনানন্দ জীবনকে মান্য করেছেন। এখানে সংলাপ বানানো হতে পারে না। জীবন থেকে উঠে আসা এসব কথাবার্তা একটি বাস্তব আবহাওয়া গড়ে তুলেছে। এই প্রসঙ্গ অনুযায়ী ভাষার ব্যবহার, আবার তাতে কাব্যিক দৃষ্টিযোগ কবিতাটিকে কবিতা করে তুলেছে।

প্রবহমানতার কথা আগে তুলেছিলাম। এবারে দৈর্ঘ্য বা পঙ্ক্তির অসমান ব্যবহার ভাবা যাক। সমিল প্রবহমান পয়ার ছন্দ এখানে লেখকের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। ভালো কবিতায় এভাবে ছন্দ অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে।

এবার ওঠে পরিকল্পনার কথা। কয়েকটি চরিত্র এনে গল্পের আভাস জাগলেও, কথাবার্তার আবহাওয়া রচিত হলেও কবির চোখে নারীর রূপ আড়ালে থাকে নি। এই কবিতাটি দীর্ঘ। কেননা যুগে যুগে অঙ্কিত নারীরূপের

অসারতা দেখানো হয়েছে। 'সোনার আঁচল খসা, হাতে দীপশিখা' করে যে নারীকে রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন, সেই কল্যাণময়ীর ব্যাবহারিক রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যুগের কথা বা বাণী (স্পিরিট অব্ দা এজ) এভাবে কবিব্যক্তিত্বের (স্ট্যাম্প অব্ পার্সোনালিটি) স্পর্শে নবরূপ পায়।

❑ উৎসগ্রন্থ ও প্রবন্ধ

১-২. আশিসকুমার দে (১৯৮৭), 'আধুনিক বাংলা কবিতা : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ', শিলালিপি।
(১৯৯০) 'আধুনিক বাংলা কবিতা : কৃত্রিমতার ধারণা', সমন্বয়ে, হুগলি।

৩. পবিত্র সরকার (১৯৮৫), 'গদ্যরীতি পদ্যরীতি', সাহিত্যলোক।

৪. শিশিরকুমার দাশ (১৯৮৬), 'গদ্য পদ্যের দ্বন্দ্ব', দেজ পাবলিশিং।

একক ৩ ❑ গদ্যের শৈলী

৩.১ গদ্যকে কীভাবে দেখেছি

৩.২ যুক্তির গদ্য, সৃষ্টির গদ্য

৩.৩ গদ্যশৈলীবিচার ও শৈলীবিজ্ঞান

৩.৪ ভাষাদর্শ (নর্ম) এবং সরে-আসা (ডেভিয়েশন)

৩.৫ ভাষার পরিবর্তক (ভ্যারিয়ান্ট) এবং উপলক্ষ্য (কনটেক্সট)

৩.৬ গদ্যের শৈলীবিচারের মানক

৩.৭ উদাহরণমালা : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা'

৩.১ ❑ গদ্যকে কীভাবে দেখেছি

কবিতার শৈলী নিয়ে আলোচনার পর আমরা গদ্যের শৈলীর দিকে তাকাতে পারি। গদ্যভাষা নিয়ে লেখাপত্র খুব জরুরি। কেননা বাংলা গদ্য নিয়ে আলোচনা খুব কম। কবিতা নিয়ে ভাবলে যেমন হাজারটা অনুভূতির দরজা খুলে যায়, তেমনি গদ্যশৈলীকে দেখলে বোধের বন্ধ দরজাটা খোলে। লেখকের মানসিক কর্মশালার আরেক কাজের ধরন জানতে পারি।

সাধারণভাবে একাল অবধি চলে আসা অলংকারশাস্ত্রে গদ্যের শৈলীভাগ স্বীকার করা হয়—উঁচু (মহান), মাঝারি (মধ্যম), নীচু (সাধারণ)। আরিস্টটল তাঁর রিটোরিকসে একে বলেছেন—গ্রেড, মিডল, লো স্টাইল। এ প্রসঙ্গে পূর্ব-আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, কোথাও কোথাও তিনটি মিলে যাচ্ছে এবং একটি অপরটিতে আরোহ-অবরোহ করছে—এই জটিল প্রশ্নের সমাধান সমালোচকের চোখের বাইরে থেকেছে।

গদ্যশৈলীর আলোচনায় আবার যুগ্ম-বৈপরীত্য (বাইনারি অপোজিশন) ধারণা ব্যবহার করি। যেমন, এম. এইচ. আব্রামস বলেছিলেন পর্যাবৃত্ত (পিরিওডিক)-অপর্যাবৃত্ত (নন-পিরিওডিক) অথবা সংযোজকঅব্যয়হীন (প্যারাট্যাক্সিস)-সংযোজক অব্যয়যুক্ত (হাইপোট্যাক্সিস) বাক্যের কথা। 'পর্যাবৃত্ত' বলতে বাক্যের শেষে ভাবনার ছেদ, বক্তৃতার ঢং বা নিয়মবাঁধা রূপ ভাবা হয়েছে। আর 'অপর্যাবৃত্তে' শৈলী এলায়িত (লুজ বা রিলাক্সড), সংলাপ-ঘেঁষা। একই বাক্যে অনেক উপবাক্য কিংবা নিরপেক্ষ সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত বাক্যমালাকে বলা হয়েছে 'প্যারাট্যাক্সিস'। আবার অব্যয়যুক্ত বাক্যের গড়ন অনেকটা পর্যাবৃত্তের মতো—জাগতিক যুক্তির সম্পর্কে বাঁধা। 'যখন....তখন, কারণ, সুতরাং, জন্যে, ফলে'—অধিবাক্যাংশ (ফ্রেজ) বা উপবাক্যাংশ (ক্লজ)-এর সাহায্যে গঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে অপর্যাবৃত্ত বা সংযোজক অব্যয়হীন বাক্য হল সরল বাক্য। আর পর্যাবত্ত বা অব্যয়যুক্ত বাক্য হল জটিল বাক্যের নামান্তর একটু ভিন্নমাত্রাসহ। নর্থ্রপ ফ্রাই তাঁর 'দা ওয়েল-টেম্পারড ক্রিটিক' (১৯৬৪) বইয়ে এই

শৈলীবিভাজন করেছেন লৌকিক (ডেমোটিক) এবং শিষ্ট (হায়ারাটিক) নামে। 'লৌকিক' হল সাধারণ মানুষের ভাষা, ছন্দস্পন্দ ও অনুষঙ্গজাত আর 'শিষ্ট' হল নিয়মে-বাঁধা বিশদীকরণ যা সাধারণ ভাষা থেকে আলাদা। দুটিরই আবার উঁচু-নীচু-মাঝারি ভেদ আছে। লক্ষ করার মতো যে, আব্রামসের বক্তব্যের ভিত হল বাক্যের গড়ন আর ফ্রাইয়ের চলতি ও সাহিত্যিক ভাষাভেদের ধারণা। এ ধরনের যুগ্ম বৈপরীত্যবাদ গদ্যশৈলী বিশ্লেষণকে কঠিন করে।

অন্যদিকে গদ্য আলোচনায় আমরা কয়েকটি 'লেবেলিং' লক্ষ করি। যেমন,

১. প্রচল শৈলীধারণা : খাঁটি, অলংকৃত, সাজানো, কৃত্রিম, সহজ, সরল, বিশদ

২. সাহিত্যপর্যায় বা প্রথা : ফোর্ট উইলিয়মের গদ্য, তৎসমপ্রধান গদ্যশৈলী

৩. প্রভাবজাত রূপ : মহাকাব্যিক শৈলী

৪. প্রায়োগিক : বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিকসুলভ

৫. বিশেষত্ববোধক : রাবীন্দ্রিক, বঙ্কিমী, প্রমথীয়

এই লেবেলগুলো আমাদের সমালোচনার সুবিধার জন্য গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই বিচার নিরপেক্ষ নয়। যেমন, 'খাঁটি' বিশেষণটি ভাববাদী আবার 'সরল' বললে অতিভাষণ হয়। কেননা সরল লেখা কঠিন। আর অতিসরল লেখা ছাত্রপাঠ্য বস্তু। অন্যান্য বিভাগগুলো যুগপ্রভাব, অতীত প্রভাব, বিষয়ানুসারিতা কিংবা লেখকের বিশেষত্বকে প্রকাশ করেছে। তবে গদ্যশৈলী বিচারে প্রথমটি বাদ দিলে বাকি কটির গ্রহণযোগ্যতা আছে।

৩.২ ❑ যুক্তির গদ্য, সৃষ্টি গদ্য

আবার গদ্য যেহেতু পদ্যের বিপরীত, তাই যা কিছু পদ্য নয়, তাকেই গদ্য আখ্যা দিই। ফলে গদ্যের আওতায় পড়ে প্রবন্ধ, লিখিত ভাষণ, চিঠি, নাটক, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি। গদ্যের যে দুটি রূপ আছে, একথা সমালোচনায় আমরা মেনে নিই না। ভাষায় যেমন জ্ঞানমূলক এবং সৃষ্টিমূলক দুটি দিক আছে, গদ্যেরও তাই। অভিধাটি মনে থাকে না বলে লেখকের যুক্তির গদ্য আর সৃষ্টির গদ্যের বৈশিষ্ট্য একইভাবে বিচার করি। যুক্তির গদ্যে প্রার্থিত হল—সংক্ষিপ্ততা, ভারসাম্য, নিয়মানুগত্য এবং বিষয়ানুবন্ধতা। অন্যদিকে সৃষ্টির গদ্যে যুক্তির গদ্যের গুণগুলিকে চরম বলে ধরা হয় না। আবার যুক্তির গদ্যেও সৃষ্টির স্থান আছে। কেননা একজন সচেতন সামাজিক মানুষই যুক্তির গদ্য লেখে। সৃষ্টির গদ্যে বিষয় শুধু জ্ঞানজগৎ নয়, মানবচরিত্র। কাজেই অনুভূতির দোলাচল আঁকতে গিয়ে লেখকরা যুক্তির সোপান, ব্যাকরণের নিয়মকে লঙ্ঘন করেন। আমরা পাঠকরা তাই উপন্যাস, গল্প, নাটকে গদ্যের শরীর দেখি না—খুঁজি তার প্রতিক্রিয়াকে। কেননা রসিকের চিন্তা : সৃষ্টি গদ্য ভাবতে গেলে যদি সৃষ্টিটাই হারিয়ে যায়। অথচ প্রাবন্ধিকের গদ্যে যুক্তি-তর্কের শিকলি যেমন তার বোধ-বোধির ফল, তেমনি সৃষ্টির গদ্যেও ভালো করে লক্ষ করলে সাহিত্যিকের মনের খবর জানা যায়। সাহিত্যিক গদ্যকে নিজের প্রয়োজনে ভাঙচুর করেন, আর একান্ত যুক্তির গদ্যকার বন্ধন মেনেই নিজের বক্তব্যকে হাজির করেন।

কিন্তু দু স্থলেই মনের খোরাক থাকে। প্রথম স্থলে প্রিয় অনুভব বা মানবজীবন ব্যাখ্যার আনন্দ, আর দ্বিতীয় স্থলে থাকে জ্ঞানজগতে ভ্রমণের মাধুর্য বা প্রথম স্থলে পাওয়া আনন্দের ব্যাখ্যা (অর্থাৎ সাহিত্যসমালোচনা)। তবু যুক্তির গদ্য যতটা ধীরচারী, সৃষ্টির গদ্য তা নয়। এছাড়া ইতিহাস থেকে জানা যায়, যুক্তির গদ্য আগে জন্মেছে,

তারপর সৃষ্টির গদ্য। তাই যুক্তির ছকটা না জেনে সৃষ্টির খাতিরে গদ্যের চর্চা চলে না। তবে সৃষ্টির গদ্যের শৈলী বিচারে আমরা কৃতি-অতিরিক্ত (এক্সট্রা-টেক্সচুয়াল) বিষয় যতটা এনে ফেলি, যুক্তির গদ্যে তার সম্ভাবনা কম। একটি উপন্যাসের শৈলী বিচারে তার পরিবেশ, সমাজ তত্ত্ব, বিশেষ শ্রেণীচেতনা, অভিজ্ঞতা যতটা সক্রিয়, যুক্তির গদ্যে তার সুযোগ কম। কেননা যুক্তির গদ্য লেখা হয় কয়েকটি কারণকে কেন্দ্র করে—

১. নূতন তত্ত্বের উপস্থাপনা

২. বিজ্ঞান-বাণিজ্য বিষয় প্রচার

৩. নিজের জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা

৪. ইতিহাস, ভূগোলাদির পরিচয়

৫. কোনো সামাজিক বা অন্য বিতর্কের সৃষ্টি

৬. ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থের অভাব

৭. ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি তাত্ত্বিক বিষয়ের জটিলতা ভঙ্গ

৮. মাতৃভাষার প্রকাশক্ষমতা পরীক্ষা

৯. সৃষ্টির গদ্যের ব্যাখ্যা

১০. সৃষ্টির গদ্যে প্রকাশের অযোগ্য বিষয়ের জন্য

এই দশটি কারণ এসেছে লেখকের মনের গড়ন, যুগের দাবি কিংবা সামাজিক উপযোগিতাকে নির্ভর করে। যুক্তি ও সৃষ্টি—গদ্যের এই দোরাস্তার প্রথমটির ইতিহাসক্রম জানতে পারি। সৃষ্টির গদ্য নিয়ে আমরা নীরবতা হিরণ্ময় মনে করি। অথচ দুটো রাস্তারই হদিশ যদি আমরা রাখতাম, তাহলে সাহিত্য-ভাষার পালাবদল ব্যাখ্যাত হতে পারত। সৃষ্টির গদ্যের অসংখ্য শিকড়মূল পরে ব্যাখ্যাত হবে বলে আপাতত আমরা যুক্তির গদ্যের শরীর নিয়ে আলোচনা সীমিত রাখব।

আব্রামস বা ফ্রাইয়ের মত অতি-সাধারণ। আবার গদ্যশৈলীর ব্যাখ্যায় পেটারের 'ইউনিক ওয়ার্ড থিওরী' বা মারীর 'টু স্টাইল থিওরী' একেবারে রোমান্টিক। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে শৈলী খুঁজলে দণ্ডী বা কুন্তকের কথা মনে আসে। কিন্তু এদের দুজনের ধারণা শৈলীধারণার সঙ্গে একার্থক নয়। একালে আমরা যখন গদ্যশৈলী দেখি, তখন হয় ব্যাকরণ অঙ্গগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিই (বীপ্সা গণনা/ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্টিং) কিংবা উপলক্ষ্য অনুযায়ী ভাষার প্রয়োগ (কনটেক্সট অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ) খুঁজি। কখনও মনে হয় গদ্যের ছন্দস্পন্দ যিনি বুঝেছেন, তিনি প্রকৃত গদ্যশৈলীকার (যেমন, বিদ্যাসাগর মূল্যায়ন)। গদ্যশৈলী বলতে শুধু অন্বয় বা পদগণনার কঠোরতা বা প্রসঙ্গ-ভাষার সমঝোতা বোঝায় না, আরও কিছু বোঝায়। যুক্তির গদ্যেও যে লেখকরা বিশেষ অন্বয়-কৌশল, নূতন শব্দের সৃষ্টি করেন এবং পুরাতন শব্দে নূতন মাত্রা আনেন অথবা প্রচল গদ্যপথ থেকে সরে আসেন, তাও বোঝায়।

আবার গদ্যশৈলী দেখতে গিয়ে. কারোর ক্ষেত্রে স্বদেশি বা বিদেশি প্রভাব লক্ষ করি ও বলি, বিদ্যাসাগর সংস্কৃতানুসারী, প্রমথ চৌধুরী ফরাসিস কিংবা সুধীন্দ্রনাথ জর্মন রীতির গদ্য লিখতেন। এই বলার পেছনে এঁদের পড়াশোনার পরিধি বা ভালো-লাগা সাহিত্যবোধ সক্রিয় ছিল। অথচ ফরাসি বা জর্মন রীতির গদ্য বাংলায় এলে

তা কতদূর বাংলা হবে, এ কথা ভাবি না। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতানুসারিতার লেবেল পাওয়ার কারণ তাঁর শৈলীতে তৎসম শব্দ বা সমাজের প্রভাব। কোনো সমালোচকই পাশাপাশি সংস্কৃত, ফরাসি, জর্মন গদ্যশৈলীর নমুনা দেখাননি।

স্বদেশি বা বিদেশি প্রভাব শৈলীতে মন্থরতা, সজীবতা বা তর্কের তীক্ষ্নতা আনতে পারে। সেটাও লেখকমনে বহিরঙ্গ প্রভাব স্বীকার করা। এখানেও লেখকমনের বিশেষত্বটুকু অনুধাবনীয়। তাই অন্বয়, শব্দভাণ্ডার, প্রসঙ্গানুযায়ী ভাষার মানক লেখকের ক্ষেত্রে স্থির থাকে না, তা পালটে যায়। আগেই যদি গদ্যশৈলীর মানকগুলি বীপ্সাগণনা বা অন্বয়বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভর করে, তাহলে বিচার দূর অস্ত্ হয়ে দাঁড়ায়। সৃষ্টির রাজ্যে সাহিত্যিক যেমন নিজের প্রতিটি পর্যায়কে অতিক্রম করেন, তেমনি গদ্যশৈলীও স্থির নয়, বিশেষ লেখকের ক্ষেত্রেও পরিবর্তমান। গদ্যের ইতিহাসে যদি অগ্রগতি-পরম্পরা ভাবি, তাহলে এখানেও তা ভাবতে হবে। তবু গদ্যশৈলী নিয়মহীন নয়। তাও লেখকের মন-বুদ্ধির ফসল, এটা মনে রাখা দরকার।

৩.৩ ❑ গদ্যশৈলীবিচার ও শৈলীবিজ্ঞান

শৈলীবিজ্ঞানের তিনটি মহলের কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। একটি মহলে শৈলীবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানের শাখা, সেখানে তা শৈলীভাষাবিজ্ঞান। দ্বিতীয় মহলে এটি হল সাহিত্যালোচনার উপশাখা বা সাহিত্যশৈলীবিজ্ঞান (লিটারারি স্টাইলিস্টিকস্)। আর শেষ মহলে এটি প্রয়োজনে ভাষাবিজ্ঞান ও প্রচলিত সমালোচনার সাহায্য নেয়, সেখানে এর নাম স্বাধীন বা সাধারণ শৈলীবিজ্ঞান (জেনারেল বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টাইলিস্টিকস্)। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মহল প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যভাষার উপর বেশি জোর দেয়। কিন্তু প্রথমটি ভাষা-বিজ্ঞানের যুক্তিকে বেশি আশ্রয় করে। সাহিত্যের নানান বাঁকের কথা ভাবলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় মহলই আমাদের উপকারে আসে। যুক্তির গদ্যের বিচারে শৈলীভাষাবিজ্ঞান (স্টাইলোলিংগুইস্টিকস্) বেশি সক্রিয় এবং উপযোগী। গদ্যের বিচারকালে নির্দেশমূলক (প্রেশক্রিপটিভ), বর্ণনামূলক (ডেসক্রিপটিভ) এবং ঐতিহাসিক-তুলনামূলক (হিস্টোরিক্যাল কম্পারেটিভ) ব্যাকরণ ছাড়াও বৈপরীত্য (কনট্রাস্টিভ) এবং রূপান্তরী-সঞ্জননী (ট্রান্সফর্মেশনাল জেনারেটিভ) ব্যাকরণেরও প্রয়োজন কম নয়। কিন্তু বাংলায় শেষ দুই জাতের ব্যাকরণ আজও পুরোপুরি না হওয়ায় আমাদের আলোচনা আংশিকতার লক্ষণ নিয়ে প্রকাশ পাবে। আবার প্রচল ব্যাকরণের পথেও লেখকের গদ্যভঙ্গির বিস্তৃত বর্ণনামূলক কাজ এখনও সর্বাংশে হয়নি। ব্যাকরণ এবং লিখিত গদ্যের আদর্শ, আবার তা থেকে লেখকের সরে-আসা (ডেভিয়েশন) মৌলিকতা নিয়ে কথা বলাই এই অংশের বিষয়।

৩.৪ ❑ ভাষাদর্শ (নর্ম) এবং সরে আসা (ডেভিয়েশন)

ভাষাদর্শ নিয়ে মতবিরোধের শেষ নেই। 'আদর্শ' বললেই কি ব্যাকরণগত রূপ কিংবা বিশেষ পর্বের লেখকদের, একজন প্রভাবশালী লেখকের কথা মনে আসে? যেমন, ফোর্ট উইলিয়মের ভাষাদর্শ, রামমোহনের ভাষাদর্শ থেকে বিদ্যাসাগর প্রমুখ সরে এসেছিলেন। এখানে ব্যাকরণগত রূপবদল পূর্বোক্তরা ঘটিয়েছেন। আবার তাদের প্রতিষ্ঠিত লেখ্য গদ্যের রূপ পরে পালটেছে। এভাবে আদর্শ ভেঙে আরেক আদর্শ গড়ে ওঠে। এই সরে-

আসা প্রচলিত লেখ্য ভাষার ধরন থেকে; কোনো আদর্শ, ব্যক্তিত্ব বা শৈলীবর্জিত কোনো পদ্ধতি থেকে নয়। আলালের ভাষা বা হুতোমী ভাষা কোনোক্রমেই রামমোহনী বা বিদ্যাসাগরী নয়। আবার বঙ্কিমী ভাষা থেকে সেই পর্বে অনেকেই মুক্তির চেষ্টা করেছিলেন। অর্থাৎ একটি সর্বজনীন ভাষাদর্শ থেকে অনেকে সরে আসে। এই সরে-আসা সবসময় ঘটে, এখনও হয়। অনেকে তো দেখি প্রতিষ্ঠিতের মতোই কলম ধরতে চান সজ্ঞানে। এভাবেই বঙ্কিমী গোষ্ঠী কিংবা রাবীন্দ্রিক মহল তৈরি হয়েছিল। এখানে লেখকরা আলাদা হতে চাইছেন না, বরং আঁকড়ে থাকতে চাইছেন। এই আঁকড়ে থাকার স্বভাব বা সংসক্তি (কনফর্মিটি) লেখকক্ষমতার উপরে নির্ভর করে। যেখানে তিনি ঠিকমতো অনুসরণে ব্যর্থ হন, সেখানে তার ব্যর্থতাগুলি অক্ষমতার পরিচায়ক। তাই শুধু আদর্শ থেকে সরে-আসা নয়, তাকে আঁকড়ে ধরার ব্যক্তিগত বা দলগত প্রয়াসও শৈলীর বৈচিত্র্য গড়ে তোলে।

৩.৫ ❑ ভাষার পরিবর্তক (ভ্যারিয়ান্ট) এবং উপলক্ষ্য (কনটেক্সট)

ভাষার পরিবর্তক এবং প্রসঙ্গকে দুভাবে দেখা যায় :

১. উপলক্ষ্য বর্গীকরণ (কনটেক্সচুয়াল ক্লাসিফিকেশন) : একটি কৃতির উপলক্ষ্য নির্দেশ করে আমরা সেখানে কী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, তা দেখতে পারি। যেমন উনিশ শতকের সাধারণ গদ্য এবং 'শকুন্তলা'। আবার উলটোভাবেও এটি করা যায়। যেমন, উনিশ শতকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাষা ব্যবহারের একটি বিশেষত্ব উদ্ধার করা এবং তাকে 'প্রাচীন' নামে চিহ্নিত করা। বাস্তবে আমরা দুটো পদ্ধতিই প্রয়োগ করে থাকি। আসলে উপলক্ষ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখতে হবে, কোন্‌গুলি শৈলীবিজ্ঞানের দিক থেকে সংগতিপূর্ণ, আর কোন্‌গুলি অতিরেক (রিডানডেন্ট)। এখানে সব মিলিয়ে সাধারণ যে রূপটি স্পষ্ট হয় তা হল আবরণ (এনভেলাপ), আর উপলক্ষ্য হল শৈলীবিজ্ঞানের সংগতিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ।

এংকভিস্ট, স্পেন্সার ও গ্রেগরি তাঁদের 'লিংগুইস্টিকস্ অ্যান্ড স্টাইল' (১৯৬৪) রচনায় উপলক্ষ্যের আলোচনা এভাবে করতে চেয়েছেন :

১. যথার্থ ঐতিহাসিক ও ঔপভাষিক পরিবেশে কৃতির উপস্থাপনা

২. ক্ষেত্র, ধরন এবং সংপ্রেষণের সম্পর্ক দ্বারা কৃতির বিশ্লেষণ

(এখানে ক্ষেত্র হল বিষয়ের সঙ্গে আলোচনা পদ্ধতির সম্পর্ক। যেমন প্রেম-পত্রের সঙ্গে পরমাণুবিদ্যার আলোচনার পার্থক্য আছে। ধরন = মৌখিক ও লিখিত আলোচনার (ডিসকোর্স) পার্থক্য থেকে জাত ভাষাবৈজ্ঞানিক বৈসাদৃশ্য। টেনর = লেখক/বক্তার সঙ্গে পাঠক/শ্রোতার ব্যক্তিগত বা নিয়ম-বাঁধা (ফর্মাল) সম্পর্ক পালটায়)

ভাষাবিজ্ঞানের মতোই এখানে সমলয়কালীন (সিনক্রনিক), বিসমলয়কালীন (ডায়াক্রনিক) বিবেচনার বদলে সর্বকালীন (প্যানক্রনিক) সমন্বয় কামনা করা উচিত।

আরেকটি প্রসঙ্গ হল শৈলীবদল (শিফট অব স্টাইল)। অনেক সময় লেখক উপলক্ষ্য বদল না করেই নানা শৈলীর আশ্রয় নিতে পারেন। যেমন একটি গতিশীল, জীবন্ত বর্ণনার পর স্থির অনুত্তেজিত বর্ণনা। এখানে পাঠকের দায়িত্ব হল উপলক্ষ্য ও ভাষার সম্পর্ক পরিবর্তন লক্ষ করা।

ক্রিস্ট্যাল এবং ডেভি শৈলীর আটটি মাত্রা ঠিক করেছেন। এজন্য কতকগুলি উপপ্রশ্নতালিকা তাঁরা স্থির করেছেন। এগুলি হাজির করলেই উত্তরে শৈলীর মাত্রা জানা যায়। উপপ্রশ্নগুলি এই ধরনের :

ক. রচনাপাঠে রচয়িতার পরিচয় জানা যায় কি? (ইন্ডিভিজুয়ালিটি)

খ. লেখক কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী? (রিজিওনাল ডায়ালেক্ট)

গ. লেখক কোন্ সমাজশ্রেণীর অন্তর্গত? (ক্লাস ডায়ালেক্ট)

ঘ. লেখক কোন্ সময়ে লিখেছেন এবং তাঁর বয়স? (টাইম)

ঙ. তাঁর পাঠকের কাছে প্রত্যাশা কী? সকলে তার বলার ধরনটা না তিনি কী বলছেন তাই দেখুক? (সিম্পল/কমপ্লেক্স ডিসকোর্স মিডিয়াম)

চ. কোনো বিশেষ বিষয় নিয়ে লেখাটি রচিত কি? (প্রভিন্স)

ছ. লেখক-পাঠকের সামাজিক সম্পর্ক কীভাবে রচনায় এসেছে? (স্ট্যাটাস)

ঝ. লেখকের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে কি? (মোডালিটি)

এর মধ্যে 'ঘ' মাত্রাটি শৈলীবিচারে একান্ত জরুরি নয়। কিন্তু গদ্যশৈলীর ইতিহাসলেখকের কাছে সময় বা কালের হিসেব ফেলনা নয়। লেখকের গদ্যকৃতি থেকে যদি উত্তর আসে না-এর, তাহলে সেই গদ্যশৈলী হবে অল্খ নিরঞ্জন জাতীয়। একে ক্রিস্টাল-ডেভি নাম দিয়েছেন 'কমন-কোর ল্যাংগুয়েজ'।

গদ্যশৈলী আলোচনায় একটি স্তর হল দুর্বোধ্যতা বা অবোধ্যতার স্তর। অনেক সময় লেখক এমন একটি শৈলী নির্বাচন করেন, যাকে প্রচল গদ্যবোধ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। কেন, তা আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। কিন্তু কমলকুমার মজুমদার কিংবা অমিয়ভূষণ মজুমদার (আংশিকভাবে) একেবারে আলাদা গদ্যশৈলীতে লিখেছেন। মাঝে মাঝে একে মনে হয় সন্ধ্যাভাষার মতো। লেখক যেন পরিচিত-অপরিচিত শব্দ, অন্বয়বিন্যাসে এক আলো-আঁধারী রাজ্য গড়ে তুলতে চান। পাঠক চেষ্টা করেও প্রবেশের পথে শতেক বাধা দেখে একে গুহ্য বা গোপন ভাষা (এস্টোরিক ল্যাংগুয়েজ) রূপে চিহ্নিত করতে চান। এমনভাবে লেখকেরা স্বভাববৈশিষ্ট্য প্রকাশ করলেন কেন? সংপ্রেষণকামনা এখানে কি অপ্রধান?

৩.৬ ❑ গদ্যের শৈলীবিচারের মানক

গদ্যের শৈলীবিচার করতে গিয়ে কতকগুলি মানক স্থির করা প্রয়োজন। এগুলি হল—

১. বাক্যের প্রকৃতি

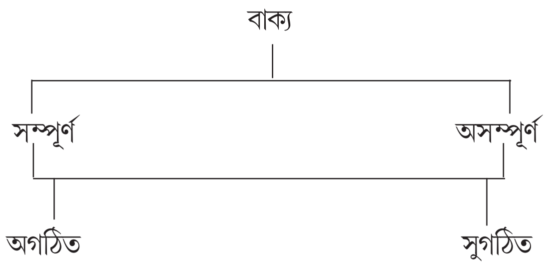

২. উপলক্ষ্যের সুসংগতি (কনটেক্সচুয়াল কোহেশন) : একই উপলক্ষ্যের বৈশিষ্ট্য যা বাক্যের মধ্য দিয়ে অনুভব করা যায়।

৩. শাব্দিক সুসংগতি (লেক্সিকাল কোহেশন) : একই জাতের শব্দভাণ্ডারের প্রয়োগ একটা ঐক্যভাব জাগিয়ে তোলে।

৪. উপবাক্যের সংযোগ (ক্লজাল লিংকজে) : কিছু কৌশল যা দিয়ে বাক্য, উপবাক্য কিংবা কৃতিতে বাক্যের মিশ্রণ-প্রক্রিয়া বোঝানো হয়। 'বাক্য-উপবাক্যের সম্পর্ক ব্যাকরণে থাকলেও কৃতির সঙ্গে বাক্যের সম্পর্ক আলোচনার দাবি করে। লুই. টি. মিলিচ তাঁর 'স্টাইলিস্টস অন স্টাইল : আ হ্যান্ডবুক উইথ সিলেকশন ফর অ্যানালিসিস'-এ বাক্যের সঙ্গে বাক্যের যোগকে আটটি মৌলিক ও যৌক্তিকভাবে দেখিয়েছেন :

ক. অতিরিক্ত (অ্যাডিটিভ) : একটি বিবৃতি যার সঙ্গে আগের বিবৃতির যোগ নেই (এবং)

খ. সূচনা (ইনট্রুডাকশন) : অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যের গড়ন

গ. বৈপরীত্যসূচক (অ্যাডভার্সেটিভ) : একটি বিবৃতি যা যুক্তির মোড় ফেরায় (কিন্তু)

ঘ. পরিবর্তিত (অলটারনেটিভ) : আগের বিবৃতির বদলে (বা, কিংবা)

ঙ. ব্যাখ্যামূলক (এক্সপ্লেনেটরি) : আগের বিবৃতি নিয়ে আবার মন্তব্য, সংজ্ঞাদান বা বিশদীকরণ (তা হল)

চ. উদাহরণমূলক (ইলাসট্রেটিভ) : উদাহরণ বা ব্যাখ্যা (যেমন, উদাহরণস্বরূপ)

ছ সূত্রমূলক (ইলেটিভ) : উপসংহার ধরনের (সুতরাং)

জ. কারণাত্মক (কজাল) : আগের উপসংহারের হেতু (কারণ, জন্য)

৩.৭ ❑ উদাহরণমালা : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা'

"ভব-ব্যাধি-প্রমোচক জ্ঞানদয়াসিন্ধু বৈদ্যরাজ বোধিদ্রুমমূলে সম্বোধিলাভের সময় ভব-ব্যাধির হেতুস্বরূপ দ্বাদশটি নিদানের আবিষ্কার করিয়াছিলেন; সেই তত্ত্বের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ।"

কিংবা, "মনুষ্যমাত্রেরই জীবনকালে এমন একটি মুহূর্ত আইসে, যখন সে সুদূর বনপ্রদেশ হইতে সায়ংকালীন বংশীধ্বনি কর্ণপাত করিয়া চন্দ্রাপীড়ের ঘোড়ার মত সেই অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দিগ্বিদিক ছুটিতে থাকে, এবং হয়ত শেষ পর্যন্ত তাহার উদ্‌ভ্রান্ত জীবন চরম লক্ষ্যের ঠাহর না পাইয়া নিয়তিবশে কোনরূপ অচ্ছোদ সরোবরের সলিলতলে সমাধিলাভ করে।"

এই দুটি অংশ পড়ে পাঠকের ধারণা হয় যে, এগুলি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গদ্য-নমুনা। এই কালগত গদ্যের নমুনা প্রকৃতপক্ষে একটি সাধারণীকরণ—এটি লেখকের বিশেষত্ব প্রমাণ করে না। আমাদের তাই লেখক সম্বন্ধে স্পষ্টতা আসে না—শুধু রচনাকাল প্রমাণিত হয়। কিন্তু শৈলী বলতে যে স্বাতন্ত্র্যের কথা বুঝি, তা জানার জন্য আরও কয়েকটি নমুনার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

উপর্যুক্ত দুটি অংশের লেখক হলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। দুটিরই রচনাকাল উনিশ শতকের শেষাংশে। রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যশৈলীবিচারে তাঁর সব কটি প্রবন্ধের বই আলোচনায় আনছি না। শুধুমাত্র 'জিজ্ঞাসা' বইটির

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে ব্যবহৃত গদ্যশৈলীই আমাদের আলোচ্য। আবার 'জিজ্ঞাসা'রও সব প্রবন্ধের আলোচনা না করে নির্বাচন করা হয়েছে। এই নির্বাচিত লেখায় যদি তাঁর বিশেষ শৈলী চেনা যায়, তাহলেই এর সাহায্যে অন্যগুলির বিশেষত্ব বোঝা সম্ভব হবে।

১. "জীবন দুঃখময়; কেননা, দুঃখময়তাতেই জীবনের উন্নতি ও আশা। আবার জীবন দুঃখময়; সেইজন্য সুখের আবশ্যকতা। নইলে দুঃখের ভারে জীবন টিঁকিত না, নইলে প্রকৃতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইত।"

(সৌন্দর্যতত্ত্ব)

এখানে প্রথম বক্তব্যটি সুনিশ্চিত করতেই বাকি বাক্যগুলি এসেছে। অর্থাৎ, এগুলিকে মূল বক্তব্যের সাহায্যকারী বাক্য বলতে পারি। কিন্তু সাহায্যের প্রকারভেদ আছে। যেমন, প্রথম অধিবাক্যটি (কেননা....আশা) কারণাত্মক। দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথমটির বিরোধী না হলেও 'সুখের আবশ্যকতা' অংশটিতে একটা আপাতবাক্যের (নইলে) সাহায্য নেওয়া হয়েছে। লেখক বৈপরীত্যের প্রশ্নটিকে সমাধানে পৌঁছে দিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের এই গদ্যভঙ্গিতে ক্রিয়ার স্বল্পতা চোখে পড়ে। আবার বাকি অংশের সাধু গদ্যের পাশে 'টিঁকিত না' একটা চলিত ভঙ্গি এনেছে। এখানে 'টিঁকত'র জায়গায় 'টিঁকিত' আছে বলেই তা সাধু হয়ে যায় না।

২. "যাহা জীবাত্মা, তাহাই পরমাত্মা। কিন্তু ইহা বলিলেই মহাকোলাহল উঠিবে। রামানুজস্বামী হইতে বার্কলি পর্যন্ত সকলেই সমস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিবেন। কেহ লাঠি বাহির করিবে, কেহ ভ্রুকুটি করিবেন, কেহ উপহাসের হাসি হাসিবেন এবং সকলেই গর্জন করিবেন। বলিবেন, একটি বাতুলের প্রলাপ; এই সংকীর্ণ সসীম পরিমিত কর্মপাশবদ্ধ সংসারচক্রে ঘূর্ণ্যমান দুর্বল ক্ষীণ জীবের এত বড় স্পর্দ্ধা যে, সে জগৎকর্তৃত্ব জগৎবিধাতৃত্ব সর্বশক্তিমত্তা চায়।....হা দগ্ধোঽহস্মি!" (মুক্তি)

প্রথমে একটি গুরুতর বিষয়ের সমাধান টেনেছেন। বাকিগুলিতে তার প্রতিক্রিয়া যেভাবে সাজিয়েছেন, তার মধ্যে কৌতুকসৃষ্টির পরিচয় পাই। এটি গদ্যের বিশদীকরণের দৃষ্টান্ত। আবার জীবের আগে সাতটি গম্ভীর বিশেষণ যে আসলে উচ্চ হাসির ভূমিকা, তা বোঝা অসম্ভব নয়। তার্কিকের যোদ্ধারূপ (যুক্তির অভাবে), ভ্রুকুটি (জ্ঞানবৃদ্ধের স্বভাব), উপহাসের হাসি (তাচ্ছিল্যভাবে)—লেখকের প্রাপ্য। কিন্তু সকলের গর্জনের মধ্যে একটি হাসির ভাব আছে। আবার একটি সংলাপের ধরন আড়ালে নেই।

৩. "উজ্জয়িনীর রাজপথে তামাসা উপস্থিত হইলে কালিদাসের নয়ন তামাসা ফেলিয়া সৌধবাতায়নের প্রতি উর্দ্ধমুখে ধাতিব হইত; স্নানান্তে আর্দ্রবসনা যুবতীর সন্দষ্টবস্ত্র অবয়বের প্রতি তাহার লোলুপ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত; এবং তাহার মানস লোচন জলদময়ী তিরস্করিণীর আবরণ ভিন্ন করিয়া অংশুকাক্ষেপবিলজ্জিতা কিম্পুরুষাঙ্গানার নগ্ন দেহের দিকে বিবর্তিত হইত।" (সৌন্দর্যতত্ত্ব)

প্রথম উদাহরণের পাশে এটি রাখলে লেখকের শৈলীর ভিন্নগামিতা লক্ষ করা যায়। তিনটি বাক্য একই বাক্যবন্ধে লগ্নীকৃত হলেও তিনটি উদাহরণ জাতীয়। সংস্কৃত কাব্যপাঠের ফল রামেন্দ্রসুন্দর সচেতনভাবে প্রয়োগ করলেও যেভাবে বক্তব্যটিকে দুঃসাহসিক করেছেন, তা তাঁর মনের সংস্কারমুক্তির পরিচায়ক। কেউ এটিকে সংস্কৃতানুসারী বলতে পারেন। কিন্তু অন্তরঙ্গে এই ছবিগুলি শ্লেষবিদ্ধ। মানুষের রুচির তফাৎ এবং সৌন্দর্যবোধকে বোঝাতে গিয়ে এগুলি এসেছে।

৪. "আমার অনুভূতি ক্রমেই তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হইতেছে। অনুভূতি, অর্থাৎ দুঃখের অনুভূতি। অর্থাৎ প্রকৃতিহস্তে খড়্গাঘাতের আশঙ্কা। এই অনুভূতি যাহার তীক্ষ্ণ নহে, খড়্গাঘাতের আশঙ্কা যাহার মোটেই নাই, সে জীবনসমরে আত্মরক্ষায় সমর্থ নহে, তাহার জীবনের ভরসা নাই।" (সৌন্দর্যতত্ত্ব)

রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যশৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই জাতীয় বাক্যবিন্যাস। প্রথম বাক্যে একটি বক্তব্য। দ্বিতীয় বাক্যে প্রথম বাক্যের একটি শব্দের (অনুভূতি) বিশেষ সংজ্ঞাদান। তৃতীয় বাক্যটি দ্বিতীয় বাক্যের শেষাংশ নিয়ে সূচিত—পুনর্ব্যাখ্যান। চতুর্থ বাক্যটিতে অভাবের পরিণামে আঁকা হয়েছে। বাক্যগুলির গড়ন হল :

১—২—৩
│
৪

রেখাচিত্র ১ : বাক্যাবলির গড়ন

আবার 'অনুভূতি' শব্দটির বিচিত্র গতিও লক্ষণীয় :

১ক—২ক—৩ক—৪ক

রেখাচিত্র ২ : বিশেষ শব্দের গতি

এটি রামেন্দ্রসুন্দরের বিশেষ গদ্যকৌশল যার সাহায্যে তিনি উপবাক্য বা বাক্যের সংগতি আনেন। এই গদ্যকৌশল অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ মনের রচনা। কিন্তু যুক্তির জালের মধ্যে কৌতুক, ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা পরিবেশিত। তাঁর গদ্যে ব্যঙ্গের তীব্র জ্বালার অভাব নেই। যেমন,—

৫. "মানবশিশুর 'মিউলিং অ্যান্ড পাকিং ইন দা নার্সেস আর্মস'—ধাইমার কোলে কেঁউমেউ করে—এই অবস্থায় অভিনয়ের আরম্ভ এবং বার্দ্ধক্যে 'সাঁ আইজ, সাঁ টীথ'—কানা চোখ, পড়া দাঁত অবস্থায় অভিনয়ের যবনিকাপাত; সেই বৃত্তান্ত যাহারা পড়িয়াছেন, তাহারা অন্ততঃ কবিত্বের জন্য শেক্সপীয়রকে বুদ্ধদেবের অনেক উচ্চে বসাইবেন।" (প্রতীত্যসমুৎপাদ)

সাধারণ পরিবর্ত-বাক্য রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে একটি বিশেষ গদ্যভঙ্গিতে পরিণত হয়েছে। যেমন,

৬. "সে ব্যক্তি না হয় নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক ছিল, কিন্তু তাহার পত্নীর কথা কে জানে? অথবা তাহার দোষ না থাকুক, তার বাপের দোষ ছিল; অথবা পিতামহের দোষ ছিল; এ জন্মে দোষ না থাক, পূর্বজন্মে দোষ ছিল না, তাহা কে বলিল?" (অমঙ্গলের উৎপত্তি)

এখানে গদ্যভঙ্গিতে প্রত্যাশিত জটিলতা কিংবা কথনের অপূর্বতা তৈরি হয়েছে। 'অথবা' যোগে পরিবর্ত-বাক্যগুলি একটি আরোহভাব এনেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচল সিংহ-মেষশাবকের গল্পটিকে মনে পড়ে লেখার গুণে। অবশ্য পরিবর্ত-বাক্যগুলিতে প্রশ্নবাক্য সাহায্য করেছে।

গদ্যশৈলীর সব কটি বৈশিষ্ট্য যে বাক্যনির্ভর, এ কথা আমরা বলি না। যেমন, রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যে একটা সূত্রানুসারী (পয়েন্টেড) বক্তব্য পেশের বহিরঙ্গ রূপ দেখতে পাই। 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে সব কিছু বলার পর তিনি আটটি সূত্র সাজিয়েছেন। প্রসঙ্গানুযায়ী গদ্যের বহতা রূপকে সমাপ্তিতে সংক্ষিপ্ত করার এ এক কৌশল। যেহেতু প্রায় প্রবন্ধে এই ধরন গৃহীত হয়েছে, তাই এটিকে তাঁর গদ্যশিল্পের এক বিশেষ চেহারা বলা চলে।

পাঠকের সঙ্গে আলাপন ছোটোগল্প-উপন্যাসের একটি বিশেষ পদ্ধতি। প্রবন্ধে এর বিশেষ পরিচয় পাই না। রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যে এই লেখক-পাঠক যোগাযোগ লক্ষ করি। প্রবন্ধের শেষাংশে তিনি লেখেন :

৭. "মীমাংসা হইল না। নিরপেক্ষভাবে দুই দিক দেখাইতে গিয়া লেখক যদি অজ্ঞাতসারে কোন দিকেই বেশী টান দিয়া থাকেন, পাঠকেরা মার্জনা করিবেন।"

সাধারণভাবে প্রবন্ধে লেখক আড়ালে থাকেন। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে এই আড়াল-আবডাল কম থাকে। রামেন্দ্রসুন্দর এই আড়াল রাখতে চাননি। প্রবন্ধের নৈর্ব্যক্তিকতার এতে হানি হল, না লেখক-পাঠক সম্পর্ক গভীর হল, তা বিবেচনার বিষয়।

এই বিশেষ গদ্যগুণকে আমরা তাঁর প্রাবন্ধিক বৈশিষ্ট্য হিসাবেই দেখব। গদ্যে এই কৌশল মাঝে মাঝে অভিনবত্ব এনেছে, বিষয়ের জটিলতা থেকে সহজ মুক্তির উপায় খুঁজেছেন পাঠককে আপন করে নিয়ে :

৮. "সেই আমি কে? বলিতে পারি না। যতে বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—বাক্য সেখানে গিয়া প্রতিহত হয়; মনও সেখানে নিবৃত্ত হয়,—আমি আছি; আমি চিৎ—আমি চৈতন্যস্বরূপ; আর-আর—নিতান্ত না ছাড়—আমি আনন্দ—আমি আনন্দরূপ—আমি আছি, এই আমার আনন্দ।"

লেখক যেন আমিত্বের বিশ্লেষণে আপাত-অসমর্থ। সংস্কৃত গড়নের সেই বিশ্লেষণের মধ্যে চলতি বাংলার কৌতুকের সুরও যুক্ত হয়েছে। প্রথমটি বঙ্কিমী কৌশল হলেও দ্বিতীয় উদাহরণে খণ্ড বাক্যের বিন্যাস, যতিচিহ্নের প্রাচুর্য, 'নিতান্ত না ছাড়' বাক্যাংশে পাঠকের সঙ্গে আলাপের ইচ্ছা গদ্যমাধ্যমেই সাধিত হয়েছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের দার্শনিক প্রবন্ধাবলিতে যেমনি যুক্তির গাঢ়তা অথচ সরসতা লক্ষ করি, তেমনি তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলির গদ্যভঙ্গিও আকর্ষণীয়। বিজ্ঞানের বিশেষ করে পদার্থবিদ্যার উত্তাপতত্ত্ব, বর্ণতত্ত্ব, মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ে তাঁর আলোচনার সুর একেবারে ঘরোয়া আলাপের মতো। বিজ্ঞানের বিষয়কে সাধারণ পাঠকের উপযোগী করতে গিয়ে তিনি এখানে চলতি সংলাপের ঢংকে পুরোমাত্রায় কাজে লাগিয়েছেন। এখানে সম্বোধন বাক্যের প্রভাব সবচেয়ে বেশি নেওয়া হয়েছে :

৯. "তুমি বৃহস্পতি, বিশাল কায় লইয়া বহুদূরে থাকিয়া পার পাইবে মনে করিও না। ...আর বুধ-কুজাদি ক্ষুদ্র গ্রহগণকেও একেবারে আজ্ঞা করিলে তোমার চলিবে না, তাহাদের দিক দিয়াও একটু ঘুরিয়া চলিতে হইবে।...নেপচুন, তুমি বহুদূরে থাকিয়া এতকাল লুকাইয়াছিলে; বন্ধু উরেনসকে টান দিতে গিয়া স্বয়ং ধরা পড়িলে।" (নিয়মের রাজত্ব)

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের গদ্যে এই সহজ আলাপন ভঙ্গিতে সংস্কৃত শব্দের বিন্যাস আমাদের বিরক্তি ঘটায় না। কেননা আড়ালের বা প্রত্যক্ষ লৌকিক সুর আমাদের মন টানে—আরও পড়তে, জানতে ইচ্ছা করে। জ্ঞানবিষয়ের এই আকর্ষণকারী গদ্যভঙ্গি রামেন্দ্রসুন্দরের বিশেষ ব্যাপার।

কখনও কখনও তিনি উদাহরণ আনতে গিয়ে শব্দাবলির সহজতম দেশি রূপকে স্থান দেন :

১০. "রঙ্টা হইল মানসিক ব্যাপার; ঘাস হইতে রঙ আসে না, ঘাস হইতে আসে ধাক্কা—বর্ণহীন ঘ্রাণহীন নীরব ধাক্কা—পিঠে কিল দিলে যেমন বর্ণহীন ঘ্রাণহীন ধাক্কা হয়, ঠিক তেমনিই ধাক্কা। এই ধাক্কা শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কে যায়, সেখানেও সেই ধাক্কাই থাকে; কিন্তু ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে সেই বিকার—সেই অনুভূতি—রঙের অনুভূতি আসিয়া উপস্থিত হয়।" (বর্ণতত্ত্ব)

‘ধাক্কা’ শব্দটি সাতবার ব্যবহৃত হয়েছে অভিঘাত বোঝানোর জন্য। আবার এর প্রকৃতি বোঝানোর জন্য ‘পিঠে কিল মারা’র মতো লৌকিক বাক্যাংশ এসেছে। পদার্থবিজ্ঞানের বর্ণতত্ত্ব নিয়ে যখন পাঠ্যপুস্তক লেখকরা হিমসিম খান, তখন রামেন্দ্রসুন্দর তাকে জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগ করে জীবন্ত করে তোলেন। এই জীবন্ত ভাষা নেওয়ার কারণ সংপ্রেষণ কামনা।

পরিভাষা কেমন হবে, এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। কেউ চান একে তৎসম শব্দভাণ্ডারনির্ভর করতে, কেউ চান দেশি রূপে তদ্ভবরূপে পরিভাষিত করতে, আবার কেউ কেউ শব্দটিকে স্বরূপে কিংবা লিপ্যন্তরে রাখতে চান। রামেন্দ্রসুন্দর সংস্কৃত ভালো জানলেও প্রথম দলের গোঁড়ামীতে সায় দেননি। আবার জোর করে পরিভাষার বাংলা রূপ এনে যে কিম্ভূত অবস্থা, তাকেও মানেনি। বরং যে শব্দটি কলমের ডগায় স্বাভাবিকভাবে আসে, তাকেই স্থান দিয়েছেন (ইকুয়াল, ইকুয়াভেলেন্ট, হিট, মেকানিক্যাল ইংরেজি অক্ষরে)। আবার ‘মাস’ শব্দের বাংলা ‘ভর’ না করে জানিয়েছেন—

১১. “বাঙ্গালা ভাষার ঐ মাস্ শব্দের ভাল প্রতিশব্দ নেই; গ্রন্থলেখকরা অনুবাদে যাঁহার যে শব্দ ইচ্ছা ব্যবহার করেন। আমি একটা নূতন প্রতিশব্দ ব্যবহার করিব; মাস (ইংরেজীতে) অর্থে বস্তু শব্দ প্রয়োগ করিব।....এই বস্তু শব্দকেই জড়ত্ব বিজ্ঞাপক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।” (বিজ্ঞানে পুতুলপূজা)

বাংলায় প্রতিশব্দ নির্মাণের নৈরাজ্য যে রামেন্দ্রসুন্দরকে পীড়িত করেছিল, এই কথা আমরা আলোচনা থেকে বুঝতে পারি।

১২. রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যবহৃত শব্দাবলির মধ্যে সংস্কৃতের সংখ্যা কম না হলেও একান্ত তদ্ভব বা দেশি শব্দের প্রয়োগে তিনি উদার ছিলেন। যেমন, হটমট করে ছোটা, দাঁতের ভাঁটা, ধাক্কা খাওয়া, মুড়ি-মিছরির এক দর, সওয়ার টলেন, চোতা কাগজ, খামখেয়ালি, গোলে পড়া, দড়ি-কলসী যোগান, উড়ে যাওয়া, সাহসে কুলান, ওলট-পালট করা, জল উঁচু স্বীকার করা, ফাজিল অঙ্ক, লাঠি মারা, তামাসা, গায়ে গা, ছাঁটিয়া কাটিয়া, ছাঁচে ঢালা, খট্‌কা, চেপে ধরা, এলোমেলো (পাশে আবার বিশৃঙ্খল), আঁক-কষা, গালি দেওয়া, খাপছাড়া, নাকি সুর, ভোঁতা তলোয়ার, খুঁটিনাটি, ভান করা, লুকোচুরি খেলা, আঁকাবাঁকা, কলুর চোখ ঢাকা বলদের মতো, মতলব আঁটা, আঁধ পোয়া, হজম করা, এক পা চলা, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে, মজুরি পাওয়া, প্রাণ গেল, দেওয়াল পড়া, হুলস্থুল ঘটান, হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া, মাঝামাঝি, মাপকাঠি, ঝুটা, সরিয়ে ফেলা, বাছিয়া লওয়া, পথ ঘোরা, ভাগ কম পড়া, বাছবিচার না করা, মাথার উপর মাথা, কাটাকাটি, ঢিল ছোঁড়া, ঠোকাঠুকি, কাছাকাছি, ঝাড়ের কলম, পিঠে পড়া, বাঁধাবাঁধি, মোটা লাভ, একঘেয়ে, এক নিঃশ্বাসে মীমাংসা করা, বাঁশের দোলা (পরে শয়ান শবমূর্তি), কথায় কথায়, বাড়াইয়া বলা, কানা চোখ, পড়া দাঁত, গা ছমছম করা, বাগ্‌বিতণ্ডা, থেঁতলান, গুঁড়া করা, পোড়ান, ধব্ করিয়া, ভুল-চুক, কারবার করা, যোল আনা, পেটুক, মাতাল, লাঙ্গল চষা, হাওয়ার উপর বাড়ী গাঁথা, মরিচা-ধরা, মুখস্থ করা, মোলায়েম, বাহবা, ‘বানরে সঙ্গীত গায়’, মরা মানুষ, ধরি মাছ না ছুঁই পানি, জজিয়তি, হেলে থাকা, ঢুকিয়ে দেওয়া, হাত পোড়ান, হেঁয়ালি, তলাইয়া দেখা, মাথা খোঁড়া, প্যাঁক প্যাঁক করা, ছোঁ দেওয়া, মাথা খাটান, কিলবিল, গলা টেপা, আফিমের গুলি, ভেংচান, লেজ গজান, ওযুধ গেলা, বোঁটা (আগেবৃন্ত আছে), ধোঁকা, অল্প খাওয়া, মন গড়া, খরিদ করা, পাগলা গারদ, ফ্যাঁস করা, কচকচি, মুটেভাড়া, একভরি, সাবেক।

এই একশোর বেশি চলিত শব্দ, ক্রিয়া, বাক্যাংশ, প্রবাদবাক্য তিনি আত্মার অবিনাশিতা, সৌন্দর্যতত্ত্ব, বিজ্ঞানে পুতুলপূজা ইত্যাদি নানা আলোচনায় ব্যবহার করেছেন। তত্ত্বকে জেনে তাকে প্রয়োগ করার জন্য বা জানানোর জন্য যে গদ্যশৈলী ব্যবহৃত, তার সংপ্রেষণে সহজতা এনে দিয়েছে গদ্যাংশগুলি।

১৩. সাধারণভাবে রামেন্দ্রসুন্দরে সংক্ষিপ্ত বাক্যের সংখ্যা বেশি। যেগুলি আমাদের মনে দীর্ঘ বাক্যের আভাস আনে, সেগুলিও অনেক বাক্যের যোগফল, সেমিকোলনে জোড়া। লেখক পূর্ণযতির চেয়ে সেমিকোলনে, ড্যাশচিহ্নে বেশি স্বস্তি পেয়েছেন। বাক্যের গতি আনার জন্য কিংবা যুক্তির শিকল বা প্রবাহ বোঝাবার জন্য পূর্ণযতির বিরাম প্রত্যাশিত নয়। এছাড়া নানান ধরনের ছেদচিহ্ন তাঁর গদ্যশৈলীতে অবিরত সক্রিয় থেকেছেন।

১৪. চলিত বা দেশি শব্দের মতো তৎসম শব্দগুলির অভিধা ও ব্যঞ্জনার্থপ্রয়োগে রামেন্দ্রসুন্দর সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিন্তু সাধু গদ্যরীতির প্রাণহীনতার জগতে সংপ্রেষণের সহজতা সঞ্চারের জন্যই তিনি এক মধ্যম শৈলী বেছেছিলেন—যা সাধুও নয়, আবার একেবারে চলিত নয়। এরই সঙ্গে তর্ক-আলোচনার ভঙ্গি ভাষাকে সজীবতা, সরসতা দান করেছে।

শৈলীবিচারে এই চোদ্দটি বৈশিষ্ট্য একটি গদ্যশৈলী বা তার স্রষ্টার পরিচয়কে উদ্ভাসিত করেছে। রামেন্দ্রসুন্দর নিজে যেমন বিষয় অনুসারে চলতি বাক্‌ভঙ্গির মেজাজ সাধু গদ্যে আনেন, তেমনি তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সঙ্গে দার্শনিক প্রবন্ধের শৈলীপার্থক্যও আছে। দার্শনিক প্রবন্ধের যুক্তিতে বোনা গদ্য সরসতার শক্তিতে কখনও নীরস তত্ত্বে পৌঁছায়নি। সেখানে পাঠকের জ্ঞানস্পৃহাকে সম্মান জানিয়েছেন। কিন্তু বিজ্ঞানের গদ্য বলতে যে আঙ্কিক তথ্য সমাহার বুঝি, তার ধারণা তিনি ভেঙেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের এই ধরনের অভিনব কর্মে অপর দুই সহযোগী ছিলেন বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের তত্ত্বস্তূপকে আলাপচারিতার গুণে নূতন মাত্রা দিয়েছিলেন। তিনি এখানেও সতর্ক ছিলেন যাতে সরসতার মোহ যুক্তি, বিষয়ের বোধ ছাড়িয়ে না যায়। অনেক সময় আলাপন বিষয়কে লঘু করে, বিপর্যস্ত করে। রামেন্দ্রসুন্দর সেই সীমা জানতেন। ইংরেজি বা বিদেশি শব্দের বঙ্গানুবাদ করতে পিছপা হননি। আবার জোর করে পরিভাষা করার তিনি একান্ত বিরোধী ছিলেন।

এই অধ্যায়টি তাঁর বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক প্রবন্ধেই সীমিত থেকেছে। তাঁর সাহিত্যসমালোচনার গদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কেননা সৃষ্টির গদ্যের ব্যাখ্যা এখানে সমালোচনায় নূতন মানক যোগ করে। চোদ্দটি শৈলীবৈশিষ্ট্য পরপর সাজানো হয়েছে, এমন নয়। তাঁর ‘জিজ্ঞাসা’ বইটি এই বৈশিষ্ট্যগুলির বিন্যাস-সমাহার, এটা মানতে বাধা নেই। রামেন্দ্রসুন্দর যে নিয়মের রাজত্ব দেখেছিলেন, এটি সেই পথে চলারই আনন্দ। লেখকের মনের কামারশালার সংবাদ যে পরিবেশন করা যায় যুক্তির গদ্যের বিশ্লেষণে, এখানে সেই চেষ্টা করা হল।

❑ উৎসগ্রন্থ ও প্রবন্ধ

বাংলা

১. অজরচন্দ্র সরকার (১৯৪৯), বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২. অপূর্বকুমার রায় (১৯৭৬), উনিশ শতকের বংলা গদ্যসাহিত্য : ইংরাজি প্রভাব, জিজ্ঞাসা।

৩-৪. আশিসকুমার দে (১৯৮১), রামেন্দ্রসুন্দরের জিজ্ঞাসা : শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি (পত্রিকা) বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৪।

(১৯৮৭), ঋজুতা না গদ্যের উৎকট গতি : সুধীন্দ্রনাথের গদ্যশৈলী, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : জীবন ও সাহিত্য', পুস্তক বিপণি।

৫–৬. নবেন্দু সেন (১৯৭১), গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জিজ্ঞাসা।

(১৯৮৮), বাংলা গদ্য : স্টাইলিসটিকস্, সাহিত্যপ্রকাশ।

৭. পবিত্র সরকার (১৯৮৫), গদ্যরীতি ও পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক।

৮. মনোমোহন ঘোষ (১৯৪২), বাংলা গদ্যের চার যুগ, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং।

৯. শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৬০), বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, শতাব্দী গ্রন্থভবন।

১০. সজনীকান্ত দাস (১৯৬২), বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস, মিত্রালয়।

১১. সুকুমার সেন (১৯৬৭, ৪র্থ সং), বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ইস্টার্ন পাবলিশার্স কলকাতা।

ইংরেজি

১. আব্রামস, এম. এইচ. (১৯৭৮), এ গ্লসারি অব্ লিটারারি টার্মস, ম্যাকমিলান সংস্করণ।

২. ক্রিস্ট্যাল, ডেভিড অ্যান্ড ডেভি, ডেরেক (১৯৬৯), ইনভেস্টিগেটিং ইংলিশ স্টাইল, ইন্ডিয়ানা য়ুনিভার্সিটি প্রেস ব্লুমিংটন।

৩. মিলিচ, লুই টি (১৯৩৯), স্টাইলিস্টস অন স্টাইল : আ হ্যান্ডবুক উইথ সিলেকশন ফর অ্যানালিসিস, চার্লস স্ক্রিবনার সন্স, নিউ ইয়র্ক।

একক ৪ ❑ ছোটোগল্পের শৈলী

৪.১ ছোটোগল্পের শৈলীবিচার

৪.২ পথহারা পথিক

৪.৩ উদাহরণ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পুষ্করা'

৪.১ ❑ ছোটোগল্পের শৈলী

কিছুদিন আগে এক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ছোটোগল্পের সূত্রে বলেছিলেন, ছোটোগল্পে প্রসঙ্গের বৈচিত্র্য থাকলেও প্রকরণের বৈচিত্র্য কোথায়? প্রশ্নটাকে উলটো করে সাজালে বোধহয় ভালো হয়। প্রসঙ্গ (বিষয়) যদি প্রবৃত্তির দিক দিয়ে ধরি, তাহলে তার বৈচিত্র্য সীমাহীন নয়। ক্ষুধা (দৈহিক বা মানসিক), রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি, প্রেম, ধর্ম, ঈর্ষা, যশ, বিশ্বাস (প্রচলিত মূল্যবোধে আস্থা), হিসাব (জীবনে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির খতিয়ান), ব্যাখ্যা (জীবনের বিশ্লেষণ) এবং হিংসা (মানসিক ও শারীরিক দ্বন্দ্ব)—এই প্রসঙ্গাবৃত্তের বাইরে প্রবৃত্তির দোলাচল আঁকা যায় কি?

তাই প্রসঙ্গ যদি অনন্ত না হয়, প্রকরণের সমূহ সম্ভাবনাও ছকবন্দি করা যায় না। প্রসঙ্গ কে কীভাবে দেখেন, কীভাবে গল্পের বুনোটে পাঠকের মন কাড়েন—ছোটোগল্পের শৈলী মানে তাই। এই বলার ভঙ্গি এবং দৃষ্টিভঙ্গি এক লেখকের ছোটোগল্পকে অন্য লেখক থেকে আলাদা করে। অবশ্য কোনো লেখক চলে-আসা প্রসঙ্গের হাত এড়াতে মানসিকতা অনুযায়ী বিশেষ শ্রেণী, সমাজের অবহেলিত প্রান্তগুলিকে প্রসঙ্গের সীমা ভাঙার কাজে লাগান। আর প্রকরণের বৈচিত্র্য যদি নাই থাকবে, তাহলে একই লেখক নিজের ছোটোগল্পের বাচনভঙ্গি পাল্টান কেন?

অবশ্য প্রসঙ্গ ও প্রকরণের একতা যে-কোনো শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্পের প্রাণ। প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই বাচনভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু লেখার ভঙ্গি একই ছোটোগল্পের আস্বাদনকে পৃথক করে। উদাহরণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, ছোটোগল্প কারো কাছে সহজ সরল প্রাঞ্জল রচনা, কারো কাছে তা চাবুকের কড়া আঘাত। অন্যজনের কাছে তা একটি মুহূর্তের চূড়ান্ত অনুভব (মোমেন্ট'স মন্যুমেন্ট), যেখানে আর সবই তার অধীন। কখনও বলি তা গবাক্ষের আলোর মতো কিংবা 'বুলস্ আই' লণ্ঠনের মতো—একটি বিশেষ প্রসঙ্গাকে আলোকিত করাই তার কাজ।

ছোটোগল্পে উপন্যাসের মতো চরিত্রের ভিড় নেই। বিরাট দর্শন আওড়ানোর অবকাশ সেখানে থাকে না। উপন্যাসের মতো সামাজিক মানুষের বিশদ বর্ণনা বা প্রতিবেশের ভূমিকা সেখানে জোড়া যায় না। গল্পের শুরুতে সংকটের কাছাকাছি অথবা ক্রমশ সংকটকে প্রকাশ করার দায় লেখকের থাকে। জটিলতা থেকে বা সরলতা থেকে জটিলতার প্রান্তে গল্পকে দ্রুততালে উপসংহারে নিয়ে যেতে হয়। কখনও কয়েকটি বাক্য তার

ইচ্ছাপূরণ করে থাকে। এগুলিকে বীজবাক্য বা কী-ওয়র্ড বলতে পারি। গল্পের এই মিতায়তন ছোটোগল্পকে উপন্যাসের চেয়ে উঁচুদরের প্রত্যক্ষতা দান করে।

এ পর্যন্ত পড়ে মনে হতে পারে যে, আমরা নিজেদের অজান্তে বোধহয় ছোটোগল্পের প্রসঙ্গ আর প্রকরণ নিয়ে একটি বাঁধা ছকের কথা আনতে চাইছি। চিন্তার একটি ছক নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু ছোটোগল্পের রূপ আমাদের নির্দেশমতো হবে, এমন ভাবনা আমাদের নেই। কেননা, বনফুল যেমন পোস্টকার্ডের সীমায় গল্প লেখেন, তেমনি হেনরি জেমসের 'টার্ন অব দা স্ক্রু' কিংবা হারমান মেলভিলের 'বিলি বাড' জটিল এবং বড়ো আকারের। ছোটোগল্পের একমুখিতা থাকলেও এডগার অ্যালান পো-র নির্দেশমতো একবারে বসে দেড় ঘণ্টা বা দু-ঘণ্টায় পড়ে ফেলা যাবে, এমন ফতোয়া জারি করা কঠিন। বাংলা ছোটোগল্পের প্রথম শিল্পী রবীন্দ্রনাথ এমন সময়সীমা ভেবে লেখেননি। বোধহয় কেউই লেখেন না।

ছোটোগল্প আকারে তন্বী হবে—এমন ধারণা পিছনে ফেলে এবার বলার ভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা যায়। ব্যক্তিকথা (অ্যানেকডোট) থেকে ছোটোগল্প অন্য পথচারী। সরল, অবিশদভাবে একটি ঘটনার ছুটে চলা ব্যক্তিকথার ধর্ম। প্লটের এই সারল্য কোনো কোনো গল্পলেখক মানলেও ছোটোগল্পের প্লটরীতি বিষাদান্ত, ব্যঙ্গাত্মক হতে পারে। গল্প নানা দৃষ্টিকোণের (পয়েন্ট অব ভিউ) পরিচয় থাকে—তা কল্পকাহিনী, বাস্তবঘেঁষা কিংবা প্রকৃতিবাদী হতে পারে। লেখক গল্প শুরু করেন প্রথম বা উত্তম পুরুষে—কথক ও লেখক ক্রমশ একাকার হয়ে যেতে থাকে। কখনও গল্পও একটি বিবৃতিমূলকতার চেহারা নেয়। চেখভের চরিত্রপ্রধান গল্পে এমন ভঙ্গি বেশি। হেমিংওয়ের 'এ ক্লীন ওয়েল লাইটেড প্লেস' গল্পে বুড়ো মাতালের কাহিনী দুজন ওয়েটার চালিয়ে গেছে, মাঝে মাঝে এদের একজনের চিন্তাও এসেছে। আবার ঘটনাপ্রধান গল্পে ঘটনার গতি ও ফলশ্রুতি মনোযোগ কাড়ে। নিরীহভাবে ঘটনাপ্রধান গল্পও ধীরে ধীরে পাঠককে তার জটিলতায় উদ্বিগ্ন করে—লেখকের ঝোঁক কোন্ দিকে সেটা আগে-ভাগে আঁচ করা কঠিন হয়ে পড়ে। সংকটের তীব্রতায় কোনো ছোটোগল্পের যবনিকা ওঠে। তীক্ষ্ণ বাদানুবাদ বা একটি চূড়ান্ত মুহূর্তে অনায়াসে এই কাজ করে দেয়। কখনও শুরুটা গায়কের আলাপের মতো তাড়াহুড়ো নেই। কিন্তু গল্পের পারানি সঠিক পারঘাটায় পৌঁছে দেয়। বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা' গল্পে বিরাট আয়োজন নেই। কিন্তু সামান্য আবেগও পাঠকের মনে সূক্ষ্ম কাঁপন জাগায়। রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের সমাপ্তিতে 'চন্দরা কহিল—মরণ!' উক্তিতে পাঠকের মনোভূমি চরিত্রটির জটিলতায় আলোড়িত হয়। সুবোধ ঘোষের 'ফসিল', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দোসর', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'স্টোভ' গল্পে পাঠক এক অজানা বিস্ময়ের মুখোমুখি হন। তিনটি গল্পেই কমবেশি শাণিত ভাষার ব্যবহার আমাদের মনে বিস্ময়রস আনে। শুরু মধ্যাংশ, শেষাংশ নিয়ে গল্পের যে প্লট ভাবা হয় তারও হেরফের আছে। কখনও গল্পের শেষাংশ শুরুতে বলা হল, লেখক বাকিটুকু জানান শেষাংশের ভূমিকারূপে। এখানে রূপ এমন চেহারা নেয়—একটি উপসংহার, তারপর কী করে, কেন-র জাল বোনা।

লেখক লিখে চলেন, গল্প আপনি তার সমাপ্তিতে পৌঁছে যায়—রচক এমন করে বললেও আলোচক মেনে নিতে পারেন না। সৃষ্টিকর্ম যতই জটিল ও গভীর হোক না কেন, গল্পের গঠন সম্পর্কে একটি ধারণা স্রষ্টামনে কাজ করে। সেই পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে লেখকের সজ্ঞান অংশের না হলেও এর অভাবে অসাধারণ প্রসঙ্গও সামান্য চেহারা নেয়। অন্যদিকে গল্পগঠনের মানসিক পরিকল্পনা যার কাছে স্পষ্ট, তিনিই সার্থক

ছোটোগল্প লিখে থাকেন। গল্পের এই বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ স্তরের দ্বন্দ্বমূলক অবস্থান সম্পর্কে আলোচক অবহিত থাকলে অনেক সামান্য রেখাচিত্রকে (স্কেচ) গল্পের শিরোপা পরাবেন না।

আবার রাজনীতি আমাদের শিল্পবিচারে কাজে লাগানো হয় অনেক সময় স্থূলভাবে। পাঠকের পছন্দসই রাজনৈতিক বিশ্বাস লেখায় সামান্য ছড় টানলেই তা শিল্পের ছাড়পত্র পায় না। রাজনৈতিক বিশ্বাসকে চরিত্রের প্রত্যয় থেকে উঠে আসতে হবে। নইলে বলবার ভঙ্গি অগোছালো, কোনোভাবে বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনে নোঙর বাঁধার চেষ্টা করতে গেলে ব্যর্থতাই বাড়বে। মানিকের অজস্র ছোটোগল্পে বলার ভঙ্গি এবং প্রসঙ্গের স্বাভাবিকতা খুঁজে দেখি না বলে একটা ভ্রান্তির অবকাশ তৈরি করি। মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র, গান্ধীবাদ যাই লেখককে আলোড়িত করুক না কেন, তাকে চরিত্র-প্লটের বিশ্বাসযোগ্যতা দান করতে হবে।

গদ্যের শৈলীতে যেমন অলখ নিরঞ্জনের কথা তুলেছি, তেমনি ছোটোগল্পে বলার কিছু না থাকলেও অনেকে লিখতে লিখতে লেখক হয়ে যাচ্ছেন। এরা সেই বার্তের বলা লিখিয়ে, রচক নন। সংবাদপত্রের দাক্ষিণ্য, প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা, অন্য মাধ্যমে (যেমন কবিতায়) দক্ষতা ছোটোগল্পকার করে তোলে না। এক বিশেষ বয়সের রোমান্টিক ইচ্ছাপূরণের জন্য এরা অজস্র লিখেছেন এবং লিখে চলেছেন। উপসংহারও এদের কাছে অসম্ভবের সামিল। এখানে গল্পের ভান থাকলেও সামাজিক যে মানুষটি ব্যক্তিভাবনার উৎকেন্দ্রিকতাকে সংযত করতে পারে, তার কণ্ঠরোধ করা হয়। এরা শিল্পের জন্য শিল্প বলে প্রসঙ্গহীন, সাদামাটা, প্রকরণে, ভাষার চাকচিক্যে পাঠকের মন ভোলান। উদার মানবিকতা এবং যৌবনচাঞ্চল্যের নামে, বৈজ্ঞানিক শিরোনামায় অবৈজ্ঞানিকতার প্রহসন এনে এইসব লেখক নিজেকে এবং পাঠককে বঞ্চনা করে আনন্দ পান কাঞ্চনমূল্যের প্রসাদে। এঁদের একাধিক শ্রেষ্ঠ গল্প বাজারে চালু থাকে। কিন্তু কোন্ লেখক জীবনে কটি শ্রেষ্ঠ গল্প লিখেছেন, তার বিচার নিজে নিজে করা যায় না, তা করে পাঠক এবং মহাকাল।

যুগের অবিচারে, বিজ্ঞানের ধ্বংসী রূপের একান্ত চিন্তায় কিছু লেখক এত পীড়িত যে, মনে হয় আমাদের চারপাশে বিকারী (পারভার্টেড/অ্যাবনর্মাল) মানুষেরই ভীড়। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ভাসা-ভাসা অভিজ্ঞতা এদেরকে প্রসঙ্গ ও প্রকরণ—দুই সম্পর্কে উদাসীন করে তুলেছে। প্রসঙ্গ ও প্রকরণজ্ঞানহীন সাংবাদিক কলম যে অরূপরীতির সৃষ্টি করছে, তার মরীচিকা সার্থক ছোটোগল্প পড়ার সূত্রে কেটে যেতে পারে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে মনে করা হল পরশুরাম-ত্রৈলোক্যনাথের সার্থক উত্তরসূরি (শ্বেত পাথরের থালা পড়ে)। কিন্তু অতি প্রজননতায় তিনিও অসার এমনকি কামনার কূপ খুঁড়ে গল্প লিখে চলেছেন। ফ্রাঙ্ক ওকোনর আমেরিকান ছোটোগল্পকে 'জাতীয় শিল্পরূপ' (ন্যাশনাল আর্টফর্ম) বলেছিলেন। কেননা এডগার অ্যালান পো থেকে শুরু করে স্যালিঞ্জার পর্যন্ত এক ঐতিহ্য বহমান আছে। আমরা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিকের পরে পঞ্চাশের দশক অবধি এক প্রসঙ্গনিষ্ঠ ও প্রকরণনিষ্ঠ গল্পলেখকদের সম্পর্কে এমন কথা বলতে পারি।

আগের দুটি অনুচ্ছেদে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের হঠকারিতা নিয়ে লেখার কারণ, ছোটোগল্পে একটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকবেই। সেক্ষেত্রে শিল্পের একটি সামাজিক দিকও আছে। সমাজের ছোঁয়া বাঁচিয়ে, ব্যক্তি-অনুভূতির বিকারে লেখা ছোটোগল্প নামের রিপোর্টাজ বা হালকা গল্প সম্পর্কে আলোচকের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। নইলে এসব রচনার গুরুত্ব খুঁজতে গিয়ে সময় ও প্রতিভার অপব্যয় হতে বাধ্য। আবার আমাদের বলা ছোটোগল্পের

রূপসাধনার বিশেষত্ব বোঝাতে এইসব উদাহরণ প্রয়োগের প্রয়োজন নেই, এটা সুনিশ্চিত করতে এই আলোচনা করা হল।

একান্তভাবে শৈলীসন্ধানী পাঠক হয়তো এ অবধি পড়ে বিমর্ষ হয়ে পড়ছেন। তাই এবারে ছোটোগল্প বিচারে শৈলীর পরিচয় কী করে লাভ করতে পারি, তার বিষয়ে বলা যাক।

১. ভালো-লাগা বা আলোচ্য ছোটোগল্পটি ঠিক কীভাবে আমাদের ভালো লাগল, তার সন্ধান করা চাই। একটি চরিত্র বা ঘটনার মধ্য দিয়ে তা আমাদের অভিজ্ঞতার কোন্ বিশেষ দিকটিকে স্পর্শ করল, সেটা দেখা দরকার। কেননা, এমন হতে পারে যে দ্বিতীয়বার পড়ার সময় গল্পটি কোনো দাগই কাটতে পারল না। আবার এই ভালো-লাগাকে নিজেদের পঠন-অভিজ্ঞতা থেকে বাদ দেওয়া যায় না। 'শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এভাবে ভাবেন' এরকম আপ্তবাক্যের আড়ালে হয়তো কুম্ভীলকবৃত্তি (প্লাগারিজম) লুকিয়ে থাকে। পাঠকের য়ুরোপীয় গল্পপাঠের অপরিচয়ের সুযোগ হাল আমলের বাঙালি গল্পলিখিয়েরা নেন। ঋণী থাকেন, কিন্তু ঋণ স্বীকার করেন না। তাই আলোচকের বহুপঠনের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। তবে ঋণ বোঝাতে গিয়ে জোর করে কোনো সিদ্ধান্তে না আসাই ভালো।

২. আলোচ্য গল্পটির জাত-বিচার (ক্লাসিফিকেশন) একটি গুরুতর প্রশ্ন। গল্পটিতে প্রকৃতি থাকতে পারে, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি থাকতে পারে। এই উপাদানগুলোর মিশ্রণের অনুপাত ও কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। নইলে চরিত্র-ঘটনাপ্রধান, মনস্তাত্ত্বিক, রহস্যময়, প্রকৃতিপ্রধান ইত্যাদি নামকরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। অবশ্য উপন্যাসের মতো নানা উপাদানের মিশ্রণের জটিলতা সাধারণত ছোটোগল্পে মেলে না। কিন্তু প্রেম, মানসিক অনুভব মাঝে মাঝে গল্পের জাত বিচারে বাধা আনে। যেমন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'খিল' গল্পে দুই পুরনো প্রেমিক-প্রেমিকার কথা আছে। মৃতদার প্রেমিকের পাশের ঘরে একটি রাত্রির মতো চাকরির সাক্ষাৎকারের জন্য আসা প্রেমিকা আশ্রয় নেয়। মাঝরাতে দুঘরের মাঝখানের দরজার খিল খুলে যায়। আলো এসে পড়ে প্রেমিকের চোখে। অথচ পরের দিন হঠাৎ চলে যাওয়ার পর সে জানতে পারে অশোকা নামে কোনো প্রার্থীকে চাকরির সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়নি। তাহলে মেয়েটি কি প্রেমিকের চরিত্রের সরলতা পরীক্ষা করতে এসেছিল? খিল খুলেছিল সত্যিই দরজার না তা প্রেমিকের অবচেতন মনের রুদ্ধ দুয়ার খোলার ইঙ্গিত? এমন পরিস্থিতিতে গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক না মামুলী প্রেমের, তা নিয়ে দ্বন্দ্ব জাগে। তবে সাধারণভাবে যে-কোনো একটি উপাদান বড়ো হয়ে গল্পটির বর্গকে সুনিশ্চিত করে। তবে উপন্যাসের মিশ্রবর্গীয়তার নমুনা ছোটোগল্পে বড়ো একটা দেখি না।

৩. পূর্বোল্লিখিত গল্প বলার ভঙ্গিটিও লক্ষ করতে হবে। এর মধ্যে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতাকে ধরা যাবে। এর মানে এই নয় যে, গল্পের সারসংক্ষেপ করতে হবে। ভাবনির্যাসের অগ্রগতি (প্রোগ্রেসন অব্ এসেন্স) লক্ষ করতে হবে ঘটনাজালের মধ্যে। এখানে কিছু কাট-ছাঁট হতে পারে। অনেক সময় টুকরো টুকরো কাহিনী বা চরিত্রের ছিন্নকথনের মাধ্যমে একটি ছোটোগল্প গড়ে উঠতে পারে। এই ছিন্ন কথামালার সার্থকতা তাদের গোপন অবিচ্ছিন্নতায়। সেইসব ঘটনাই কাজে লাগবে, যারা ভাবনির্যাসের বহিঃরূপ। গল্পলিখিয়ের মূল উদ্দেশ্য যারা সফল করছে, তারাই গল্পকথনের কয়েকটি বিন্দু। উপন্যাসের আয়তন থাকে না বলে ছোটোগল্পে ঘটনার অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে।

৪. ছোটোগল্পের গঠনশৈলী আলোচনা যেমন শিল্পরূপের হদিশ দেয়, তেমনি ছোটোগল্পের ভাষাভঙ্গি অবহেলার যোগ্য নয়। লেখকের প্রকাশমাধ্যম হল ভাষা—চরিত্র, ঘটনা, মৌলিক ভাবনা, গঠনকৌশল সবই ভাষার আশ্রয়ে প্রকাশ পায়। উপন্যাসের ভাষার পটচিত্র অনেক বড়ো। সেখানের সব ভাষা-বদলের (ল্যাংগুয়েজ শিফ্‌ট্‌) আলোচনা ভাষাবৈজ্ঞানিক ব্যায়াম হলেও তা ক্লান্তিকর। কখনও ভুল বুঝে লেখকের ব্যবহৃত শব্দের তালিকা প্রস্তুত করে তার অভিধানগত অর্থ এবং লেখকের ভাষাব্যবহারের পার্থক্য গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সংখ্যাতত্ত্ব বা অভিধান এভাবে মনোযোগ কাড়লে সাহিত্যবোধ যায় কোথায়? তাই উপন্যাসের তুলনায় ছোটোগল্পের ভাষা বিশ্লেষণ সহজসাধ্য। ছোটোগল্পে ভাষা চাবিকাঠির মতো চরিত্র-ঘটনা-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে লেখককে চিনিয়ে দেয়। শাণিত বাক্যরীতির আড়ালে রচয়িতার বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিনির্ভরতা নিজেকে প্রকাশ করে। আবার আটপৌরে ভাষায় আস্থাবান লেখক তার বক্তব্য বলেন নিচু সুরে। বাক্যের শাব্দিক ধ্বনিগত মন্থর ভঙ্গি পাঠকের ভাবচর্বণায় সাহায্য করে।

এই ভাষাবদল লেখকজীবনের নানা পর্বে নানারকম হতে পারে। এমনকি বিষয়ও ভাষার বদলে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের উনিশ শতকের নব্বুই দশকের গল্পগুচ্ছের সঙ্গে 'তিনসঙ্গী'র গল্পগুলির ভাষার দুস্তর ফারাক। আধুনিক হবার বাসনা যেমন এখানে সক্রিয়, তেমনি গদ্যের শাণিত সংক্ষিপ্ত রূপের প্রতি আধুনিকদের টান—এর কারণরূপে দেখা চলে। তবু একটি হাজির হওয়ায় অপরটি গরহাজির থাকে না। দুটি ধারাই বহমান থাকে। কথকতার আপাত নিস্তরঙ্গ বর্ণনাত্মক গদ্য আর উইট্‌-প্রধান গদ্যের ভাষার পিছনে আরেকটি কারণ থাকে। প্রচল স্থির, শান্ত গদ্যভঙ্গি থেকে সরে আসার দুঃসাহস সকলের থাকে না। বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছনোর তাগিদে চলে-আসা ভাষারূপ যথেষ্ট মনে হয়। আর শাণিত বাক্যমালার লেখকরা শহুরে শিক্ষিত পাঠককে কাছে পেতে চান। তার জন্য গুণগ্রাহী কমলেও তাঁরা পিছপা নন। দ্বিতীয় কারণটি খুঁজে পেলেও তাকে যথেষ্ট যুক্তিতথ্য দিয়ে এই মুহূর্তে সাজানো যাচ্ছে না। তবু ভাবা যেতে পারে যে, ব্যক্তি-সমাজকে চুলচেরা বিশ্লেষণের জন্য প্রচল গল্পভাষার চেয়ে উইট্‌-প্রধান ভাষা অনেক বেশি সক্রিয় সাহায্য করে। তাই ছোটোগল্পের ভাষা নির্বাচনের পেছনে লেখকের সংপ্রেষণের বিশেষ কামনা লুকিয়ে থাকে।

কখনও ছোটোগল্পের ভাষা উইট্‌ ছাড়িয়ে সংকেত-ভাষার (কোড-ল্যাংগুয়েজ) সীমানায় পৌঁছয়। এখানে পাঠক-লেখকের সংযোগের চেয়ে বিশেষ ভাষা সৃষ্টির কৌশল বেশি প্রশ্রয় পায়। তন্ত্রে মন্ত্রের যেমন একটা গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টা থাকে, তেমনি গল্পভাষাকে ব্যক্তিমনের নির্মাণশালায় এমন একটি রূপ দেওয়া হয় যেখানে পাঠক বিপন্নবোধ করে। লেখক ভাষার ব্যায়ামকে পছন্দ করেন একটা নিজস্বতার রং ছড়ানো যায় বলে। বাংলা ছোটোগল্পে কমলকুমার বা অমিয়ভূষণ মজুমদার এমনতরো ভাষা গড়েছেন। ভাষাকে বাজাতে গিয়ে কখনো তার ছিঁড়ে গেছে। শ্রোতা এলোমেলো সুরে অসহায় ভূমিকা পালন করছেন। বীণাকার শুধু আপনমনে বাজিয়ে চলেছেন। পৃথিবীর সার্থক গল্পগুলির মধ্যে এমন সংযোগহীনতা নেই। তবু কেন এমনটি হয়। এরও কারণ আছে—১. প্রচল গদ্যভাষায় এইসব লেখকের অনাস্থা জন্মেছে ২. ভাষায় একটা নিজস্বতা, চারিত্রের ছাপ ফেলার তাগিদ ৩. ভাষাকে একটু বাঁকিয়ে-চুরিয়ে গদ্যের সহনক্ষমতা (টলারেন্স) পরীক্ষা ৪. অভিনব ভাষা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব ইত্যাদি।

প্রচল বা শাণিত গল্পভাষা ব্যবহার করলেও বাক্যগঠনে অনেক সময় একটা নিজস্ব ভঙ্গি এসে পড়ে। মানিক

এবং আরো অনেকে বাক্যকে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। ভাবটা অনেকটা এইরকম—বুঝ জন যে জানহ সন্ধান। প্রসঙ্গ এখানে প্রবল বলে আমরা এই গদ্যবিশেষত্বকে (অগঠিত বা অসম্পূর্ণ বাক্যমালা) তলিয়ে দেখি না। আমাদের মনে হয় এখানে ভাষা-বিন্যাসের মধ্যে লেখকের একটা মনস্তাত্ত্বিক বিরোধ কিংবা পাঠকের বোধশক্তির পরীক্ষা করার প্রবৃত্তি চেহারা পেয়েছে।

কবিতায় যেমন গল্পের ঢেউ এসে লাগে, তেমনি ছোটোগল্পে কবিতার রঙ লাগা বিচিত্র নয়। রোমান্টিক মন অথবা স্রষ্টার কবি-পরিচয় ভাষাকে গদ্যের কঠোরতা থেকে আবেগ ও অনুভূতির কোমলতায় উত্তীর্ণ করে। অনেক সময় যুক্তি-তর্ক-বুদ্ধির অজস্র পঙ্‌ক্তির চেয়ে একটি কাব্যিক পঙ্‌ক্তি অনেক বেশি ভাবায়। তবে ভাষার এই কাব্যিকতাদান ভাবপ্রধান গল্পে মানালেও বাস্তবতার প্রখরতাকে নিরুত্তেজ করে তোলে। কাজেই কাব্যের দাবিতে নয়, গল্পের দাবিতে কাব্যিকতা যদি আসে, তা বরণীয়। সঙ্গে সঙ্গে কাব্যিকতা যদি আবেগের জলাভূমি তৈরি করে, তবে তা বর্জনীয়।

বিজ্ঞাননির্ভর ছোটোগল্পগুলিতে বিশেষ প্রতিবেশকে ফোটাতে গিয়ে লেখকরা পারিভাষিক শব্দের দিকে মনোযোগী হচ্ছেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, আঞ্চলিক ভাষা এবং উপভাষা এমনকী গোষ্ঠী ভাষাও লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্যকে সফল করে। তবে পরিভাষা বা উপভাষার মোহে গল্পের মূল ভাবনাটি যদি অস্পষ্ট হয়ে পড়ে তবে তা শিল্পগুণের হানি করে।

ছোটোগল্পের ভাষা প্রসঙ্গে শেষ কথা হল, গল্পকার বিষয়ের উপযোগী যে ভাষাকেই বাছুন না কেন, তাকে সংপ্রেষক (কম্যুনিকেটিভ) হতে হবে। সে সংপ্রেষণ মুষ্টিমেয় বা বৃহৎ জনসাধারণের সঙ্গে যেমনই হোক না কেন।

৫. শৈলী বলতে যারা একান্তভাবে ভাষারূপের বৈচিত্র্যসন্ধানে তন্ময়, তাঁদের সঙ্গে এই আলোচকের তফাত আছে। আমরা ছোটোগল্পকে একটি শিল্পকর্ম ভাবছি, যার অবয়বে (স্ট্রাকচারে) প্রসঙ্গ ও ভাষার স্থান আছে। এই স্থান-দেওয়ার প্রণালী একরকম হতে পারে না। স্রষ্টার সামনে প্রসঙ্গের সম্ভার সাজানো থাকলেও রূপের তাড়নাও থাকে। প্রসঙ্গকে প্রকরণের মাধ্যমে প্রকাশের কৌশল ভিন্ন হয়ে যায় একটি বিশেষ কারণে। তা হল লেখকের বিশ্ববীক্ষার সূত্রে। ছোটোগল্পের মিতায়তন মনে রাখলে এই বীক্ষণ খানিকটা খণ্ডিত হতে বাধ্য। কিন্তু প্রসঙ্গ বা প্রকরণের নূতনত্ব লেখকদের সামান্যত পৃথক করে। সবচেয়ে বড়ো কথা লেখকের দৃষ্টিকোণ যা দিয়ে তিনি প্রসঙ্গ ও প্রকরণের নবরূপ খোঁজেন।

এই দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের জন্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বাস্তবতার ঘেরাটোপে রোমান্টিকতা ও রোমান্সের প্রদীপ জ্বালেন, মানিক সামাজিক সমস্যা তুলেও মনস্তত্ত্বকে এড়ান না। তারাশংকর অবক্ষয়ী সমাজের মধ্যে ‘গোটা মানুষের মানে’ খোঁজেন। সমরেশ বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর মধ্যবিত্ত চিত্র, ইন্দ্রিয়ঘনতায় সফল হন। সুবোধ ঘোষ যন্ত্রকে মানবীয় করে তোলেন। মতি নন্দী মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবনের আপাততুচ্ছতাকে তীক্ষ্ণ কলমে আঁকেন।

জীবনে সদর্থকতার চিহ্ন যারা খুঁজে পাননি, তাঁরা সামাজিক পচনকেই প্রকৃতিবাদীর কলমে ফুটিয়ে তোলেন। শিল্পের জন্য শিল্প, বাস্তবতার জন্য বাস্তবতা কিংবা শিল্পীর সামাজিক দায়দায়িত্ব আছে—এ নিয়ে বিরোধ থাকলেও ব্যক্তিমন কীভাবে চারপাশে সমাজ ও প্রকৃতিকে দেখছে, তা ছোটোগল্পের ভাঙা পটে ধরা পড়ে। এক্ষেত্রে

লেখকের দৃষ্টিকোণ জানতে একটি গল্প যথেষ্ট নয়। গল্পমালার মধ্যে স্রষ্টার মালাকার হিসাবে সার্থকতা এবং জীবন-দর্শনের একটা পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। তবে একটি গল্পের অবয়ব ও ভাষা বিশেষ শিল্পকৃতিটির শৈলী জানায়। ছোটোগল্পের শৈলীর আলোচনায় তাই একজনের একটি গল্প বা গল্পসমগ্রে দুই স্তরের হতে বাধ্য। একটি গল্পে লেখকের প্রকাশ্যে হাজির হওয়ার সম্ভাবনা কম। গল্পসমগ্রে তাঁর বিশেষ প্রবণতা, সামাজিক মন, শিল্পরূপচেতনা ধরা পড়ে।

৪.২ ❑ পথহারা পথিক

এই লেখাটি ছোটোগল্পের শৈলীর প্রথম আলোচনা নয়। গল্পের প্রকরণ নিয়ে ভাবনা বিস্তর হলেও অবয়ব-ভাষার সমঝোতার প্রশ্নটি অনালোচিত থেকে গেছে। গল্প আলোচনায় ভাষার উজ্জ্বল বা বিবর্ণরূপ সামান্য জায়গা দখল করেছে প্রাক্তন সমালোচনায়। অবয়বের প্রশ্নে আবার কোনো আলোচক অঙ্কশাস্ত্রের নিয়ম ভেঙে নানা সারণি, ছক সাজাচ্ছেন। শিল্পীর অবয়ব-পরিকল্পনাকে সূত্রাকারে প্রত্যক্ষ করানোর চিত্ররূপ জরুরি হলেও বৈজ্ঞানিক ধারণার অপ-ব্যবহার অনুচিত। একটি ছোটোগল্প কোন্ গুণে সার্থকতা পেল, পাঠকমনে প্রভাব ফেলল এসবের সংক্ষিপ্তকরণে, ভাষার অতি-বিস্তারের বদলে ছক-সারণি আসতেই পারে। প্রসঙ্গ ও প্রকরণের জৈবিক একতা (অর্গানিক ইউনিটি) সামাজিক ও মৌলিক বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় সাহায্যই নিতে পারে। আমরাও বিজ্ঞানের সামাজিক উপযোগিতায় বিশ্বাসী। শুধু তার অচেতন ব্যবহারে ব্যথা পাচ্ছি। আলোচকরা একটি ছোটোগল্প বা গল্পসমগ্রের শিল্পবিচারে সামাজিক বিজ্ঞানে আস্থাবান নিশ্চয়ই হবেন। শুধু প্রয়োগের ক্ষেত্র, সামর্থ্য এবং পরিমিতিবোধ থাকা দরকার। সমালোচনার পথ থেকে, সাহিত্যবোধের জ্ঞান থেকে দিকভ্রান্তরা আমাদের এই সমাপ্তি অংশ লিখতে বাধ্য করল, এমন বলা যায়।

এবার তত্ত্বকথা ছেড়ে একটি ছোটোগল্পের অন্দরমহলে যাওয়া যাক। পাঠক বিশ্রাম পাবেন আর আমরাও সেই অবসরে ছোটোগল্পের শৈলীর পরিচয় পাব।

৪.৩ ❑ উদাহরণ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পুষ্করা'

আমাদের আলোচ্য গল্পটি হল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পুষ্করা'। এটি 'দুঃশাসন' গল্পগ্রন্থে (১৯৫২) সংকলিত হয়েছিল। আবার ১৯৫৪-তে প্রকাশিত 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পে'ও স্থান পেয়েছে।

গল্পটির পরিণতি বীভৎস। সামাজিক ক্ষতের চেহারা অসাধারণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কারণ, এই গল্পের পরতে পরতে একটি সময় আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই সময় বড়ো দুঃসময়। কেননা তা ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল। তখন মারী ও মড়ক বাঙালি সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে। দুর্ভিক্ষও জীবনের মেয়াদ কমানোর ষড়যন্ত্র করেছে। শুধু শারীরিক মৃত্যু নয়, মানসিক এক দো-টানাও বাঙালি সমাজের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। মানুষের দ্বারা মানুষের নিগ্রহ কারো কারো মনে উজানের দিকে গিয়ে দৈবকে আঁকড়ে ধরেছিল সনাতন ভারতীয় পন্থায়। এরকম একজন দৈববিশ্বাসী পুরোহিত তার সংস্কারকে বড়ো করে দেখেছে এই গল্পে। তার সংস্কার-অর্জিত স্বপ্ন সফল হয়। কালীমূর্তির আবির্ভাব, প্রসাদগ্রহণের আড়ালে মানুষের বাঁচার কামনা তার চোখে অস্পষ্ট থেকে

গেছে। একদিকে দৈববিশ্বাসে অন্ধ, অন্যদিকে বাঁচবার নির্মম প্রয়াস এই গল্পে স্থান পেয়েছে। বহমান সময়, কালের নখর, অন্ধ বিশ্বাস, নির্মম সত্যের উচ্চারণে গল্পটি চূড়ান্ত শিল্পরূপ লাভ করেছে।

গল্পটি এইরকম। গ্রামীণ মানুষকে ওলাদেবীর রাগ থেকে বাঁচাতে এক শুক্লা চতুর্দশীর রাতে তর্করত্ন শ্মশানকালীর পূজায় বসেছিলেন। এই পরিবেশ এবং প্রকৃতির ভয়ংকর রূপ লেখক অসাধারণ ভাষায় চিত্রিত করেছেন। সমস্ত গ্রাম জুড়ে পদধ্বনি, চারদিকে শ্মশানের শান্তি, নীরবতা। এরই মধ্যে তর্করত্নের শিবাভোগ প্রায় ব্যর্থ হয়ে যায়। তিনি জানেন যে এই ভোগদান ব্যর্থ হলে গ্রামে পুষ্করা লাগবে। রাতশেষে শিবা নয়, দেবীই নিজের হাতে ভোগ নেন। এই অলৌকিক ঘটনায় তর্করত্নের প্রণামী তিনশো থেকে পাঁচশো হয়, ভোজ্যবস্তুতে গোরুর গাড়ির অর্ধেক ভরতি হয়ে যায়। পরের দিন, কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে বাড়ি ফেরার পথে তর্করত্নের চোখে যখন দেবীর লক্ষ্মীরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন রাস্তার ওপর এক ডোমনীর মৃত্যুযন্ত্রণার ছবি লেখক ফুটিয়ে তোলেন। তর্করত্ন, কাশী কুমোর ও গ্রামবাসীরা নিজেদের বিশ্বাসে ভর দিয়ে থাকলেও লেখক জানান যে ঐ ডোমনীই শ্মশানকালীর শিবাভোগ খেয়েছিল। দীর্ঘ অনাহারের পর ঐ রাজকীয় ভোগ তাকে মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে দিয়েছে। মানুষের বাঁচার কামনা এবং অন্ধ সংস্কার শ্মশানকালীর পুজোতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। কিন্তু ঐ অভাগিনী দেবাতর ভোগ পেয়েও জীবন বাঁচাতে পারেনি। সংস্কারকে অগ্রাহ্য করার শক্তি সে পেয়েছিল ক্ষুধার জ্বালা থেকে। কাহিনীটিতে মানসিক সংস্কারের মূঢ়তা যেমন একদিকে উপহসিত, অন্যদিকে যুদ্ধের সময় মানুষের চরম দুর্দশা জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে।

এ তো গেল প্রসঙ্গ কথা। এবার প্রকরণবৈশিষ্ট্য বা শৈলীবৈশিষ্ট্য বিচার করা যাক :

১. গল্পটি পাঁচটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। সেগুলির পরিকল্পনা এইরকম—

ক. শ্মশানস্থলের বর্ণনা। অসময়ে কালীপূজার কারণ। শিবাভোগের সমাপ্তির জন্য তর্করত্নের কাতর প্রার্থনা। পূজার বিশদতা। শুক্লা চতুর্দশীর মধ্যরাত্রি।

খ. শ্মশানস্থল এবং জীবন্ত মানুষের শ্মশানের পাশাপাশি বর্ণনা। তর্করত্নের বিশ্বাস আর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বৈপরীত্যবোধ। কালীমূর্তির বীভৎসতা। তর্করত্নের পূজার নিষ্ফলতার বিচলন—তাঁর ধ্যানমূর্তি। তৃতীয় প্রহর। এরই সঙ্গে এই পূজায় তাঁর আর্থিক লাভের সম্ভাবনা আঁকা হয়েছে।

গ. কালীমূর্তির আবির্ভাব। তর্করত্নের সাধনায় সিদ্ধিলাভ। গ্রামীণ সমাজে আলোড়ন। চতুর্থ প্রহরের ঘটনা।

ঘ. গ্রাম্য সমাজের প্রতিক্রিয়া। কাশী কুমোরের মিথ্যাচার (দেবীকে স্বচক্ষে দর্শন)।

ঙ. তর্করত্নের বিদায়যাত্রা। একদিকে পুষ্করা রোধে তার সফলতা, অন্যদিকে লক্ষ্মীর পুণ্যস্পর্শে গ্রামকে নূতন রূপে দেখার স্বপ্ন। মাঝে আছে ডোমনীর মুমূর্ষু শরীর। পরিণামে লেখকের আশাবাণী—মারী-মড়কের সমস্ত বিষ গ্রামীণ মানুষরা নীলকণ্ঠের মতো পান করে বলে পুষ্করা কেটে যাবে। কোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যা।

২. কাহিনীকাল বিচার করলে দেখতে পাই তা ঘটতে একটি পুরো দিনও লাগেনি। শুক্লা চতুর্দশীর মাঝরাত থেকে কোজাগরীর সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘটনাকাল বিস্তৃত। অথচ এই সংক্ষিপ্ত সময়ে বাঙালি সমাজের এক নিদারুণ ছবি আঁকা হয়ে গেল। 'পুষ্করা' কথাটির অর্থ অভিধানগতভাবে—ক্রুরবার ভদ্রাতিথি ভগ্নপাদনক্ষত্রঘটিত অশুভ যোগভেদ। সেই অশুভ তিথি যাতে না আসে সেজন্য গ্রামীণ মানুষের সংঘবদ্ধ পূজাদান। দেবতার কাছে এই

কল্যাণপ্রার্থনা ডোমনীর প্রসাদগ্রহণে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে বিদ্ধ হয়েছে। ক্ষুধিত মানুষ দেবতার অন্ন ভোগ করতে চায়। মৃত্যু ঘটে দেবতার হাতে নয়, অপরিমিত আহারের জন্য। একদিকে ক্ষুধার জ্বালা, অন্যদিকে দেবতার কল্যাণপ্রার্থনায় প্রসাদের থালা সমাজের দুটি অভিজ্ঞতার চিহ্ন। সমকাল ক্রিয়া করে প্রথম অংশে। দৈবানুগ্রহ লাভে তৎপরতা আমাদের হাজারো বছরের অর্জিত সংস্কাররাজ্যে নিয়ে যায়। দুটো ঘটনাই এককালে লগ্ন—ক্ষুধার তাড়নায় নিরূপায়তা এবং দেবতা সম্পর্কে সংস্কার। সংস্কারের অন্ধকার চিরে সামাজিক সত্যের যে নিষ্ঠুর আত্মপ্রকাশ আমরা দেখি, তা অমানবিক বীভৎস হলেও স্বাভাবিক।

৩. এবারে ভাষা প্রসঙ্গে আসা যাক। এই তীক্ষ্ণ সমাজসন্ধানী গল্পটির ভাষায় নাটকীয়তা আছে। নাটকীয়তা এসেছে পূজা ও পূজাস্থল, দেবীর ভোগগ্রহণে ভক্তদের প্রতিক্রিয়া বোঝাতে। এর জন্য সংলাপ অবশ্যই সাহায্যে এসেছে। সেইসব জায়গায় বক্তাদের চরিত্রের আভাস দিতে কতকগুলি বিশেষণ লেখক খুঁজে নিয়েছেন। এর মধ্যে চরিত্রের লক্ষণ স্পষ্টতা পেয়েছে। যেমন, অসহায় কাতর দৃষ্টিতে চারদিক তাকিয়ে বলা, শুকনো মুখে বলা, কাতর আর্তকণ্ঠে আহ্বান করা, কান্নায় কাঁপা গলা, ধমক দিয়ে বলা, ভীত শুকনো গলায় বলা, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করা, তর্করত্নের সংস্কারগ্রস্ত মনের নানা প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেছে। তেমনি কাশী কুমোরের কণ্ঠে শুনি নিঃস্বের অবিচল কণ্ঠস্বর :

'আচ্ছা, থামলাম। ন্যাংটোর আবার বাটপাড়ের ভয়। আমার তো সবই ওলা-দেবীর পেটে গেছে। বউ ব্যাটা সমস্তই। পুষ্করাই লাগুক আর ঘোড়ার ডিমই লাগুক—ওতে আমার কী হবে ঠাকুর।'

৪. পরিবেশ চিত্রণে আবার বর্ণনামূলক ভাষা দেখি। সেই ভাষাও পরিবেশের বীভৎসতাকে ফুটিয়ে তুলেছে :

ক. নদীর জল 'কালো আর পিঙ্গালে মিশে যেন হিংস্রতার রূপ নিয়েছে।'

খ. ওপারের বনজঙ্গলগুলো রাশি রাশি বিচ্ছিন্ন আর আকারহীন বিভীষিকার মতো জেগে রয়েছে।

গ. তার ওপরে বড় একটা জবাফুল, পেট্রোম্যাক্সের আলোতে চাপবাঁধা খানিকটা রক্তের মতো দেখাচ্ছে।

ঘ. আধপোড়া হাড়, মানুষের মাথা, চিতার কয়লা, পোড়া বাঁশ আর রাশি রাশি ভাঙা কলশি।

ঙ. বিদ্যুতের সর্পিল চমক; একটা নিষ্ঠুর রক্তাক্ত হাসির মতো

চ. বাতাসে মড়ার গন্ধ ভাসছে

ছ. মড়াখেকো শ্মশানকুকুরের একটানা কান্না

জ. একমাথা ঝাঁকড়া চুল, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি। তার দাঁতের চাপে হাড়গুলো মড় মড় করে ভেঙে যাচ্ছে।

ঝ. চারিদিকে রন্ধ্রহীন অন্ধকার, কালো অন্ধকার, পচা মড়ার গন্ধ, আকাশ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় কালো বৃষ্টি গলে পড়ছে।

ঞ. মরা নদীর জল আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল, ওপারের ন্যাড়া শিমুল গাছে ডুকরে উঠল শকুনের বাচ্চা।

এ সব উদাহরণ যেমন গেল দশটি বীভৎস ছবির বর্ণনা, তেমনি শান্ত রসের চিত্রণেও লেখক কার্পণ্য করেননি। যেমন :

ক. মাঠ-উজ্জ্বল চাঁদের আলোর দিকে দিগন্তে ধানের শীষ দুলছে—চমৎকার ফলন হয়েছে এবার।...পথের দুপাশে কাঠমল্লিকার ফুল যেন গন্ধের মায়া বিস্তার করে দিয়েছে।

খ. চাঁদের দুধে ধানের শীর্ষ পূর্ণায়ত হয়ে উঠেছে। ফসলের ভরা ক্ষেতের মধ্যে থেকে থেকে একটি করে প্রদীপের শিখা। শস্যলক্ষ্মীকে আহ্বান করছে মাটির মানুষেরা, তাঁর পায়ের ছোঁয়া লেগে ক্ষেতের ধান সোনা হয়ে যাবে। কাঠমল্লিকার সুরভিতে কি তাঁরই শ্রীঅঙ্গের পদ্ম-গন্ধ?

গল্পটিতে জীবনের নিষ্ঠুর সত্যের উচ্চারণ বেশি প্রয়োজনীয় বলে বীভৎসের তুলনায় শান্ত দৃশ্যের বর্ণনা কম। তবু শেষ দুটি উদাহরণ একটা বৈপরীত্যের ব্যঞ্জনা জাগায়।

৫. গ্রামটি অচিহ্নিত। বাংলাদেশের যে-কোনো গ্রামে এটি ঘটতে পারত। তাই উপভাষা নেই। কিন্তু ইতর দেশি শব্দে চলিত ক্রিয়ার বিন্যাসে সংলাপ, চরিত্র নির্দিষ্ট মাত্রা পেয়েছে। যেমন—পাত্তা দেখা, রাত কাবার, পুজো-আচ্চা, ভালো করে ডাকা, ভোগ খাওয়ান, গাঁজার ঝোঁক, মড়াখেকো, পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দেওয়া, উচ্ছন্নে যাওয়া, যা কপালে আছে, তাই হবে; চিমসে লুচি, পোয়াটাক বোকা পাঁঠার মাংস, বয়ে যাওয়া, হারামজাদা, ঘোড়ার ডিম, শরীর হিম হওয়া, থর থর করে কাঁপা, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করা, সত্যি মিথ্যের রঙ চড়ান, চামড়া উঠে যাওয়া, লীলে, পেটের পিলে, চড়াৎ করে ফাটা, বেটা আর সোয়ামী, কাতরানো, যমে ধরা, জিভ মেলে হাঁপানো।

৬. এই গল্পে লেখকের ভাষাব্যবহার অবহেলার নয়। একটি প্রসঙ্গের সজ্জায় অবয়ব ও ভাষা কীভাবে সযত্ন মনোযোগে অনুস্যূত, তা দেখা গেল। গল্পটির পাঁচটি অনুচ্ছেদ যেমন স্তরে স্তরে আরোহী, যেমনই উপমার প্রাচুর্য, ইতর-দেশি-চলিত বাগভঙ্গির প্রাধান্য গল্পটিকে ঈপ্সিত শিল্পরূপদান করেছে। 'পুষ্করা' পড়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি জানতে পারি। সমাজের এক পঙ্গু অবস্থাকে তিনি দেখাতে চান। সেই চাওয়াকে সম্ভবপর করে তোলার জন্য এক তীব্র গতির ভাষা ব্যবহার করেছেন। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা অবয়বের পঞ্চাঙ্গ সাজালেও পাঠক এক নিশ্বাসে গল্পের শেষে পৌঁছোন। পরিণামে লেখকের আশাবাণী অনুপ্রবিষ্ট কথকের (ইনট্রুডিংন্যারেটর) আভাস সঞ্চার করেছে :

'কিন্তু তবু পুষ্করা কেটে যাবে। মারী ও মড়কের সমস্ত বিষ চিরকাল ওরাই তো নীলকণ্ঠের মতো পান করে নেয়।'

লেখক এভাবে কাহিনীতে অনুপ্রবেশ করলেন কেন? ডোমনীর নিদারুণ মৃত্যুতে জীবনপ্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যায় না, তা বোঝানোর জন্য। বিশেষ বিশ্বাসকে তিনি তাই আলগাভাবে কাহিনীতে আনেননি, তাকে প্রয়োজনীয় করেই এনেছেন। কেননা গল্পটি ছিল প্রত্যাশাভঙ্গের। মানবজীবনের প্রতি আস্থা-বিশ্বাসই লেখককে সদুক্তি উচ্চারণে প্রেরণা দিয়েছে। লেখকের সমাজসচেতন, মানবপ্রেমী রূপটি আরও স্পষ্ট হয়েছে পাঠকের কাছে।

ছোটোগল্পের শৈলীবিশ্লেষণের এখানেই ইতি টানা হচ্ছে। একটি গল্প হয়তো আমাদের তাত্ত্বিক উচ্চারণের যথেষ্ট সাক্ষ্য দিল না। আমরা শৈলীবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়োগসামর্থ্য একটি নমুনায় ধরতে চেয়েছিলাম। তৎপর আলোচকরা এ থেকে সূত্র নিয়ে বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রয়োগ দেখাবেন, এমনটি আশা করা যায়।

❑ উৎসগ্রন্থ ও প্রবন্ধ

১. আশিস্‌কুমার দে (১৯৮৪), ছোটোগল্পের শৈলী, ভাষা পত্রিকা, ৩ বর্ষ ২ সংখ্যা।

২. পবিত্র সরকার (১৯৮৫), রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প, গদ্যরীতি পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক।

একক ৫ ❑ উপন্যাসের শৈলীবিচার

৫.১ উপন্যাসের শৈলীবিচার

৫.২ উপন্যাস শৈলীর সন্ধানে

৫.২.১ বর্গীকরণ (টাইপস অব নভেল)

৫.২.২ প্রসঙ্গ ও সমস্যাতত্ত্ব

৫.২.৩ অবয়বকৌশল

৫.২.৪ ভাষা নিয়ে

৫.৩ উপন্যাসের স্বপ্নভগ্ন : 'চোখের বালি'

৫.৩.১ 'চোখের বালি'র ঔপন্যাসিক জাত

৫.৩.২ গঠনকল্পনা

৫.৩.৩ ভাষাভঙ্গি : প্রাচীন-নবীনের সংঘর্ষ

৫.৩.৪ শব্দজাল : পুরোনো, অচল, নূতন শব্দ

৫.৩.৫ উপমার বিশেষত্ব ও শ্রীহীনতা

৫.৩.৬ ভাষার নাটকীয়তা, বাস্তবধর্মিতা, মনোবিশ্লেষণ প্রয়াস

৫.৩.৭ এপিগ্রাম : ভাষার অন্ত প্রসঙ্গ

৫.৩.৮ 'চোখের বালি'র মূল্য, জনপ্রিয়তা ও ঔপন্যাসিক কণ্ঠস্বর

৫.১ ❑ উপন্যাসের শৈলী

উপন্যাসের মতো বিমিশ্র (কম্পোজিট) সাহিত্যমাধ্যম খুব একটা চোখে পড়ে না। ছোটগল্প, কবিতা, নাটক, চিঠিপত্র, বর্ণনাত্মক গদ্য, জ্ঞানমূলক গদ্য, সব কিছুই উপন্যাসে স্থান করে নিতে পারে। স্থান করে নিতে পারে—ছোটগল্পের তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা, কবিতার স্বরূপে কিংবা আবেগঘন উচ্চারণে, নাটকীয় সংলাপে, গদ্যের বিচিত্র ব্যবহারের মধ্যে। ফলে কবিতা, গদ্য, ছোটগল্পের আলোচনায় আমাদের যে স্বচ্ছন্দভাব ছিল, তা এখানে নানা প্রশ্নের শিকড়ে বাধা পায়। তাই শৈলীবিজ্ঞানের একান্ত মনোযোগী বিশ্লেষকও উপন্যাসের শৈলী আলোচনায় বিরত থাকেন। অনেকে ভাষাপথে এর সমাধান খুঁজেছেন। জেন অস্টেনের উপন্যাসে আভিধানিক শব্দগুলো কত বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত, এর উদাহরণমালা একটি বিচ্যুতির অভিধান হাজির করলেও আমরা অতৃপ্ত থাকি।

চরিত্র, সংলাপ, আলোচনা, ভাষা, অবয়ব, প্রসঙ্গ, উপলক্ষ—সব মিলে উপন্যাসের শিল্পজগৎ এক বিশাল আকার ধারণ করে। এর মধ্যে চরিত্রকে অবয়ব অংশ বলব কিনা, এ বিষয়ে সংশয়ী মানুষের সংখ্যা কম নয়। কেননা প্লট এবং চরিত্রের আন্তর সম্পর্কবিচার এখনও অবধি প্রহেলিকার মতো।

প্রশ্নটি একটু সরল করা যাক। তা হল উপন্যাসে আমরা কী দেখতে চাই? কেউ বলেন চরিত্রের জটিলতা, কেউ বলেন প্লটের জটিলতা। আবার ব্যক্তি-সমাজের দ্বন্দ্বরূপে একে কেউ দেখতে চান। উপন্যাসে যা একান্ত থাকা দরকার, তা হল লেখকের জীবনদর্শন। অন্যত্র তা থাকে। কিন্তু উপন্যাসের বিশাল পটচিত্রে এর রূপায়ণই আমাদের লেখক তার শিল্পধারণা সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে।

জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা নিয়েও মতামতের ঝড় রয়েছে। কোনো লেখক জীবনদর্শন বলতে বোঝেন বাস্তবতার চিত্রণ, সমাজের তন্নিষ্ঠ বিশ্লেষণ। এর বিরুদ্ধাচরণের অভাব নেই। আমরা র‍্যালফ ফক্সের মতো স্বীকার করি (অ্যাবাভ অল, নভেল রাইটিং ইজ আ ফিলোজফিক্যাল অকুপেশন)। কিন্তু সেই দর্শন যখন শিল্পরূপ নেয়, তখন তা কীভাবে ঘটে, এই আলোচনায় আমরা উৎসাহী। লেখক কি কোনো ছক (প্যাটার্ন) সাজিয়ে নেন জীবনদর্শনের বিন্যাসের জন্য? নাকি কলমের ডগায় চরিত্রেরা আসে। তারাই গল্প সাজিয়ে উপন্যাসের চেহারা দেয়? উপন্যাসের শরীর নিয়ে লেখক কীভাবে ভাবেন? একজন ভাস্করের মতো তারও কি এই মূর্তি-গঠন নিয়ে নানা চিন্তা কাজ করে? নইলে একজন শিল্পী তো একইভাবে উপন্যাসের শরীর গড়তেন। এই উপন্যাসের সাজবদল বিষয়ের চাপে না অন্য কোনো কারণে, এর উত্তর সন্ধানই আমাদের লক্ষ্য। উপন্যাস লেখককে দিয়ে লিখিয়ে নেয় চরিত্রদের নিজের দাবিতে—এমন মন্তব্য বিখ্যাত ঔপন্যাসিকরা করলেও আমরা এত সহজ সমাধান ভাবতে পারছি না।

৫.২ ❑ উপন্যাসশৈলীর সন্ধানে

উপন্যাসশৈলী নিয়ে কয়েকটি মানক (প্যারামিটার) আগে স্থির করা প্রয়োজন। এই মানকগুলি সর্বত্রই স্থির থাকবে, এমন বলতে চাওয়া হচ্ছে না। বরং উপন্যাসের শৈলীবিচারে এরা একটা পথনির্দেশ করতে পারে। এই মানকগুলির প্রয়োগ এবং তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা একসময় বাংলা উপন্যাসের আটটি নমুনা নিয়ে দেখানো হয়েছিল।[১] এখনও অবধি সেই আলোচনার কাঠামো পরিবর্তনের কোনো জোরালো কারণ ঘটেনি বলে আমরা সেগুলি পুনরুক্ত করছি।

৫.২.১ বর্গীকরণ (টাইপ্ অব্ নভেল)

যে উপন্যাস বা উপন্যাসাবলির বিচার সমালোচক করবেন, তার বর্গ সবচেয়ে আগে নির্ণয় করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তিনি প্রবল সমালোচনার পথিক হবেন না, এমন নয়। তবে সংস্কারমুক্তিরও প্রয়োজন আছে। প্রাক্তন সমালোচনায় চরিত্র তেমন গুরুত্ব পায়নি বলে কিংবা চরিত্র-প্লটের সম্পর্ক জটিল বলে মাঝে মাঝে উপন্যাসের বর্গবিচারে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। সমাজ বা পরিবার থাকলেই তা সামাজিক বা পারিবারিক উপন্যাস হয়ে ওঠে না। লেখক পাঠককে সমাজের কেন্দ্রে না বিশেষ চরিত্রের অন্দরমহলে হাজির করবেন, তার সেই চেষ্টার ওপর উপন্যাসের সামাজিকত্ব বা চরিত্রপ্রাধান্য নির্ভর করে। পদ্মা নদীর মাঝিতে প্রথম দিকে যেমন জেলেসমাজের বিস্তৃত বিবরণ আছে, তেমনি পরের দিকে কুবেরকথাই আমাদের মন কাড়ে। কুবের যদি জেলেসমাজের প্রতীক হয়, তাহলে এটি সামাজিক উপন্যাস। কিন্তু কুবেরের ব্যক্তিগত তৃপ্তি-অতৃপ্তিবোধ জেলেদের সাধারণ ধর্ম হয়ে

উঠবে কেমন করে? শলোখভের ডন সিরিজ একটি সমাজের অঞ্চলের জীবনকথা হয়ে উঠেছে। পদ্মানদীর মাঝিতে সেই সম্ভাবনা কোথায়? সমালোচক তাই প্রসঙ্গ ও চরিত্রের সূক্ষ্ম বিচার করে শ্রেণি ও ব্যক্তি পারস্পরিক ঔপন্যাসিক গুরুত্ব স্থির করবেন। নইলে সামাজিক সত্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে ব্যক্তিচরিত্রকে উপেক্ষা করে বর্গীকরণ একটা পণ্ডশ্রমের উদাহরণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কোনো সময় উপন্যাসের যা কিছু ঘটমান, তা লেখকের মানসিক আয়নার প্রতিফলন। তিনি বিশেষ তত্ত্বের উপযোগী আদর্শ ঘটনাকে বেছে নেন। তাই বাইরে তারা ঘটনার প্রতিভাস জাগালেও অন্তরঙ্গে একটি তত্ত্বকে নানাভাবে দেখার ক্রিয়াই তারা সাধন করে। ঔপন্যাসিকের এই বিশেষ তত্ত্বমুখিতা না বুঝলে রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ, মানিকের চতুষ্কোণ, সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী পড়ে মনে হতে পারে এগুলি অসংলগ্ন রচনা। এক জায়গায় এদের নাম উচ্চারিত হলেও এই রচনাগুলিও এক জাতের নয়। কিন্তু এরা তত্ত্বমুখ্যতারই বাহন। এদেরকে ব্যাখ্যানমূলক (এক্সপ্লানেটরী) বলা চলে।

৫.২.২ প্রসঙ্গ ও সমস্যাতত্ত্ব

উপন্যাসপ্রসঙ্গ ব্যাপারটি অনেক সমালোচকদের কাছে কাহিনির সারাৎসার বলে অনুমিত হয়েছে। লেখকের অনুসারী হয়ে তাই তারা দুবার কথনে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। প্রসঙ্গ তাই এদের কাছে অনন্ত। আমরা প্রসঙ্গ বলতে অন্য কথা বলতে চাই। প্রসঙ্গ মানে কাহিনি নয়। তা হল জীবনের প্রবাহ থেকে নির্বাচিত কয়েকটি নির্দিষ্ট সমস্যা। এই সমস্যার কূটতা ঔপন্যাসিককে স্পন্দিত করে। তিনি কাহিনির ছকে ঐ সমস্যা তোলেন। সমাধান সেখানে থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। সামাজিক মানুষরূপে, অনুভবের শিল্পীরূপে জীবন-সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করা, তাদের বৈচিত্র্যকে ধারণের আনন্দ তিনি পাঠককে সংক্রমিত করতে চান। তিনি জীবন ও জগতের একটি ব্যাখ্যানকর্ম উপহার দিতে চান। সেই ব্যাখ্যান নানাভাবে হতে পারে।

যদি কাহিনি ঐতিহাসিক চরিত্র বা প্রেক্ষাপটে গঠিত হয়ে ঔপন্যাসিকের জীবনব্যাখ্যান উপস্থিত করে, তাহলে তা ঐতিহাসিক উপন্যাস। মানবীয় প্রেমসম্পর্ক এবং প্রেমহীনতা কোনো উপন্যাসে জটিল সমস্যারূপে চিহ্নিত হতে পারে। আবার অন্য জায়গায় তো সহকারী ঘটনারূপে বা সমস্যার আকারে আসতে পারে। ইতিহাসকে কেউ জীবনব্যাখ্যানের তাগিদে মৌল উপাদান ভাবেন। অন্য দিকে কালের চেতনা ইতিহাসকে অন্যরূপে ফুটিয়ে তোলে।

সামাজিক মানুষের জীবনে কেন্দ্রীয় সমস্যা হল রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, প্রেম এবং ধর্মজড়িত। এদের মুখ্য ভাবলে গৌণ সমস্যার উৎপত্তি হয়। ব্যক্তিমানুষের মানস-দর্পণে এরা কয়েকভাবে ছায়া ফেলে। যেমন বলতে পারি 'ঐতিহ্য' (চলে আসা সমাজব্যবস্থা, সংস্কারের প্রতি আস্থা), 'হিসাব' (প্রাক্তন বর্তমানের ঘটনাফল বিচার করে মানসিক তৃপ্তি-অতৃপ্তিবোধ), 'ব্যাখ্যা' (ঘটনা সম্পর্কে ব্যক্তিকল্পনা বা আদর্শের ব্যাখ্যানকর্ম)। ঔপন্যাসিক জানেন তিনি কেন্দ্রীয় সমস্যার একটি কাহিনিমূলক শিল্পরূপ সৃষ্টি করতে চান। সেই সৃষ্টিকর্মে লেখকমনের ব্যক্তিগত প্রবণা অনুযায়ী গৌণ সমস্যা তাই মুখ্য হয়ে ওঠে। আমাদের প্রস্তাবিত গৌণ সমস্যাগুলি কেন্দ্রীয় সমস্যাভূমি থেকে জাত বলে পাঠক কেন্দ্রীয় সমস্যারও স্বাদ পান। সহজ কথায়, কেন্দ্রীয় সমস্যার ধারণাটি হল সামাজিক বিজ্ঞান-নির্ভর আর গৌণ সমস্যাগুলি উপন্যাসের শিল্প ধারণাজাত।

৫.২.৩ অবয়ব কৌশল

উপন্যাসের অবয়ব সম্পর্কে প্লট ধারণা বহুদিন ধরে চলে আসছে। প্লট বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট অনুভবমূলক এবং শৈল্পিক প্রতিক্রিয়া লাভের জন্য উপন্যাস ঘটনার গঠনভঙ্গি। সংজ্ঞাটি সহজ দেখালেও সহজ নয়। কেননা ঘটনা সংঘটিত হয় চরিত্রের মানসিক, শারীরিক, বাচিক এবং অ-বাচিক ক্রিয়ার দ্বারা। এর মধ্যে চরিত্র এভাবে পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল। হেনরী জেমস তাই বলেছিলেন, ঘটনার বিচার-নিষ্পত্তি ছাড়া চরিত্রকে কী বলব? আর ঘটনা চরিত্রের ব্যাখ্যান ছাড়া ঘটনা আর কী?

প্লট বলতে একটি সাহিত্যকর্মের ঘটনাপ্রবাহের সারসংক্ষেপ নয়। যখন সারসংক্ষেপের মধ্যে কেন এবং কী করে প্রশ্ন দুটি সক্রিয় থাকে, তখনই সত্যিকারের প্লটধারণা তৈরি হয়। যেমন একজন ঔপন্যাসিক অনেকসময়েই চরম মুহূর্ত (ক্লাইম্যাক্স) আগে সাজান। বাকিটা আসে অতীত বোঝাতে। আবার কেউ উপসংহারকে প্রথমে নিয়ে আসেন। কোনো কোনো ঔপন্যাসিক অঘটনের জয়যাত্রা করে মূল ঘটনায় পৌঁছোন। আবার মনস্তাত্ত্বিক ও চেতনা-প্রবাহধর্মী উপন্যাসে সাধারণ কেন এবং কী করের পরম্পরা রক্ষা করা হয় না। এখানে এর পরে এই, এমনটি নূতন করে সাজাতে হয়।

এবারে সাধারণ প্লটধারণার একটু আভাস দেওয়া যাক। প্লট এগিয়ে চলে। পাঠকের মনে ভবিষ্য ঘটনা সম্পর্কে একটা প্রত্যাশাবোধ জন্মায়। একটা অজানা উৎকণ্ঠায় আমরা শিহরিত হই। বিশেষ করে যেসব চরিত্র ইতিমধ্যে আমাদের সহানুভূতি কেড়েছে, তাদের জন্য উৎকণ্ঠা জাগে। একে বলতে পারি সন্দেহজনিত উৎকণ্ঠা (সাসপেন্স)। আবার যা আমাদের প্রত্যাশাভঙ্গ ঘটায় তা হল চমক (সারপ্রাইজ) প্লটের প্রাণ হল এই উৎকণ্ঠা এবং চমকের ওঠা-পড়া। পড়া ঘটনা এবং জানা চরিত্র যখন আমাদের প্রত্যাশার বাইরে চলে যায়, তখনই চমক সবচেয়ে সক্রিয়তা দেখায়। অপ্রত্যাশিতের মানসিক আঘাত সবসময় পাঠক সহ্য করেন না। এর উত্তর কাহিনিতে মেলে না। এর উত্তরসন্ধানে সামাজিক প্রেক্ষিত, লেখকের ব্যক্তিমনের দ্বন্দ্ব এবং কালের অভিঘাতের কাছে পৌঁছতে হয়। যেমন, চোখের বালিতে বিনোদিনীর কাশীযাত্রা। রবীন্দ্রনাথ তৃতীয় বিষবৃক্ষেও সমাজমনকে অস্বীকার করতে পারেননি।

কাহিনির শুরু, বিকাশ এবং পরিণামকে কেউ কেউ গুস্তাভ ফ্রেতাগের মতো একটি পিরামিড আকারে কল্পনা করেন। যেমন,

ক = কাহিনির উদ্ভব

খ = কাহিনির বিকাশ

গ = কাহিনির পরিণতি

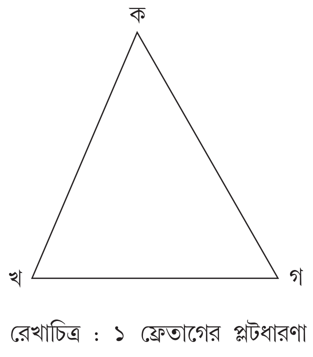

রেখাচিত্র : ১ ফ্রেতাগের প্লটধারণা

আবার এটিকে বৃত্ত বলার পক্ষপাতী আলোচকও আছে। তাঁদের কাছে প্লট এইরকম :

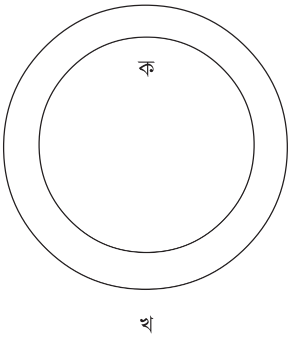

ক = মূল কাহিনী

খ = উপকাহিনী

রেখচিত্র ২ : প্লটের ধারণা

মূল কাহিনিবৃত্তের চারপাশে এক বা তার বেশি উপকাহিনি লেখকের ধারণা, চরিত্রের বিশেষত্ব চরিত্রের সম্পর্ক বোঝাতে আসে। কখনও আবার উপকাহিনি হয়ে দাঁড়ায় মূল কাহিনিবৃত্তের বিপরীত দর্শনজাত। অর্থাৎ লেখক একটা জীবনবৈপরীত্য বোঝাতে উপকাহিনি আনেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই উপকাহিনি মূল কাহিনির পুষ্টিই ঘটায়। এমন তো হতে পারে যে উপকাহিনি মূলের চেয়ে লেখকের দৃষ্টিকে বেশি কাড়ল? তখনই হয় বিপর্যয়। উপকাহিনি সেখানে আকারে-প্রকারে মূল বৃত্তের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। পরগাছার মতো মূল কাহিনিবৃক্ষকে নীরক্ত, নীরস করে সে বেঁচে থাকে।

কাহিনি চরিত্রের দাবিতে এগোয়—এমন অবান্তর ধারণা আমরা স্বীকার করি না। বরং আমাদের কল্পনা হল, লেখক গোটা কাহিনিকে একটা চিন্তাবৃক্ষরূপে ভাবেন। নিজের জীবনব্যাখ্যানকে সুষ্ঠু রূপ দিতে গেলে এছাড়া 'নাস্ত্যেবগতিরন্যথা'। এর শিকড় লেখকমনে থাকলেও বাইরে এটি কয়েকটি পর্ব বা খণ্ডে, খণ্ড আবার পরিচ্ছেদে বিভক্ত থাকে। লেখকমনের ভাবনার সবচেয়ে বড়ো অংশ হল খণ্ড (পার্ট)। আর তার অংশ হল পরিচ্ছেদ (চ্যাপটার)। লেখকমন পরিচ্ছেদ থেকে খণ্ডে, আবার বিপরীতক্রমে যাওয়া-আসা করে। পরিচ্ছেদের আবার বিভাগ দেখি—অনুচ্ছেদ (প্যারাগ্রাফ)। অনুচ্ছেদ শুধু অন্বয়তত্ত্বের নয়, ঔপন্যাসিক শিল্পরূপেরও একটি প্রকাশ। অনুচ্ছেদকে এযাবৎ আমরা শেষতম বিভাগ মনে করেছিলাম। কিন্তু মাঝে মাঝে দেখি, পরিচ্ছেদের মধ্যস্থলে কিছুটা স্থান ভাগ করে একটা উপ-পরিচ্ছেদ (সাব-চ্যাপটার) আনা হয়েছে। অনেক সময় পরিচ্ছেদ পালটালো না। অথচ লেখক কাহিনীতে নূতন চরিত্র, ঘটনা, বা ঘটনার অন্য ব্যাখ্যান সংযোজন করলেন। একে তর্কের খাতিরে কেউ কেউ বলেন মুদ্রণ প্রয়োজনে আগত। আমাদের কাছে এই উপ-পরিচ্ছেদ এতটা সহজ সিদ্ধান্ত নয়। কেননা এই নূতন বিভাগটি ঘটে নানা কারণে—কখনও সময়ের বদল, কখনও উপকাহিনী, কখনও একই ঘটনার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া বা ভিন্ন ঘটনার ভিন্ন ঘটনাস্থল বোঝাতে। সঞ্জননী-রূপান্তরী ব্যাকরণের বৃক্ষচিত্ররূপে এটিকে এভাবে দেখতে পারি :

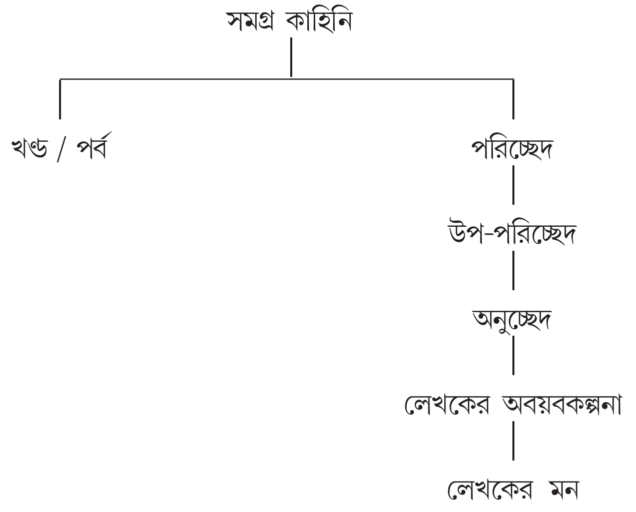

রেখাচিত্র ৪ : আমাদের অবয়বধারণা

লেখকের ধারণা পর্ব থেকে পরিচ্ছেদ, উপ-পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদে যায়। আবার সবকিছু পর্বে ফিরে আসে। এভাবে পর্ব থেকে অনুচ্ছেদে অবিরাম যাওয়া-আসা ঘটে। এই পর্ব-পরিচ্ছেদ মিলে যার অধীনতা স্বীকার করে, তা হল লেখকের অবয়ব-পরিকল্পনা। লেখকের মনে হল গভীর স্তর (ডীপ লেভেল), আর অনুচ্ছেদ থেকে পর্ব হল উপরিস্তর (সারফেস লেভেল)।

পড়ুয়া পাঠক এমন একটি রেখচিত্রে আপত্তি তুলতে পারেন। কেননা সব উপন্যাস তো এমনভাবে লেখা হয় না। খণ্ডহীন, পরিচ্ছেদহীন উপন্যাসও তো দেখি। যেমন মানিকের চতুষ্কোণে এই ঘটনা ঘটেছে। এই অভিনব উপন্যাস-অবয়ব আসলে লেখকের অবয়বধারণার বহিরঙ্গ প্রকাশ, উপকাহিনি এখানে বর্জিত। চারটি মেয়েকে ঘিরে নায়কের যে পরীক্ষানিরীক্ষা, তারই ফল এই উপন্যাস। এখানে সবটাই লেখকের চেতনাপ্রবাহধর্মী ব্যাখ্যান অনুযায়ী উপন্যাসটি নবশিল্পধারণ করেছে।

কখনও আবার খণ্ডেও নবীনতা আছে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ। এখানে জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনী, শ্রীবিলাস বলে চারটি পর্ব আছে। অথচ জাগরীর মতো তা একেক মানুষের আত্মকথন নয়। কাহিনির কথক একজন, সে হল শ্রীবিলাস। শচীশের ডায়েরি, দামিনীর কথাবার্তা (যা পরে শ্রীবিলাস জেনেছে) এখানে অনুকথক। একটি চরিত্রের পক্ষে সবগুলি ঘটনা জানা বা বাকিদের হৃদয় খোঁড়া সম্ভব ছিল না। চারটি অংশ চরিত্রনামে এলেও মুখ্য কথা এদের কোনো একজনের নয় অথবা এগুলি এদের জবানীতে আসেনি। ঘরে-বাইরেতে যেমন চরিত্রগুলি আত্মকথন করেছে, এখানে তেমনটি করা হয় নি। অথচ খণ্ডগুলির আপাত নামদানে একটা আত্মকথনের বিভ্রম তৈরি হয়েছে।

উপন্যাসের সূচনা ও সমাপ্তির কোনো ছাঁদ আছে কিনা, এ নিয়ে আমরা ভাবিনি। অথচ এ দুটিই উপন্যাসের অবয়বের উল্লেখ্য অঙ্গ। কেননা সূচনা কারোর ধীর লয়ে, কেউ আবার দ্রুত একটি সুর সঞ্চার

করেন। প্রথম ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে কাহিনির জট খোলে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কাহিনির দ্রুত সূচনাভঙ্গি পাঠককে মুহূর্তে কাহিনির চমকে টেনে নিয়ে যায়। সূচনায় কখনও দেখি বর্ণনার ভাষা, কখনও নাটকীয় সংলাপ, কখনও জ্ঞানমূলক বিবরণধর্মী গদ্য, কখনও একটি তীক্ষ্ণ রহস্যের সঞ্চারসম্ভাবক ভাষা। এখানে লেখকের উপন্যাসের কথা শুরুর কৌশল ধরা পড়ে।

তেমনি উপসংহারও মনোযোগ কাড়ে। প্রচলিত প্লটধারণার বিমোচন (ক্যাথারসিস) বা অবরোহ-পর্ব সবসময় উপসংহারে মেলে না। লেখক একটি সমস্যা চরিত্র-বিষয়-ঘটনাক্রমে সাজাতে সাজাতে বিপন্ন হন, তখন হঠাৎ জটিলতার জাল ছিঁড়ে ফেলে নিজেকে মুক্ত করেন। আবার মূল চরিত্রকে নানা অপসারণ কৌশলে কেন্দ্রভূমি থেকে সরিয়ে ঘটনাভার লাঘব করেন। কখনও এভাবে মৃত্যু আসে, মৃত্যুর সম্ভাবনা জাগে অথবা চরিত্ররা দূরের যাত্রী হয়। মৃত্যুরও নানা রঙ দেখি, কখনও তা চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণাম, কখনও বীভৎস রসের। উপন্যাসের সমাপ্তি সূচনার মতো দ্রুত বা ধীর লয়ে ঘটতে পারে। অথবা সংকটের চরম মুহূর্তে পৌঁছে উপসংহার আসতে পারে (যেমন, চার অধ্যায়)। ঔপন্যাসিক সবসময় পাঠককে প্রত্যাশিত সমাধানে পৌঁছে দেবেন, এমন নাও হতে পারে। কেননা, এমন হতে পারে যে (১) প্রত্যাশিত সমাধান তাঁর জানা নেই, (২) ঐ সমাধান জানানো পাঠকের বুদ্ধির প্রতি অনাস্থা জানানোর সামিল, (৩) সমাধানে আসবেন কিনা এ বিষয়ে তার মনে সংশয় আছে।

সূচনা ও উপসংহার তাই প্রসঙ্গ ও অবয়ববিচারে দরকারী ভূমিকা পালন করে। জীবনের একটি ভাষ্যকর্মের কথারম্ভ ও কথাসাঙ্গ কীভাবে লেখক করে, সেটা জানা অবয়বধারণারই বিষয়।

উপন্যাস-অবয়বে বর্ণনামূলক, নাটকীয় সংলাপ ছাড়াও গান, কবিতা, লোককাহিনি, কবিতাংশ, চিঠিপত্র, নীতিমূলক গল্প স্থান পেয়ে থাকে। এগুলির কাহিনিগত প্রয়োজন নির্ধারণ করতে হবে। এরা অনেক সময়েই চরিত্র-মানসিকতার পরিচয় জানায়। আবার একজন কবি বা গায়ককে নিয়ে লেখা কাহিনিতে চূর্ণ কবিতা, গান আসা স্বাভাবিক। তেমনি লোকজীবনের উৎসব, বিশ্বাস, চরিত্র বোঝাতে লোকগীতি, কাহিনি কিংবা ছড়াগান আসতে পারে। এমনকি ধাঁধাও থাকতে পারে। এ যেমন চরিত্র বা কাহিনির চরিত্রপ্রসঙ্গ বোঝানোর জন্য, তেমনি লেখকের উপন্যাসে একটা ভূমিকায় ব্যবহৃত হতে পারে। যে কথা সরাসরি জানানো যায় না, তাকে চিঠিতে প্রকাশ করা উপন্যাসে একটা সাধারণ কৌশল। আবার দূরের মানুষের কাছে কোনো ঘটনার প্রতিক্রিয়া কীভাবে পড়েছে কিংবা চরিত্র তার হৃদয়দুয়ার কীভাবে খুলে ধরেছে, তা উপন্যাসে চিঠি ব্যবহারের কারণ হতে পারে। বঙ্কিম আবার চিঠিকে বিবেকের দায়িত্ব পালন করিয়েছেন। এইসব চিঠিপত্রের ভাষা উপন্যাসের বহতা ভাষা থেকে আলাদা হয়। এদের ঔপন্যাসিক গুরুত্ব অবয়বধারণায় আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

এবার আসা যাক কালের কথায়। উপন্যাসে যে ঘটমান কাল ব্যবহার করা হয়, তা হল আপাত (অ্যাপারেন্ট)। আবার সেই আপাত কাল ছাড়িয়ে চরিত্র-ঘটনা যখন অতীতে প্রবেশ করে এই কালকে সমৃদ্ধ করে, তা হল প্রকৃত (রীয়াল)। এই আপাত-প্রকৃতকালের বিন্যাস লেখক অবিরত করেন এমন নয়। কিন্তু এই কালচেতনাই উপন্যাসের অবয়বে নূতন বৈশিষ্ট্য সঞ্চার করে। যেমন, পশ্চাৎ-উদ্ভাবন (ফ্ল্যাশব্যাক), আত্মকথনে দুই কালের মিশ্রণ (আপাত ও প্রকৃত)। কখনও কখনও পর্ব-পরিচ্ছেদও এই দুই কালে বিভক্ত হয়ে উপন্যাসের প্রসঙ্গকে নবীন ধরনে জানায়। এর মধ্যে চরিত্রের পরিচয়, মনস্তত্ত্ব থাকলেও অবয়বে এদের স্বাতন্ত্র্য লেখক

দেখান। কখনও আপাত, কখনও প্রকৃত এভাবে কালের বুনোটে পরিচ্ছেদ বোনেন। এই কালের বুনোট দেখা প্রয়োজন।

৫.২.৪ ভাষা নিয়ে

আমরা উপন্যাসের শৈলীর মধ্যে ভাষা-ভিন্ন ধারণার কথা আগে আলোচনা করে নিয়েছি। এবার উপন্যাসের ভাষা-বিচার আলোচনা করা যাক। সমস্যা, চরিত্র, প্রসঙ্গ, বর্ণনা, বাস্তবতা, সংলাপ—এইসব উপন্যাসভাষার অঙ্গ। ভাষার সার্থকতায় যেমন অসাধারণ উপন্যাস-প্রতিমা গড়ে ওঠে, তেমনি ভাষার বিফলতায় মহৎ বিষয়ও কালের গর্বে লোপ পায়। এছাড়া অনেক উপন্যাস লেখককে আমরা যে ভাষাভঙ্গিহীন মনে করেছি (যেমন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়), তারও পুনর্বিচার প্রয়োজন। লেখকের শব্দ বাছাই, বাক্যের সরল/বাঁকা গড়ন, বর্ণনাকৌশল, ভাষাজ্ঞান—সবই এখানে আলোচ্য হতে পারে।

১. প্রত্যেক লেখক উপলক্ষ ও মানসিকতা অনুযায়ী ভাষার নির্বাচন করেন। এক্ষেত্রে উপলক্ষের চাপ প্রধান বিবেচ্য। একটি উপভাষা বা প্রান্তিক অঞ্চল-কথা লিখতে চাই প্রয়োজনীয় উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাজ্ঞান। এই জ্ঞানও আবার পরিমিতিবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। নইলে উপভাষার দখল দেখাতে গিয়ে লেখক এক প্রাণহীন উপভাষাকর্ম রচনা করতে পারেন। আবার উপভাষা অঞ্চলের চরিত্র আদর্শ চলিতে বাক্য বলে চলেছে। এমন হলে কাহিনিতে প্রত্যাশিত অঞ্চলবোধ সঞ্চারিত হয় না।

২. বাংলা ভাষার দুটি লেখার ধরন লেখকের সামনে থাকে—ক. সাধু, খ. চলিত গদ্য। সাধু গদ্য ও চলিত গদ্যের ভেদরেখা অনেকের কাছে স্পষ্ট হলেও আমাদের কাছে তা শুধুমাত্র ব্যাকরণ-বৈশিষ্ট্যের ভেদ নয়। সাধু গদ্যের আড়ালে চলিতের সুর অনেক সময় বেজে ওঠে। আবার অনেকের চলিত গদ্যের মধ্যে সাধুর ব্যঞ্জনা লক্ষ করি। উপন্যাসে এই দ্বিচারণা সংলাপের ক্ষেত্রে আরও স্পষ্ট হয়। বর্ণনাত্মক সাধুভাষায় বর্ণনার পর সংলাপ এসেছে চলিতে। ঔপন্যাসিক কি এখানে বর্ণনার জন্য মৃত ভাষা এবং সংলাপের জন্য জীবন্ত ভাষা ব্যবহার করতে চান? সাধু গদ্যের চালচলনে যে একটা আড়ষ্ট, মন্থরতা জন্মায়, সংলাপে তা আরও কৃত্রিম হয়ে দাঁড়ায়। বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকে গদ্যের এই দ্বিচারণা দেখতে পাই।

৩. চলিত গদ্যে যাঁরা উপন্যাস লিখছেন, তারাও একই চলিতের সাধনা করেন না। কারও চলিত বর্ণনাধর্মী, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত। আবার অন্য ঔপন্যাসিক চলিতকে শাণিত, পরোক্ষ বাক্যমালায় সাজিয়ে তোলেন। এ ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের শব্দ তাকে সাহায্য করে, তা নিয়ে যথেষ্ট বিবেচনার প্রয়োজন আছে। মানিক অসাধারণ উইটে ভাষার রূপনির্মাণ করেছেন তৎসম শব্দের সাহায্যে। এখানে শব্দ নয়, বাক্য গড়নের দ্বারা এক অপূর্ব ব্যঞ্জনার ক্ষমতা এই উইটের মূলে। তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণ কিন্তু এই উইটপ্রধান ভাষার আশ্রয় বেশি নেননি। কেননা তাঁদের কাছে জীবনের স্থির, নিস্তরঙ্গ প্রবাহ সত্য ছিল। এদের মধ্যে একটা প্রচল উপন্যাস-ভাষার প্রতি সংসক্তিবোধও ছিল। মানিক, জগদীশ গুপ্ত কিন্তু প্রচল উপন্যাস-ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেননি। এক নাগরিক মনোবৃত্তি (যা ব্যঙ্গপ্রবণ এবং বিশ্লেষক) তাঁদেরকে অন্য ভাষারূপ গ্রহণে বাধ্য করেছে জীবনকে বিশ্লেষণ করে বাঁচার দুঃখবোধ তাঁদের ভাষার শাণিত রূপের মূলে। অন্যদিকে পাঠক সম্পর্কে দুপক্ষেরই লক্ষ্য আলাদা।

তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ যখন প্রচল উপন্যাসভাষা অবলম্বন করে বেশি পাঠক পেতে চান, তখন মানিক তাঁর ভাষাগুণে মুষ্টিমেয় সাহিত্যরসিকের তৃপ্তি জোগান।

উপলক্ষ এখানে সামান্য প্রতিবাদ জানায়। কেননা মানিকেরও পাঠক কম নয়। পাঠক কম না হলেও মানিককে তাঁর শিল্পরূপে বুঝেছেন, এমন মানুষের সংখ্যা এখনও কম। নইলে তাঁর শিল্পরূপ প্রকরণ নিয়ে আমরা মোটা দাগ টেনে যাচ্ছি কেন? যুগের বক্রভাষণ এবং সকলের আড়চোখে সকলকে দেখার ভঙ্গি মানিকের উপন্যাসরূপকে জটিল করে তুলেছে।

উপন্যাসে ভাষার আরেকটি লক্ষণীয় দিক হল—গ্রাম্য, ইতর, দেশি এবং নিষিদ্ধ শব্দের ব্যবহার। উপন্যাসে এমন অনেক চরিত্র আসে যারা শুচিবায়ুগ্রস্ততাকে ছিন্ন করেছে। শিল্পে পবিত্র এবং অপবিত্র ভাষার ভেদ এভাবে লোপ পেয়েছে। শিল্পের প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন যে-কোনো শব্দ সাগ্রহে লেখক বরণ করেছেন।

উপন্যাসে দ্বিতীয় ভাষার (সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ) প্রয়োগ একটি সাধারণ ঘটনা হলেও এটি আমাদের প্রাক্তন সমালোচনায় স্থান পায়নি। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষার কথা বলতে গেলে যে বিচিত্র পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তার উদাহরণ বাংলা উপন্যাসে অজস্র। কখনও চরিত্ররা দ্বিতীয় ভাষায় দক্ষতা দেখিয়েছে (আড়ালে আছে লেখকের দ্বিতীয় ভাষাজ্ঞান)। কখনও আবার মিশ্রভাষার (মিক্সড ল্যাংগুয়েজ) বনেদ গড়ে উঠেছে। ইংরেজের বলা বাংলা কিংবা বাঙালির হিন্দিতে এমন মিশ্র ভাষারূপ দেখি। ইংরেজের বাংলা উচ্চারণে 'ট' বর্ণের মাত্রাবৃদ্ধি বাংলা নাটক-উপন্যাসে একটি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবার 'মুসলমানী বাংলা' বলতে আরবি ফারসি উর্দু শব্দের ছিটেফোঁটা এসেছে। এভাবে বাঙালি লেখক ইংরেজি, হিন্দি, মুসলমানি বাংলার এক ঔপন্যাসিক ভাষাছাঁদ গড়েছেন। কোনো কোনো সময় হাস্যরস বা চরিত্রের জাতি-পরিচয় এই ভাষাকৌশল ফোটানো যায়।

নূতন শব্দ নির্মাণ, পুরোনো শব্দে নূতন মাত্রাদান, সাদৃশ্য-শব্দ নির্মাণ (অ্যানালজি ফর্মেশন) কবিতার মতো উপন্যাসেও বারবার ঘটেছে এবং ঘটছে। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মতো একালের তিন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক—তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন। দেশি ও তদ্ভব শব্দকে সমাসবদ্ধ করা মানিকের বিশেষ কৃতিত্ব।

উপমার বিচিত্র প্রয়োগ কবিতার মতো উপন্যাসেরও সম্পদ। এক্ষেত্রে উপমা এবং বিশেষণশব্দ লেখকের উপমাচয়নে সার্থকতা-ব্যর্থতা জানায়। আবার কালোপযোগী আধুনিক মানস পুরোনো উপমায় অতৃপ্তি জানিয়ে নূতন উপমালোক তৈরি করেছে। উপমার পৌরাণিক যুগ এভাবে দূরে সরে গিয়ে আধুনিক বাতাবরণ খুঁজে ফিরেছে।

বাক্যবন্ধ একেক ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে একেকরকম। কারোর ঝোঁক সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ বাক্যে। কেউ আবার যৌগিক এবং জটিল বাক্যমালায় বক্তব্য প্রকাশ করেন। তবে সরল বাক্যে উপন্যাস লেখা একান্ত জটিল ও যৌগিক বাক্যগঠনের মূলে ক্রিয়া করে। জটিল বাক্য মানে দুরান্বয় নয় কমলকুমার মজুমদারের মতো। কেননা সংপ্রেষণের ক্ষমতাই ঔপন্যাসিক বাক্যের একমাত্র লক্ষ্য। দীর্ঘ বাক্যমালা (নানা যতিচিহ্নের বাঁধনে বাঁধা) অমিল নয়। লেখক এখানে বলেই যাচ্ছেন। পাঠক নিজের অর্থবোধের বিপত্তি দেখতে পান। তবে সৌভাগ্য যে এরা একটি চৌদ্দ পঙ্‌ক্তিক বাক্য নয়, অনেক বাক্যের সমাহার-বিন্যাস। শুধু চোখের দেখায় এইসব বাক্য একটা ভয়ের আবহাওয়া তৈরি করে।

সম্বোধন বাক্য আসে নানা কারণে। লেখক নিজেই অনুপ্রবেশ করে পাঠককে বোঝানোর দায়িত্ব নেন। কেন তিনি উপকাহিনি শেষ করছেন, বর্ণনাকে সংক্ষিপ্ত করছেন, অন্য কাহিনিতে প্রবেশ করছেন—এসব তথ্য সম্বোধনবাক্যে পরিবেশিত হয়। ঔপন্যাসিকের একটা সর্বজ্ঞ (ওমনিসিয়েন্ট) মনের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। পাঠককে ডেকে চরিত্র, তাদের কর্মলক্ষের মূল্যায়ন করা উপন্যাসের আদি যুগের এবং বর্তমানের সর্বজনীন (প্যানাক্রনিক) লক্ষণ। এ জাতীয় মন্তব্য এবং অবয়বের ভিন্নতা জাগায়। প্রাথমিক যুগে লেখক আড়ালে আবডালে বলে পুতুলখেলা পছন্দ করতেন না বলে এরকম করতেন। এখনও তা বহমান কেন? আশ্চর্যের বিষয় এই কৌশলটি একেবারে বাতিল হয়ে যায়নি। আসলে লেখক চরিত্র-ঘটনা-বক্তব্যের সঙ্গে পাঠকের আড়ালে অস্বস্তিতে থাকেন। তাই এগিয়ে এসে অন্তরঙ্গতা তৈরি করতে চান। এতে আন্তরিকতা থাকলেও পাঠকের গ্রহণযোগ্যতা এবং বোধগম্যতার সীমা সম্পর্কে একটু তাচ্ছিল্য লুকিয়ে থাকে।

বাক্যে বক্রতার পরিমাণ, সাধু-চলিতের দ্বন্দ্ব, উপভাষাবোধ, দ্বিতীয় ভাষার ব্যবহার, নবশব্দনির্মাণ, বাক্যের সম্বোধনরীতি শেষে আরেকটি সমাজ-ভাষা (সোসিওলেক্ট) ধারণার পরিচয় নিলে পাঠক এই উপন্যাসের শৈলীর শেষে পৌঁছতে পারেন। এটি হল সম্বোধনসূচক সর্বনামের বিচিত্র প্রয়োগ। এইসব সর্বনাম (তুই-তুমি-আপনি) সামাজিক স্তরভেদে, ঘনিষ্ঠতার মাত্রায় অবিরত নানা রূপ নেয়। আদরে তাচ্ছিল্যে নামের বিকৃত উচ্চারণ দুর্লভ নয়। সামাজিক ব্যাকরণে যেমন ‘হরি’ ‘হরে’তে পরিণত হয়। তুই-তুমি-আপনি সম্বোধনে সর্বনামের তিনটি ব্যাকরণবৈশিষ্ট্যই নেই, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয়বহ। অজানা মানুষ পরিচয়ের প্রথম পর্বে ‘আপনি’ সম্বোধনে আপ্যায়িত বা দূরায়িত (ডিসট্যান্ট) হলেও পরে তুমি/তুই দ্বারা ঘনিষ্ঠ হয়ে যেতে পারে। যেমন কাজের জায়গায় বা পরিচয় গভীর হলে। নিম্নজাতীয় মানুষের প্রতি উঁচুজাতের মানুষের ‘তুই’ ডাক পালটে যায় সামাজিক সম্মানে বা টাকার জোরে প্রথম জন সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠলে। আবার পরিচিত মানুষজনের কাজে গুণী মানুষও প্রাপ্য সম্মান পান না। তাই তার সামাজিক স্তর, আত্মীয়তাসম্বন্ধ একটু নীচু মাত্রার ‘তুই’ যোগ করে। সম্বোধনের বৈচিত্র্যকে আমরা রেখাচিত্রে দেখাচ্ছি :

আ	উচ্চ (বিত্ত বা সম্মানে)		আ
	সমান ও অন্তরঙ্গ তু^{১}, তু^{২}	সমান কিন্তু অন্তরঙ্গ নয় আ	
তু^{১}	নীচ		ত^{১}

রেখাচিত্র ঃ তুই-তুমি-আপনির সম্বোধনবৈচিত্র্য

এই রেখাচিত্রে আ=আপনি

তু^{১}=তুই

তু^{২}=তুমি

চরিত্রগুলির সামাজিক মর্যাদা, পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে ঔপন্যাসিক এই সম্বোধনবৈচিত্র্যকে মেনে চলেন। আবার এদের রদবদলে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে, তা তাঁকে খেয়াল রাখতে হয়। যুগ পালটানোর সঙ্গে সঙ্গে নীচু তলার মানুষরা 'তুমি' দ্বারা সম্বোধিত হতে চায়। এতে আবার বড়োমানুষরা অস্বস্তিতে পড়েন। সমাজের এই স্তরবদল এবং সম্মান নিয়ে বিতর্ক ঔপন্যাসিককে তাঁর চরিত্রে নির্দিষ্ট মাত্রা জোগায়।

উপন্যাসের শৈলী, এইসব অবয়ব-ভাষা প্রয়োগের বৈচিত্র্য লক্ষ করলে আমরা একজন ঔপন্যাসিকের শৈলীবদলের ইতিহাস জানতে পারি। কখনও এই কাঠামোর বাইরে কেউ যাবেন না, এমন নিষেধাজ্ঞা জারি করা যায় না। কেননা শব্দশাস্ত্রের মতো উপন্যাসের শৈলী অনন্ত সম্ভাবনা ফুটিয়ে তোলে। অনন্ত সম্ভাবনা বললে ব্যাখ্যানের দায়িত্ব কমে যায়। অথচ বাংলায় উপন্যাস শৈলী নিয়ে প্রথম আলোচনার সূত্রে একটা ভাবনা কাঠামোর (থট প্রসেস) উপস্থাপনে সুধী পাঠকেরা নিশ্চয়ই অভিযোগের তর্জনী তুলবেন না।

এবারে উপন্যাস শৈলী বিশ্লেষণের একটি প্রয়োগকর্ম পাঠকের সামনে হাজির হচ্ছে। রচনাটি হল রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (১৯০৩)। মানুষের আঁতের কথা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ধারায় প্রতিবাদকারী তৃতীয় বিষবৃক্ষের ব্যর্থতাবহ এই উপন্যাস সমালোচকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমরা এই রচনাটির শিল্পগুণ বিশেষত শৈলীরূপবিশ্লেষণে তৎপর হচ্ছি। এই আলোচনায় শেষ অংশ চোখের বালির শৈলীবিচার। এই বিচারে সন্তুষ্ট এবং অসন্তুষ্ট মানুষরা নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছেন পূর্বাহ্ণেই। ব্যাপক পাঠকের কাছে এটি কেমন প্রতিক্রিয়া জাগায়, তা জানার কৌতূহল রইল।

৫.৩ ❑ উপন্যাসের স্বপ্নভঙ্গ : 'চোখের বালি'

দুটো উপন্যাস লেখার পর ছোটোগল্প আর অসামান্য কবিতার ফুল ফুটিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকালেন আধুনিক সামাজিক সমস্যার দিকে। আগের দুটো উপন্যাসে ইতিহাস-কল্পনা-রোমান্সের ভাঙা আয়নায় মানুষের জীবনকে দেখেছেন। কিন্তু সে দেখা অপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, উপন্যাসের আলাদা প্রতিরূপের পথরোধ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'চোখের বালি' বেরোয় নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে (১৩০৮-০৯ বঙ্গাব্দ)। বিষয়ক্ষেত্রে সমস্যা এখানেও বাল্যবিধবার প্রেমচেতনা। অথচ 'বিষবৃক্ষ'-এর কুন্দনন্দিনী বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর রোহিণী এখানে ফিরে এল না। এল বিনোদিনী, যে 'বড় সুন্দরী', 'মেমের কাছে পড়াশুনা' করা, দুজন পুরুষ এবং একজন নারীর জীবনে অশান্তির ঝড় তুলল। বাঙালি পাঠকের মনও অশান্ত হল বক্তব্যের নবীনতায়, পরিচিত উপন্যাস-কল্পনা আঘাত পেল।

সমালোচকরা উপন্যাসে আধুনিকতার সূচনা লক্ষ করলেন। বঙ্কিম-উপন্যাসে সামাজিক-পারিবারিক বাতাবরণ, রোমান্সের ঘনঘটাকে এড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ চোখ ফেরালেন ব্যক্তিমনের অন্দরমহলে। সেখানে অবিরত প্রবৃত্তির ওঠা-পড়া, কী যে সে চায়, নিজেই জানে না। বিনোদিনীর এই অবোধ্যতাই আধুনিক মানুষের লক্ষণ। ঔপন্যাসিক সহজ অপসারণ-কৌশলে[১] বিনোদিনীকে সরালেন না কিংবা রমেশচন্দ্রের মতো পুনর্বিবাহে[২] সুখী করলেন না। চেতন-অবচেতন, সামাজিক সংস্কার ও নারীর স্বাভাবিক কামনার দ্বন্দ্ব বিনোদের জীবনকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। যে-পরিণতিতে সাধারণ গল্প-ভোলা পাঠক অমিলে কষ্ট পান আর প্রবীণ সমালোচকরা রোমান্সের আলো[৩] জ্বলে উঠতে দেখেন। 'পশুশালার দরজা' খোলা হল। চরিত্ররা কলকাতা-বারাসত-কাশী-এলাহাবাদের বিরাট

পরিধিতে মুক্তি পেল। অথচ এই স্থানিক বিস্তার রোমান্সের অঘটনের জন্য নয়, চরিত্রের আত্মগোপন বা অবচেতনের প্রকাশক্ষেত্র হয়ে উঠল।

বঙ্কিমে মাতৃচরিত্র অবহেলিত। মধ্যযুগ থেকে শুরু করে চলে আসা বাঙালির মাতৃচেতনাকেও রবীন্দ্রনাথ এখানে স্থান দিলেন। মা রাজলক্ষ্মী কিংবা মাতৃসমা অন্নপূর্ণা এলেন। মহেন্দ্র 'মাতার বহির্গর্ভের থলিটির মধ্যে আবৃত', তার 'ইচ্ছার বেগ উচ্ছৃঙ্খল'। বিহারীকে দুর্বল করে আঁকা হয়েছে। কারণ সে মহেন্দ্রের প্রতিস্পর্ধী চরিত্র নয়, তার সম্পূরক মাত্র (স্টীমবোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধাবোট)। আশা কুন্দ বা ভ্রমরের মতোই অপরিপূর্ণা। প্রকৃতপক্ষে কাহিনির মৌল চরিত্র বিনোদিনী; ঈর্ষা-সংসারকামনা-ভালবাসার পাত্রের অভাবে অতৃপ্তি সব কিছু মিলিয়ে ব্যক্তিত্বময়ী। একালে নগেন্দ্রনাথের মতো পুরুষের অভাব থাকলেও মহেন্দ্রের মতো প্রেমভিখারী ব্যক্তিত্বহীন ধনীপুত্রের অভাব ছিল না। বিপরীতে বিহারী ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারে না। অনাথ আশ্রম ও বসন্তের পালন করে সে সাংসারিক সমস্যাকে দূরে রাখে। উনিশ শতকের পোষ্যপুত্র এইসব পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা, নারীর মহিমা, অবৈধ প্রেম, সমাজে তার স্থান রবীন্দ্রনাথকে নূতন উপন্যাস লিখতে উৎসাহিত করেছিল। তবু মনে আঁকাবাঁকা টানটোন, চরিত্রের দোলাচলতা বঙ্কিমী ভাবাদর্শের সীমার মধ্যে দাঁড়িয়েই তিনি দেখালেন। এখানেই 'চোখের বালি'র প্রগতি; পরিচিত উপন্যাসের স্বপ্নভঙ্গের সূচনা হল।

৫.৪.১ 'চোখের বালি'র ঔপন্যাসিক জাত

উপন্যাসটি বাংলা উপন্যাসের পালাবদল ঘটাল। এই পালাবদলের সূত্রে এর সাহিত্যিক জাত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বাস্তববাদী বলতে চান একদল, কেউ বা এক ধাপ এগিয়ে 'মনস্তাত্ত্বিক'। শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উপন্যাস-বিচারে এই জাত-নিরূপণ একটি দরকারি কাজ। আমরা পূর্ব সমালোচনার মধ্যে যুক্তি অনুসন্ধান করতে চাই। প্রথমে 'মনস্তাত্ত্বিক' এই লেবেল নিয়ে আলোচনা করা যাক। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের জন্ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে নয়। মূল্যবোধের ভিত আলগা না হলে নিজেদের অবচেতন ফ্রয়েডীয় বা নাস্তিবাদের নিরর্থকতায় ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। ১৯০৯-এ চেখভের ইংরেজি অনুবাদ, ফ্রয়েড-ইয়ুংয়ের মনোবিজ্ঞান ব্যাখ্যা, ১৯১০-এ বাস্তবরূপবাদ (ইমপ্রেশনিস্টক) পদ্ধতির ছবির প্রদর্শনী, ১৯১২-তে ডস্টয়েভস্কির গার্নেটকৃত ভাষান্তর, প্রুস্ত-রিচার্ডসন-জয়েসের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসরচনার আবহ তৈরি করেছিল।[৪] সবগুলিই একই কাললগ্ন, ভাবনার নবীনতাই এদের মূলে।

বিশ শতকের প্রথম দশকে চিত্তভূমির প্রাচীন স্থৈর্য একটু-একটু করে নষ্ট হচ্ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এর পর পুরনো বিশ্বাসের শিকড় ওপড়াল। 'চোখের বালি'তে যে মনস্তত্ত্ব আছে, তা বঙ্কিমী নয়। কিন্তু ঘটনা বা প্লটের মোহকে রবীন্দ্রনাথ জয় করতে পারেননি। পুরো মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে ঘটনার ভারের বিরুদ্ধতা লক্ষ করি। সেখানে বাস্তবতা 'ফর্মাল রিয়ালিজম'-এর গন্ডি ভেঙে 'ইনার রিয়ালিজম' গড়ে তোলে। এর জন্য আমাদের 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছে। 'চোখের বালি'তে মানুষের মন আঁকার শুরু ঘটনার ফ্রেমে, 'চতুরঙ্গ'-এ ঐ ফ্রেমটিও সরিয়ে নিলেন। মনের কথা থাকলেই মনস্তাত্ত্বিক হয় না। জীবন-অন্বেষা ঘটনার ভারমুক্ত হয়ে ভাবনার নির্যাস যেখানে রাখে, সেখানেই উপন্যাস 'মনস্তাত্ত্বিক' আখ্যা পেতে পারে।

এর চেয়ে 'বাস্তববাদী' সংজ্ঞাটি গ্রহণীয়। যদিও এখানে বাস্তববাদ বলতে বলা হচ্ছে 'দা ন্যারেটিভ মেথড হোয়ারবাই দা নভেল এমবডিস সারকামস্টেনসিয়াল ভিউ অব্ লাইফ' বা ফর্মাল রিয়ালিজম। এর সঙ্গে দার্শনিক বাস্তবতাবোধের প্রভেদ আছে। দার্শনিক বাস্তবতাবাদে সমালোচনাত্মক প্রথাবিরোধী, সংস্কারমুক্ত ব্যক্তিমনের বিশেষ অনুভূতি শব্দার্থের সঙ্গে বাস্তবতার যোগ গড়ে তোলে। 'চোখের বালি'র সময়ে সমাজে ব্যক্তির আলাদা মূল্য অনেকটা মেনে নেওয়া হয়েছে। গোষ্ঠী নয়, ব্যক্তিচেতনা বড়ো হয়ে উঠেছে। ফলে অবৈধ প্রেম, নারীর ব্যক্তিসত্তা, গৃহত্যাগ থাকলেও এই রচনাটি 'বিষবৃক্ষ'-এর প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথের সংস্কারমুক্ত মনে বিষবৃক্ষের পরিণতি সমালোচিত হয়ে প্রতিবাদমুখর হল 'চোখের বালি'তে। নারী আলাদা মর্যাদা, পুরুষ-শাসিত সমাজে তাদের প্রেমপাত্রের অভাবে অসহায়তা তিনি দেখালেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমী ভাষাভঙ্গি, কাহিনিবয়ন না ছেড়ে সংস্কৃত উপমা-অলংকার-মণ্ডিত ধূসর ভাষার মধ্যে নূতন বক্তব্য আনলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জোরে। উপন্যাসটির মধ্যে প্রথা সনাতন সংস্কার চুরমার, বিনোদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মাঝখানে 'নিবাতনিকম্পমিবপ্রদীপম্'।

প্রশ্ন ওঠে, বঙ্কিমের রচনাতেও তো বাস্তবতা ছিল, কিন্তু ব্যক্তিচেতনার 'এই দৃঢ় ধাতুর মূর্তি' পেলাম না কেন? এর উত্তর খানিকটা মেলে রবীন্দ্রনাথ কৃত 'চোখের বালি'র ভূমিকায়। বাকিটা হল এরকম :

ক. ব্যক্তিকে গুরুতর সাহিত্যবিষয়রূপে সমাজের স্বীকৃতি দান; খ. পাঠকের বিশ্বাস ও কর্মপ্রবাহকে বিশ্বাস্য করে উপন্যাস দেখতে চাওয়া।[৬] তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-শিবনাথ শাস্ত্রী-রমেশচন্দ্র দত্ত-শ্রীশচন্দ্র মজুমদার নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে বাস্তবতা এনেছেন। কিন্তু সমাজ তখনও ব্যক্তিমহিমাকে স্বীকার করেনি কিংবা পাঠক নিজের জীবনকে উপন্যাস-উপযোগী মনে করত না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের উপন্যাসে এটা সত্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু 'চোখের বালি'র রচনাকালে সমাজ ও পাঠক দুইয়েরই দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। দুটো কারণ মিলিয়ে বাস্তবতা প্রখর হল, বিনোদিনী আবির্ভূত হল। বাকি চরিত্রগুলি, প্লট, পরিবেশচিত্রণ একটি দায়িত্ব পালন করেছে— নারীর স্বাতন্ত্র্য, মর্যাদারক্ষার সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বের রূপায়ণ। জীবনচিত্রণের যথার্থতা থাকলে বাস্তববাদী বলতে পারি না, তা প্রকৃতিবাদী হয়ে ওঠে। অথচ বাস্তব সমস্যার কেন্দ্রে পরিবর্তমান সমাজের মধ্যে, মানুষের স্বাধিকারকামনাকে ইতিহাস-কল্পনা-রোমান্সের রঙে আঁকা যায় না, তাকে 'উগ্র মদ্যসম রৌদ্র' তেজে প্রকাশ করতে হয়। 'চোখের বালি' এখানেই বাস্তববাদী উপন্যাস হয়ে উঠেছে।

গঠনকল্পনা

উপন্যাসশৈলী বলতে ভাষা নয়, গঠনকেও বোঝায়। এমনকি ভাষা-বিজ্ঞান নির্ভর শৈলীবিজ্ঞানেও যে 'ইন্টার-সেন্টেস গ্রামার'[৭]-এর কথা বলা হয়েছে, তা গঠনেরই পরোক্ষ স্বীকৃতি। 'গঠন' মানে পরিচ্ছেদ প্রবাহের সংক্ষেপণ নয়, তাদের অন্তর্নিহিত ঐক্যের বা অনৈক্যের চেহারাটা স্পষ্ট করে তোলা। ঔপন্যাসিক সমগ্র কাহিনিকে একটা চিন্তাবৃক্ষরূপে ভাবেন, খণ্ড (পর্ব) পরিচ্ছেদ-অনুচ্ছেদ বা উপপরিচ্ছেদ হল তার ডালপালা। এই বৃক্ষটি বিভিন্ন আকারের হতে পারে, ত্রিকোণাকৃতি কিংবা বৃত্তাকার। সমালোচক বঙ্কিমের উপন্যাস-দেহকে পিরামিডাকার কল্পনা করেছেন। যেখানে শেক্‌সপীয়রের নাটকের আদর্শে 'হৃদয়াবেগ ও ঘটনাধারা আরম্ভ থেকে ক্লাইম্যাক্সে উপরে উঠছে, ক্লাইম্যাক্স থেকে সমাপ্তিতে নেমে আসছে।'[৮] আবার ফকিরমোহন সেনাপতির 'ছ-মাণ আট গুণ্ঠ' (১৮৮৯

সালে রচিত প্রথম উপন্যাস। যার অর্থ উনিশ বিঘা দুই কাঠা) উপন্যাসে ; উলটো (∩) গঠন দেখি। সেখানে ঘটনা (মূল) আরোহী, মাঝে কয়েকটি পরিচ্ছেদ উপকাহিনি, পরে আবার ঘটনা নেমে এসেছে। এখানে ঘটনা ক্লাইম্যাক্সে আরোহণ করেই ত্রিভুজের মতো নামেনি, মাঝে অলগ্ন একটি উপকাহিনী আছে।[৯]

বঙ্কিম-উপন্যাসে নাটকের দৃশ্যমত স্থানিক নির্দিষ্টতা আছে। যদিও এই 'স্থানীয় ঐক্য'[৯] ইউনিটি অব্ প্লেস কিংবা 'কালিক ঐক্য' ইউনিটি অব্ টাইম সাহায্যকারীরূপে এসেছে। বঙ্কিমে সমান্তরাল ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে

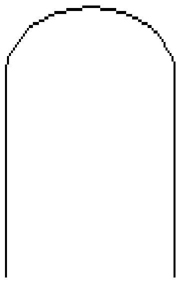

১নং রেখাচিত্র

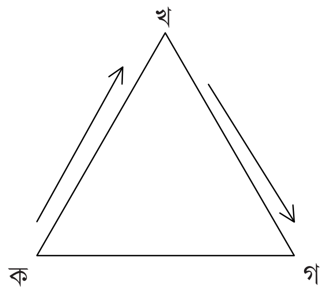

২নং রেখাচিত্র

বৈপরীত্যবোধ কাজ করছে। অতীত উদ্ভাসন-রীতি, ভবিষ্যকথন, ছদ্ম পরিচয়ের কৌতূহল, চরিত্রের অনুপস্থিতি (দীর্ঘকালীন) তাঁর গঠনশিল্পের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য।[১০]

রবীন্দ্রনাথে বঙ্কিমী উপন্যাসগঠনরীতির সাক্ষাৎ পাই। প্রথমে দুজনের মিল আলোচনা করে অমিল দেখানো যেতে পারে। 'চোখের বালি'তে ঘটনাস্থল মূলত কলকাতা বা বারাসাত শহরতলি হলেও প্রয়োজনে চরিত্ররা কাশী-এলাহাবাদ গিয়েছে। ফলে স্থানিক সীমার বিস্তার ঘটেছে। মাঝে মাঝে কাশী-কলকাতা একই পরিচ্ছেদে গ্রথিত (২৩ পরি.)। পঞ্চান্নটি পরিচ্ছেদের গঠনের যে পরিকল্পনা, তার বিশালতা আমাদের চোখ এড়ায় না। অতীত উদ্ভাসনরীতি স্বল্প। কখনও 'আয়রনি' দুটো পরিচ্ছেদে একত্র (যেমন ২৫-২৬ পরিচ্ছেদে আশার কাশীযাত্রার আয়োজন, যাত্রা, রাজলক্ষ্মীর অনুরোধে বিনোদের গৃহশয্যা)। চরিত্রের দীর্ঘ অনুপস্থিতি এখানেও আছে—৭ম পরিচ্ছেদে অন্নপূর্ণা কাশী গেছে; ২২ পরিচ্ছেদে মহেন্দ্র অন্নপূর্ণাকে কাহিনিতে ফিরিয়ে আনে, ২৩-এ তাই ঘটনাস্থল কাশী। ২৫, ২৭, ৩০ পরিচ্ছেদে তাকে কাশীতে দেখা গেলেও ৩৫ পরিচ্ছেদে আবার সে মূল ঘটনাভূমিতে হাজির। ভবিষ্যকথন (জ্যোতিষী, সন্ন্যাসী বা দৈববাণী) এখানে নেই। কিন্তু ভিক্টোরীয় সাহিত্যাদর্শে কয়েকটি চিঠির ব্যবহার আছে। বঙ্কিম উপন্যাসে চিঠি একটি গুরুতর উপাদান। মনস্তত্ত্ব বোঝাতে চিঠিগুলি এলেও এগুলি উপন্যাসের ত্রুটির দিক। অলৌকিকতা একেবারেই নেই। কিন্তু সম্পর্ক জোড়ার জন্য কিছু চরিত্র এসেছে। যেমন বসন্ত, অন্নপূর্ণা যাকে কেন্দ্র করে বিহারী-বিনোদ অন্যান্যদের সম্পর্ক জুড়েছে।

পরিচ্ছেদগুলির পরিকল্পনাটি এবার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথম পরিচ্ছেদে মূল চরিত্রগুলির পরিচয় আছে। কালসীমা তিন বছর। রাজলক্ষ্মী-অন্নপূর্ণার দ্বন্দ্ব, বিনোদিনীর সাধব্যজীবনের কথা অল্প পরিসরে বর্ণিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কিশোরী আশালতার কথা। তৃতীয়তে আশাকে নিয়ে মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীর সংঘাত। সপ্তম পরিচ্ছেদে ঘটনাস্থল পালটাল, মুখ্য চরিত্রের সঙ্গো অন্যান্য চরিত্রের যোগাযোগ দেখাতে গিয়ে। দশমে সংসারের বেহাল অবস্থায় বিনোদিনী এল, আশা হীনমন্যতায় ভুগল। উপন্যাসের নামকরণ ঘটল—দুজনের 'চোখের বালি'

পাতানোয়। এগারো থেকে পনেরো পর্যন্ত পরিচ্ছেদে বিনোদিনী-মহেন্দ্রের অনুরাগ, বিহারী আড়ালে পড়ে যায়। সতেরো পরিচ্ছেদে ঘটনা দমদমের বাগানে চড়িভাতি, এখানে মহেন্দ্র-বিনোদের সম্পর্কে বিহারীর অনুপ্রবেশ। আশা সরলা ভ্রমরের মতো সংসারের কাজে অনভিজ্ঞা, মহেন্দ্র পৌরুষহীন। কাজেই বিনোদিনীর মহেন্দ্র-জয়ে কোনো বাধা পড়েনি। কিন্তু বিনোদিনী বিহারীর চোখে সমব্যথা দেখেছে, বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। এরপর চৌত্রিশ পরিচ্ছেদ অবধি মহেন্দ্রের সঙ্গে বিনোদিনী কামনায় মগ্ন। আশা-মহেন্দ্রের সম্পর্কে বিস্ফোরিত একটি আপাত 'ক্লাইম্যাক্স' এল পঁয়ত্রিশ পরিচ্ছেদে যেখানে বিহারী বিনোদকে ফিরিয়ে দিল। বিনোদিনী এবার রিক্ত। প্রেমৈকপাত্রের অভাবে উনচল্লিশ-একচল্লিশ পর্যন্ত 'বসুধালিঙ্গন' জীবনযাপন। সাতচল্লিশে অপসৃত চরিত্র অন্নপূর্ণা ফিরে আসে; আশা সান্ত্বনা পায়। আবার এর মধ্যে মহেন্দ্র-বিনোদের উন্মত্ত জীবনযাপন, বিনোদিনীর ক্লান্তি জমে। পঁয়ত্রিশ পরিচ্ছেদে বিনোদিনীর আত্ম-আবিষ্কার, একান্ন পরিচ্ছেদে 'তাহার হৃদয়কে রক্তে ভাসিয়া' দেয়। বিনোদিনী কয়েকবার গৃহত্যাগ করেছে, কখনও সঙ্গীহীন কখনও সঙ্গী নিয়ে। 'বিষবৃক্ষে' সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ যেমন 'ক্লাইম্যাক্স' এখানে বহির্ঘটনা তা নয়। তাই সতেরো, পঁয়ত্রিশ মিলে যে হৃদয়জ্বালার সূচনা, তার অনুপম বিশ্লেষণ ঘটল একান্ন পরিচ্ছেদে। তিপান্ন নাগাদ সব চরিত্রেরই ভুল ভাঙার পালা, একটা নিম্নগতির শুরু। চুয়ান্ন সবচেয়ে ছোটো পরিচ্ছেদ। কাহিনিভূমি থেকে মহেন্দ্রের মাকে স্বাভাবিক মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়ে সরিয়ে ফেলা হল। বালির অনাথ আশ্রমের কাজে মহেন্দ্র সহকারী হতে চাইল শেষ পরিচ্ছেদে (৫৫ পরি.)। বিনোদ অন্নপূর্ণার সহযাত্রী হয়। বিস্ময়করভাবে মহেন্দ্র বিনোদকে প্রণাম করে। মহেন্দ্র-আশার জীবন নিষ্কণ্টক হলেও সেখানে বিনোদিনীর মূর্তি মুছে যায় না।

লক্ষ করার মতো, পঞ্চান্নটি পরিচ্ছেদের সব কটিকে আমরা গঠন আলোচনায় ব্যবহার করিনি। কেননা প্রেমবোধের জন্ম, বিকারগ্রস্ত কামনা, তা থেকে সহজে মুক্তিলাভ, এগুলি রবীন্দ্রনাথ অনুপুঙ্খভাবে দেখিয়েছেন। এই বিশদতা (ডিটেলিং) অন্যভাবে লেখকের গঠনের অংশ। আমরা দীর্ঘ পরিচ্ছেদবহুল বিশাল আখ্যান থেকে বাঁক নেওয়া বা ঝলসে ওঠা কয়েকটি গুরুতর পরিচ্ছেদের গঠনের ছাঁদ দেখলাম। ঐ 'টার্নিং পয়েন্ট'গুলো ঘটনার উপর নির্ভরশীল। যদিও মনের বিচিত্র গতির সূক্ষ্মতর আলোচনা ঘটনার অ-নির্ভর নয়। আমরা রবীন্দ্র-বক্তব্য নিয়ে প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে ভেবেছি। গঠন কিন্তু বক্তব্য নয়, বক্তব্যস্থাপনের পরিকল্পনা। সেদিক থেকে দেখলে একান্ন পরিচ্ছেদে বিনোদিনীর আত্ম-আবিষ্কারই চূড়ান্ত শীর্ষবিন্দু, যদিও পঁয়ত্রিশে একটি উন্নতি-রেখা পাচ্ছি। প্রথমদিকে তাই রয়েছে (১-৭ পর্যন্ত) পরিচয়-পর্ব, একান্ন পর্যন্ত হৃদয়াবেগ-প্রবৃত্তির অদৃশ্য পাকে মানবজীবনের আন্দোলন। আর বাকি চারটি (বিশেষত উপসংহার) চিন্তাবৃক্ষের ডালপালাকে সংযত করে গোছানোর পালা। যে মহৎ বিনষ্টির শোক পাঠকমনে জেগেছিল, তাকে কুঠারাঘাত করে শান্তিবারি ঢালা হল অন্তিমে। বিধবা প্রেমের সমস্যায় বঙ্কিম বিষপাত্র তুলে দিয়েছেন, রমেশচন্দ্র সংসারের অমৃতকুম্ভবারি দান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সামাজিক চাপ এবং শিল্পসিদ্ধির লড়াইয়ে বিনোদিনীকে সংসারবিষ দিয়ে কাশীতে শান্তিযাত্রা করালেন।

গঠন সম্পর্কে শেষের কথা হল, রেখাচিত্র ১-এ বর্ণিত 'ক্লাইম্যাক্স' (সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ) এসেছে ত্রিশ পরিচ্ছেদে, তারপর আরও কুড়িটি পরিচ্ছেদ চলেছে নিচের ঢালে। আর এখানে পঁয়ত্রিশ আপাত ক্লাইম্যাক্স হলেও প্রকৃত ক্লাইম্যাক্স এল একান্নতে। ফলে সমবাহু ত্রিভুজের পরিকল্পনা খারিজ। বাকি চারটি পরিচ্ছেদ

লেখকের সমাপ্তির অধৈর্য, শিল্পরীতির সংকট প্রতিপন্ন করেছে। তাই এর গঠনে বঙ্কিমী-প্রভাব যেমন সক্রিয়, তেমনি অক্রিয়। গঠনের চক্রান্তের চেয়ে মানসিকতার নিপুণ বিশ্লেষণই রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত ছিল—যদিও সামগ্রিকভাবে বঙ্কিমের উপন্যাস গঠনের ছাঁদ 'চোখের বালি'তে মান্য করা হয়েছে। লেখকের বঙ্কিম-বিরোধী প্রতিপাদ্য, মনোবিশ্লেষণের আগ্রহ একটা ফারাক এনেছে। মুশকিল-আসান চরিত্র নেইই প্রায়। নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তি-মূল্য, মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনচর্যা আঁকার আগ্রহ অবৈধ প্রেমকে আপাত প্রতিষ্ঠাদান 'চোখের বালি'র 'ফর্মাল রিয়ালিজম'-কে পৃথক করেছে। দার্শনিক বাস্তববাদের আলোচনা মনস্তাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনার বস্তু। উপন্যাসের তন্ময়ভাবে বহির্গঠন নিয়ে ভাবনা শেষ। বহির্গঠনের বিন্যাসের অন্তরালে রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক দ্রোহবুদ্ধি অলক্ষ নয়। তিনি তাই বঙ্কিমী উপন্যাসের গঠনছাঁদ বাতিল করলেন না। ঐ সীমাবদ্ধতার মধ্যে আপন জীবনদর্শনের নবীনতা ছড়িয়ে দিলেন।

৫.৩.৩ ভাষাভঙ্গি : প্রাচীন নবীনের সংঘর্ষ

গঠনে যেমন চলতি রীতিকে মান্য করার ভাব, তেমনই ভাষার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নবজাত দ্রোহবুদ্ধি কীভাবে পরিবর্তন এনেছে, তা দেখা যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃতজগৎ, বঙ্কিমী ভাষার প্রভাবমুক্তি বা স্বীকার অনিবার্য আলোচ্য বিষয়। ভাষাকে যাঁরা শৈলীর একমাত্র বলে ভাবেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ সাংগঠনিক শৈলীবিজ্ঞানীদের পার্থক্য আছে। উপন্যাসের বহির্গঠন ঔপন্যাসিকের শিল্পকলার নির্মাণ-স্বরূপ স্পষ্ট করে। আবার ভাষা হল মনের বিশেষত্বের সেই প্রকাশ যা বলার কথাকে সুষ্ঠু করে কিংবা এলোমেলো করে। গঠন যদি হয় মনের বাইরের ফটক, তাহলে অন্দরমহলের প্রকাশরূপ হল ভাষা। খণ্ড (পর্ব)-পরিচ্ছেদ-অনুচ্ছেদ-উপপরিচ্ছেদ আসলে উপরিতল, ভাষা হল নিম্নতল (ইনফ্রাস্ট্রাকচার)। অনুচ্ছেদের গঠন হল বাক্য-পরম্পরা সূত্রে। আবার বাক্যের শেষ বিভাজন হল শব্দ। আমরা ভাষাবিজ্ঞানের উৎসাহী প্রায়োগিক হলেও ধ্বনিবৈজ্ঞানিক স্তর অবধি যেতে চাই না। কেননা বিশ্লেষণের আনন্দে ধ্বনির বৈচিত্র্য দেখা বেশ একটা বিশেষজ্ঞভাব আনলেও তা সাহিত্য আস্বাদনের পরিপন্থী। ভাষার রহস্য, লেখকের নব নির্মাণের আনন্দ, প্রচলিতের আনুগত্য (কনফর্মিটি) কিংবা সরে আসার (ডিভায়েন্স) সাহিত্যিক বিশেষত্বটুকু ধরলেই 'চোখের বালি'র নবপাঠ হতে পারে। শব্দ-অর্থের সহযোগিতা, বাক্যের স্বচ্ছন্দতা একেকজনের রচনায় একেকরকম। আত্ম-প্রকাশে ভাষার এই রকমফেরের পেছনে রচয়িতার শিক্ষাদীক্ষা, পরিবেশ, অগ্রজের প্রভাব এবং সবচেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে স্রষ্টামন। সৃষ্টির রহস্য যেমন উপন্যাসের গঠনে, তেমনি ভাষাশৈলীতেও ব্যাখ্যাত হতে পারে। আগে থেকেই পুরোনো আলোচনা হাঁটকানো কিংবা চরিত্র-বক্তব্যের ভালো-লাগায় মন হারালে সর্বনাশ—নিজের এবং পাঠকেরও। দূরদৃষ্টি এবং ক্ষীণদৃষ্টি কোনোটাই কাম্য নয়। রচনার গঠন ও ভাষাকে তন্ময়ভাবে দেখলে স্বাভাবিক দৃষ্টি সমালোচনায় আসতে বাধ্য। যাক, অবিনয়ী কথা এড়িয়ে 'চোখের বালি'র শব্দজালের দিকে চোখ ফেরানো যাক।

৫.৩.৪ শব্দজাল : পুরোনো, অচল, নূতন শব্দ

'চোখের বালি'র শব্দজাল ভেদ করতে গিয়ে কতকগুলি শ্রেণিবিভাগ করা ভালো। সবসময় শব্দই ধরা পড়েনি—শব্দ নিয়ে গঠিত বাক্যাংশও দ্বিতীয় স্তরে আসে। প্রথমে শব্দের নব অর্থের প্রয়োগ (১) বিশেষণ-সমাসবদ্ধ পদ (২) কথ্য-ইতর শব্দ (৩) বাক্যাংশের নীরসতা (৪) এবং (৫) অচল শব্দের তালিকা দেওয়া হল।

(১) কারুকার্য : প্রচলিত আভিধানিক অর্থ শিল্পনৈপুণ্য, নক্‌শা। এখানে বিনোদিনীর শিল্পকর্মের প্রমাণ পাই। শুধুমাত্র সূচীশিল্পের ক্ষেত্রে। কাজেই এখানে প্রচলিত শব্দের সংকুচিত নব অর্থে প্রয়োগ ঘটেছে।

স্তম্ভিত : বাংলায় প্রচলিত অর্থ অবাক, বিস্মিত (স্তম্ভের ন্যায় নিশ্চল); রূপক-অতিশয়োক্তি অর্থ প্রধান। কিন্তু 'চোখের বালি'তে এটি আদি অর্থে গৃহীত : 'স্তম্ভের ন্যায় উঁচু-উঁচু গাছের সারি।'

কুলিখিত : বাংলায় নেই। অর্থ দুটি : ১. অপরিচ্ছন্ন হাতের লেখা ২. অপরিচ্ছন্ন ভাবজড়িত। শব্দটি নূতন এবং 'তুচ্ছ পত্রে'র বিশেষণ।

অজস্র (অশ্রুজল) : এখানে বিশেষণটি অগণনীয় নির্দেশক। বাংলায় 'অসংখ্য' অর্থে ব্যবহৃত। 'অঝোর' শব্দের মূল সংস্কৃত রূপপ্রয়োগ একটু শ্রুতিকটু।

দৈহতাপতপ্ত : 'চিঠি'র বিশেষণ। এখানে সংক্ষেপণের জন্য সমাসবদ্ধতা আনা হয়েছে।

পরমস্নেহময় : সাধারণভাবে ব্যক্তির আগে ব্যবহৃত। এখানে ধৈর্যের মতো নির্বস্তক বিশেষ্যের বিশেষণ।

ঘন : 'নিশ্বাসের' বিশেষণ। প্রচলিত বিণ হল 'দীর্ঘ'। মনে হয় ইংরেজি 'ডীপ' বা 'হেভি'-র সাদৃশ্যে এই সংস্কৃত শব্দের বিচিত্র প্রয়োগ।

অনুগ্রহপালিত : এই সমাসবদ্ধ পদটিও নূতন। অনুগ্রহ + পালন দুটি ভাবকে একত্র করার চেষ্টা।

সহারবান্ : 'সাহায্যকারী' অর্থে। 'সহায়' 'মতুপ' প্রত্যয় (< বতুপ) যোগে নব আকার ধারণ করেছে।

ব্যস্ততাবেগবান : এখানে জনপথের ব্যস্ততা, গতি একত্রে বোঝানো হয়েছে।

দিনান্তরম্য : সন্ধ্যাকালীন সৌন্দর্য অর্থে তৎসম শব্দসমষ্টির নব প্রয়োগ।

ভোলামন : এরপর 'লোক' শব্দটি অতিরিক্ত (সুপারফ্লুয়াস)। আমরা বলি 'ভুলো মন' বা 'ভুলো লোক'। এখানে 'অন্যমনস্ক' অর্থে নবতর বিশেষণের সৃষ্টি; বিচ্যুতির উদাহরণ। হতে পারে লৌকিক ভাষা থেকে গৃহীত।

কুঞ্চিতদলিত : ইংরেজি 'ক্রাশড্'-এর বঙ্গানুবাদ।

চিরাভ্যস্তবৎ : স্পর্ধার বিশেষণ। ইংরেজি 'হ্যাবিচুয়াল'-এর বঙ্গানুবাদ।

সজ্জিতসুন্দর : গঠন হল বিণ + বিণ। তৎসম সমাসের মোহ এড়াতে পারেননি।

লজ্জিতমুগ্ধ : ঐ

দীপহীন : আমরা 'নিষ্প্রদীপ', 'আলোকহীন', 'অন্ধকার' ব্যবহার করি। শব্দটি কবিসুষমাজাত।

কলরবক্ষুব্ধ : 'জনতা'র বিশেষণ। মহানগরীর ভয়ংকর কোলাহল এখানে লক্ষ্য।

নিরলসা : সম্পূর্ণ আভিধানিক প্রয়োগ। সংস্কৃত লিঙ্গ মানার ফল।

২. ধন্না, ঠাকুরণ, মেঠাই, (পানের) বাটা, বিবি, পোড়ারমুখী, মেমসাহেব, সরম, রোসো, লগ্নি, ডাইনী, ফেসাদ, গুমর, জিয়ন্ত, খোলসা, ছুতা, ব্যামো।

৩-৪. 'চোখের বালি'তে বক্তব্য আমাদের কাছে নূতন লাগে বলে এর বাক্যাংশের তৎসমবাহুল্য এবং নীরসতা চোখ এড়িয়ে যায়। সংলাপ অংশ যেমন প্রাণবান, বর্ণনা অংশে তেমনই জীর্ণ বাক্যাংশ আছে।

শুধু বক্তার উক্তির আগে তার মনোভাব, নাটকীয় কার্য সঞ্চার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের বাক্যাংশ প্রয়োগ করেছেন : 'রুদ্ধরোষে, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধীরভাবে, রক্তবর্ণ হইয়া, অসংযত ভাষায়, কাতর হইয়া, ধনুষ্টংকারের মতো বাজিয়া, সানুনয়স্বরে, হস্তদ্বারা তর্জন করিয়া, তীব্র কণ্ঠ,' বলা-কওয়া নানান ভাবের হয়। কিন্তু সংলাপ অংশের আগে বক্তার অঙ্গভঙ্গি (জেশ্চার) স্বাভাবিক হলেও ধনুষ্টংকারের মতো বাজা কিংবা রক্তবর্ণ হয়ে ওঠার বর্ণনায় অকারণে সংস্কৃতঘেঁষা হওয়ার ঝোঁক আছে। এগুলির আদর্শ হলেন বঙ্কিম। অথচ রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে বাদ দিলেও সংলাপ রচনার ক্ষমতা রাখতেন, তার পরিচয় 'চোখের বালি'তে আছে।

(৫) অচল শব্দ/বাক্যাংশ :

৪-এর সূত্রে পাঁচ আসে। যেমন কুলায়, বিরলে, বিষদিগ্ধ। আবার তৎসমপ্রবণতা 'সুবাসিত-ফুরফুরে চাদর' কিংবা 'গুনগুন গুঞ্জরিত কাহিনী'র মতো বিষম বাক্যাংশ তৈরি করেছে।

৫.৩.৫ উপমার বিশেষত্ব ও শ্রীহীনতা

'চোখের বালি'তে বজ্র, বাণ ইত্যাদির সঙ্গে বারংবার উপমা দেওয়া হয়েছে। যেমন, 'বিদ্ধ মৃগীর মতো চকিত মৃত্যুবাণ বাজা', 'জলন্ত বজ্রের মতো কঠোর কটাক্ষ' 'মৃত্যুবাণাহত রক্তহীন পাংশু মুখ', 'বাণাহত জন্তুর মতো আর্তস্বরে কাঁদা', 'জ্বলন্ত শক্তিশেল উদ্যত করিয়া'। এমনকি এক স্থলে ভীষ্মের শরশয্যার প্রসঙ্গও এসেছে : 'মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া ভীষ্ম যেরূপ স্তব্ধ হইয়া শরবর্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন, আশাও সেরূপ রাজলক্ষ্মীর কৃত সমস্ত প্রসাধন পরমধৈর্যে সর্বাঙ্গে গ্রহণ করিল' (৬০ পরি.)। বাণের তীক্ষ্ণতা, যন্ত্রণা দেওয়ার ক্ষমতা প্রতি ক্ষেত্রেই বাক্যের সঙ্গে তুলিত। গভীরে দেখলে পৌরাণিক জগতের অস্ত্রগুলি রবীন্দ্রনাথ সার্থক উপমার অভাবে ব্যবহার করেছেন।

কখনও নারীর পাতিব্রত্য বোঝাতে প্রাচীন জগৎ এসেছে। যেমন, "শোকের তপ্ত তীর্থজলে অভিষিক্ত হইয়া এই তরুণী রমণী (আশা) প্রাচীন যুগের দেবদেবীদের ন্যায় একটি অচঞ্চল মর্যাদা লাভ করিয়াছে—সে এখন আর সামান্য নারী নহে, সে যেন দারুণ দুঃখে পুরাণবর্ণিতা সাধ্বীদের সমান বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে।"

স্পষ্টভাবে আশাকে পুরাণের সাধ্বীদের সঙ্গে তুলনা চরিত্রটিকে আদর্শের বাতাবরণ দিয়েছে।

(খ) "সেই প্রেমশূন্য রাত্রির অন্ধকারে তাহার কানের মধ্যে, বুকের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে, তাহার সর্বাঙ্গে রক্তস্রোতের মধ্যে, তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারে, তাহার আকাশের নক্ষত্রে, তাহার প্রাচীরবেষ্টিত নিভৃত

ছাদটিতে, তাহার শয়নগৃহের পরিত্যক্ত বিরহশয্যাতলে একটি ভয়ানক গম্ভীর ব্যাকুলতার সঙ্গো বিসর্জনের বাদ্য বাজিতে লাগিল।" (৪২ পরি.)

এখানে আশার মনোযাতনা আরোহ-অবরোহক্রমে বর্ণিত হয়েছে। মনোভাব প্রথম তিনটি অংশে বহিরঙ্গো, তারপর অন্তরঙ্গো (রক্তস্রোতের মধ্যে), বিশাল প্রকৃতিতে, শেষপর্যন্ত আবার ছাদ, শোওয়ার ঘরে ফিরে এসেছে। যন্ত্রণার বহিঃরূপ আরোহীক্রমে প্রকৃতির উদারতায় অনুভূত, আবার তা বাস্তব পরিবেষ্টনে বিরহশয্যায় অপ্রেমের জ্বালা। 'বিসর্জনের বাদ্য'-এর সঙ্গো প্রেমহীন ব্যথাকে একাকার করার উপমা এখানে যেন বাস্তব হয়ে উঠেছে। এখানে তৎসম শব্দই প্রধান, 'বিসর্জনের বাদ্য' তৎসম হলেও বাঙালির পরিচিত বিশেষ উপমা।

(ঘ) "নদীর পরপারে অন্ধকারে সেই অভিসারিণী বহুদূরে—তবু মহেন্দ্র তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তাহার কাল নাই, তাহার বয়স নাই, সে চিরন্তন গোপবালা—কিন্তু তবু মহেন্দ্র তাহাকে চিনিল—সে এই বিনোদিনী।" (৫১ পরি.)

মহেন্দ্রের এই অভিসারিকা-চিন্তা পদাবলির রাধিকাকে ঘরের বিনোদিনীর সঙ্গো অভিন্ন করছে। প্রেমিকের দৃষ্টি অপর যুগ থেকেও তার প্রেমিকার তুলনা খুঁজে পায়। বিনোদিনী এক্ষেত্রে এক লহমায় চির-অভিসারিকায় পরিবর্তিত। এখানে উপমা সন্দেহ অলংকারের রূপ নিয়েছে।

(ঙ) "বিহারীর মধ্যে যে যৌবন নিশ্চলভাবে সুপ্ত হইয়াছিল, যাহার কথা সে কখনো চিন্তাও করে নাই, বিনোদিনীর সোনার কাঠিতে সে আজ জাগিয়া উঠিয়াছে। সদ্যোজাত গরুড়ের মতো সে আপন খোরাকের জন্য সমস্ত জগৎটাকে ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে।" (৪৮ পরি.)

দুটি উপমাগত বাক্য রবীন্দ্রভাষার একটি দ্বিধাগ্রস্ততা ফুটিয়েছে। 'সদ্যোজাত গরুড়ের ক্ষুধা' যেমন পৌরাণিক তুলনাটি মনে আনে, তেমনি 'সোনার কাঠি' শব্দে রূপকথার সংকেত বেজেছে। বিহারীর যৌবনানুভূতির এ এক আশ্চর্য সফল উপমা। কিন্তু 'খোরাক', 'ঘাঁটা' শব্দ দুটি পাঠককে উপমার ঐ স্তর থেকে মুহূর্তে সরিয়ে আনে। 'চোখের বালি'তে সাধু ভাষার শব্দজগতের সঙ্গো চলতি শব্দভাণ্ডারের 'বিষম মিলন' রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তায় দ্বিধার স্বাক্ষর।

(চ) এই দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব থেকে বাস্তবতা সঞ্চারের স্থূল চেষ্টা কতকগুলি অযথার্থ উপমার সৃষ্টি করেছে। যেমন,

$চ_১$ "গ্রীষ্মকালের ডোবার মাছ যেমন অল্পজল পাঁকের মধ্যে কোনোমতে শীর্ণ হইয়া খাবি খাইয়া থাকে, গলি-নিবাসী অল্পাশী পরিবারগ্রস্ত কেরানীর বঞ্চিত জীবন সেইরূপ।" (৪৮ পরি.)

$চ_২$ "অত্যন্ত বেদনার স্থানে দুই পা দিয়া মাড়াইয়া দিলে, আহত ব্যক্তি মুহূর্তকাল বিচার না করিয়া আঘাতকারীকে যেমন সবলে ধাক্কা দিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে—রুদ্ধকণ্ঠ বিহারী তেমনি।" (২৩ পরি.)

$চ_৩$ "সেই চিঠি যদি বিষধর সাপের মূর্তি ধরিয়া তখনই আশার অঙ্গুলি দংশন করিত তবে ভালো হইত; কারণ, উগ্র বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাহার চরম ফল ফলিয়া শেষ হইতে পারে, কিন্তু বিষ মনে প্রবেশ করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা আনে—মৃত্যু আনে না।" (৩৩ পরি.)

$চ_৪$ "বাছুর যেমন গাভীর স্তনে আঘাত করিয়া দুগ্ধ এবং বাৎসল্যের সঞ্চার করে, মহেন্দ্রের রাগ তেমনি রাজলক্ষ্মীকে আঘাত করিয়া তাহার অবরুদ্ধ বাৎসল্যকে উৎসারিত করিয়া দিল।" (৭ পরি.)

অযথার্থ উপমার আরও অনেক উদাহরণ আছে। কিন্তু এই চারটি উদাহরণ উপমার অস্বাভাবিকতা, স্থূলতা (ক্রুডিটি) বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। উপমা লেখকের প্রয়োজনীয় শিল্পকৌশল। রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'তে বিষয়বস্তু সম্পর্কে যতটা সচেতন ছিলেন, প্রকাশের দিকে ততটা চেতনাবাদ ছিলেন না।

৫.৩.৬ ভাষার নাটকীয়তা, বাস্তবধর্মিতা, মনোবিশ্লেষণ প্রয়াস

১. এবং ২. পড়ে উপন্যাসটির ভাষাভঙ্গি সম্পর্কে বিশ্রব্ধ মনোভাব জাগতে পারে। কিন্তু এর ভাষায় কিছু সদাত্মক গুণও আছে। ঔপন্যাসিক যেমন বঙ্কিমের সংস্কৃত-প্রীতির অনুকরণ করেছেন, তেমনি তার নাটকীয়তাও। নবযুগের জীবনাবেগে দীপ্ত এই অংশগুলির নাটকীয়তা অন্তরঙ্গে বঙ্কিম থেকে স্বতন্ত্র পথচারী।

ক. ৩৫ পরিচ্ছেদে বিনোদিনী বলেছে : "ঠেকাইব কাহার জন্য। তোমার আশার জন্য? আমার নিজের সুখদুঃখ কিছুই নাই? তোমার আশার ভালো হউক, মহেন্দ্রের সংসারের ভালো হউক, এই বলিয়া ইহকালে আমার সকল দাবি মুছিয়া ফেলিব, এত ভালো আমি নই—ধর্মশাস্ত্রের পুঁথি এত করিয়া আমি পড়ি নাই। আমি যাহা ছাড়িব তাহার বদলে আমি কী পাইব!"

বিনোদিনীর উক্তির স্পষ্টতার উত্তরে বিহারীর ব্যঙ্গ শাণিত : "তুমি আজ যে কাণ্ডটা করিলে, এবং যে কথাগুলি বলিতেছ, ইহার অধিকাংশই, তুমি যে সাহিত্য পড়িয়াছ তাহা হইতে চুরি। ইহার বারো আনাই নাটক এবং নভেল।" (৩৫ পরি.)

বিহারীর শাণিত ব্যঙ্গে প্রাচীনপন্থী পাঠক খুশি হতে পারেন। অথচ বিহারী যে বিনোদের নবজীবনচেতনা, নারীর কামনাকে অস্বীকার করতে চায়, এটা দৃষ্টি এড়ায় না। বিনোদিনীর বাক্য তার অনুভবের দ্বারা প্রদীপ্ত, অন্যদিকে বিহারী প্রথামান্যের দ্বারা মলিন।

খ. কখনও 'চোখের বালি'র ভাষা রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বাগ্‌ব্যবহারের আশ্রয় নিয়েছে। লক্ষ করার মতো নাটকীয় অংশে নাট্যসংলাপের মতো চরিত্রের নাম এবং বক্তব্য সাজানো :

মহেন্দ্র। তুমি আমাকে ভয় কর না কেন, এখানে তোমার রক্ষক কে আছে।

বিনোদিনী। তুমি আমার রক্ষক আছ। তোমার নিজের কাছ হইতে তুমি আমাকে রক্ষণ করিবে।

মহেন্দ্র। এইটুকু শ্রদ্ধা, এইটুকু বিশ্বাস, এখনো বাকি আছে!

বিনোদিনী। তা না হইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিতাম, তোমার সঙ্গে বাহির হইতাম না। (৫১ পরি.)

রক্ষকের অভিনব ব্যাখ্যা, মহেন্দ্রের শুভবুদ্ধির কাছে বিনোদিনীর আবেদন, মহেন্দ্রের বিস্ময় সবকিছু রবীন্দ্রভাষার পরবর্তী ঔজ্জ্বল্যেরই পূর্বাভাস। এখানে কথা হচ্ছে দুজন শিক্ষিত মানুষে। আবেগের নাট্যরস অপেক্ষা বুদ্ধিগত আবেদন এই অংশটির বেশি।

গ. অন্নপূর্ণা প্রায়শ রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভাষার কথা বলছে :

"ওরে বাছা, যাঁর সঙ্গে আসল দেনা-পাওনার সম্পর্ক, যিনি এই সংসার-হাটের মূল মহাজন, তিনিই আমার সমস্তই লইতেছিলেন, হৃদয়ে বসিয়া আজ সে-কথা স্বীকার করিয়াছেন। তখন যদি জানিতাম! যদি তাঁর কর্ম বলিয়া

সংসারের কর্ম করিতাম, তাঁকে দিলাম বলিয়াই সংসারকে হৃদয় দিতাম, তা হইলে কে আমাকে দুঃখ দিতে পারিত!" (৩০ পরি.)

তাই পরিচ্ছেদের প্রথমে অন্নপূর্ণা ভগবানকে 'স্বামী' বলে ঘোষণা করেছে। বৈধব্যজীবনে হিন্দু নারীর স্বাভাবিক ঈশ্বরধর্ম আঁকড়ে থাকা। অন্নপূর্ণা প্রথমে আশাকে স্বাভাবিকভাবে বুঝিয়েছে, দ্বিতীয়াংশে নাটকীয়তা নেই, তত্ত্বালোচনা আছে। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে তত্ত্ব যতই সত্য হোক, অন্নপূর্ণার মুখে তা বেমানান ঠেকে। এটি স্বাভাবিকতা এবং নাটকীয়তা ভেঙে তত্ত্বমুখিনতার প্রয়াস।

ঘ$_1$ 'চোখের বালি'তে নারীদের সংলাপে বাস্তবতার ছায়া গাঢ় হয়ে পড়েছে :

'তুই এমনি করিয়া আমার মাথা-হেঁট করিবি পোড়ারমুখী? লজ্জা নাই, শরম নাই, সময় নাই, অসময় নাই, বৃদ্ধা শাশুড়ীর উপর সমস্ত ঘরকন্না চাপাইয়া তুমি এখানে আরাম করিতেছ? আমার পোড়াকপাল, আমি তোমাকে এই ঘরে আনিয়াছিলাম!" (৫ পরি.)

আশার প্রতি অন্নপূর্ণার এই উক্তি মেয়েলি 'রেজিস্টার'বহুল! 'গ'-তে যেমন পরিচ্ছেদের তত্ত্বসর্বস্বতা চরিত্রের স্বাভাবিক সংলাপ কেড়ে নিয়েছে, এখানে তেমনি স্বাভাবিকতার ছাপ আছে।

পাশাপাশি আশার কথাবার্তার স্বাভাবিকতার গণ্ডি ভাঙার চেষ্টা কম। যেমন,

ঘ$_2$ "মাথা খাও, একটি বার তোমাকে এ কাজ করিতেই হইবে। একবার যে করিয়া হোক তাহার গুমর ভাঙিতে চাই, তারপর তোমাদের যেমন ইচ্ছা তাই করিয়ো।" (১৩ পরি.)

ভাষার নাটকীয়তা, স্বাভাবিকতা ছাড়া কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতো। সাধারণভাবে উপন্যাসের বিবৃতি অংশ সাধু, সংলাপের ভাষা কথা। রবীন্দ্রনাথ দুটোকে সাধু করতে গিয়ে মাঝে মাঝে গুরুচণ্ডালি করেছেন। যেমন গ এবং ঘ$_2$। পাঠকমন সংলাপে কথ্যভাষা কল্পনা করে বলে পড়ার সময় এটি কানে বাজে না।

নাটকীয় সংলাপ যেমন উপন্যাসের বড়ো সম্পদ, তেমনি বাস্তবধর্মী বর্ণনাও পরিবেশরচনার পক্ষে জরুরি। রবীন্দ্রনাথ এই শর্ত কতদূর মিটিয়েছেন, তা, আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়। বাস্তবধর্মী বলতে আলোকচিত্রবৎ প্রকৃতি নয়। রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতার কলম সবসময় মানসিকতাকে সঞ্চারিত করেছে। উপমার অপ্রখরতায়, তৎসম শব্দের অর্থহীন সম্ভার ক্লান্তিকর। কিন্তু মানুষের চোখে প্রকৃতিকে দেখার মধ্যে একটি নব-বাস্তবতা (নিওরিয়ালিজম) আছে। নিছক পরিবেশ প্রায় কোথাও নেই। অত্যুৎসাহী পাঠকের চোখে তা পড়লেও মাঝখানে চরিত্রটির উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

ক. "চন্দনগুঁড়া ও ধুনার গন্ধে ঘর আমোদিত...মশারিতে গোলাপী সেশমের ঝালর লাগানো, নিচের বিছানায় শুভ্র জাজিম তকতক করিতেছে এবং তাহার উপর...রেশম ও পশমের ফুলকাটা বিলাতি চৌকা বালিশ সুসজ্জিত।...সবসুদ্ধ ঘরের চেহারা অন্যরকম।" (২৬ পরি.)

আশার অন্তর্ধানে বিনোদিনীর এই নবসজ্জা সূক্ষ্মরুচির পরিচায়ক। এটি 'মহেন্দ্রকে ভুলাইবার কৌশল', শুধুমাত্র 'ঘরের চেহারা' পালটানো নয়। বিনোদিনীর প্রতি মহেন্দ্রের অনুরাগ জাগানোর জন্য বাহ্য পরিবর্তনের দৃশ্য আপাতদৃষ্টিতে সামান্য হলেও মহেন্দ্রের চোখে পূর্ব-ইতিহাসের চিহ্ন লুপ্ত, নূতন হস্তের নবসজ্জায় একটি আচ্ছন্নতা সঞ্চারিত।

খ$_1$ "ঘর ফুলের গন্ধে পূর্ণ। উন্মুক্ত জানালা-দরজা দিয়া জ্যোৎস্নার আলো শুভ্র বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বিনোদিনী....মালা গাঁথিয়া খোঁপায় পরিয়াছে, গলায় পরিয়াছে কটিতে বাঁধিয়াছে—ফুলে ভূষিত হইয়া সে বসন্তকালের পুষ্পভারলুণ্ঠিত লতাটির ন্যায় জ্যোৎস্নায় বিছানার উপরে পড়িয়া আছে।" (৫১ পরি.)

ফুলের গন্ধে ভরা ঘর, ফুলসাজে সাজা যুবতী, জ্যোৎস্নায় ধোয়া ঘর সবই ছিল। দারুণ আবেগ-মোহময় দৃশ্য অভিনীত হবে, এমন পরিবেশ আঁকা হল। অথচ মহেন্দ্রের মোহভঙ্গের বেদনা ঘটবে বলেই এই আয়োজন। সে এই ফুলশয্যায় অনাহূত। মানুষের আশা আর আশাভঙ্গের অপূর্ব বৈপরীত্য আঁকাই খ১-এর গূঢ় অভিপ্রায়।

খ$_2$ যে জ্যোৎস্নামাখা রাত্রি, সুখাবহ চিন্তা মহেন্দ্রের মনে স্বপ্নের ঘোর এনেছিল, বিনোদিনীর প্রত্যাখ্যানে তার পরিবর্তন ঘটে :

"সেই কেয়ারি-করা বাগান, তাহার পরে বালুকাতীর, তাহার পরে নদীর কালো জল, তাহার পরে ওপারের অস্ফুটতা—সমস্তই যেন একখানা বড়ো সাদা কাগজের উপরে পেনসিলে আঁকা একটি চিত্র মাত্র—সমস্তই নীরস এবং নিরর্থক।" (ঐ)

মহেন্দ্রের ও বিনোদিনীর প্রকৃতি-দেখা মানসিক দিক থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি দুটি দর্শককে এভাবে সাজানো যায় :

মহেন্দ্রের চোখে প্রকৃতি	বিনোদিনীর চোখে প্রকৃতি
১. বাগানে ঘনপল্লব, বিপুল নিম্ববৃক্ষের পুঞ্জীভূত স্তব্ধতা	১. কেয়ারি-করা বাগান
২. বালুকার অস্ফুট পাণ্ডুরতা	২. বালুকাতীর
৩. নিস্তরঙ্গ জলের মসীকৃষ্ম কালিমা	৩. নদীর কালো জল
৪. তরুহীন ম্লান ধূসর তটের বঙ্কিম রেখা	৪. ওপারের অস্ফুটতা

সারণি ১ : মহেন্দ্র ও বিনোদের চোখে প্রকৃতির দুই রূপ

৫১ পরিচ্ছেদে মহেন্দ্রের চোখে ঐ অভিসারিকা রাধার বর্ষাভিসারের প্রতিবেশ—যা যথেষ্ট বিশেষণে আঁকা। বিনোদিনীর চোখে একই প্রকৃতি নিরাভরণ, শুধু নদীর জলের বিশেষণ কালো। প্রথমটি যদি হয় তেলরঙে আঁকা ল্যান্ডস্কেপ, তাহলে অপরটি রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তিতে একটি পেনসিল স্কেচ, বর্ণহীন আঁচড়ের সমষ্টি মাত্র। দুটি নরনারীর মনোভাব প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে দেখেছে।

গ. জ্যোৎস্নারাত্রি প্রকৃতি খ$_1$, খ$_2$ দৃষ্টান্তে দুটি নরনারীর মানসিক প্রতিক্রিয়ার বিন্দু, আবার অমাবস্যার অন্ধকারও হৃদয়গুহার প্রকাশের কাজে রবীন্দ্রনাথ লাগিয়েছেন :

গ$_1$. "সেই পরমাসুন্দরী প্রহেলিকা তাহার দুর্ভেদ্যরহস্যপূর্ণ ঘনকৃষ্ম অনিমেষ দৃষ্টি লইয়া কৃষ্মপক্ষের অন্ধকারে বিহারীর সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। গ্রীষ্মরাত্রির উচ্ছ্বসিত দক্ষিণ-বাতাস তারই ঘন নিঃশ্বাসের মতো বিহারীর গায়ে আসিয়া পড়িতে লাগিল।" (৩৭ পরি.)

এরপর ১১ পঙ্‌ক্তি জুড়ে বিনোদিনীর আত্মনিবেদনের সুখস্মৃতি, অসম্পূর্ণ ব্যাকুল চুম্বনের বেদনা বর্ণিত। রাত্রির অন্ধকার বিহারীর অন্তর থেকে অবচেতনকে তুলে ধরেছে। বিনোদিনীর জন্য কামনা অন্ধকার রাতে দুর্নিবার বলে আলোয় এসে বিহারী মহেন-আশার ফোটোগ্রাফ দেখছে। এ যেন মনের অবচেতনকে স্বপ্নে দেখে জাগ্রত অবস্থায় তাকে অস্বীকার করা।

গ. "বিহারীর ধ্যানে যখন সন্ধ্যার দীপশূন্য অন্ধকার ঘর যখন নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—যখন সমাজ-সংসার, গ্রামপল্লীর সমস্ত বিশ্বভুবন প্রলয়ে বিলীন হইয়া গিয়াছে—তখন বিনোদিনী হঠাৎ দ্বারে আঘাত শুনিয়া....অসংশয় বিশ্বাসে ছুটিয়া দ্বার খুলিয়া কহিল "প্রভু আসিয়াছ?' তাহার দৃঢ় প্রত্যয় হইল, এই মুহূর্তে জগতের আর কেহই তাহার ঘরে আসিতে পারে না।" (৩৮ পরি.)

এই অংশে নাটকীয়তা আছে। 'দীপশূন্য অন্ধকার ঘর' পরিপূর্ণ হয়ে আছে প্রেমিকের অনুধ্যানে। বিনোদিনীর প্রত্যাশা মেটেনি। বিহারীর বদলে মহেন্দ্র এসেছে। কিন্তু নির্জন রাত, অন্ধকার ঘর, প্রেমের চিন্তা বিনোদিনীর সামান্য ঘরকে মুহূর্তে অসামান্য করেছে। অন্ধকারের সুযোগে সে যাকে দুহাত বাড়িয়ে চায়, তাকে পায় না। আবার পূর্ব দৃষ্টান্তে বিহারী আঁধারের আড়ালে মনের দুর্বলতা দমন করার জন্য আলোকপিয়াসী হয়। দুটি উদাহরণেই অন্ধকারকে মানবহৃদয় উন্মোচনের প্রেক্ষাপটরূপে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন।

৫.৪ বঙ্কিমী দর্শনরীতি :

সব জায়গায় না থাকলেও মাঝে মাঝে পরিবেশবর্ণনা বঙ্কিমী আনুগত্য বজায় রেখেছে। যেমন,

ক. "তখন চৈত্রমাসের দিবসান্তে সূর্য অস্তোন্মুখ। দোতলার দক্ষিণ বারান্দায় চিত্রিত চিক্কণ চীনের টালি গাঁথা; তাহারই প্রান্তে দুই অভ্যাগতের জন্য রূপার রেকাবি ফলমূলমিষ্টান্নে শোভমান এবং বরফজলপূর্ণ রূপার গ্লাস শীতল শিশিরবিন্দুজালে মণ্ডিত। মহেন্দ্র বিহারীকে লইয়া আলজ্জিতভাবে খাইতে বসিয়াছেন। নিচে বাগানে মালী তখন ঝারিতে করিয়া গাছে গাছে জল দিতেছিল; সেই সিক্ত মৃত্তিকার স্নিগ্ধ গন্ধ বহন করিয়া চৈত্রের দক্ষিণ বাতাস মহেন্দ্রের শুভ্র কুঞ্চিত সুবাসিত চাদরের প্রান্তকে দুর্দাম করিয়া তুলিতেছিল। আশেপাশের দ্বার-জানালার ছিদ্রান্তরাল হইতে একটু-আধটু চাপা হাসি, ফিসফিস কথা, দুটা-একটা গহনার টুংটাং যেন শুনা যায়।" (২ পরি.)

খ. "শরৎকালের প্রাতঃকাল অতি মধুর। রৌদ্র উঠিয়া শিশির মরিয়া গেছে, কিন্তু গাছপালা নির্মল আলোকে ঝলমল করিতেছে। প্রাচীরের গায়ে শেফালি গাছের সারি রহিয়াছে, তলদেশ ফুলে আচ্ছন্ন এবং গন্ধে আমোদিত।

আশা কলিকাতার ইষ্টকবন্ধন হইতে বাগানের মধ্যে ছাড়া পাইয়া বন্যমৃগীর মতো উল্লসিত হইয়া উঠিল। সে বিনোদিনীকে লইয়া রাশীকৃত ফুল কুড়াইল। দুই সখীতে দীঘির জলে পড়িয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া স্নান করিল। এই দুই নারীতে মিলিয়া একটি নিরর্থক আনন্দে—গাছের ছায়া এবং শাখাচ্যুত আলোক, দিঘির জল এবং নিকুঞ্জের পুষ্পপল্লবকে সচেতন করিয়া তুলিল।" (১৭ পরি.)

ক, খ দুটি উদাহরণ একেবারেই পরিবেশরচনার জন্য। প্রথমটিতে পাত্রী দেখার বাঙালি পরিবেশ এবং খ-তে চড়িভাতিতে দুই নারীর উচ্ছলতা, পরিবেশের মনোরম ভাব বর্ণিত। এখানে পরিবেশের সঙ্গে হৃদয়ের

যোগাযোগ তেমন গভীর নয়। পরিবেশরচনার কুশলতায় বঙ্কিম চিরকাল জাত-শিল্পী। তাই এই দুটি অংশে তাঁর অনুসরণ স্বাভাবিক ছিল।

৫.৩.৭ এপিগ্রাম : ভাষার অন্ত প্রসঙ্গ

বাস্তবধর্মী বর্ণনাতে রবীন্দ্রনাথের মনোবিশ্লেষণ সঞ্চারের সার্থক প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ করেছি। রবীন্দ্র-সুলভ এপিগ্রাম সংখ্যায় কম হলেও 'চোখের বালি'তে আছে। যেমন,

ক. "পরের জন্য হইলেও কন্যা দেখিবার প্রসঙ্গমাত্রেই যৌবনধর্ম আপনি চুলটা একটু ফিরাইয়া লয়, চাদরে কিছু গন্ধ ঢালে।" (২ পরি.)

খ. "ভালোবাসার উৎসবও কেবলমাত্র দুটি লোকের দ্বারা সম্পন্ন হয় না—মুখালাপের মিষ্টান্ন বিতরণের জন্য বাজে লোকেরও দরকার হয়।" (১১ পরি.)

গ. "কাজের মধ্যেই প্রেমের মূল না থাকিলে, ভোগের বিকাশ পরিপূর্ণ ও স্থায়ী হয় না।" (৮ পরি.)

ভাষাবিচার করে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাধু গদ্যের বঙ্কিমী পর্বকে কিছুমাত্র ভাঙতে পারেননি। প্রচলিত ভাষাদর্শের রূপ মানতে গিয়ে বাক্য বা শব্দে বুদ্ধিদীপ্তির পরিমাণ তেমন ঘটেনি যা একটি আধুনিক, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস-ভাষা হতে পারে। ব্যক্তিকে নানা-ভাগ করে দেখার কঠিন চেষ্টা ভাষায় অসহজতার জন্য সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথ এখানে বিচ্যুতি যতটা দেখিয়েছেন, তার তুলনায় সংসক্তির পরিমাণ বেশি। পূর্বে লেখা 'কথা ও কাহিনী', 'কল্পনা', 'নৈবেদ্য'-এর সংস্কৃত উপমাজগৎ 'চোখের বালি'তে সক্রিয় ছিল। নূতন শব্দ গড়া, এপিগ্রাম অল্পস্বল্প এলেও তা বিশেষ ভাষাবৈচিত্র্য সাধন করেনি, বরং সেগুলির উজ্জ্বলতা ধূসর উপমার অন্ধকারে খানিকটা চাপা পড়েছে।

৫.৩.৮ 'চোখের বালি'র মূল্য, জনপ্রিয়তা, ঔপন্যাসিক কণ্ঠস্বর :

গঠনের দিক থেকে এই উপন্যাসটি বঙ্কিমের সাংগঠনিক ত্রিভুজের (স্ট্রাকচারাল পিরামিড)-এর সামান্য হেরফের ঘটিয়েছে। ঘটনার সংখ্যা কম নয়। বাইরের ঘটনা মনোজগতের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। ঘটনাহীন পরিচ্ছেদ নেই। আত্মবিশ্লেষণে চরিত্রগুলি মাঝে-মাঝে ঘটনা থেকে দূরে সরেছে। কিন্তু 'অন্তর্গূঢ় একোক্তি' (ইন্টার্নাল মনোলগ)[১১] ঘটনার দ্বারা পরিপুষ্ট। পরক্ষণেই নারীর ব্যক্তিত্ব, প্রেম, বিধবা-বিবাহের সমস্যা মহেন্দ্র-আশা-বিনোদিনী-বিহারীর বিশ্লেষণে পরিস্ফুট হলেও সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্য (স্ট্রাকচারাল ইন্ডিপেন্ডেন্স) রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে পাননি। ভাষার ক্ষেত্রে সেভাবে অগ্রগতি নেই। অর্থাৎ উপন্যাসশৈলীর মৌল দুই ভিত্তি গঠন এবং ভাষা—'চোখের বালি'র ঔপন্যাসিক প্রতিষ্ঠা দেয়নি। রচনাটির অন্তরঙ্গে রূপে তাহলে কী আছে, যা সময়ের কলুষিত হাত এড়িয়ে এটিকে জনপ্রিয় কিংবা বিশেষ পাঠ্য করেছে?

এই প্রশ্নের সমাধানে আমাদের ইতিহাসপ্রেক্ষিত, সাহিত্যে আগের রচনার সঙ্গে এর সম্পর্ক ও অসম্পর্ক জানা প্রয়োজন। তবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ প্রতিষ্ঠা এই রচনার মূলে এটা বিস্মৃত হতে পারি না। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-'অবলাবান্ধব' দ্বারকানাথ সকলেই নারীকে সামাজিক আসন দিতে চেয়েছিলেন। উনিশ

শতকের শেষ পর্বে তাই বিহারীলালের ‘বঙ্গসুন্দরী’ (১৮৮০), সুরেন্দ্রনাথের ‘মহিলা’ (প্রথম অংশ ১৮৮০), দ্বি. সং. ১৮৯৬), দেবেন্দ্রনাথের অশোকগুচ্ছের ‘নারীমঙ্গল’ (১৯৯০) কাব্যে প্রতিষ্ঠা পায়। একদিকে সামাজিক আন্দোলন, অন্যদিকে গীতিকবিতার জগতে প্রবেশকারী নারীমহিমার মাঝখানে প্রাচীন পটে উজ্জ্বল আধুনিকতা সঞ্চারিত ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যে। নারীর বিশেষ মূল্য বোঝাতে উনিশ শতকের প্রথম ভাগ ব্যয়িত, দ্বিতীয় ভাগে অসংখ্যরূপে তার প্রকাশ সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে। কিন্তু নারীমহিমার স্বীকার উপন্যাসে নির্দ্বিধায় হয়নি। ‘বিষবৃক্ষ’-এ নারীস্বাধীনতা যতটা, পরবর্তী পর্বে তা ততটাই কমে গেছে। নারীর মুক্তি নিয়ে বাঙালির বহির্চেতনা যতটা আন্দোলিত, অন্তরঙ্গে তার বিকাশ ঘটতে গোটা শতক লেগেছে। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র বঙ্কিম-ভিন্ন বক্তব্য পোষণ করলেও ঔপন্যাসিক প্রতিভার অভাবে তা শিল্পিত হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ ‘রাজর্ষি’তে বিভার মতো আদর্শ নারীরূপ এঁকেছেন। কিন্তু বঙ্কিম-রমেশচন্দ্রের বিধবার প্রেম সমাধানের অসম সমাধানে তৃপ্ত হননি। তাঁর পরিবেশ-বিন্যাস ভিন্ন, প্রত্যক্ষ জমিদারি সংশ্রব এড়ানোর চেষ্টা করেছেন। বিহারীর জমিদারির বিবরণ সামান্যভাবে এক জায়গায় আছে। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশ ব্যাখ্যাত নয়। মহেন্দ্র অবশ্য এফ.এ. পাস করে ডাক্তারি পড়ে, বিহারী নবযুগমাফিক এনজিনিয়ারিং ছেড়ে মেডিকেল কলেজে ঢোকে। লক্ষ করার মতো, শহরবাসী এই দুই যুবকের চাকরির বা অর্থের কোনো প্রয়োজন হয়নি। তাই সমস্যাটি শহর কলকাতার বহির্জগৎ থেকে বাড়ির চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ।

১৮৯০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত বারবার ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ, প্লেগের মহামারি; ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল বিল-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ; মুসলমানদের হিন্দুবিদ্বেষ—এসকল শাহরিক ঘটনা মহেন্দ্র-বিহারীর চিত্তে আলোড়ন জাগায়নি। শুধু বিহারী রুগ্ণ কেরানীর জন্য আশ্রম স্থাপন করে সামাজিক কর্তব্য করেছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসজগতে সামাজিক-ঐতিহাসিক ঘটনার বিশ্লেষণ এসেছে পরে। সব মিলিয়ে আর্থিক নিরাপত্তা মহেন্দ্র-বিহারীকে নিশ্চিন্তে হৃদয় খুঁড়বার প্রেরণা দিয়েছে। উনিশ শতকে এই মুষ্টিমেয় ধনবান, উচ্চশিক্ষিত যুবকদের জীবনে একটি নবযুবতী বিধবার প্রেমকামনা অশান্তির সৃষ্টি করল। বিনোদিনী উচ্চবিত্ত সমাজের নয়। কিন্তু সে সেখানে স্থান পেয়েছে। দরিদ্র অসহায়ার ধনীর ঘরে আশ্রয়লাভ উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে সাধারণ ঘটনা। কুন্দের আশ্রয়লাভও এই জাতীয় ব্যাপার। তবে আশ্রিতকে সর্বগুণময়ী করে দেখানো এযাবৎ হয়নি। বিনোদের মানবিক-জৈব আকাঙ্ক্ষা তীব্র অথচ স্বাভাবিক। মহেন্দ্রের মতো অসংযমীর সামনে রাজলক্ষ্মী যেভাবে বিনোদিনীকে আশার প্রতিপক্ষ করে তুলেছেন, তাতে সংসারে ফাটল ধরেছে। বিনোদিনীর জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা তিলে তিলে বেড়েছে। আধুনিক পাঠক-সমালোচকের কাছে এর জনপ্রিয়তা বিনোদিনীর চরিত্রক্রমেজাত বক্তব্যগুণে। বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথের পশ্চাদপসারণ এখানেই শুরু। মনস্তাত্ত্বিক কুশলতা সঞ্চারিত তাই ঐ প্রেমের বিচিত্র বিকাশে।

রবীন্দ্রনাথ কুন্দ-রোহিণীর পরিস্থিতি পছন্দ করেননি। একজন ‘সবলা’ নায়িকাকে এনেছেন যার ব্যক্তিত্ব আছে, অবহেলায় পুরুষকে জয় করতে পারে। তার অতৃপ্ত সংসারকামনা, দারিদ্র্য মহেন্দ্রের সংসারে প্রতিষ্ঠালাভের স্বপ্ন দেখিয়েছে। মহেন্দ্রের প্রতি তার আকর্ষণ যতটা প্রতিষ্ঠাবাসনায়, ততটা আন্তরিক নয়। একটি সাজানো সংসারে কর্ত্রী হওয়ার বাসনা তার জেগেছিল। আশা ছিল তার ‘খেলার পুতুল’। রাজলক্ষ্মীর চোখে বিনোদের বাসনাটি সুন্দর ধরা পড়েছে : ‘তুমি যে কেমন মায়াবিনী, তাহা আমি জানিতাম না।’ এরই

মধ্যে সর্বনাশ ঘটেছে। মহেন্দ্রের সংসার জ্বালানোর পর তার সংবিৎ জেগেছে। অসামান্য ব্যক্তিত্বময়ীর উপযুক্ত পাত্র মহেন্দ্র ছিল না, প্রেমের ঘটকে পূর্ণ করার মতো ক্ষমতা তার ছিল না। ধনী, মাতৃলালিত, ব্যক্তিত্বহীন, সংসার-অনভিজ্ঞ মহেন্দ্রের সম্পূরক চরিত্র বিহারীর কাছে বিনোদিনী শূন্য মুঠো পূর্ণ করতে গেছে ভালোবাসার দানে। বিহারী রবীন্দ্রনাথের মানসপুত্র। সে প্রথমাবস্থায় বিনোদিনীর প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করেছে। বিহারী আদর্শ মানব, কর্মিষ্ঠ; সহজে প্রেমের ডাকে সাড়া দেয়নি। বিহারীর প্রত্যাখ্যান বিনোদকে আরও উত্তেজিত করেছে। যদিও অন্তরের গভীরে তার স্থান আরও দৃঢ় হয়েছে।

তার পশ্চিমযাত্রা আসলে ক্ষুব্ধ চিত্তেরই অশান্ত যাত্রা। হাতের কাছে পাওয়া পুরুষের সামান্যতা আর অপ্রাপণীয় পুরুষের জন্য তার বিরহ বাংলা উপন্যাসভূমিতে একেবারেই নূতন। ৫১ পরিচ্ছেদে বিনোদিনীর অনুভবটুকু এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায় : "কেন একটা অনাবশ্যক ভালোবাসার প্রবল অভিঘাত প্রত্যহ তার ধ্যানের মধ্যে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িতেছে। আর একটা আগন্তুক রোদন বারংবার আসিয়া তাহার অন্তরের রোদনকে বেশ পরিপূর্ণ অবকাশ দিতেছে না। এই যে একটা প্রকাণ্ড আন্দোলনকে সে জাগাইয়া তুলিয়াছে, ইহাকে লইয়া সমস্ত জীবন সে কী করিবে।"

এই প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির দ্বন্দ্ব সেভাবে আগে নায়িকাকে আলোড়িত করেনি। সাধারণ জৈবিক কামনা থাকলে মহেন্দ্রের রক্ষিতা হয়ে তার সময় মন্দ কাটত না। বিনোদিনী আধুনিকা, শিক্ষিতা নারী। সামান্যতে খুশি হবার মানসিকতা তার ছিল না। তাই মহেন্দ্রের বিকারগ্রস্ত ভোগকামনা তাকে ক্লান্ত করে। অন্তরের গভীরে ভালোবাসার মানুষের জন্য সে অপেক্ষা করে। সাংসারিক বঞ্চনার জ্বালা ধীরে ধীরে কমে এসেছে। পাপের বিচিত্র গতি দেখেও সে ক্লান্ত। 'হৃদয় রক্তে ভেসে যায়', কিন্তু অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় না কিছুতেই। জীবনের রস পান করতে উন্মুখ চিত্ত শান্ত হয়ে আসে। মহেন্দ্রের মোহভঙ্গ ঘটে। জীবনকে আঁকড়ে ধরার জন্য বিধবার মনোভূমি এ পর্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে বিশ্লেষিত, একটি মনের আলোকে বাকি কটি চরিত্রকেও পাঠক চিনতে পারেন। বঙ্কিমী বক্তব্যকে অস্বীকার করার দৃঢ়তা, মনস্তত্ত্ব পাঠককে মুগ্ধ করে। 'চোখের বালি' ১৮৬৫ থেকে ১৯০৩-এর উপন্যাসজগতে অসামান্য আখ্যা পায়।

যে বুর্জোয়া উদার মানবিকতা বিনোদিনীর চাওয়া-পাওয়ার কাহিনি বুঝতে আগ্রহী ছিল, পরিণামে তাকেও দ্বিধাজড়িত হতে হয়েছে।[১২] বঙ্কিমের নায়িকারা প্রেমের শেষ পর্বে উন্মাদিনী (শৈবালিনী), আত্মহত্যাকারী (কুন্দ) কিংবা নিহত (রোহিণী)। রবীন্দ্রনাথ ততটা নিষ্ঠুর নয়। বিনোদিনীর পরিণতি এর চেয়ে মার্জিত, সুন্দর। বিহারীর বিয়ের প্রস্তাব ফেরানো, বিহারীর ধ্যানের মূর্তিকে অন্তরে রেখে কাশীযাত্রা একটি অস্বাভাবিক সমাধান-কল্পনা। যে ব্রাহ্ম-হিন্দু সমাজের কথাকে ভুলে তিনি শিল্পীর মনকে প্রকাশ করেছিলেন, শেষ পর্বে (৫২-৫৫ পরিচ্ছেদ) তা সাহসীক সমাধানকে বাধা দিল। লেখক সমাজের প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হতে চাননি। এখানে রোমান্সের আলো জ্বলে উঠল সেই কারণে। 'শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ' হয় বিশ শতকের প্রথম দশকে, এটা তিনি জানতেন। কিন্তু সামাজিক রবীন্দ্রনাথের হাতে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের পরাজয় আমাদের ব্যথিত করে। যে বিদ্রোহভাবনা একটি নারীর মর্মজ্বালাকে একান্নটি পরিচ্ছেদের দীর্ঘ বিস্তারে বর্ণনা করল, তা সামাজিক কারণে প্রশমিত হল। উপন্যাসটির এই অপূর্ব সমাপ্তিতে হিন্দুসমাজের বর্ষীয়ানরা নিশ্চয়ই স্বস্তি পেয়েছিলেন। আবার ব্রাহ্ম-ভিক্টোরীয় শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষের কাছেও তা সমানভাবে গ্রহণীয়। 'মানবচরিত্রের কঠিন সংস্পর্শ'

উপন্যাসে এল বটে, কিন্তু সামাজিক ধারণার চাপ তাকে পুরোপুরি বিনষ্ট করল। 'আঁতের কথা' শেষ হল না, সমাজ তার নিষেধের তর্জনী তুলল উপসংহারে। দার্শনিক বাস্তবতাবাদ গোড়া থেকে বহমান থেকেও শেষরক্ষা করতে পারল না 'সোস্যাল কনস্ট্রেন্টস'-এর চাপে। আমরা সানন্দে 'চোখের বালি'র ভূমিকা পড়ে, মনোজগৎ বিশ্লেষণের প্রতিভায় মুগ্ধ হলেও অতৃপ্ত থাকি। ব্যক্তিমানস ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের যে উজ্জ্বল রূপায়ণ করতে চেয়েছিল, তা সার্থকতা পেল না। বিপরীতে একান্নটি পরিচ্ছেদে বন্ধ থাকলেও উপন্যাস-দেহটিতে বহিরঙ্গ চমক দেখি না। অন্তরে কিন্তু কষ্ট পেতে থাকি, নূতন অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হই। গঠন-ভাষাদীপে হৃদয়ে 'বহুদীপের জ্বলন' ঘটেনি। বক্তব্যের নবীনতা, প্রথাবিরোধী সংস্কারহীন প্রেমের বলিষ্ঠ প্রকাশ, অসাধারণ দীপ্ত নারীচরিত্রের 'মনের সংসার'-বিবরণী 'চোখের বালি'কে অসামান্য করেছে। যে নারীমুক্তির বাণী রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাস-ছোটোগল্পকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, তার ঔপন্যাসিক রূপের প্রথম পরিচয় 'চোখের বালি'। শৈলী-বিজ্ঞানে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিত্ব খোঁজার আগ্রহ আমাদের এই শেষ স্তরে নিয়ে এল, যেখানে শিল্পীব্যক্তিত্ব ভাষা-গঠনে বঙ্কিমীপথের পথিক হলেও কণ্ঠস্বরে, মনের সুলুকসন্ধানে নবযুগ আনলেন।

উল্লেখসূচি

১. সহজ অপসারণ কৌশলে ঔপন্যাসিক চরিত্রের নিরুদ্দেশ যাত্রা, স্বাভাবিক/অস্বাভাবিক, বয়সোচিত/অকাল মৃত্যুর পথ বেছে নেন। অপসারণযোগ্য চরিত্রটি কাহিনীর প্রয়োজন ফুরোলে নির্মমভাবে বাদ পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে নীতি-শিল্পের দ্বন্দ্ব এই অপসারণের হেতু হয়ে দাঁড়ায় (রোহিণীর হত্যা/কৃষ্ণকান্তের উইল)।

২. রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৮৬) 'সংসার'।

৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৫) 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (৫ম সং, পৃ. ১৪)।

৪. Edel, Leon (1965) *The Psychological Novel, Rupert Hart Devis, London.*

৫. Watt, Ian (1957) *The Rise of the Novel,* 'Realism & the Novel Form', Penguin Books in association with Chatto & Windus, London.

৬. Ibid, Ch. 3, p. 66.

৭. 'Inter-Sentence Grammar'-এ বাক্যের আলোচনায় বাক্য-বহির্ভূত প্রসঙ্গ ব্যাখ্যার জন্য আসে।

৮. ক্ষেত্র গুপ্ত (১৯৮১) 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড), পৃ. ১৭৮।

৯. ফকীরমোহন সেনাপতি, (১৯০২) 'ছ মণ আঠ গুণ্ঠ', বাংলা অনুবাদ 'উনিশ বিঘা দুই কাঠা' (১৯৬৫) 'চোখের বালি'র সমকালে প্রকাশিত ওড়িয়া উপন্যাসের সূচনা করেছে। এখানে উপন্যাসগঠন ভিন্ন। বঙ্কিমভিন্ন মডেল যে ভারতীয় উপন্যাসে ছিল, তারই পরিচয়।

১০. এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় উৎসাহীরা ড. ক্ষেত্র গুপ্তের 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি' দেখতে পারেন।

১১. এ প্রসঙ্গে সুন্দর তত্ত্বগত বিশ্লেষণ আছে ড. পবিত্র সরকারের 'বাংলা গদ্য : রীতিগত অনুধাবন' প্রবন্ধে। এটি সমতট প্রকাশনীর 'বাঙলা গদ্য শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৮০) গ্রন্থে সংকলিত।

১২. এই দৃষ্টি-পরিবর্তন (Shift of Vision) পার্সি লাবক এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : 'There is nothing more disconcerting in a novel than to see the writer changing his part in this way throwing off the character into which he has been projecting himself and taking a new stand outside and away from the story.' (*The Craft of Fiction :* First Indian Edition, 1979, p. 87).

লাবক এরপরে দৃষ্টি পরিবর্তনের অশুভ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন :

> 'here is a new view of it, external and detached, and another mind at work, the author's—and that sense of having shared the life of person in the story seems suddenly unreal.' (Ibid, p. 88).

উৎসগ্রন্থ ও প্রবন্ধ

বাংলা

১-৮. আশিসকুমার দে (১৯৮২), যোগাযোগ : শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বর্ষ ১৮ : সংখ্যা ১।

(১৯৮২), উপন্যাস-শৈলী ও চোখের বালি, প্রমা, বর্ষ ৪ : সংখ্যা ৩।

(১৯৮৩), রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে : শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বর্ষ ১৯ : সংখ্যা ১।

(১৯৮৩), ফকীরমোহনের 'ছ মণ আঠ গুণ্ঠ' : শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, জিজ্ঞাসা পত্রিকা, বর্ষ ৩ : সংখ্যা ১।

(১৯৮৩), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জননী : শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বর্ষ ১৯ : সংখ্যা ২।

(১৯৮৩), উপন্যাসের শৈলী : তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যাপিরাস।

(১৯৮৪), তিনজনা সেই ছিন্নমূলে : চতুরঙ্গ, জিজ্ঞাসা, বর্ষ ৪ : সংখ্যা ১।

(১৯৮৫), তারাশঙ্করের গণদেবতা : শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বর্ষ ২০ : সংখ্যা ৪।

(১৯৮৭), রবীন্দ্র-উপন্যাসে উপসংহার : কাম্যতা ও সম্ভাব্যতা, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, রবীন্দ্রসংখ্যা (৫-৬ সং), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

৯. ক্ষেত্র গুপ্ত (১৯৮৬), বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), গ্রন্থনিলয়।

১০. পবিত্র সরকার (১৯৮৫), উপন্যাসের ভাষা-শিল্প ও শরৎচন্দ্র, গদ্যরীতি-পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক।

১১. হীরেন চট্টোপাধ্যায় (১৯৮২), বাংলা উপন্যাসের শিল্পরীতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

ইংরেজি :

১. লাবক, পার্সি (১৯৫৪), দা ক্রাফট অব্ ফিকশান, জোনাথান ক্যাপ, লন্ডন।

২. মুইর, এডুইন (১৯২৮), দা স্ট্রাকচার অব দা নভেল (প্রথম ভারতীয় সংস্করণ), বি. আই. পাব্লিকেশনস, নয়াদিল্লি।

অনুশীলনী :

১. স্টাইলের বাংলা পরিভাষা রীতি না শৈলী কী হবে, তা আলোচনা করো।

২. রাশিয়ান ফর্মালিজম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

৩. অবয়ব পদ : প্রথম গোষ্ঠীর মূল বক্তব্য কী ছিল, তা লেখো।

৪. শৈলী বিজ্ঞানের নানা মহল বলতে কী বোঝায়?

৫. উপলক্ষের মানক সম্পর্কে লেখো।

৬. 'আমাদের মতামতে' সাহিত্যশৈলী আলোচনার কোন্ পথকে বেছে নেওয়া হয়েছে?

৭. কবিতার শৈলী কীভাবে বিচার করা যায়, তা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৮. গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব কতটা কবিতার আলোচনায় গ্রহণ করা যায়, তা বিচার করো।

৯. প্রমুখণ (মণ্ডল) কীভাবে সংঘটিত হয়?

১০. শব্দের দুরূহতা কীভাবে কবিতাপাঠে বাধা তৈরি করে, তা বুঝিয়ে দাও।

১১. যুক্তির গদ্য ও সৃষ্টির গদ্যের বিভাগকে কতদূর মানা যায়, তা আলোচনা করো।

১২. ভাষাদর্শ (নর্ম) ও বিচ্যুতি (ডেভিয়েশন) কেন এবং কীভাবে ঘটে, উল্লেখসহ বুঝিয়ে দাও।

১৩. গদ্যের শৈলীবিচারে যেসব মানদণ্ড (মানক) উল্লিখিত হয়েছে, তা সংক্ষেপে লেখো।

১৪. ক্রিস্টাল ও ডেভির অনুসরণে শৈলীর আটটি মানকের পরিচয় দাও।

১৫. ছোটোগল্পের শৈলীবিচারের চারটি সূত্র সংক্ষেপে লেখো।

১৬. ছোটোগল্পের শৈলী বলতে কী বোঝায়?

১৭. উপন্যাসের বর্গীকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখাও।

১৮. প্রসঙ্গ ও সমস্যাতত্ত্ব কীভাবে উপন্যাসে গৃহীত হয়?

১৯. উপন্যাসের অবয়ব (স্ট্রাকচার) প্রচলিত সমালোচনায় কীভাবে আলোচিত হয়?

২০. উপন্যাসের ভাষা আলোচনা উপন্যাসের বিচারে কতটা প্রয়োজনীয়, তা সংক্ষেপে লেখো।

২১. উপন্যাসের শৈলী বিচারের কারণ কী?

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা :

অজরচন্দ্র সরকার	(১৯৪৯)	বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
অপূর্বকুমার রায়	(১৯৭৬)	উনিশ শতকের বাংলা গদ্যসাহিত্য : ইংরাজি প্রভাব, জিজ্ঞাসা।
	(১৯৮৯)	শৈলীবিজ্ঞান, মডার্ন বুক এজেন্সী।
আশিসকুমার দে	(১৯৮৩)	উপন্যাসের শৈলী : তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যাপিরাস।
	(১৯৮৭)	আধুনিক বাংলা কবিতা : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, শিলালিপি।
উদয়নারায়ণ সিংহ	(১৯৮৭)	সম্পাদিত কবিতার ভাষা, গাঙ্গেয়পত্র বিশেষ সংকলন।
ক্ষেত্র গুপ্ত	(১৯৮৬)	বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (১ম খণ্ড), গ্রন্থনিলয়।
নবেন্দু সেন	(১৯৭১)	গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জিজ্ঞাসা।
	(১৯৮৮)	বাংলা গদ্য স্টাইলিসটিকস্, সাহিত্যপ্রকাশ।
পবিত্র সরকার	(১৯৮৫)	গদ্যরীতি পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক।
বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়	(১৯৮৯)	সাহিত্যবিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, দে'জ পাবলিশিং।
মনোমোহন ঘোষ	(১৯৪২)	বাংলা গদ্যের চার যুগ, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং।
শিশিরকুমার দাশ	(১৯৮৬)	গদ্য পদ্যের দ্বন্দ্ব, দে'জ পাবলিশিং।
	(১৯৮৭)	কবিতার মিল ও অমিল, দে'জ পাবলিশিং।
শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়	(১৯৬০)	বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, মিত্রালয়।
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	(১৯৬৫)	বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সী।
সজনীকান্ত দাস	(১৯৬২)	বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস, মিত্রালয়।
সুকুমার সেন	(১৯৬৭)	বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ইস্টার্ন পাবলিশার্স।
সুধীরকুমার দাশগুপ্ত	(১৯৭৯)	কাব্যালোক ৫ম সংস্করণ, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং।
হীরেন চট্টোপাধ্যায়	(১৯৮২)	বাংলা উপন্যাসের শিল্পরীতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

ইংরেজি :

আব্রামস, এম. এইচ.	(১৯৭৮)	এ গ্লসারি অব লিটারারি টার্মস, ম্যাকমিলান।
বারবাশ, য়ুরি	(১৯৭৩)	ইসথেটিকস অ্যান্ড পোয়েটিকস, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো।
চ্যাটম্যান, সেম্যুর (সম্পা.)	(১৯৭১)	লিটারারি স্টাইল, আ সিম্পোসিয়াম, অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন।
চ্যাটম্যান, রেমন্ড	(১৯৭৩)	লিংগুইস্টিকস্ অ্যান্ড লিটারেচর, এডওয়ার্ড আর্নল্ট পাবলিশার্স, লন্ডন।

ক্রীস্টাল, ডেভিড অ্যান্ড

ডেভি, ডেরেক	(১৯৬৯)	ইনভেস্টিগেটিং ইংলিশ স্টাইল, ইন্ডিয়ানা য়ুনিভার্সিটি প্রেস, ব্লুমিংটন।
এংকভিস্ট, নিলস এরিক এট অল	(১৯৬৪)	লিংগুইস্টিকস অ্যান্ড লিটারারি স্টাইল, অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন।
	(১৯৭৩)	লিংগুইস্টিকস্ স্টাইলিস্টিকস্, মুটন, দ্যা হেগ।
ফ্রিম্যান, ডোনাল্ড সি. (সম্পা.)	(১৯৭০)	লিংগুইস্টিকস্ অ্যান্ড লিটারারি স্টাইল, হোস্ট রাইনহার্ট অ্যান্ড ইউন্সটন, নিউ ইয়র্ক।
প্রায়েড, ডি. (সম্পা.)	(১৯৭২)	দা প্রাগ স্কুল অব লিংগুইস্টিকস্ অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ টিচিং, অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন।
গ্রৈ, বেনিসন	(১৯৬১)	স্টাইল : দা প্রব্লেম অ্যান্ড ইটস ফল্যুশনস্, মুটন, দা হেগ।
গারভিন, পল এল (সম্পাদিত ও অনূদিত)	(১৯৬৫)	এ প্রাগ স্কুল রিডার অব্ ঈসথেটিকস্ লিটারারি স্ট্রাকচার অ্যান্ড স্টাইল, জর্জ টাউন।
লাবক, পার্সি	(১৯৫৪)	দা ক্রাফট অব্ ফিকশান, জোনাথান কেপ, লন্ডন।
মুখার্জী, রমারঞ্জন		হিস্ট্রি অব স্যাংস্ক্রিট লিটারারি ক্রিটিসিজম, কলকাতা।
মুইর, এডুইন	(১৯২৮)	দা স্ট্রাকচার অব্ নভেল।
মারী, মিডলটন	(১৯৬১)	দা প্রব্লেম অব্ স্টাইল, রিপ্রিন্ড এডিশন, অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটিচ প্রেস, লন্ডন।
মিলিচ, লুই, টি	(১৯৬৯)	স্টাইলিস্টস্ অন্ স্টাইল : আ হ্যান্ডবুক উইথ সিলেকশন ফর অ্যানালিসিস।
পেটার, ওয়াল্টার	(১৯৬৭)	অ্যাপ্রিসিয়েশনস ইউথ অ্যান এসে অন স্টাইল, রূপা এডিশন, কলকাতা।
সেবক, টমাস এ, (সম্পাদিত)	(১৯৬০)	স্টাইল ইন ল্যাংগুয়েজ, দা এম. আই. টি. প্রেস, ম্যাসাচুসেটস্, কেম্ব্রিজ।
স্পিৎজার, লিও	(১৯৭৬)	লিংগুইস্টিকস্ অ্যান্ড লিটারারি হিস্ট্রি, প্রিন্সটন, য়ুনিভার্সিটি প্রেস, প্রিন্সটন, নিউজার্সি।
টার্নার, ডব্লিউজে	(১৯৭৩)	স্টাইলিস্টিকস্, পেঙ্গুইন বুকস, মিডলসেকস্, ইংল্যান্ড।
উলমান, স্টিফেন	(১৯৬৪)	ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড স্টাইল, বেসিল ব্ল্যাকওয়েল, অক্সফোর্ড।
জিস, আভনের	(১৯৭৭)	ফাউন্ডেশন অব্ মার্কসিস্ট ঈসথেটিকস্, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো।

বাংলা (পঞ্চম পত্র)

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পর্যায় ঃ ৩

একক ঃ ১ - ৪

প্রবন্ধ সাহিত্য পরিচিতি

'প্রবন্ধ' শব্দটি সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া গেলেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ বলতে আমরা যা বুঝি তা আসলে ইংরেজি Essay শব্দের প্রতিশব্দ। 'A Dictionary of Literary Terms'-এ J. A. Cuddon, Essay সংজ্ঞা দিয়েছেন "A Composition, usually in prose, which may be of only a few hundred words or of book length and which discusses, formally or informally, a topic or a variety of topics. It is one of the most flexible and adaptable of all literary forms".

ইংরেজিতে Essay শব্দটি এসেছে ফরাসি 'Essai' শব্দ থেকে। 1580 খ্রিস্টাব্দে ফরাসি লেখক মনতেইন (Michel de Montaigne) তাঁর একটি আত্মভাবপ্রধান রচনাকে 'Essaies' নামে প্রকাশ করেন। ইংরেজিতে ফ্রান্সিস বেকন প্রথম Essay শব্দটি ব্যবহার করেন। যদিও মন্তেইন ও বেকনের বহু পূর্বেই প্রাচীনকালে গ্রিস ও রোমে প্রবন্ধধর্মী গদ্য রচনার চর্চা করেছিলেন থিওফ্রেটাস, প্লুতার্ক, সিসেরো প্রমুখ।

সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' শব্দটির নানা অর্থে বহুল ব্যবহার দেখা যায়, ছন্দগত বন্ধন, বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু সম্বন্ধরূপ বন্ধন, সর্গ-পর্ব-অধ্যায়ের বন্ধন, রচনাক্রমের ধারাবাহিক পারম্পর্য-রূপ বন্ধন ইত্যাদি নানারকম বন্ধন সমন্বিত গদ্য পদ্য উভয় রচনাতেই 'প্রবন্ধ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'প্রবন্ধ' শব্দটি সাহিত্য দর্পণকার আচার্য বিশ্বনাথ ব্যবহার করেছিলেন কাব্যাদির বিভিন্ন উপাদানগত সংগতি বোঝাতে। যেমন, নাটকের ভাষা, পঞ্চসন্ধি সমন্বিত ইত্যাদি সমস্ত আঙ্গিক নিয়ে যে সংগতি তাকে বলা হত নাট্য প্রবন্ধ।

'প্রবন্ধ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি 'প্র + √ বন্ধ্ + অ' থেকে। অর্থ হল প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত বা প্রকৃষ্টভাবে গ্রথিত রচনা। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে যে-কোনো রকম প্রকৃষ্ট বন্ধন বোঝাতেই প্রবন্ধ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন 'লাচারী প্রবন্ধ', 'পয়ার প্রবন্ধ', 'পাঁচালী প্রবন্ধ' প্রভৃতি। যেমন কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর অনূদিত রামায়ণে ব্যবহার করেছেন 'যতেক প্রবন্ধ করে নিশাচরগণে'। এছাড়াও চৈতন্যমঙ্গাল, মনসামঙ্গাল, ধর্মমঙ্গাল, শিবায়ন ইত্যাদি গ্রন্থে প্রবন্ধ শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। তবে সেখানেও এই শব্দটির দ্বারা কোনো সাহিত্যিক সংরূপ বোঝাবার চেষ্টা হয়নি। আধুনিক যুগে ইংরেজি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই এটি একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যিক সংরূপের স্বীকৃতি পেয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ভাবসমৃদ্ধ মননশীল গদ্যরচনাকেই প্রবন্ধ বলা হয়। বাংলা সাহিত্যে গদ্যমাধ্যমের ব্যবহার শুরুর পরে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখের হাতে যখন এই ধরনের রচনার সূত্রপাত ঘটে তখন তারা সাধারণত 'প্রস্তাব' শব্দটি ব্যবহার করতেন। এছাড়া প্রবন্ধ বোঝাতে বাংলায় 'সন্দর্ভ', 'নিবন্ধ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়। শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের একদিক' গ্রন্থে সন্দর্ভ শব্দের সংজ্ঞা দিয়েছেন, 'শব্দের সহিত শব্দের, অর্থের সহিত অর্থের, এবং শব্দের সহিত অর্থের সম্যক্ প্রকার গ্রথিত হওয়াকেই সন্দর্ভ বলা যায়'। 'নিবন্ধ' শব্দটিও বন্ধনযুক্ত রচনা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত দীর্ঘ প্রবন্ধকে নিবন্ধ নামে অভিহিত করা হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'প্রবন্ধ' ও 'প্রস্তাব' দুটি শব্দই ব্যবহার করেন। কবি রঙ্গালাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'বাংলা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' গ্রন্থে প্রবন্ধ শব্দটি বর্তমান অর্থে প্রথম সচেতন ভাবে ব্যবহার করেন।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে প্রবন্ধ শব্দটি ধীরে ধীরে তার বর্তমান অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। 'বাংলা সাহিত্যের একদিক' গ্রন্থে শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখছেন "উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রবন্ধ শব্দটি সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা যোগরূঢ় অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ইহার ব্যবহার গদ্যের ক্ষেত্রে সংকুচিত হইল।......

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে রসের পরিণতি অপ্রধান সিদ্ধান্তের পরিণতিই মুখ্যবস্তু। সকল প্রবন্ধের ক্ষেত্রেই ছোট হোক বড় হোক আমাদের একটি প্রতিপাদ্য থাকে। তথ্য প্রমাণের যথাযথ সমাবেশ, ভাবে ভাষায় চিন্তার প্রাখর্যে, সমন্বয়ে এবং পরিচ্ছন্নতায় সেই প্রতিপাদ্যকে প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই প্রতিপাদ্য বস্তু প্রত্নতাত্ত্বিক হইতে পারে, ঐতিহাসিক হইতে পারে, ভৌগোলিক হইতে পারে, ধর্ম, রাষ্ট্র সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি কিছু হইতেই তাহার বাধা নাই। হৃদয়গ্রাহী ভাষা ও রীতিতে যিনি তাঁহার প্রতিপাদ্যকে যতখানি সুস্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন, তিনিই তত বড় প্রবন্ধ লেখক।”

ইংরেজি সাহিত্যের সূত্রে যেহেতু বাংলা সাহিত্যে বর্তমান অর্থে প্রবন্ধের অনুপ্রবেশ, ফলে প্রবন্ধের প্রকারভেদেও ইংরেজি সাহিত্যের অনুকরণ লক্ষ করা যায়। ইংরেজিতে প্রধানত দুভাগে Essay-কে ভাগ করা হয়। (১) Formal or Objective or Impersonal এবং (২) Informal or Subjective or Personal. বাংলাতেও এই প্রকারভেদকে অনুসরণ করে প্রবন্ধকে দুভাগে ভাগে করা হয়। (১) বিষয়নিষ্ঠ বা তন্ময় প্রবন্ধ (২) ব্যক্তিগত বা মন্ময় প্রবন্ধ। যারা আরেকটু পুঙ্খানুপুঙ্খ হওয়ার চেষ্টা করেছেন, তারাও ইংরেজি সাহিত্যেরই দ্বারস্থ হয়েছেন। ইংরেজিতে হ্যারল্ড জে মরিয়াম Essay-কে আট ভাগে ভাগ করেছেন—(i) Treatise/ Monograph, (ii) Bio-graphical/Scientific/Historical/Expository/Critical, (iii) Editorial, (iv) Book Review, (v) Artical, (vi) Character, (vii) Impressionistic এবং (viii) Personal Playful Sketch। এই বিভাজনের আদলে বাংলাতে কেউ কেউ বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। (ক) বিবৃতিমূলক প্রবন্ধ : ঐতিহাসিক বা সাময়িক ঘটনাপ্রসঙ্গ, (খ) বর্ণনামূলক বা তথ্যমূলক প্রবন্ধ : বিজ্ঞানের নানা বিষয়, নিসর্গ, সমাজ-সংস্কৃতিমূলক রচনা, (গ) বিচারমূলক বা মননাশ্রয়ী প্রবন্ধ : ধর্মীয় মতবাদ প্রসঙ্গ, দর্শন তত্ত্বমূলক রচনা, (ঘ) সমালোচনা বা ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ : সাহিত্য প্রসঙ্গ, বিবিধ শিক্ষামূলক রচনা। আর ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে দুইভাগে ভাগ করেছেন, (ক) মনঃপ্রধান ও (খ) অন্তরানুভূতিপ্রধান।

❑ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা :

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের মধ্যে দিয়ে যেমন বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের চর্চা শুরু হয়, তেমনি বাংলা প্রবন্ধ রচনার আংশিক আভাসও এই কলেজের এক পন্ডিতের রচিত গদ্য সাহিত্যে লক্ষ করা যায়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’তেই প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রাক্‌রূপ লক্ষ করা যায়। তবে বাংলা সহিত্যে প্রবন্ধের যথার্থ সূচনা রামমোহন রায়ের রচনাতেই। রামমোহন রায়ের প্রবন্ধগুলি ধর্মতত্ত্বমূলক আলোচনা এবং সামাজিক আচার বিষয়ক রচনা এই দু-ভাগে ভাগ করা যায়। তাঁর ধর্মতত্ত্বমূলক আলোচনার মধ্যে পড়বে ‘বেদান্তসার’, ‘বেদান্তগ্রন্থ’ প্রভৃতি, আর সামাজিক আচার বিষয়ক রচনার মধ্যে পড়বে ‘সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের সম্বাদ’ ইত্যাদি। তাঁর প্রবন্ধে যুক্তি, তথ্য থাকলেও যথার্থ সাহিত্যগুণ ছিল না। রামমোহন পরবর্তী কালে বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম করতে হয়। অক্ষয়কুমার বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রতত্ত্ব, সমাজ ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর প্রবন্ধের অন্যতম বিশিষ্টতা হল ভাষাগত ওজস্বিতা, প্রাজ্জ্বলতা, ভাবপ্রকাশগত সংযম এবং বিষয় উপযোগী ভাষা প্রয়োগ। প্রাবন্ধিক রূপে বিদ্যাসাগরের মৌলিক কৃতিত্ব হল, তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ ও মৌলিক প্রবন্ধ রচনার ভাষাগত পার্থক্য লুপ্ত করেন। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে যুক্তির সঙ্গে হৃদয়াবেগের মিশ্রণ ঘটেছে। তবে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাংলা প্রবন্ধকে স্বতন্ত্র সাহিত্যিক সংরূপের মর্যাদা দান করেন। তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট, সহজ ও যৌক্তিক ভাষাই যে প্রবন্ধ রচনার প্রাণ একথা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম দেখান। তিনি নানা বিষয় অবলম্বন করে প্রবন্ধ রচনা করেছেন—বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব,

ইতিহাস, সমস্ত বিষয়কেই তিনি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ও পরবর্তী প্রাবন্ধিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম করা উচিত। তিনি বস্তুগত ও ব্যক্তিগত দু-রকম প্রবন্ধই রচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলিকে—সাহিত্য সমালোচনা, রাজনীতি-সমাজনীতি-শিক্ষা, ধর্ম-দর্শন-আধ্যাত্মিকতা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনি ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়। তাঁর প্রবন্ধ সম্পর্কে শ্রী অতুল গুপ্তের মন্তব্য উদ্ধৃত করা উচিত—'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ। সাহিত্যের সমালোচনায়, কি রাষ্ট্র ও সামাজিক সমস্যার আলোচনায়, বাংলা কবিতার ছন্দবিচারে, কি বাংলা ব্যাকরণের রীতি ও বাংলা শব্দতত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সর্বত্র পড়েছে মহাকবির মনের ছাপ। সত্র মহাকবির বাগ্‌বৈভব।' এছাড়া রবীন্দ্র সমসাময়িক প্রাবন্ধিকদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

প্রস্তাবনা—বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সূচনা ও বিকাশ : সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

পুরনো বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ বাক্য বিন্যস্ত যে কোনো রচনা বোঝাতে ব্যবহৃত হত। 'পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস' ধরনের পঙ্‌ক্তি তার প্রমাণ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইংরেজি 'এসে' (Essay)-র বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে গৃহীত হয়েছে 'প্রবন্ধ' নামটি। গদ্য রচনার এই বিশেষ ধরনটির প্রথম রূপ দিয়েছিলেন ফরাসি লেখক মিশেল মঁতেইন (১৫৩৩-১৫৯২)। তিনি দিয়েছিলেন 'essai' নাম এবং 'প্রয়াস' অর্থে তা ব্যবহার করেছিলেন। ১৫৯৭-এ এই রচনাধারার দেখা মেলে ইংল্যান্ড-এর লেখক ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon : ১৫৬১-১৬২৬)-এর 'Essays' গ্রন্থে। পরে ড্যানিয়েল ডিফো (Daniel Defoe : ১৬৬০-১৭৩১), জোসেফ অ্যাডিসন (Joseph Addison : ১৬৭২-১৭১৯), চার্লস ল্যাম (Charles Lamb : ১৭৭৫-১৮৩৪), উইলিয়ম হ্যাজলিট (William Hazlitt : ১৭৭৮-১৮৩০) প্রমুখ বহু ইংরেজ গদ্যশিল্পী প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বাংলায় প্রবন্ধ এসেছে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে। উনিশ শতকে সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে গদ্য ব্যবহার সূত্রে বাংলায় এসেছে এই সাহিত্য ধারা।

বাংলায় প্রবন্ধ বলতে বোঝায় চিন্তনপুষ্ট, যুক্তি ও তথ্যে বিন্যস্ত গদ্য নিবন্ধ। প্রবন্ধে বিষয়ের গুরুত্ব এবং বক্তব্যের উপস্থাপনভঙ্গি—দুটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

গোপাল হালদার যখন প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন তখন বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য কৈশোর অতিক্রম করে পৌঁছেছে বলিষ্ঠ যৌবনে। তাঁর পূর্বকালীন বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে দুটি প্রধান ধারায় বিভক্ত করা যায়—সূচনা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র তথা 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২-১৮৭৬) পর্ব; রবীন্দ্রনাথ থেকে 'সবুজপত্র' (১৯২৪-১৯২৮) পর্ব। প্রবন্ধ-বিষয় সাধারণত সমাজ-ভাবনা, ইতিহাস চেতনা, সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্য-ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান আর ব্যক্তিমনের নিমগ্ন ভাবনার রূপায়ণ—এদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২-১৮৭৬) থেকে বিশ শতক পর্যন্ত প্রধানত সাময়িক পত্র ছিল প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রেরণাদাতা এবং পালনকর্তা।

মূলত ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর বাংলা গদ্য হয়ে ওঠে সাহিত্য-মাধ্যম। এই শৈশব গদ্যে মূলত আখ্যানই রচিত হয়েছিল। ক্বচিৎ লেখা হয়েছিল দু-একটি জীবনী; যেমন রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত' (১৮০১) এবং রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' (১৮০৫)। এই গ্রন্থদ্বয়ে প্রবন্ধের বীজ উপ্ত হয়েছে বলা যায়।

বাংলা প্রবন্ধের সূচনা করেন রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। সমাজ-সংস্কার এবং নব ধর্ম ব্যাখ্যার সচেতন

উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি যে সব পুস্তিকা লিখেছিলেন তাদের ভাষা আড়ষ্ট। কিন্তু যুক্তিপ্রাধান্য এবং বিশ্লেষণ প্রবণতার জন্য এসব পুস্তিকা অনেকাংশে প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে। পুস্তিকাগুলি ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার এই দুটি ভাগে বিন্যস্ত। ধর্ম বিষয়ক পুস্তিকা—'বেদান্ত' (১৮১৫), 'বেদান্তসার' (১৮১৫) 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' (১৮১৭), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০), 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' (১৮২০), 'চারি প্রশ্নের উত্তর' (১৮২২), 'গুরুপাদুকা' (১৮২৩), 'পথ্যপ্রদান' (১৮২৩), 'পাদরি ও শিষ্য সংবাদ' (১৮২৩), 'প্রার্থনাপত্র' (১৮২৩), 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' (১৮২৬), 'ব্রহ্মোপাসনা' (১৮২৮) ও 'অনুষ্ঠান' (১৮২৯)—এই চোদ্দোটি। সমাজ-সংস্কারমূলক চারটি পুস্তিকার নাম যথাক্রমে—'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯), 'কায়স্থের সহিত মদ্যপানবিষয়ক বিচার' (১৮২৬), 'সহমরণ বিষয়' (১৮২৯)।

রামমোহনের পরে আসেন প্রাবন্ধিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) নাম। রামমোহনের তুলনায় তাঁর প্রবন্ধ-ভাষা সরল, সরস। যদিও তিনিও সমাজ-সংস্কারের জন্যই প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন। যুক্তি-সহায়তায় বক্তব্য উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণ-প্রবণতা বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধের বিশেষত্ব। তাঁর সংস্কারভিত্তিক প্রবন্ধ গ্রন্থ 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১ম ও ২য় পুস্তক : ১৮৫৫), 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১ম ১৮৭০, ২য় ১৮৭২) সাহিত্য বিষয়ক তাঁর একমাত্র প্রবন্ধ 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩)। বেথুন সোসাইটির অধিবেশনে পাঠের জন্য রচিত প্রবন্ধটি বিদ্যাসাগরের সাহিত্যবোধ ও ব্যাখ্যা-শক্তির প্রমাণ। স্নেহভাজন বালিকা বন্ধুকন্যার মৃত্যুতে রচিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধ 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (১৮৬৪) বিদ্যাসাগরের মন্ময় প্রবন্ধ রচনা-দক্ষতার প্রমাণ। স্বলিখিত অসমাপ্ত 'বিদ্যাসাগরচরিত' (১৮৯১) তাঁর চরিত্র প্রবন্ধ রচনা-ক্ষমতার প্রমাণ দেয়। বিদ্যাসাগরের সমকালের লেখক রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪) প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২-৭৩) রচনার জন্য স্মরণীয়। গ্রন্থটিতে তৎকালে প্রাপ্ত সকল তথ্যের সহায়তায় বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে লেখকের নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য-ইতিহাস রচনার ধারার সূচনা হয় বিদ্যাসাগর ও রামগতি ন্যায়রত্নের প্রয়াসের মাধ্যমে। বিংশ শতকে প্রবন্ধের এই বিশেষ ধারাটি লাভ করে পূর্ণতা।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮২) বেশির ভাগ প্রবন্ধ লিখেছিলেন ইংরেজিতে। বাংলায় লেখা তাঁর অনেক প্রবন্ধই গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। তাঁর প্রবন্ধ-গ্রন্থের সংখ্যা তিন—'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত' (১৮৭৮) 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা' (১৮৫৯) ও 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১)। 'কৃষিপাঠ'-এর অধিকাংশ প্রবন্ধই হর্টিকালচারাল সোসাইটির মুখপত্রে প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধের অনুবাদ। অতএব এক্ষেত্রেও পত্রিকা প্রবন্ধের পোষকতা করেছে বলা যায়। যুক্তি ও উদাহরণ দ্বারা বক্তব্য উপস্থাপনই প্যারীচাঁদের প্রবন্ধের বিশেষত্ব।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৯৭-১৯০৫) উদ্যোগে প্রকাশিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এ পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) বিজ্ঞানবিষয়ক ও বিজ্ঞানমনস্ক বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য রচনার অগ্রপথিক। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-য় মুদ্রিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞাননিষ্ঠ প্রবন্ধ সংকলন 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১ম ভাগ ১৮৫১, ২য় ভাগ ১৮৫৩) জর্জ কুম্ভ-এর 'কনস্টিটিউশন অব ম্যান' ('Constitution of Man') অবলম্বনে লিখিত হলেও মৌলিক চিন্তা গ্রন্থটির বিশেষত্ব। 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকার ষোড়শ ও সপ্তদশ সংখ্যায় মুদ্রিত হোরেস হেম্যান উইলসন (Horace Hayman Wilson : ১৭৮৬-১৮৬০)-এর 'স্কেচ অব দ্য রিলিজিয়াস সেক্টস অব দ্য হিন্দুজ'—নামের দুটি প্রবন্ধ, অক্ষয়কুমার দত্তের 'ধর্ম্মনীতি' (১৮৫৬) এবং 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১ম ভাগ ১৮৭০, ২য় ভাগ ১৮৮৩) বই দুটির অবলম্বন। কিন্তু গবেষণা-ধর্মী তথ্য-বিন্যাস এবং তত্ত্ব ব্যাখ্যার দ্বারা অক্ষয়কুমার

দত্ত গ্রন্থদুটিকে করে তুলেছেন মৌলিক সৃষ্টি। বিশেষত দুখণ্ড 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'-এ অক্ষয়কুমার স্বীয় অনুসন্ধানলব্ধ বহু নতুন তথ্য সংযোজন করেছেন। মৃত্যুর পরে মুদ্রিত 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার' (১৯০১) নামের ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থটিতে অক্ষয়কুমারের দেশপ্রেম ও জ্ঞানসন্ধিৎসু মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। রচনারীতির সহজ সাবলীলতা এবং সংহতি অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধের বিশেষত্ব। বহু পরিভাষাও তিনি রচনা করেছিলেন। গবেষণাধর্মী বাংলা প্রবন্ধের পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্ত।

'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র স্থপয়িতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' (১৮৬১) এরূপ প্রবন্ধের একটি সংকলন। বেশির ভাগ প্রবন্ধ ব্রাহ্মসমাজে দেওয়া তাঁর বক্তৃতার লিখিত রূপ। তাঁর 'স্বরচিত জীবনচরিত' (১৮৯৮) মন্ময় প্রবন্ধের উত্তম নিদর্শন। গভীর অনুভূতির হৃদয়স্পর্শী সরল ভাষারূপ দান এ গ্রন্থের বিশেষত্ব।

হিন্দু কলেজের ছাত্র ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্যতম ব্যক্তিত্ব ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪) বাঙালির শিক্ষা, সমাজ ও পরিবারের উন্নতি বিধানের সচেতন উদ্দেশ্য নিয়েই লিখেছিলেন বেশ কিছু প্রবন্ধ। তাঁর সে সব প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে 'শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব' (১৮৫৬), 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২) এবং 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২)-গ্রন্থ তিনটিতে। তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি প্রবন্ধ-সংকলন ত্রয়ীতে ভাষারূপ লাভ করেছে। সরল ভাষায় যুক্তিবিন্যাস এবং বক্তব্য বিশ্লেষণ তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। প্রসঙ্গত স্মরণীয় ভূদেব ছিলেন 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)-র প্রবন্ধ রচনার উৎস ছিল ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার ও স্বদেশপ্রেম। তাঁর প্রায় সব প্রবন্ধই সভা-সমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতার লিখিত রূপ। যুক্তি প্রবণতা তথ্য ও তত্ত্বের সুষম বিন্যাস এবং বিশ্লেষণ শক্তি রাজনারায়ণের প্রবন্ধের বিশেষত্ব। 'ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা' (১ম ১৮৬৬, ২য় ১৮৬৭) 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪), 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের বৃত্তান্ত' (১৮৭৪), 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৮) এবং 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' (১৮৮৬)—রাজনারায়ণের বিশিষ্ট কয়েকটি প্রবন্ধ-সংকলন।

'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' এবং 'নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) 'ধর্ম্মতত্ত্ব', 'সুলভ সমাচার' (১৮৭০) 'নব বিধান'—নামের তিনটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। ব্রাহ্ম নেতা হিসেবে খ্যাত কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধও লিখেছিলেন। সরল বলিষ্ঠ ভাষায় রচিত সেই সব প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে 'ব্রাহ্মোৎসব' (১৮৬৮), 'আচার্য্যের উপদেশ' (১৭৯২ শকাব্দ), 'সেবকের নিবেদন' (১৭৯২ শকাব্দ) প্রভৃতি গ্রন্থে। 'জীবনবেদ' (১৮৮৪) তাঁর লেখা আত্মস্মৃতি-মূলক প্রবন্ধের নিদর্শন। বিশিষ্ট ব্রাহ্ম ধর্ম-নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) গল্প, কবিতা, উপন্যাস ভিন্ন লিখেছিলেন বেশ কিছু ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ। 'বক্তৃতা স্তবক' (১৮৮৮), 'ধর্ম্মজীবন' (১৯০১), 'মাঘোৎসবের উপদেশ' (১৯০১) 'প্রবন্ধাবলী'—প্রভৃতি গ্রন্থে এসব প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। তবে জীবনীভিত্তিক সমাজ-ইতিহাস রচনা তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৮৯৭) এবং 'আত্মচরিত' (১৯১৮) এ শ্রেণির প্রবন্ধ-গ্রন্থের নিদর্শন। তাঁর প্রবন্ধ যুক্তি, তথ্য ও সমৃদ্ধ এবং পাঠরম্য। ধর্ম এবং সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্য ছাড়াই কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। প্রবন্ধগুলির বিষয় প্রাচীন কবিওয়ালা ও কবিদের জীবনী প্রবন্ধ। এদের বলা যায় প্রথম ক্ষেত্র-সমীক্ষালব্ধ তথ্যনির্ভর বাংলা প্রবন্ধ। তাঁর একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত'।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় বাংলা প্রবন্ধ ক্রমশ উন্নত হয়ে উঠছিল। তারপরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) লেখনী বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে পূর্ণ যৌবনের লাবণ্যময় বলিষ্ঠতায় অন্বিত করেছিল। বাঙালির মানসিক পুষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি প্রকাশ করেন মাসিক পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২-১৮৭৬)। পত্রিকার প্রয়োজনে তিনি

স্বয়ং বিবিধ বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন এবং সমকালের বহু তরুণকে বাংলা প্রবন্ধ রচনায় প্রাণিত করেন। যুক্তি-বিন্যাসের ক্রমানুসারে অনুচ্ছেদ বিভাগের রীতি প্রথম দেখা যায় তাঁর প্রবন্ধে। বাংলায় পুস্তক সমালোচনা এবং শিল্প, সংগীত, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার প্রেরণা তিনিই দিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তন্ময় এবং মন্ময়—উভয় ধারার প্রবন্ধের রচয়িতা। দু-একটি ব্যঙ্গাতির্যক প্রবন্ধও তাঁর আছে। সহজবোধ্য স্পষ্ট ভাষা আর বিষয়মুখী যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ—তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। বিজ্ঞান, সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্য-সমালোচনা, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ভাষা—এই সব বিষয়ে তিনি রচনা করেছিলেন প্রবন্ধ। তাঁর তন্ময় প্রবন্ধের মধ্যে আছে বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ-সংকলন—'বিজ্ঞান রহস্য' (১৮৭৫), সাহিত্যকেন্দ্রিক প্রবন্ধগ্রন্থ—'বিবিধ সমালোচন' (১৮৭৬), 'প্রবন্ধপুস্তক' (১৮৭৯), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (এটি 'বিবিধ সমালোচন' ও 'প্রবন্ধ পুস্তক'-এর প্রবন্ধ সমূহের সংকলন ১ম ১৮৮৭, ২য় ১৮৯২), সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধপুস্তক—'সাম্য' (১৮৭৯), 'দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি' (১৮৮৫), ধর্ম প্রবন্ধ-সংকলন 'কৃষ্ণচরিত্র' (১ম ১৮৮৬, সম্পূর্ণ গ্রন্থ ১৮৯২), 'ধর্ম্মতত্ত্ব' (১৮৮৮), 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম' (১৯৩৮ মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্ময় প্রবন্ধ-সংকলন 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫, পরিমার্জিত সংস্করণ 'কমলাকান্ত' ১৮৮৫), ব্যঙ্গ প্রবন্ধপুস্তক 'লোকরহস্য' (১৮৭৪) ; বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রবন্ধ-সংকলন।

'বিজ্ঞান রহস্য'-এ আছে জীববিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধ। তিনি চাকরিসূত্রে মফস্‌ল বাংলা ও কৃষিশ্রমিকদের দুরবস্থার কথা জেনেছিলেন এবং সমাজগঠনের যেসব ত্রুটি এর কারণ তা দূর করার কথা ভেবেছিলেন। 'সাম্য' তাঁর সে চিন্তার ফল। 'দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি' সংকলনে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালিদের সমস্যা ও প্রবণতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'বিবিধ প্রবন্ধ' (দুটি খণ্ডে 'বিবিধ সমালোচনা' ও 'প্রবন্ধ পুস্তক'-এর সম্মিলিত রূপ। প্রথম গ্রন্থ থেকে 'কৃষ্ণচরিত্র' বাদ দেওয়া হয় যা পরে পৃথক গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হয়। 'প্রবন্ধ পুস্তক'-এর 'বুড়া বয়সের কথা' 'কমলাকান্ত'-এ স্থান পায়) সংকলনের 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি', 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধত্রয়—বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও ভাষা সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমের দৃষ্টান্ত।

'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম ভাগে সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ে বঙ্কিমের যেসব প্রবন্ধ আছে সেগুলি 'বঙ্গদর্শন'-এ পুস্তক সমালোচনা উপলক্ষে লিখিত। এদের মধ্যে সাহিত্যতত্ত্ব মূলক প্রবন্ধ আছে তিনটি—'গীতিকাব্য', 'প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত' এবং 'সঙ্গীত'। সাহিত্যসমালোচনার পর্যায়ে পড়ে 'উত্তরচরিত', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' এবং 'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমনা'। শেষের প্রবন্ধ দুটিকে তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনার প্রথম বাংলা নিদর্শন বলা যায়।

'কৃষ্ণচরিত'-এ বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকে দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ ও সমর-পরিচালক হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এর প্রবন্ধ সমূহে হিন্দুধর্মের নানা তত্ত্ব বিশেষত অনুশীলন তত্ত্ব সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা দৃষ্ট হয়। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ টমাস ডি কুইন্সি (Thomas De Quency : ১৭৮৫-১৮৫৯)-র 'দ্য কনফেসনস্ অফ অ্যান ইংলিশ অপিয়ম ইটার' ('The Confessions of an English Opium-Eafer')-এর প্রকরণের আংশিক অনুসরণ থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তনশক্তি ও উপস্থাপনকৌশলে গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে স্বাধীন সৃষ্টি। এইভাবে ১৮৭২ থেকে ১৮৯২ মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে বাংলা প্রবন্ধ বিষয় বৈচিত্র্য, প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠতায়, যুক্তিনির্ভরতায় লাভ করেছিল পূর্ণতা।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং 'বঙ্গদর্শন'-কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি বৃত্ত। এই বৃত্তের মধ্যে ছিলেন রামদাস সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রমুখ প্রাবন্ধিক। ঈষৎ পরবর্তী প্রাবন্ধিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে রচনা বৈশিষ্ট্যের বিচারে বঙ্কিম-অনুসারী লেখক বলা যায়।

বাংলা ভাষায় প্রথম পুরাতাত্ত্বিকবিষয়ক প্রবন্ধ-রচয়িতা রামদাস সেন (১৮৪৫-১৮৮৭) 'বঙ্গদর্শন'-এ নিয়মিত লিখতেন। তাঁর এরূপ প্রবন্ধের সংকলন 'ঐতিহাসিক রহস্য' (১৮৭৪-১৮৭৬) ও 'ভারত রহস্য' (১৮৮৫)।

সাপ্তাহিক 'সাধারণী' ও মাসিক 'নব জীবন'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বঙ্কিম-সুহৃদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) ছিলেন বঙ্কিমানুসারী প্রাবন্ধিক। নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করলেও রূপকধর্মী লঘু নিবন্ধ রচনাতেই তিনি ছিলেন নিপুণ। তাঁর এজাতীয় প্রবন্ধের সংকলন 'রূপক ও রহস্য'। ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে তাঁর লেখা প্রবন্ধের সংকলন যথাক্রমে 'সনাতনী' ও 'সমাজ-সমালোচন' (১৮৭৪)।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায় বাংলা সাহিত্য চর্চায় মন দিয়েছিলেন। ঋগ্বেদ-সংহিতার অনুবাদ (১৮৮৫-১৮৮৭) ভিন্ন বাংলা ও ইংরেজিতে বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি। প্রাচীন ভারত আর বর্তমান ভারতের সমাজজীবন এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর লেখা প্রবন্ধ 'নব জীবন', 'নব্য ভারত' 'ভারতী', 'ভারতী ও বালক', 'সাধনা' আর 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'-র পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। যুক্তিপ্রধান মিতভাষণ তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধের প্রকাশস্থান, প্রকাশকাল এবং নাম দেওয়া হল—'হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস'; 'নব্যভারত' (ভাদ্র, ১৩৯৮ ব.) 'কবি ভবভূতি'; 'সাধনা' (মাঘ, ১২৯৯ ব.), 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'; 'নব্য ভারত' (বৈশাখ, ১৩১০ ব.) 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র'; 'সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা' (৩য় সংখ্যা ১৩০১ ব.), 'ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি'; 'ভারতী' (শ্রাবণ, ১৩০৮ ব.) প্রভৃতি। এই তালিকা থেকে বোঝা যায় স্বদেশপ্রীতি ছিল তাঁর প্রবন্ধ-রচনার উৎস।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৬) গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনায় দক্ষ ছিলেন। যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে তিনিই প্রথম বিদ্যাপতির যথার্থ পরিচয় নির্ণয় করেন। 'নানা প্রবন্ধ' (১৮৮৫) তাঁর একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ-সংকলন। রজনীকান্ত গুপ্তও (১৮৪৯-১৯০০) গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনার জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁর এরূপ প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাঁচখণ্ডে রচিত 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' (১ম ১৮৭৯, ২য় ১৮৮৬, ৩য় ১৮৯০, ৪র্থ ১৮৯৭, ৫ম ১৯০০) তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে আছে 'জয়দেব চরিত' (১৮৭৩), 'পাণিনি' (১৮৭৫), 'প্রবন্ধমালা' (১৮৭৭), 'ভারতকাহিনী' (১৮৮৩) প্রভৃতি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় নিপুণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে কয়েকটি সাহিত্যতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ, কিছু লঘু নিবন্ধ আর ভ্রমণ-বৃত্তান্তও তিনি লিখেছিলেন। তাঁর বেশির ভাগ প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শন', 'নারায়ণ' পত্রিকায় নিবদ্ধ রয়ে গেছে। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'ভাণ্ডার' প্রভৃতি পত্রিকায় বাংলার ভাষা সাহিত্য, ধর্ম সম্পর্কে হরপ্রসাদের অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য সম্পন্ধে লেখা তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে আছে 'কালিদাসের মেয়ে দেখান', 'অগ্নিমিত্রের ভাঁড়', 'শকুন্তলায় হিঁদুয়ানী'। 'বেদ ও বেদব্যাখ্যা' প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করেছেন বেদ আসলে লোককবিতার সংকলন। বঙ্গ-বিদ্যা চর্চার পথিকৃৎ হরপ্রসাদ বুঝেছিলেন বাংলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে দেশের কামার, কুমোর, তেলি, মালি প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতির গুরুত্ব। তিনি যুক্তি এবং তথ্যসহ প্রমাণ করেছেন বাঙালি মিশ্রজাতি, তার সংস্কৃতি মিশ্র সংস্কৃতি। দেশজ শব্দবহুল সরল সরস ভাষা আর নিরাসক্তি হরপ্রসাদের প্রবন্ধের বিশেষত্ব। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ-সংকলন 'ভারতমহিলা' (১২৮৭ ব.)। 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের ৫৪৩ সংখ্যক গ্রন্থ), 'বৌদ্ধ ধর্ম' (১৯৪৮)—দুটিই মরণোত্তর প্রকাশনা। হরপ্রসাদ বহু গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। সেগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায়

বৌদ্ধ গান ও দোহা' (১৯১৬)। এ গ্রন্থেই প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাগীতি। যুক্তি তথ্য সমন্বিত জ্ঞানাত্মক প্রবন্ধ রচনায় হরপ্রসাদ বিশেষ কৃতী ছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) রবীন্দ্র-সমকালীন প্রাবন্ধিক হলেও তাঁর প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবই বেশি। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির জন্য আকর্ষক ভাষায় দুরূহ বিজ্ঞান-তথ্যভিত্তিক প্রবন্ধ রচনা তাঁর বিশেষত্ব। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নব জীবন' পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। 'জন্মভূমি', 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'মানসী' ও 'মর্মবাণী', 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়), 'প্রদীপ', 'সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ'—এইসব পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

তাঁর মোট প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা বারো। এদের মধ্যে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-প্রবন্ধের সংকলন 'প্রকৃতি' (১৮৯৬), 'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০), 'জগৎকথা' (১৯২৬)। 'প্রকৃতি'-র চোদ্দোটি প্রবন্ধের অবলম্বন চার্লস রবার্ট ডারউইন (Charles Robert Darwin : ১৭৩১-১৮০২), টমাস হেনরি হাক্সলি (Thomas Henry Huxley : ১৮২৫-১৮৯৫) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের তত্ত্ব। 'বিচিত্র কথা'-য় আছে বাহ্য জগৎ যে বিজ্ঞানের অবলম্বন—এই সত্যের আলোচনা। 'জগৎ কথা'-য় আছে পঁচাত্তরটি পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ। এছাড়া তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ সংকলনেও আছে কয়েকটি বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ। 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬) ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে রচিত। 'যজ্ঞকথা'য় (১৯২০)-য় বৈদিক যজ্ঞের বিভিন্ন অঙ্গের বিবরণ ও বিশ্লেষণ আছে। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম যথাক্রমে 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৫), 'মায়াপুরী' (১৯০০), 'কুর্ম্ম-কথা' (১৯১৩), 'চরিতকথা' (১৯১৩), 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' (১৯১৪), 'শব্দকথা' (১৯১৭), 'নানাকথা' (১৯২৪), 'মায়াপুরী' পরে 'জিজ্ঞাসা'র অন্তর্ভুক্ত হয়। দুরূহ তত্ত্বের যুক্তিমূলক সহজ ব্যাখ্যা রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধের বিশেষত্ব। কোনো কোনো প্রবন্ধে তিনি বিজ্ঞান-তথ্যের সঙ্গে দার্শনিক তত্ত্বের সুষম অন্বয় ঘটিয়েছেন।

বঙ্কিম-বৃত্তের বহির্ভূত অথচ রবীন্দ্র-বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত নন—এরূপ প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) প্রধানত দর্শনভিত্তিক প্রবন্ধই লিখেছেন। তাঁর 'তত্ত্ববিদ্যা' (চার খণ্ড; ১৮৬৬-১৮৬৯) এরূপ প্রবন্ধ সংকলনের নিদর্শন। তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থ 'গীতাপাঠের ভূমিকা' (১৯১৫)।

রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) প্রয়াসে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য সাহিত্যগুণে মণ্ডিত হয়, বিস্তৃত হয় তার পরিসর। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথকে ঘিরেও গড়ে উঠেছিল একটি সাহিত্যবলয়। 'সাধনা' (১৮৯১), 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়) পত্রিকা দুটি সম্পাদনা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। 'হিতবাদী', 'সাপ্তাহিক বসুমতী', 'প্রদীপ', 'নারায়ণ', 'সবুজপত্র' প্রভৃতি সমকালের প্রায় সব পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে ১৯১৪-র প্রথম বিশ্বযুদ্ধ—এই সময় পর্বে বাঙালি জীবনের পরিবর্তন, আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বাঙালি মনের রূপবদল—রবীন্দ্র-প্রবন্ধকে প্রভাবিত করেছিল। 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকার ১২৮৩ বঙ্গাব্দের (১৮৭৬) কার্তিক সংখ্যায় মুদ্রিত 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, দুখ-সঙ্গিনী ও অবসর সরোজিনী' নামের তিনটি গ্রন্থের সমালোচনা-প্রবন্ধটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে বঙ্কিম-প্রভাব প্রকট। তবে রবীন্দ্রনাথ অচিরে সে প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্র-প্রবন্ধ সাহিত্যকে বিষয় অনুসারে মোটামুটি—(ক) সাহিত্যবিষয়ক, (খ) সাহিত্যতত্ত্বমূলক, (গ) সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক, (ঘ) ধর্মভিত্তিক, (ঙ) ভ্রমণ নিবন্ধ, (চ) স্মৃতিচারণা ও (ছ) বিচিত্র বিষয়ক—এই কয়ভাগে বিন্যস্ত করা যায়।

(ক) **সাহিত্য-প্রবন্ধ**—'আলোচনা' (১৮৮৫) ও 'সমালোচনা' (১৮৮৬) রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-বিদেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিক সংক্রান্ত প্রবন্ধের সংকলন। এ দুই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি পরে 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯৩৭) গ্রন্থে সংকলিত হয়। 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭) রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত সাহিত্য-সংক্রান্ত প্রবন্ধের সংকলন। 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭)-এ আলোচিত হয়েছে বাংলার জনসাহিত্য ; প্রবন্ধগুলি প্রায়ই স্বতন্ত্র সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

(খ) **সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধ**—সমকালের সাহিত্য সমালোচনা আর সাহিত্য রচনার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা'। 'সাহিত্য' (১৯০৭), 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬), 'সাহিত্যের স্বরূপ' (১৯৪৩)—তাঁর এরূপ প্রবন্ধের সংকলন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-তত্ত্বের ভিত্তি ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের রসবাদ এবং পাশ্চাত্যের রোমান্টিসিজম্ জাত সাহিত্যতত্ত্ব। কিন্তু সাহিত্যের রূপ ও ভাবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি নিজস্ব বোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন, ফলে সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্ব নামে নতুন এক সাহিত্য-তত্ত্ব।

(গ) **সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিমূলক প্রবন্ধ**—রবীন্দ্রনাথ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে স্বদেশ ও স্ব-সমাজের ত্রুটি বিশ্লেষণ করেছেন কিছু প্রবন্ধে। তাঁর মতে আত্মশক্তির উদ্ভাসেই দেশ ও জাতির যথার্থ স্বাধীনতা লাভ সম্ভব। তার সঙ্গে মিলেছিল তাঁর মানবহিতৈষণা। ফলে বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে তিনি উদাসীন থাকতে পারেননি। 'আত্মশক্তি' (১৯০৫), 'রাজাপ্রজা' (১৯০৮), 'সমাজ' (১৯০৮), 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (১৯১৭), 'কালান্তর' (১৯৩৭) এবং 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১)—গ্রন্থ পঞ্চকে রবীন্দ্রনাথের এই জাগ্রত রাষ্ট্র ও সমাজ-ভাবনার নিদর্শন সংক্রান্ত প্রবন্ধ সমূহ মুদ্রিত হয়েছে।

(ঘ) **ধর্ম-প্রবন্ধ**—ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা ছিল স্বচ্ছ এবং গোষ্ঠীমুক্ত। উপনিষদ-স্বীকৃত ব্রহ্মবাদের প্রাধান্য থাকলেও তাঁর ধর্মচিন্তায় স্ব-উপলব্ধিজাত বিশ্বাসের প্রকাশ লক্ষিত হয়। সে বিশ্বাস মতে মনুষ্যত্বের বিকাশ আর সর্ব মানবের কল্যাণসাধনই যথার্থ ধর্ম। 'ব্রহ্মোপনিষদ' (১৮৯৯), 'ব্রহ্মমন্ত্র' (১৯০০), 'উপনিষদ ব্রহ্ম' (১৯০১), 'ধর্ম' (১৯০৯), 'শান্তিনিকেতন (১ম-৮ম খণ্ড ১৯০৯, ৯ম-১৩শ খণ্ড ১৯১০-১৯১১, ১৪শ-১৭শ খণ্ড ১৯১৫-১৯১৬), 'ধর্মের অধিকার' (১৯১২), 'সঞ্চয়' (১৯১৬), 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩)—তাঁর ধর্মচিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন।

(ঙ) **ভ্রমণ নিবন্ধ**—রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ ভ্রমণকথাই চিঠি ও দিনলিপির আকারে রচিত। পত্রাকারে লিখিত ভ্রমণকথার মধ্যে আছে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১), 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' (১ম ১৮৯১, ২য় ১৮৯৩), 'জাপানযাত্রী' (১৯১৯), 'যাত্রী' (১৯২৯), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১), 'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৯৩৮), 'পথের সঞ্চয়' (১৯৩১)। এইসব ভ্রমণকথামূলক পত্র-নিবন্ধে বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনার সঙ্গে আপন ভাবনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ফলে প্রবন্ধগুলি হয়ে উঠেছে মূল্যবান ও আকর্ষক।

(চ) **আত্মবিশ্লেষণ ও স্মৃতিনিবন্ধ**—'জীবনস্মৃতি' (১৯১২), 'ছেলেবেলা' (১৯৪৩) এবং 'আত্মপরিচয়' (১৯৪৩) এই ধারার প্রবন্ধ গ্রন্থ। প্রথম দুই গ্রন্থে ঘটনামূলক স্মৃতিমন্থন সূত্রে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় কবিসত্তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। 'আত্মপরিচয়' সম্পূর্ণত আত্মভাববিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ।

(ছ) **বিচিত্র বিষয়ক**—ইতিহাস, শিক্ষা, ভাষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'ভারতবর্ষ' (১৯০৬) এবং 'স্বদেশ' (১৯০৮) তাঁর ইতিহাস-প্রবন্ধের সংকলন।

'শিক্ষা' (১৯০৮), 'শিক্ষার মিলন' (১৯২১), 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' (১৯৩৩), 'শিক্ষার বিকিরণ' (১৯৩৩), 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' (১৯৩৬), 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (১৯৪১)—তাঁর শিক্ষাচিন্তা এবং তার বাস্তব রূপদানের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ। বাংলা ভাষা বিষয়ক রবীন্দ্র-প্রবন্ধের সংকলন 'শব্দতত্ত্ব' (১৯০৯), 'ছন্দ' (১৯৩৬) এবং 'বাংলা ভাষাপরিচয়' (১৯৩৮)। বিজ্ঞান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি আগ্রহী ছিলেন। কিছু বিজ্ঞান পরিভাষাও তিনি নির্মাণ করেছিলেন। সাহিত্যলাবণ্য-সমন্বিত 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭) তাঁর বিজ্ঞান-প্রবন্ধের নিদর্শন। 'চারিত্রপূজা' (১৯০৭), 'প্রসাদ' (১৯৩৯) এবং 'মহাত্মা গান্ধী' (১৯৪৮)—তাঁর রচিত জীবনী প্রবন্ধের নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের আত্মভাবনামূলক মন্ময় প্রবন্ধের সংকলন 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৩), 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭), 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৯০৭) এবং 'পরিচয়' (১৯১৬)। এই সংকলনগুলির মধ্যে গঠনকৌশল এবং চিন্তনের গভীর সুষম প্রকাশে অনন্য 'পঞ্চভূত' গ্রন্থটি। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধভাষা উপমাসমৃদ্ধ কাব্যলাবণ্যমণ্ডিত এবং স্বচ্ছ। সময় এবং বিষয় অনুসারে তাঁর প্রবন্ধ ভাষাও পরিবর্তিত হয়েছে। অনুভব-গভীরতা, চিন্তনগাঢ়তা এবং ভাষায় তার সুষম প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে করেছে উজ্জ্বল এবং সুন্দর।

রবীন্দ্র-সমকালের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) বিজ্ঞান বিষয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেগুলি সংকলিত হয়েছে তাঁর একমাত্র প্রবন্ধ-সংকলন 'অব্যক্ত'-এ। এই সংকলনের বিজ্ঞান-প্রবন্ধগুলি জগদীশচন্দ্রের কবিমন, দার্শনিক দৃষ্টি ও বিজ্ঞানীর মন ও দৃষ্টির পরিচায়ক। জটিল বিজ্ঞান-তথ্যের রম্য প্রকাশ তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) ছিলেন একই সঙ্গে বিজ্ঞানী এবং প্রাবন্ধিক। তাঁর বাংলায় লেখা বিজ্ঞান-প্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র দুটি—'প্রাণীবিজ্ঞান' (১৯০৩) এবং 'নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি' (১৯০৬)। সরলতা এবং স্পষ্টতা তাঁর প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য।

জগদানন্দ রায় (১৮৬৮-১৯২৯) সরল সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের প্রায় সব বিভাগ এবং উল্লেখ্য আবিষ্কার বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা আঠারো। সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিজ্ঞানের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর বিজ্ঞান-নিবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) ছিলেন শক্তিমান প্রাবন্ধিক। তবে তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধেরই ভাষা ইংরেজি। পাক্ষিক 'উদ্বোধন' পত্রিকায় তাঁর প্রায় সব বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। 'উদ্বোধন' ভিন্ন 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকাটিও তাঁর পরিচালনায় মুদ্রিত হত। ভারতের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাই বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (১৯০২), 'বর্ত্তমান ভারত' (১৯০৫, মরণোত্তর প্রকাশ), 'ভাববার কথা' (১৯০৭, মরণোত্তর প্রকাশ) গ্রন্থত্রয়ের বিশেষত্ব। মরণোত্তর প্রকাশ 'পরিব্রাজক' (১৯০৫) পাঠরম্য ভ্রমণ নিবন্ধ। প্রবন্ধের বিষয় অনুসারে ভাষার ব্যবহার বিবেকানন্দের প্রবন্ধের বিশেষত্ব। 'বর্ত্তমান ভারত'-এর বলিষ্ঠ সাধুভাষা 'ভাববার কথা'-র বিদ্রূপতীক্ষ্ণ চলিত ভাষা প্রাবন্ধিক বিবেকানন্দের লিখন-কুশলতার পরিচায়ক। তাঁর লেখা বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) রবীন্দ্র-সমকালীন হলেও ছিলেন রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত মননশীল প্রাবন্ধিক। স্বসম্পাদিত 'সবুজ পত্র' পত্রিকা তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তার পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র ছিল। চলিত ভাষার মার্জিত, মননদীপ্ত তির্যক ব্যঙ্গমিশ্রিত প্রয়োগ; বিষয়ের নিরাসক্ত যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণাত্মক উপস্থাপন এবং বিতর্কপ্রবণতা তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। 'বীরবল' ছদ্মনামে তিনি কয়েকটি শ্লেষাত্মক প্রবন্ধও লিখেছিলেন। একটি আত্মস্মৃতিসহ তাঁর প্রবন্ধ সংকলনের সংখ্যা তেরো। এগুলির মধ্যে 'তেল-নুন-লকড়ী' (১৯০৬), 'দু-ইয়ারকি' (১৯২১), 'রায়তের কথা'

(১৯২৬), 'ঘরে বাইরে' (১৯৩৬)—তাঁর রাষ্ট্রনীতি ও সমাজসমস্যা বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। 'নানা চর্চা' (১৯৩২), 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' (১৯৪০)-এ তাঁর ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধগুলি স্থান পেয়েছে। 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭) এবং 'বীরবলের টিপ্পনী' (১৯২১) ভাষা, সাহিত্য এবং বিবিধ বিষয়ক ব্যঙ্গাশাণিত প্রবন্ধের সংকলন। 'আত্মকথা' (১৯৪৬) প্রমথ চৌধুরীর স্মৃতিনিবন্ধের নিদর্শন।

বুদ্ধিনির্ভর আঙ্গিক-সচেতন প্রবন্ধের একটি ধারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। এই ধারায় পরবর্তী স্মরণীয় প্রাবন্ধিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং গোপাল হালদারের আবির্ভাব।

প্রখ্যাত গবেষক দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) কবিত্বময় সহজ ভাষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আবেগ ও যুক্তির মিশ্রণ তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৫) এবং 'বৃহৎ বঙ্গ' (১ম ও ২য় খণ্ড ১৯০৫)। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে উল্লেখ্য গ্রন্থ 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' (১৯২২), 'পদাবলী মাধুর্য্য' (১৯৩৭), 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান' (১৯৪০)।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯) বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রবীন্দ্রানুসারী হলেও ভাষা ও বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি নিজস্বতার পরিচয় দিতে পেরেছেন তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব আত্মমগ্নতা। তিনিই প্রথম বাংলায় ভারতীয় চিত্রশিল্প বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। বাংলার প্রথা ও আচার সম্বন্ধেও তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ 'বালক', 'ভারতী ও বালক' এবং 'সাধনা' পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। তাঁর একমাত্র প্রবন্ধ সংকলন 'চিত্র ও কাব্য' (১৮৯৪)।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন (১৮৬৮-১৯৪২) রবীন্দ্র-সমকালের কৃতী দার্শনিক-প্রবন্ধকার। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের নিবিড় পাঠ তাঁর প্রবন্ধকে করেছে সুবোধ্য। শাস্ত্রীয় বিষয়কে যুক্তিসম্মত চিন্তনশক্তি সহায়ে স্বচ্ছতা দান এবং মননদীপ্ত আকর্ষক ভাষা তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত চোদ্দোটি প্রবন্ধ-সংকলনের রচয়িতা হীরেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' (১৯০৫)।

বিশিষ্ট চিত্রকার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫০) চিত্র এবং শিল্প এবং শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে সজীব সাবলীল ভাষায় বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর এসব প্রবন্ধের সংকলন যথাক্রমে 'ভারতশিল্প' (১৯০৯), 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' (১৯৪১), 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' (১৯৪৭) এবং 'ভারতশিল্পে মূর্তি' (১৯৪৭)। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক' রূপে প্রদত্ত উনত্রিশটি শিল্পতত্ত্ব সংক্রান্ত বক্তৃতার সংকলন 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'। 'বাংলার ব্রত' নামের ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পুস্তিকায় তিনি মনোজ্ঞ ভাষায় বাংলার মেয়েলি ব্রতের ও আলপনার বিশ্লেষণ করেছেন। 'ঘরোয়া' (১৯৪১) 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (১৯৪৪) এবং 'আপন কথা' (১৯৪৬) তাঁর স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধের নিদর্শন। সহজ অথচ কাব্যময় ভাষায় বিষয় উপস্থাপন অবনীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিশেষত্ব।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (১৮৭৯-১৯৪০) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ছাব্বিশটি ভাষা জানতেন। কোশ-গ্রন্থ প্রণেতা, সাময়িক-পত্র সম্পাদক অমূল্যচরণ দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, সংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব এবং সাহিত্য বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। চিন্তনগাঢ় প্রবন্ধের রচয়িতা অমূল্যচরণের প্রবন্ধের বিশেষত্ব প্রামাণ্য তথ্যের যথাযথ সন্নিবেশ এবং নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। সহজবোধ্য স্পষ্ট ভাষা তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। গবেষণামূলক

প্রবন্ধরচয়িতা ভারততত্ত্ববিদ প্রাবন্ধিক অমূল্যচরণকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উত্তরপুরুষ বলা যায়। তাঁর দুটি প্রবন্ধ সংকলন 'প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য' (১৯৬২) এবং 'ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা' (১৯৬৫) মরণোত্তর প্রকাশনা।

অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮) শিক্ষা, সমাজসমস্যা, ধর্ম—বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচক হিসেবেই তিনি খ্যাত। তাঁর প্রবন্ধের প্রকরণ ও ভাষায় ঈষৎ রবীন্দ্র-প্রভাব আছে। কাব্যময় ভাষা, বক্তব্যের স্পষ্টতা এবং প্রকাশমাধুর্য অজিতকুমারের প্রবন্ধের বিশেষত্ব। তাঁর আটটি প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে আছে জীবনী গ্রন্থ 'খৃষ্ট' (১৯১১), 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৯১৬), 'রাজা রামমোহন' (১৯১৭)। 'রবীন্দ্রনাথ' (১৯১২) এবং 'কাব্যপরিক্রমা' (১৯১২) তাঁর রবীন্দ্র-সমালোচনা প্রবন্ধের সংকলন। 'লোকহিতের আদর্শ' (১৯১৪) সমাজ কেন্দ্রিক প্রবন্ধের সংকলন। 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' (১৯১১) শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয় সম্পর্কিত প্রবন্ধ-গ্রন্থ এবং 'বাতায়ন' (১৯১৩) সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম বিষয়ক দশটি প্রবন্ধের সংকলন। রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে অজিতকুমার গভীর সাহিত্যবোধ ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

একক ১ ❑ ভেজাল ও নকল ঃ রাজশেখর বসু

১.০ প্রবন্ধ—'ভেজাল ও নকল'—রাজশেখর বসু

১.২ প্রাবন্ধিক পরিচিতি

১.৩ প্রবন্ধ সংক্ষেপ

১.৪ প্রবন্ধ বিশ্লেষণ

১.০ প্রবন্ধ—'ভেজাল ও নকল'—রাজশেখর বসু

নন্দ গোয়ালা দুধে খুব জল দিচ্ছে। আপত্তি জানালে আকাশ থেকে পড়ে উত্তর দিলে, বলেন কি বাবু, আপনি পুরনো খদ্দের আপনাকে কি ঠকাতে পারি? পাপ হবে যে।

বললাম, দেখ নন্দ দুধে অল্প স্বল্প জল থাকলে আমি কিছুই বলি না, কিন্তু এখন বাড়াবাড়ি হচ্ছে। তোমার সঙ্গে আমার বহুকালের সম্পর্ক। সত্যি কথা বলে ফেল।

নন্দ লোকটি সজ্জন। মাথা চুলকে বললে, আজ্ঞে সের পিছু মোটে আধ পো জল দিই, পরিষ্কার কলের জল। আমার কাছে তঞ্চকতা পাবেন না।

—নন্দ, আর একটু সত্যি করে বল।

—আজ্ঞে, এক পোর বেশী জল কোন দিন দিই না, আমার এই গলার কণ্ঠির দিব্যি।

এবারে বোধ হল নন্দ সত্য কথা বলেছে। জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা, একেবারে খাঁটী দুধ কি দরে দিতে পার?

—আজ্ঞে, টাকায় তিন পো দিতে পারি।

—বারবার খাঁটী দেবে তো? হাত সুড়সুড় করবে না?

—তা কি বলা যায় হুজুর? মাঝে মাঝে একটু জল না দিলে চলবে কেন, গরীব লোক।

—আচ্ছা, যদি সরকার আইন করে দেয় যে দুধের দাম যতপার বাড়াতে পার কিন্তু জল একদম দিতে পারব না, দিলে মোটা জরিমানা বা জেল হবে, তা হলে কি করবে?

—তা হলে তো ভালই হবে বাবু। টাকায় আধ সের হলে আমাদের লাভ বাড়বে।

—কিন্তু নামজাদা ডেয়ারির খাঁটী দুধ তো টাকায় এক সের পাওয়া যায়।

—অবজ্ঞার হাসি হেসে নন্দ বললে, খাঁটী কোথায়, মোষের দুধে জল মিশিয়ে দেয়।

—আচ্ছা, টাকায় আধ সের হলে তুমি আর জল মেশাবে না তো?

নন্দ ঘাড় নীচু করে হাসতে লাগল।

—মনের কথা বলে ফেল নন্দ।

—তবে বলি শুনুন বাবু। সুবিধে মতন জল দিতেই হবে, এ হল ব্যবসার দস্তুর। আবার ইনস্পেক্টারকে খাওয়াতে হবে, মাঝে মাঝে জরিমানাও দিতে হবে। ছা-পোষা গরীব মানুষ, এ সব খরচ যোগাতে হবে তো!

এইবারে ব্যাপারটি বোধগম্য হল। ব্যবসার দস্তুর অনুসারে গোয়ালা সনাতন প্রথায় যথাসম্ভব জল দেবেই। যতই ইনস্পেক্টার থাকুক, শহরের সমস্ত দুধ পরীক্ষা করা অসাধ্য। অবশ্য মাঝে মাঝে ভেজাল ধরা পড়বে, তখন ইনস্পেক্টারকে খুশী করতে হবে, সে বিমুখ হলে জরিমানাও দিতে হবে। অতএব এইসব সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের জন্যে আরও জল দিতে হবে। দাম বাড়ালে বা আইন করলে বা অনেক ইনস্পেক্টার রাখলেও সর্বদা নির্জল দুধ মিলবে না। কয়েকজন ভাগ্যবান যাঁরা নিজের চোখের সামনে দুইয়ে নিতে পারেন তাঁদের কথা আলাদা।

শিউরাম পাঁড়ে এক কালে আমার বাড়িতে রাঁধত, এখন স্বাধীন ব্যবসা করে। একদিন একটা টিন এনে বললে, বাবু, বঢ়িয়া ভঁইসা ঘিউ আনিয়েছি, সস্তা আছে, ছে টাকা সের, লিয়ে লিন।

ঘি খুব সাদা, শক্ত, একটু গন্ধও আছে। জিজ্ঞাসা করলাম ভেজাল কতটা দিয়েছ?

—বনস্পতি? আরে রাম রাম।

—দেখ পাঁড়ে, তোমার টিকি আছে, জনেউ আছে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর কপালে তিলকও আছে। মিথ্যা বলো না পাপ হবে।

শিউরাম সহাস্যে বললে, গাঁওসে আনিয়েসি, গোয়ালা কি করিয়েসে সে তো মালুম নহি। বাকী সে ভালা আদমী সেরে আধ পোয়ার বেশী মিশাবে না।

—তার পর তুমি কত মিশিয়েছ?

—সচ বাত বলছি বাবু, হামি সেরে এক পৌয়া মিশিয়েছি।

—চেহারা আর গন্ধ দেখে মনে হচ্ছে সেড়ে সাড়ে তিন পোয়ার বেশী ভেজাল আছে। এ রকম ঘি আমি নিজেই বানিয়ে নিতে পারি, তাতে সওয়া তিন টাকায় এক সের হবে।

—এ ছিয়া ছিয়া! আপনে ভেজাল ঘিউ বানাবেন?

—দোষ কি, বেচব না তো। সজ্ঞানে নিজেরাই খাব।

দুধ-ঘিএর কালবাজার নেই, ভেজাল দিয়েই লাভ করতে হয়। নকল দুধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি তাই যথাসম্ভব জল মেশানো হয়। ঘি এর নকল আছে, কিন্তু শিউরাম পাঁড়ের বিদ্যা কম, তার ভেজাল সহজেই বোঝা যায়, স্বাভাবিক ঘিএর মতন রং নয়, বেশী জমাট, গন্ধ অতি কম। সেকালে যখন চর্বির ভেজাল চলত তখন চেহারা আর গন্ধ খাঁটী ভঁয়সা ঘিএর সঙ্গে অনেকটা মিলত। আজকাল ওস্তাদ ঘি-ব্যবসায়ীরা একটু নরম ঘন তেল (hydrogenated oil) কিনে তাতে ঈষৎ হলদে রং এবং রাসায়নিক গন্ধ মিশিয়ে বেচে। ঘিএর এসেন্স বাজারে খোঁজ করলেই পাওয়া যায়। তার গন্ধ অতি তীব্র, একটু পচা ঘিএর মতন এক সেরে কয়েক ফোঁটা দিলেই সাধারণ ক্রেতাকে ঠকানো যায়। সরষের তেলের এসেন্স আরও ভাল, রাই সরষের মতন প্রচণ্ড ঝাঁজ। চীনাবাদাম তিল তিসি—যে তেল যখন সস্তা, তাতে অতি অল্প এসেন্স দিলেই কাজ চলে। যাদের সাহস বেশী তারা আরও সস্তায় সারে, অপাচ্য প্যারাফিন বা মিনারল অয়েলে অল্প গন্ধ দিয়ে বেচে। সরষের সঙ্গে শেয়ালকাঁটা বীজের মিশ্রণ সম্ভবত ইচ্ছাকৃত নয়।

মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখা যায় ভেজাল ঘি তেল বেচার জন্য আদালতে অমুক অমুক লোকের জরিমানা হয়েছে। যাদের নাম ছাপা হয় তারা প্রায় অখ্যাত দোকানদার। যারা বড় কারবারী তারা কদাচিৎ দণ্ড পেলেও তাদের নাম প্রকাশিত হয় না, রিপোর্টারদের ঠাণ্ডা করতে তারা জানে। যদি সমস্ত দণ্ডিত লোকের নাম সরকারী বিজ্ঞাপনে নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করা হয়, তবে বদনাম আর খরিদ্দার হারাবার ভয়ে ভেজাল-কারবারীরা কতকটা শাসিত হতে পারে। সরকারী কর্তারা যদি এইটুকু ব্যবস্থাও না করতে পারেন তবে লোকে তাঁদেরও সন্দেহ করবে।

রেশনে যে বিদেশী ময়দা পাওয়া যায় তা আমাদের চিরপরিচিত ময়দার সঙ্গে মেলে না, লুচি বেলবার সময় রবারের মতন টান হয়। এই স্থিতিস্থাপকতা কি কানাডা-অস্ট্রেলিয়ার ময়দার স্বাভাবিক ধর্ম, না কিছু মেশানোর জন্য? সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন করা কর্তাদের উচিত। আটা কি শুধু গম-যবের মিশ্র থেকে তৈরি হয়, না অন্য শস্যও তাতে থাকে? রেশনের আটায় ভুসির পরিমাণ অত্যধিক। কোথা থেকে তা আসে? চালের সঙ্গে অনেক সময় এত পাথর কুচি আর ভুসি পাওয়া যায় যে তাকে স্বাভাবিক বলা চলে না। এই ভেজাল কোথায় দেওয়া হয় তার খবর সরকারী কর্তারা নিশ্চয় রাখেন। তাঁরা কি প্রতিকারে অসমর্থ, না ওজন বাড়াবার জন্যই ভেজালে আপত্তি করেন না? অনেক রেশনের দোকানে ভাল চালের বস্তা আড়ালে থাকে, বাছা বাছা খদ্দেরকে দেওয়া হয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও আটার কলে বিস্তর সোপ স্টোন পাওয়া গিয়েছিল, কয়েক গাড়ি তেঁতুল-বিচিও একবার আটক করা হয়েছিল। এই সব খবর সাড়ম্বরে খবরের কাগজে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তার পরেই চুপ। অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করলে কি ক্ষতি হত? গুজবের উপর জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস। ছেলেধরা শিল-নোড়ার বসন্ত রোগ, কেরোসিন তেলে জল, কলের জলে সাপ, প্রভৃতি নানারকম গুজবে লোকে খেপে ওঠে। খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণকে নিশ্চিন্ত করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

নিত্য ব্যবহার্য বহু জিনিসের ভেজাল বা নকল দেখা যায়। অসময়ে বাজারে স্তুপাকার সবুজ মটরের দানা বিক্রি হয়। শুখনো মটর সবুজ রঙে ছুবিয়ে বস্তাবন্দী করা হয়। পাইকাররা সেই রঙিন মটর আড়ত থেকে কেনে এবং দরকার মতন জলে ভিজিয়ে ফুলিয়ে বিক্রি করে। অজ্ঞ লোকে তা কাঁচা মটরশুঁটির দানা মনে করে কেনে। যে রং দেওয়া হয় তা বিষ কি অবিষ কেউ ভাবে না। মিউনিসিপালিটি উদাসীন, মার্কেটে অধ্যক্ষদের সামনেই এই বিক্রি হয়। মিষ্টান্নেও নানারকম রং থাকে, তা নির্দোষ কিনা দেখা হয় না। ময়রাকে যদি বলা হয়—রং দাও কেন? সে উত্তর দেন খদ্দের যে রং না থাকলে কেনে না। কথাটা সত্য নয়। রঙের প্রচলন ময়রার বুদ্ধিতেই হয়েছে। নির্বোধ খদ্দের মনে করে রং থাকাটাই দস্তুর বা ফ্যাশন-সংগত। পাশ্চাত্ত্য দেশে খাদ্যের রং বিশেষ বিশেষ নির্দোষ রঙের বিধান আছে, অন্য রং দিলে দণ্ড হয়। এদেশে যত দিন তেমন ব্যবস্থা না হয় তত দিন খাবারে রং দেওয়া একেবারে বন্ধ করা কর্তব্য। সরকারী আর মিউনিসিপাল কর্তাদের উচিত বার বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে সাধারণকে সতর্ক করা।

চায়ের দোকানে এবং হোটেলে যে চায়ের ছিবড়ে জমা হয় তা শুকিয়ে অন্য চায়ের সঙ্গে ভেজাল দেওয়া হয়। এলাচ লবঙ্গ দারচিনি থেকে অল্পাধিক আরক (essential oil) বার করে নেবার পর বাজারে ছাড়া হয়। সব চেয়ে বেশী ভেজাল আর নকল চলছে ঔষধে। কুইনিন এমেটিন আড্রেনালিন প্রভৃতির লেবেল দেওয়া জাল ঔষুধে বাজার ছেয়ে গেছে। শিশি-বোতল-ওয়ালারা বিখ্যাত দেশী ও বিলাতী ঔষধ এবং প্রসাধন দ্রব্যের খালি শিশি ও টিন বেশী দাম দিয়ে গৃহস্থের বাড়ি থেকে কেনে, জালকারী তাতেই ছাইভস্ম পুরে বিক্রি করে। অনেক গৃহস্থ জেনে শুনে এই পাপ ব্যবসায়ে সাহায্য করে। পাকিস্তানেও এই কারবার অবাধে চলছে।

ভেজাল ও নকল এ দেশে নূতন নয়। দেশী বিক্রেতার সাধুতায় আমাদের এতই অনাস্থা যে অনেক ক্ষেত্রে খাঁটি জিনিসের জন্য 'সাহেব-বাড়ি'র দ্বারস্থ হতে হয়। এই জাতিগত নীচতায় আমরা গ্লানি বোধ করি না। যুদ্ধের পর এবং স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে যে মহাকলিযুগের আরম্ভ হয়েছে তাতে সর্বপ্রকার দুষ্ক্রিয়া বেড়ে গেছে। সম্পূর্ণ প্রতিকার সরকারের সাধ্য নয়। জনসাধারণের অধিকাংশেরই সামাজিক কর্তব্যবোধ কম, একজোট হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার উৎসাহ নেই। সম্প্রতি আমাদের দেশে অনেক বীরপুরুষের উদ্ভব হয়েছে। এরা ট্রাম বাস পোড়ায়, বোমা ফেলে, পুলিসকে মারে মান্যগণ্য লোককে আক্রমণ করে, শ্রমিক ও স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েদের খেপায়, কিন্তু ভেজাল নকল কালো-বাজার প্রভৃতি দুষ্কর্ম সম্বন্ধে পরম নির্বিকার। শুধু অশান্তির প্রসারই এদের কাম্য। কোনও অনাচার যখন দেশব্যাপী হয় এবং সাধারণে নির্বিবাদে তা মেনে নেয় তখন অল্প কয়েকজন সমাজহিতৈষীর উদ্যোগেই তার প্রতিকার আরম্ভ হতে পারে। সতীদাহ-নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্তন, পরাধীনতার বিলোপ প্রভৃতি এইপ্রকারে হয়েছে। ভেজাল ও নকল নিবারণের জন্য কয়েকজন নিঃস্বার্থ উৎসাহী লোকের প্রয়োজন। তারা যদি প্রচার দ্বারা সাধারণকে উদ্‌বোধিত করেন এবং বিশুদ্ধ জিনিষ বেচার জন্য সমবায়-ভাণ্ডার খোলেন তবে দাম বেশী নিলেও ক্রমশ সাধারণের আনুকূল্য পাবেন। তাঁদের প্রভাবে ব্যবসায়ীরাও তাদের দস্তুর বদলাতে বাধ্য হবে।

দুর্ভিক্ষের সময় বিশ্বামিত্র প্রাণরক্ষার জন্য কুকুরের মাংস খেয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের অভ্যস্ত অন্নের অভাব হলে অন্য জিনিস খুঁজতেই হবে, নিকৃষ্ট খাদ্যে তুষ্ট হতে হবে। জনসাধারণ অনভ্যস্ত খাদ্যে সহজে তাদের প্রবৃত্তি হয় না। যাঁরা ধনী ও জ্ঞানী তাঁদের কর্তব্য নূতন বা নিকৃষ্ট খাদ্য নিজে খেয়ে সাধারণকে উৎসাহ দেওয়া। সরকার এইরূপ খাদ্যের উপযোগিতা প্রচার করবেন, কিন্তু অত্যুক্তি আর মিথ্যা উক্তি করবেন না, তাতে বিপরীত ফল হবে। মিথ্যা প্রিয় বাক্যের চাইতে অপ্রিয় সত্য ভাল। কয়েক বৎসর পরে কোনও খাদ্যবিশারদ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে শীঘ্রই ঘাস থেকে সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত হবে। সরকার যদি এ রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রচারের প্রশ্রয় দেন তবে সাধারণের শ্রদ্ধা হারাবেন। চাল আটা দুর্লভ হলে লাল-আলু টাপিওকা প্রভৃতির উপযোগিতা প্রচার করা হবে; সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে যে চাল-আটার সমান পুষ্টিকর না হলেও এইসব খাদ্যে জীবনরক্ষা হয়, স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কাও বিশেষ কিছু নেই; খরচ বেশী পড়তে পারে, কিন্তু এই দুঃসময়ে গত্যন্তর নেই।

সম্প্রতি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সরকারী খবর প্রকাশিত হয়েছে যে কোন এক ল্যাবরেটারিতে ভুট্টা টাপিওকা ইত্যাদি থেকে সিন্থেটিক চাল তৈরির চেষ্টা সফল হয়েছে। আজকাল অনেক রাসায়নিক দ্রব্য কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হচ্ছে, যেমন নীল (ইন্ডিগো), কর্পূর, মেন্থল। কিন্তু রাসায়নিক বা অন্যবিধ কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় কোনও শস্য ফল বা প্রস্তুত করা এখনও বিজ্ঞানের অসাধ্য। আমড়া থেকে আম, অথবা ব্যাঙ থেকে মাছ তৈরি যেমন অসম্ভব, ভুট্টা-টাপিওকা থেকে চাল তৈরি সেইরকম। সরকার যে বস্তুর কথা বলেছেন তাকে সিন্থেটিক রাইস বললে সত্যের অপলাপ হয়, তা ইমিটেশন রাইস বা নকল চাল, যেমন সোনার নকল কেমিক্যাল সোনা। টাপিওকা থেকে যেমন নকল সাবুদানা তৈরি হয়, সম্ভবত সেইরকম পদ্ধতিতে চালের মতন দানা তৈরি হচ্ছে, হয়তো প্রোটিনের মাত্রা সমান করবার জন্য কিছু চীনাবাদামের গুঁড়োও মেশানো হয়েছে। দেখতে চালের মতন হলে হয়তো দরিদ্র লোককে ভোলানো যেতে পারবে, খেলে পেটও ভরবে, কিন্তু এই জিনিসের গুণ চালের সমান হবে না। সরকারী প্রচারে অসতর্ক উক্তি একবারে বর্জন করতে হবে। সত্যমেব জয়তে—এই রাষ্ট্রীয় মন্ত্রের মর্যাদাহানি যেন কদাপি না হয়।

১.২ প্রাবন্ধিক পরিচিতি ঃ রাজশেখর বসু (১৬.৩.১৮৮০-২৭.৪.১৯৬০)

বাংলা সাহিত্যে পরশুরাম হিসেবে খ্যাত রাজশেখর বসুর বাবা ছিলেন দ্বারভাঙ্গা রাজ এস্টেটের ম্যানেজার এবং দার্শনিক পণ্ডিত। নাম চন্দ্রশেখর বসু। রাজশেখর বসুর ছোটবেলাও কেটেছে দ্বারভাঙ্গায়, সেখানকার রাজস্কুল থেকে এণ্ট্রান্স ও পাটনা কলেজ থেকে এফ. এ. পাস করে কলকাতায় চলে আসেন, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে। তখনো এম.এস.সি চালু না হওয়ায় রসায়ন নিয়ে এম.এ. পাস করেন ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে। এরপর বি. এল. পাশ করে কিছুদিন আইন ব্যবসা করেছেন। ১৯০৬ খ্রীঃ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যখন গঠিত হয়, তখন তাতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯০৩ খ্রীঃ বেঙ্গাল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে সামান্য বেতনে নিযুক্ত হলেও পরবর্তী কালে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হন। একদিকে গবেষণার কাজ অন্যদিকে ব্যবসা পরিচালনা—উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। রসায়ন ও শরীরবিদ্যার মধ্যে যোগ স্থাপন করে তিনি এক নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি রসরচনার জন্যই মূলতঃ বিখ্যাত। তুলনায় বেশী বয়সে সাহিত্য জীবন শুরু হলেও 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী' ও 'হনুমানের স্বপ্ন' গ্রন্থ বাংলার রসিক মহলকে আলোড়িত করেছিল। রসরচনা ছাড়াও ও 'লঘুগুরু', 'বিচিন্তা', 'ভারতের কুটির শিল্প' নামে প্রবন্ধ গ্রন্থাদিও বিখ্যাত। ১৯৩৭ খ্রীঃ তাঁর অসামান্য কীর্তি বাংলা অভিধান 'চলন্তিকা' প্রকাশিত হয়। তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বাল্মীকি রামায়ণ', 'মহাভারত', 'মেঘদূত' প্রভৃতি। তাঁর রচিত মোট গ্রন্থের সংখ্যা একুশ।

তবে বঙ্কিম থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রবন্ধ সাহিত্যের যে ধারা সেখানে রাজশেখর বসু তেমন আলোচিত নাম নয়, এর কারণ হয়তো প্রথমতঃ হাস্যরস রচয়িতার সত্তা তাঁর ক্ষেত্রে সবথেকে বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তাঁর স্বল্প সংখ্যক প্রবন্ধ গ্রন্থ (কেবল তিনটি)। তবে প্রধান কারণ হল, প্রবন্ধে রস যুক্ত হলে যে বিশিষ্ট রূপ লাভ করে তা তাঁর প্রবন্ধে তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায় না। সাধারণভাবে প্রবন্ধ প্রয়োজনের কথায় পূর্ণ থাকলেও মাঝে মাঝে অপ্রয়োজনের রস সৃষ্টি করা হয়, যা প্রবন্ধের গুরুগম্ভীর বিষয়কেও পরম আস্বাদ্য করে তোলে। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর এই শ্রেণির প্রবন্ধকার। তাই হয়তো রাজশেখরের নিজের স্বীকৃতিও শোনা যায় যে, যে অর্থে রামেন্দ্রসুন্দর, ক্ষিরোদপ্রসাদ বিজ্ঞানী হয়েও সাহিত্যিক। সেই অর্থে তিনি সাহিত্যিক নন। প্রবন্ধের ধর্ম হচ্ছে, তার মধ্যে দিয়ে কোনো বিষয় সম্পর্কে লেখকের আত্মোপলব্ধির প্রকাশ ঘটে। কিন্তু রাজশেখরের সমস্ত সাহিত্য-সর্জনা তাঁর বৃহত্তর কর্মসম্পাদনার নামান্তর। প্রবন্ধ রচনাও তাঁর একই কর্মের অভিমুখী এবং তা হচ্ছে, সমাজ ও দেশের মানুষের অজ্ঞানতা-কুসংস্কার, ভ্রান্তি দূর করা ও পরানুকরণ দ্বারা মানুষ যে বিজাতীয় আচার আচরণের মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে অধোগামী করে, তার সংশোধন করা। ফলে তাঁর প্রবন্ধগুলি প্রয়োজনের কথায় পূর্ণ। তবে ভাষা ব্যবহারে তিনি ছিলেন একজন সচেতন শিল্পী, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি তাঁর প্রবন্ধগুলি লিখেছেন।

১.৩ প্রবন্ধ সংক্ষেপ ঃ

গোয়ালা দুধে জল মেশায়। প্রাবন্ধিকের আপত্তিতে প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে নিজের দোষ স্বীকার করে বলে যে, একটু অতিরিক্ত লাভের আশায় সে এই কাজ করে। প্রাবন্ধিকের উৎসাহে সে এই তথ্যও জানায় যে শুধু গোয়ালারাই নয়, নামকরা ডেয়ারি খাঁটি দুধ বলে যা বিক্রি করে, তা আসলে মোষের দুধে জল মেশানো দুধ। গোয়ালার

কথোপকথন শেষে প্রাবন্ধিক এই সত্যে পৌঁছন যে, ব্যবসার নিয়ম অনুযায়ী গোয়ালা সনাতন প্রথায় দুধে জল মেশাবেই। দাম বাড়িয়ে, আইন করে, খাদ্য তদারক (ইন্সপেক্টর) নিয়োগ করেও নির্জলা দুধ পাওয়া যাবে না। গুটিকয় ভাগ্যবান, যারা নিজের সামনে দুধ দুইয়ে নিতে পারেন তাদের কথা আলাদা।

বাড়ীর প্রাক্তন রান্নার ঠাকুর শিউরাম পাঁড়ে একদিন ঘি বিক্রি করতে এলে ঘি দেখে প্রাবন্ধিকের সন্দেহ হয় যে এতে ভেজাল আছে কারণ ঘি খুব সাদা, শক্ত ও একটু গন্ধযুক্ত। সন্দেহ প্রকাশ করলে শিউরাম অস্বীকার করলেও পরে বলে সে এবং গোয়ালা মিলিয়ে এক সেরে (কিলো) দেড় পোয়া (১ পোয়া = ২৫০ গ্রাম) মিশিয়েছে। প্রাবন্ধিকের সন্দেহ সেরে তিন পোয়ার বেশী ভেজাল আছে। এই রকম ভেজাল ঘি প্রাবন্ধিক নিজেই বানানোর প্রস্তাব দিলে লজ্জায় শিউচরণ আপত্তি জানায়।

দুধ-ঘি এর কালোবাজার না থাকায় ভেজাল দিয়েই লাভ করতে হয়। শিউরাম পাঁড়েদের বুদ্ধি কম বলে তাদের ঘি দেখলে ভেজাল বোঝা যায়, কিন্তু যারা বড় ঘি ব্যবসায়ী তারা নরম ঘন তেল (hydrogenated oil) এর সঙ্গে কিছুটা হলুদ রং ও ঘি এর এসেন্স মিশিয়ে ঘি বলে বিক্রি করে। বাদাম, তিসি ইত্যাদি সস্তা তেল, আবার কখনো প্যারাফিন বা মিনারেল অয়েলের সঙ্গে ও এসেন্স দিয়ে সর্ষের তেল বলে বিক্রি করা হয়। সংবাদপত্রে কখনো ভেজাল কারবারীদের নাম ছাপা হলেও তারা নেহাতই ছোট দোকানদার। বড় কারবারীদের নাম সংবাদপত্রে ছাপে না। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে সমস্ত ভেজাল কারবারীদের নাম ছাপতে পারলে ভেজাল কারবারীরা কিছুটা ভয় পেতে পারে। রেশনে যে বিদেশী ময়দা বিক্রি হয়, তাতেও ভেজাল আছে বলে প্রাবন্ধিকের সন্দেহ। রেশনের আটার ভুসি, চালের পাথরকুচি ইত্যাদি ভেজাল কোথায় মেশানা হয় তা সরকারী কর্তাদের অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু এসব বন্ধে তাদের দিক থেকে উদ্যোগ নেই। আটার কলে সোপ স্টোন বা তেঁতুল বিচি আটক করার খবর একবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেও এ নিয়ে পরে আর কিছু জানা যায় নি। খাদ্যে ভেজাল বন্ধে সরকারী উদ্যোগ জনগনকে জানানো উচিত।

নিত্য ব্যবহার্য বহু জিনিসের মধ্যেই ভেজাল দেখা যায়, অসময়ে শুকনো মটরকে যে সবুজ রঙে ছুপিয়ে টাটকা বলে বিক্রি করা হয়, মিষ্টিতে যে রং ময়রারা ব্যবহার করে তা বিষ কিনা কেউ ভাবে না। নির্বোধ খদ্দের সেই রং দেখেই আকৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্যে খাদ্যে নির্দোষ রঙের বদলে অন্য কিছু ব্যবহার করলে দন্ড হয়। এখানেও সরকারের উচিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে সাধারণকে সতর্ক করা। চায়ের দোকানের চা পাতা থেকে শুরু করে এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, সবেতেই ভেজাল। তবে সবথেকে বেশী ভেজাল ওষুধে, কুইনিন, এমেটিন, আড্রেনালিন প্রভৃতি বিভিন্ন ওষুধ ও প্রসাধন দ্রব্যের পুরনো সিসি গৃহস্থ বাড়ী থেকে কিনে নিয়ে তাতে ভেজাল দিয়ে আসল বলে বিক্রি হয়। পাকিস্তানেও একই জিনিস চলছে। কিছু গৃহস্থ সচেতনভাবেই এই ব্যবসায় সাহায্য করে।

বহুদিনের ভেজাল ব্যবস্থার ফলে দেশীয় বিক্রেতাদের প্রতি আমাদের এতই অনাস্থা জন্মেছে যে খাঁটি জিনিসের জন্য আমরা বিদেশী দোকানের দ্বারস্থ হই। স্বাধীনতার পরে সমস্ত দুষ্কর্ম আরো বেড়েছে। সরকারের সামর্থ নেই সম্পূর্ণ প্রতিকারের। অসচেতনতার ফলে জনগণও ঐক্যবদ্ধ নয়। সম্প্রতি কিছু মানুষ ট্রাম-বাস পুড়িয়ে, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন করছে। কিন্তু তারা ভেজাল, কালোবাজার নিয়ে নির্বিকার। দেশব্যাপী অনাচার সাধারণ মানুষ নির্বিবাদে মেনে নিলেও কিছু সমাজহিতৈষীর উদ্যোগে তার প্রতিকার আরম্ভ হতে পারে, যেমন সতীদাহ-নিবারণ, স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তন, পরাধীনতার বিলোপ প্রভৃতি ঘটেছে। ভেজাল নিবারণেও কিছু নিঃস্বার্থ সমাজহিতৈষীর প্রয়োজন, যারা জনগনকে সচেতন করবেন ও বিশুদ্ধ জিনিস বিক্রির জন্য সমবায় ভাণ্ডার খুলবেন। তবেই বাধ্য হয়ে ব্যবসায়ীরা বহুদিনের অভ্যাস বদলাবে।

অভ্যস্ত খাবারের অভাব হলে, তুলনায় নিকৃষ্ট হলেও আমাদের বিকল্প খাদ্যের খোঁজ করা উচিত। জনগন প্রাথমিকভাবে এই ধরনের খাবার খেতে অস্বীকৃত হবে। জ্ঞানী ব্যক্তিদের এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হওয়া উচিত। সরকারের উচিত লাল-আলু, টাপিওকা এ ধরণের খাদ্যের উপযোগিতা প্রচার করা। কিন্তু অত্যুক্তি করলে বিপরীত ফল হবে। বলা উচিত এগুলি চাল-আটার সমান পুষ্টিকর না হলেও এগুলিতে জীবনরক্ষা হয় এবং স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কাও নেই।

সরকারি খবরে প্রকাশিত হয়েছে যে, কোনো এক গবেষণাগারে ভুট্টা, টাপিওকা ইত্যাদি থেকে সিন্থেটিক চাল তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এটি সত্যের অপলাপ। একে নকল সোনার মত, নকল চাল বলা যেতে পারে;কারণ নীল, কর্পুর, মেন্থল প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা গেলেও কৃত্রিম উপায়ে কোনো শস্য তৈরি করা এখনো বিজ্ঞানের অসাধ্য। যে নকল চাল তৈরি করা হচ্ছে তাতে প্রোটিনের মাত্রা বাড়াবার জন্য সম্ভবতঃ চীনা বাদামের গুড়ো মেশানো হচ্ছে। দেখতে চালের মত হলে হয়ত দরিদ্র মানুষ তা খাবে। কিন্তু এর গুণ আসল চালের মত হবে না। ফলে প্রচারের ব্যাপারে সরকারের সচেতন থাকা উচিত। 'সত্যমেব জয়তে' এই রাষ্ট্রীয় মন্ত্রের মর্যাদাহানি যেন না হয়।

১.৪ প্রবন্ধ বিশ্লেষণ ঃ

রাজশেখর বসুর 'ভেজাল ও নকল' প্রবন্ধটি, তাঁর যে তিনটি প্রবন্ধগ্রন্থ আছে, তার মধ্যে 'বিচিন্তা' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত। এই প্রবন্ধটি প্রাবন্ধিক ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে রচনা করেন। এই প্রবন্ধে তাঁর মূল বক্তব্য চারটি। (এক) আমাদের প্রতিদিনের নানা রকম খাদ্যে নানা ভেজাল মেশানো হয়। যা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। (দুই) এই খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে সরকারী বেসরকারী দুই পক্ষেরই গাফিলতি আছে। (তিন) এই ভেজাল প্রতিরোধে যে যে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। (চার) ভেজাল যতদিন আটকানো না যাচ্ছে ততদিনের বিকল্প ব্যবস্থা।

প্রবন্ধের প্রথম অংশে খাদ্যে ভেজালের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি দুধের উদাহরণ দিয়ে শুরু করেছেন। তাঁর মতে দুধের নকল না থাকায় লাভ করার জন্য ব্যবসায়ীর দুধে ভেজাল হিসেবে জল মেশায়, যা দুধের খাঁটিত্ব হয়ত নষ্ট করে কিন্তু এতে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা কম। আগে ঘিতে ভেজাল হিসেবে চর্বি মেশানো হত। কিন্তু এখন বড় ব্যবসায়ীরা ঘি বলে যা বিক্রি করে তাতে ঘি থাকেই না। নরম ঘন তেল (hydrogenated oil) এর মধ্যে হলুদ রং ও ঘি এর গন্ধ মিশিয়ে বিক্রি করে। সর্ষের তেলের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্যি যে কোনো সস্তা তেলের মধ্যে গন্ধ মিশিয়ে সর্ষের তেল বলে বিক্রি করা হয়। কেউ কেউ আবার অপাচ্য প্যারাফিন বা মিনারল অয়েলের মধ্যে গন্ধ মিশিয়ে সর্ষের তেল বলে বিক্রি করে। শুধু দুধ-ঘি-তেল নয়, ময়দা-আটা থেকে শুরু করে ওষুধ পর্যন্ত সমস্ত কিছুতেই নানা মাত্রায় ভেজাল মেশানো হয়। রেশনের ময়দা বেলবার সময় রবারের মত টান হয়। আটায় প্রচুর পরিমাণে ভূসি থাকে গম-যব ছাড়া অন্য শস্যের বলেই মনে হয়। আটার কলে ভেজাল হিসেবে সোপ স্টোন বা তেঁতুল বিচিও পাওয়া গেছে। চালে ভেজাল হিসেবে পাথরকুচি মেশানো হয়। অসময়ে বাজারে যে সবুজ মটরশুঁটির দানা বিক্রি হয়, তা আসলে শুকনো মটর বস্তাবন্দী করে সবুজ রঙে ছুপানো। এতে যে রং মেশানো থাকে তা বিষ কিনা কেউ ভাবে না। মিষ্টিতেও নানারকম রং মেশানো হয়। চায়ের দোকানে অব্যবহৃত চায়ের সঙ্গে ব্যবহৃত চায়ের গুঁড়ো ভেজাল হিসেবে মেশানো হয়। এলাচ-লবঙ্গ-দারচিনি থেকে কিছুটা আরক বের করে নিয়ে বাজারে বিক্রির জন্য ছাড়া হয়। তবু সব থেকে বেশী খারাপ অবস্থা ওযুধের। জাল ওযুধে বাজার ছেয়ে গেছে।

প্রাবন্ধিকের দ্বিতীয় বক্তব্য ভেজাল প্রতিরোধে সরকারী-বেসরকারী গাফিলতি। তিনি বলেছেন, মাঝে মাঝে কোনো কোনো ভেজাল ঘি তেল কারবারী দন্ড পেলেও বড় ব্যবসায়ীদের প্রায় কিছুই হয় না। যদি হয়ও শুধু ছোটো ব্যবসায়ীদের নামই খবরের কাগজে ছাপা হয়। বড় ব্যবসায়ীদের নয়। কারণ তারা রিপোর্টারদের ঠাণ্ডা করতে জানে। চালে পাথরকুচি মেশানোর কথাও সরকারী কর্তা ব্যক্তিরা জানে। অনেক রেশন দোকানে আবার দু' রকম চালের বস্তা থাকে। এক রকম ভেজাল মেশানো যা বেশীরভাগ মানুষকে দেওয়া হয়, আরেক রকম ভালো, যা বাছা খদ্দেরের জন্য। ভেজাল আটক করা হলেও তাৎক্ষনিকভাবে এ খবর প্রচার করা হয়, ধারাবাহিক কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। খাবারে যে রং মেশানো হয়, তা মিউনিসিপ্যালিটির মার্কেট অধ্যক্ষদের সামনেই বিক্রি হয়। আর জাল ওষুধের কারবারে অনেক সময় সচেতন ভাবে অনেক গৃহস্থও যুক্ত থাকে।

প্রাবন্ধিক তাঁর তৃতীয় অংশের বক্তব্যে এই ভেজাল প্রতিরোধে কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর মতে যে সব ভেজাল কারবারীদের ধরা হচ্ছে, তাদের সবার নাম সরকারী বিজ্ঞাপনে নিয়মিত প্রকাশ করা উচিত। এই ব্যবস্থা নিলে বদনাম আর খদ্দের হারাবার ভয়ে ভেজাল কারবারীরা কিছুটা শাসিত হতে পারে। মাঝে মাঝে যে সব জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণে ভেজাল ধরা হয়, সে সব ঘটনার অনুসন্ধানের ফলাফল সরকারের তরফে জনগণের কাছে প্রকাশ করা উচিত। বিদেশে খাবারে ব্যবহার্য রঙের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আছে এখানেও সেই বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিত। যতদিন না সেই ব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন খাবারে রঙের ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত। সাধারণ মানুষকেও রং ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে নিয়মিত সরকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা উচিত।

প্রাবন্ধিক মনে করেন না যে সমস্ত দায়িত্ব সরকারের পক্ষে একা নেওয়া সম্ভব। জনসাধারণেরও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা উচিত বলে তিনি মনে করেন। তাঁর প্রবন্ধে তিনি তৎকালীন বামপন্থীদের 'বীরপুরুষ' বলে ব্যঙ্গ করে বলেছেন যে এরা শ্রমিকদের, ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের অংশ হিসেবে ট্রাম-বাস পোড়ায়, কিন্তু এরা ভেজাল, নকল, কালো-বাজার সম্বন্ধে নির্বিকার। ফলে তাঁর মতে কালোবাজারী ঠেকাতে সমাজহিতৈষীদের উৎসাহ দরকার, যেভাবে সতীদাহ-নিবারণ, স্ত্রী-শিক্ষা-প্রবর্তন, পরাধীনতার বিলোপ সাধন সম্ভব হয়েছে সমাজহিতৈষীদের উদ্যোগে তেমনি কিছু নিঃস্বার্থ সমাজহিতৈষীর প্রয়োজন, যারা ভেজাল সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে যেমন অবহিত করবেন, তেমনি বিশুদ্ধ জিনিষ বেচবার জন্য সমবায় ভাণ্ডার খুলবেন। দাম বেশী নিলেও বিশুদ্ধ জিনিস পাওয়ার আসায় মানুষ এখানে আসবে এবং এই প্রভাবে সমস্ত ব্যবসায়ীরাই তাদের দস্তুর বদলাতে বাধ্য হবে।

প্রবন্ধের শেষ অংশে যতদিন ভেজাল আটকানো না যাচ্ছে, ততদিন বিকল্প কি করা যেতে পারে তা নিয়ে প্রাবন্ধিক আলোচনা করেছেন, তাঁর মতে যতদিন না ভেজালহীন খাবার পাওয়া যায়, ততদিন তুলনায় নিকৃষ্ট ও অনভ্যস্ত খাবারই খাওয়া উচিত। জনগণের মধ্যে এই বোধ সঞ্চারিত করার জন্য একদিকে যারা ধনী ও জ্ঞানী তাদের কর্তব্য তাঁরা যাতে ও ধরণের খাবার খেয়ে সাধারণকে উৎসাহ দেন, আর সরকারের উচিত অত্যুক্তি না করে বা মিথ্যা না বলে এ ধরনের খাদ্যের উপযোগিতা প্রচার করা। এ ধরনের খাবারের মধ্যে প্রাবন্ধিক লাল আলু, টাপিওকা প্রভৃতির নাম করেছেন। এ সব অনভ্যস্ত খাদ্যে চাল-আটার সমান পুষ্টি না থাকলেও এসব খাদ্যে জীবন রক্ষাও হয়, স্বাস্থ্যহানিও ঘটে না। কিন্তু সমস্যা হ'ল অত্যুক্তি আর মিথ্যা প্রচারের। যেমন একজন খাদ্যবিশারদ প্রচার করেছিলেন যে ঘাস থেকে সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্য তৈরি হবে। সরকারের উচিত একদিকে এসব প্রচারে প্রশ্রয় না দেওয়া অন্যদিকে নিজেদের প্রচারেও অত্যুক্তি না

করা। সরকারী খবরেও প্রকাশিত হয়েছে যে ভুট্টা, টাপিওকা ইত্যাদি থেকে সিন্থেটিক চাল তৈরি হয়েছে। কিন্তু এ প্রচার অসত্য। রাসায়নিক দ্রব্য কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা সম্ভব হলেও শস্য তৈরি বিজ্ঞানের অসাধ্য। যে জিনিস তৈরি হচ্ছে তাকে নকল চাল বলা উচিত। নকল সোনা যেমন আসল সোনার মত দেখতে হওয়ায় অনেকে কেনে। তেমনি এ জিনিস চালের মত দেখতে হলে দরিদ্র মানুষ হয়ত কিনবে, কিন্তু এর পুষ্টি কখনো আসল চালের সমান হবে না। সরকারের উচিত প্রচারের ব্যাপারে যাতে কোনো অসতর্ক উক্তি না হয়, 'সত্যমেব জয়তে' রাষ্ট্রীয় মন্ত্রকে রাষ্ট্রেরই মনে রাখা উচিত।

এই প্রবন্ধটি বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের অন্তর্গত বিবৃতিমূলক প্রবন্ধ। প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসু অত্যন্ত সহজ চলিত বাংলায় এই প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। তাঁর বেশীর ভাগ প্রবন্ধের মত এটিও প্রয়োজনমূলক। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কালোবাজারী--ভেজাল সমস্যা যে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল সেই প্রেক্ষিতে তাঁর রচিত এই প্রবন্ধ। সমস্যার শুরু আগেই। স্বাধীনতার আগেই আওয়াজ উঠেছিল দেশ স্বাধীন হলে সমস্ত কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে ঝোলানো হবে। কিন্তু দেখা গেল সমস্যা আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সে কারণে সরকারের বিরুধে তাঁর অভিযোগ। এ সমস্যা যে কত ভয়াবহ তা আমরা স্বাধীনতার চার দশক পরে প্রত্যক্ষ করেছি ভেজাল তেল খেয়ে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার ঘটনায়। ফলে তিনি জাজ্বল্যমান সামাজিক সমস্যা নিয়ে জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে কলম ধরেছেন। তবে তৎকালীন বামপন্থীদের সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ণ ঠিক নয়। সে সময়ে বামপন্থীদের আন্দোলনের একটি বড় বিষয়ই ছিল ভেজাল কালোবাজারী। আন্দোলনের ময়দানে, গানে, কবিতায়, নাটকে স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে বামপন্থীদের এ বিষয়ে সরব হতে দেখা যায়। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিশ্বাসের অনাস্থার কারণে হয়তো বামপন্থীদের সম্পর্কে তাঁর এ মূল্যায়ন। সামাজিক সমস্যাবলী নিয়ে এই ধরণের কার্যকরী প্রবন্ধ অন্নদাশঙ্কর রায়ও অনেক লিখেছেন। এসমস্ত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল প্রাবন্ধিকের যৌক্তিকতাবোধ ও নীতিরোধের শানিত তীক্ষ্ণতা। রাষ্ট্রীয় মন্ত্রকে স্মরণে রাখতে বলার নেপথ্যে কাজ করছে প্রবল দেশপ্রেমের বোধ। কল্যাণমূলক ও সত্যকামী রাষ্ট্রের মানবিক মুখ স্বাধীনোত্তর অনেক প্রাবন্ধিকের কলমেও ফুটে উঠেছিল পরবর্তীকালে। সামাজিক জীবনে সংস্কারমূলক চিন্তাচেতনার প্রকাশ রাজশেখর বসুর মতন বিজ্ঞাননিষ্ঠ, কর্মনিষ্ঠ, স্বাধীন ও স্বয়ম্ভরতার প্রচারকের লেখাতেও ঘটেছে। সমস্যা সমাধানের কোন নৈরাজ্যকামী আন্দোলনে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। ট্রাম-বাস পোড়ানোর আন্দোলনের ঝোঁক সম্পর্কে সচেতনভাবে সমালোচনা করেছেন। সর্বোপরি রাজশেখর বসুর রচনার মধ্যে একটা statesmanship ছিল যার প্রকাশ প্রবন্ধগুলির স্থিতধী ও শানিত প্রকাশভঙ্গী।

একক ২ ❑ রূপকথা ঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২.০ প্রবন্ধ—'রূপকথা'—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২.১ প্রাবন্ধিক পরিচিতি

২.২ প্রবন্ধ সংক্ষেপ

২.৩ প্রবন্ধ বিশ্লেষণ

২.০ প্রবন্ধ—'রূপকথা'—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

রূপকথা বা উপকথা—কোনটি ব্যাকরণসম্মত শুদ্ধরূপ তাহার বিচার বৈয়াকরণরা করিবেন। কিন্তু এই দুইটি নামের অন্তরালে দুই বিভিন্ন প্রকারের মনোভাবের, দুই বিভিন্ন চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। উপকথা নামটির পিছনে একটি প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার ভাব আত্মগোপন করিয়া আছে বলিয়া অনুভব করা যায়—নকলের প্রতি আসলের, মেকির প্রতি খাঁটির নীচের প্রতি উপর যে অবজ্ঞা সেই ভাব। কোন গুরুগম্ভীর বয়স্কলোক শিশুদের খেলা দেখিয়া যে একপ্রকার সহানুভূতিমিশ্র নাসিকা-কুঞ্চন করিয়া থাকেন, উপকথার উপর সাংসারিক লোকের যেন সেই প্রকারের নাসিকা-কুঞ্চন। পক্ষান্তরে রূপকথা নামটির চারিধারে একটি রহস্যঘন মাধুর্য, একটি ঐন্দ্রজালিক মায়াঘোর বেষ্টন করিয়া আছে। নামটি আমাদের হৃদয়ের গোপন কক্ষে গিয়া আঘাত করে ও সেখানকার সুপ্ত নামহীন বাসনাগুলির মধ্যে একটা সাড়া জাগাইয়া দেয়। সমালোচক বোধ হয় উপকথা নামটিই পছন্দ করিবেন; কিন্তু রসপিপাসু পাঠক যে রূপকথা নামটির পক্ষপাতী হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

আজকাল সাহিত্যে যে নানাদিক দিয়া পুরাতন কালের সুরটি ধরিবার চেষ্টা করা হইতেছে; উপেক্ষিতকে অতীতের আঁধার গুহা হইতে সূর্যালোকে টানিবার আয়োজন হইতেছে, কুণ্ঠিত, সংকুচিত গ্রাম্য-সাহিত্যের সংগঠন মোচনের প্রয়াস চলিতেছে, তাহার প্রভাব রূপকথার উপরও বিস্তৃত হইয়াছে। এই অতীত প্রত্যাবর্তন সকল দেশের সাহিত্যেরই একটা সনাতন রীতি। ইংরেজী সাহিত্যেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই অতীতে প্রত্যাবর্তন, মধ্যযুগের পল্লীগাথার রসাস্বাদন চেষ্টা একটা নূতন যুগের সূত্রপাত করিয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যে এই অতীতের প্রতি মোহের কতকগুলি গূঢ় কারণ আছে। প্রথম এবং প্রধান কারণ, বর্তমানের তীক্ষ্ণ, জটিল সমস্যা হইতে একটা পলায়নের উপায়-আবিষ্কার, তাহার শত নাগপাশের বেষ্টন হইতে আত্ম-মোচনের চেষ্টা। অতীতের সরল, সমস্যা-বিরল, মুক্ত বায়ু আমাদের প্রশ্নসংকুল জীবনকে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের মত রক্ষণশীল জাতির পক্ষে জাতীয়ত্বের গোপনমন্ত্র ও মূলরহস্য অতীতের মধ্যে লুক্কায়িত আছে; সুতরাং এই নব জাগরণের দিনে, যখন আমরা আমাদের যথার্থ স্বরূপ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, তখন এই অতীতেরই কোন অন্ধকার, অব্যবহৃত কক্ষে সেই বিস্মৃত রত্নের অন্বেষণের বিবরণ কেবল যে একটা নূতন ধরনের সাহিত্যিক খেলা তাহা নহে, একটা পবিত্র কর্তব্যও বটে। সেইজন্য অতীতের মন্দিরতলে দুইদল সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক যাইয়া সমবেত হইতেছে—এক স্বপ্নপ্রবণ বিরাম-বিলাসীর দল অতীতের মধ্যে শান্তিকুঞ্জ রচনা করিতেছে; আর এক উৎসাহী অনুসন্ধিৎসুর দল তাহাদের সমস্ত কৌতূহলের সহিত তাহার কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া নিজেদের নষ্ট কোষ্ঠীর উদ্ধার সাধনে ব্যস্ত রহিয়াছে।

এই প্রবল কৌতূহলের ধারা রূপকথাকেও ঠাকুরমার মুখ ও নিভৃত গৃহকোণ হইতে ছিনাইয়া আনিয়া সাহিত্যের প্রকাশ্য দরবারের এক প্রান্তে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে এবং আধুনিক সমালোচকেরা সম্পূর্ণ সাহিত্যিক আদর্শে ইহার বিচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু রূপকথাকে প্রকৃত সাহিত্যের নিয়মে বিচার করিলে ইহার প্রতি অবিচারই করা হইবে।

আধুনিক সাহিত্যের আদর্শে ইহা গড়িয়া উঠে নাই, আধুনিক সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও গঠনপ্রণালীও ইহার ছিল না। ইহার সমস্ত মাধুর্য উপলব্ধি করিতে হইলে ইহাকে জন্মমুহূর্তের আবেষ্টনের মধ্যে ফেলিয়া দেখিতে হইবে। বর্ষণমুখর রাত্রি; স্তিমিতপ্রদীপ গৃহ; অন্ধকারে গৃহকোণে আলোছায়ার লীলা চঞ্চল নৃত্য; সর্বোপরি কল্পনা-প্রবণ আশা-আশঙ্কা-উদ্বেল শিশুহৃদয় এবং ঠাকুমার স্নেহসিক্ত, সরস, তরল কণ্ঠস্বর; এই সকলে মিলিয়া যে একটি অনুপম মায়াজাল, যে একটি রহস্যের ঐকতান সৃষ্টি করে, তাহা স্টীলের কলমের মুখে, ছাপার বই-এর পাতায় ও সাহিত্য-ব্যবসায়ীর শিক্ষিত রুচির নিকট ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। শিশুচিত্তের উপরে ইহার অনুপম প্রভাব বুঝিতে হইলে আগে শিশুর মনোজগতের কতকটা পরিচয় থাকা চাই। পুর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি—যাঁহার মনে সম্ভব অসম্ভবের মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্টভাবে টানা হইয়া গিয়াছে, যিনি সংসারে প্রাপ্য-অপ্রাপ্যের মধ্যে ভেদ করিতে শিখিয়াছেন, যাঁহার নিকট পৃথিবী আপনার সম্পূর্ণ রহস্যভাণ্ডার নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিয়াছে,—তাঁহার ইহার মধ্যে প্রকৃত রসের সন্ধান না পাইবারই কথা। শিশুর মনের গোপন কোণে যে পুঞ্জীভূত অন্ধকার জমাট হইয়া আছে তাহাতে পৃথিবীর সমুদয় রহস্য যেন নীড় রচনা করে; তাহার চিন্তাকাশে যে কুহেলিকা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহাতে, অন্ধকারে তারার মত, নানাবর্ণের আকাশ-কুসুম ফুটিয়া থাকে। পৃথিবীর দানশীলতার শেষ সীমা সম্বন্ধে এখনও তাহার কোন সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে নাই; নানারূপ সম্ভব-অসম্ভব আশা-কল্পনার রঙীন নেশায় সে সর্বদা মশগুল। রূপকথা তাহার সম্মুখে একটি দিগন্তবিস্তৃত, বাধাবন্ধহীন কল্পনারাজ্যের দ্বার খুলিয়া দিয়া তাহার সংসারানভিজ্ঞ মনের স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করে। রূপকথার সৌন্দর্যসম্ভার তাহারই জন্যে, যে পৃথিবীর সংকীর্ণ আয়তনের মাঝে নিজ আশা ও কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করে নাই।

(২)

রূপকথার বিরুদ্ধে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রধান অভিযোগ—ইহার অলীকতা ও অবাস্তবতা। অবশ্য, বাস্তব না হইলেই যে কাহারও পৃথিবীতে স্থান নাই, এ কথা কেহ বলেন না। সংসারে অবাস্তবেরও একটা প্রয়োজন আছে। মাটির সহিত যোগ না থাকিলে, মাটিতে শিকড় না গড়িলেই, আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কে না আসিলেই কাহাকেও এই সুন্দর পৃথিবী ও মানবমন হইতে নির্বাসিত করা যায় না। নীল আকাশ অবাস্তব হইলেও ইহা শত নিগূঢ় বন্ধনে আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত আপনাকে জড়াইয়া রাখিয়াছে। ইহা আমাদের তুচ্ছ, বিড়ম্বিত জীবন-নাটকের উপর সমুজ্জ্বল চন্দ্রাতপের মত বিস্তৃত; ইহা আমাদের উগ্র কল-কোলাহলের উপর এক স্নিগ্ধ শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়; ইহার ঘন নীলরূপের দিকে চাহিয়া আমাদের উদ্ধত বিদ্রোহ ও অশান্ত প্রকৃতি মাথা নত করে। সুতরাং ইহাকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিলে মানব-মন তাহার অনেকটা সৌন্দর্য ও উদারতা হারায়। সেই হিসাবে রূপকথারও একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে রূপকথা অবাস্তব নহে, উহা একটা বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা স্থূল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বা যে শক্তি আমাদিগকে জীবনের বাস্তব প্রয়োজন মিটাইতে প্রেরণা দেয়, তাহাই যে একমাত্র বাস্তব তাহা নহে। আমাদের মনের সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসকল, যাহার মুহূর্তমাত্র হৃদয়ে উঠিয়া পরমুহূর্তেই বিলীন হয়, যাহারা আমাদের বাহ্যজীবনে কোনরূপ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে না ও যাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা নিজেরাই প্রায় অচেতন, তাহারাও মনের একটা অবিসংবাদিত ক্রিয়া বটে, এবং তাহারাও বাস্তবতার দাবি কারিতে পারে। সুতরাং রূপকথা আমাদের প্রাণে যে অস্পষ্ট আবেগ, যে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যে আপাত-অসম্ভব আশা-কল্পনা জাগাইয়া তোলে তাহারা যে অবাস্তব, আমাদের সম্পূর্ণ অনাত্মীয়, একথা বলিতে পারি না। তাহারা এখন অপরিস্ফুট অবস্থায় আছে কিন্তু স্ফুটতাই বাস্তবতার একমাত্র লক্ষণ নহে।

রূপকথা কতকগুলি অসম্ভব বাহ্যঘটনার ছদ্মবেশ পরিয়া আমাদের মনের সহিত ইহার প্রকৃত ঐক্যের কথা গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই ছদ্মবেশ খুলিলেই ইহার সহিত আমাদের যোগসূত্র সুস্পষ্ট হইবে। বাস্তব জগতে যে শক্তি আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে, যে আদর্শের আমরা সন্ধান করি, রূপকথার রাজ্যেও সেই মানব-

মনের আদিম-সনাতন নীতিরই আধিপত্য। সেই পরিপূর্ণ সুখের সন্ধান, সেই দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ, সেই সৌন্দর্য-পিপাসার পূর্ণ পরিতৃপ্তি, সেই আশাতীত শক্তিসম্পদ-লাভ, পাপপুণ্যের জয়-পরাজয়—পৃথিবীর সমস্ত পুরাতন জিনিসই এই নূতন রাজ্যের অধিবাসী। পৃথিবীর চিরপরিচিত মূর্তিগুলিই একটু অতিরঞ্জনের রাগে রঞ্জিত হইয়া, কল্পনার দ্বারা সামান্যমাত্র রূপান্তরিত হইয়া রূপকথার রাজ্যের অলিতে-গলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে সব রাক্ষস-খোক্ষস আমাদের পথরোধ করে তাহারা আমাদের পার্থিব বাধা বিঘ্নেরই একটা রূপান্তরিত সংস্করণ মাত্র; যে অনুকূল দৈব বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর রূপে সেই সমস্ত রাক্ষস-খোক্ষসের মৃত্যুরহস্য আমাদিগকে শিখাইয়া দেন, তিনি যেন অযাচিত সাহায্যের দ্বারা এই পৃথিবীতে তাঁহার কার্পণ্য-কলঙ্কে স্খালন করেন এবং তাঁহার উপেক্ষার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে যে একটা গূঢ় অভিমান পোষণ করি, তাহার কথঞ্চিৎ অপনোদন করিতে প্রয়াস পান। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বিজন রাক্ষসপুরে যে রাজকন্যা প্রবালপালঙ্কে নিদ্রামগ্না থাকেন তিনি আমাদের গোপন-অন্তঃপুরশায়িনী প্রেয়সী; যে বাধাবিপদের মধ্য দিয়া রূপকথার নিজ প্রিয়াকে লাভ করেন, তাহা আমাদের বর্তমান বণিক্‌ধর্মী বিবাহের উপর আমাদের অন্তঃস্থ আদর্শ প্রেমিকের অভিমানক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস মাত্র। পাতালপুরে নাগকন্যার প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে আমরা এই চিরপরিচিত পৃথিবীর স্পর্শ অনুভব করি এবং তাহার মণিমাণিক্য-দীপ্ত কক্ষের মধ্যেও এই নিত্যসহচর, পরিচিততম সূর্যালোকের দর্শন পাই।

(৩)

এই রূপকথার রচয়িতার কোন নামকরণ হয় নাই। সমস্ত লৌকিক সাহিত্যের ন্যায় এখানেও লেখক একটি সমগ্র জাতির পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া আছেন। এখানে ব্যক্তি বিশেষের কোন কথা না; সমস্ত জাতিরই প্রাণের কথা, অন্তরতম আশা-আকাঙ্ক্ষা ইহাতে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। পুরাতন সাহিত্যের ইহা একটি অদ্ভুত গুণ। মহাকাব্যের বিশাল দেহে অনেক নামহীন লেখক নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মিলাইয়া দিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন; যেন জাতির আত্মা বৃন্তহীন পুষ্পসম 'আপনাতে আপনি বিকশিত' হইয়া উঠিয়াছে, স্বতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষের অপেক্ষা রাখে নাই। লৌকিক গানে গাথায় ও সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভাব লক্ষিত হয়; যেন জাতি তাহাদের রচয়িতাকে সম্পূর্ণরূপে অবসর দিয়া সেগুলিকে একেবারে খাস সম্পত্তি করিয়া লইয়াছে। রূপকথার রাজ্যেও সেই একই নিয়ম—কোথাও লেখকের নিজের এতটুকু কোন ছাপ নাই, সর্বত্র একটা উদার, বিশাল, অনাসক্ত ভাবের লক্ষণ সুপরিস্ফুট। রাজা-রাজড়ার কথা ইহার বিষয় বস্তু হইলেও সাধারণ লোকের যে ক্ষীণ, সাময়িক সংকেত ইহাতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে বিদ্বেষ বা অবজ্ঞার লেশমাত্র চিহ্ন নাই। রাজপুত্র কখনও কখনও বিপদে পড়িয়া দরিদ্রের কুটীরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন ও তাহাদের দ্বারা পুত্রবৎ প্রতিপালিত হইয়াছেন। তাঁহার সৌভাগ্য সূর্য যখন উদিত হইয়াছে, তখন তাহার কিরণ হইতে তাঁহার দরিদ্র উপকারকও বঞ্চিত হয় নাই। সর্বত্রই একটা সাম্যশান্তির ভাব; সমাজের সঙ্গে লেখক এমন সম্পূর্ণ অন্তরঙ্গভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার নিজ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তাঁহার ভাষা একেবারে মৌন হইয়া আছে।

আমাদের বঙ্গদেশের সামাজিক ব্যবস্থা ও বিচারের কি এক সম্পূর্ণ ছবি এই রূপকথার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহার রচনার কাল সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ হইলেও ইহা নিঃসংশয়িতভাবে বলা যায় যে, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণ সমাপ্ত হইবার পর ইহার জন্ম। সমস্ত রূপক ও বর্ণনা বাহুল্যের অন্তরালে আমাদের বঙ্গদেশের পরিবার ও সমাজের একটি নিখুঁত ছবি ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের বহুবিবাহ, আমাদের গৃহের সপত্নী-বিরোধ,

সপত্নী-পুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচার, রূপসী প্রণয়িনীর মোহ ও পরিশেষে সেই মোহভঙ্গ, আমাদের শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি কল্পনার উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়। রাজপুত্র শ্বেতবসন্তের কাহিনী যখন বক্তার করুণার্দ্র, অশ্রুতরল কণ্ঠে কথিত হয়, তখন শিশুর ত কথাই নাই, কোন বয়স্ক ব্যক্তিও বোধ হয় অশ্রু সংবরণ করিতে পারে না। এই গল্পের উপর রামায়ণের ছায়াপাত হইলেও ইহার একটি নিজস্ব অনুপম মাধুর্য ও সৌন্দর্য আছে; ইহার অন্তর্নিহিত গভীর করুণ রস সরল, শব্দাড়ম্বরহীন ও সাহিত্যিকতা বর্জিত ভাষার সাহায্যে প্রবাহিত হইয়া আমাদের হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যন্ত দ্রবীভূত করে। এই রূপকথার মধ্যে আমাদের সমস্ত সামাজিক বৈষম্য ও পারিবারিক সমস্যা এমন একটা আদর্শ-শান্তি ও কল্পিত সমাধানের মধ্যে পর্যবসিত হয় যাহা বাস্তব জীবনে একান্ত সুদুর্লভ এবং যাহার অভাব আমাদের সমস্ত জীবনপ্রবাহে একটা অব্যক্ত-মধুর, অবিচ্ছিন্ন করুণ মর্মর জাগাইয়া তোলে। এইরূপে রূপকথা বাস্তবজীবনের সমস্ত অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিয়া তোলে, নিষ্করুণ দৈবের বিচার উল্টাইয়া দেয়; এবং মানুষ নিজের ভাগ্যবিধাতা হইলে কিরূপ পরিপূর্ণ সুখ ও শান্তির মধ্যে আপনার ত্রুটিবহুল ও ভ্রমসংকুল জীবননাট্যের উপর শেষ যবনিকাপাত করিত তাহার সুস্পষ্ট আভাস দেয়।

(৪)

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, রূপকথার বিরুদ্ধে যে অবাস্তবতার অভিযোগ আনা হয় তাহার বিশেষ কোন ভিত্তি নাই। এখন রূপকথা আমাদের জীবনের উপর কিরূপ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে তৎসম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কবি-প্রতিভার অধিকারী তাঁহারা অনেকে অনেক সময় এই রূপকথার নিকট তাঁহাদের কল্পনার উন্মেষ সম্বন্ধে প্রথম সাহায্য লাভ করেন। রূপকথার দিগন্ত-বিস্তৃত তেপান্তরের মাঠ দিয়াই তাঁহারা প্রথম কল্পনার অশ্ব ছুটাইয়া দেন ও প্রাত্যহিক জীবনের সংকীর্ণ সীমা ছাড়াইয়া অজ্ঞাতের রাজত্বে প্রথম পদক্ষেপ করিতে শিখেন। সেখানকার মণিমাণিক্যের ছড়াছড়ি তাঁহাদের সুপ্ত সৌন্দর্যবোধ ও কবিত্বশক্তিকে জাগাইয়া তোলে। যে দেশে জীবনে বৈচিত্র্য ও বর্ণসুষমার একান্ত অভাব, যেখানে শান্তশিষ্ট জীবনযাত্রার মধ্যে কোনপ্রকার দুঃসাহসিকতার অবসর থাকে না সেখানে অনেক সময় এই রূপকথার খোলা জানালা দিয়াই আমরা বিচিত্র কল্পলোকের পরিচয় লাভ করি ও 'বিপুল সুদূরের ব্যাকুল বাঁশরী' আমাদের কর্ণপথে ধ্বনিত হয়। অনেক ইংরেজ কবি রূপকথার প্রতি তাঁহাদের ঋণের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার আত্মজীবন-কাহিনীতে এই লৌকিক গল্প কিরূপে তাঁহার কল্পনা-শক্তিকে উন্মেষিত করিয়াছিল কিরূপে ইহার সাহায্যে তিনি প্রাত্যহিক জীবনের তুলনা ও সংকীর্ণতা অতিক্রম করিয়া এক বিশালতর রাজ্যে স্বচ্ছন্দভ্রমণের সুখ অনুভব করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শিশু' নামক কাব্যে শিশুচিত্তের উপর রূপকথার এই মায়াময় স্পর্শটি সজীব করিয়া তুলিয়াছেন।

আর আমাদের মধ্যে যাঁহার কবিত্ব-সৌভাগ্যের অনধিকারী তাঁহারাও ইহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহেন। মানুষের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান সত্ত্বেও তাহার অন্তরে একটি কুহেলিকাময় প্রদেশ আছে, যাহা হইতে তাহার সমস্ত রঙীন অসম্ভব কল্পনার আলোক বিচ্ছুরিত হয়, যাহা সমস্ত তর্ক যুক্তি বাস্তবতার প্রভাব অতিক্রম করিয়া তাহার মনে একটি ছায়াস্নিগ্ধ স্থায়ী কল্পনালোক রচনা করে। প্রত্যেকেই তাহার প্রাত্যহিক, নীরস, যন্ত্রবদ্ধ কাজের অবসরে এই কল্পলোকে, এই কল্পনার দুর্গে ক্ষণিক আশ্রয় করে; এখানে বসিয়াই সে আকাশকুসুম চয়ন করে ও শূন্যে প্রাসাদ

নির্মাণের উপকরণ সংগ্রহ করে। আমাদের জীবনে যাহা কিছু অপ্রাপ্য, যাহা কিছু দুর্বোধ্য ও রহস্যময়, যাহাই আমাদের উন্মুখ আশাকে 'পতঙ্গাবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ' আকর্ষণ করে,—এই সকলই আমাদের অন্তরের কল্পলোক রচনায় সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু ইহার প্রথম ভিত্তি স্থাপনের প্রশংসা রূপকথারই প্রাপ্য। রূপকথারাজ্যের মেঘখণ্ড আমাদের শিশু অন্তরের গোপন স্তরে প্রথম সঞ্চারিত হয়, তখন পরবর্তী জীবনের রহস্যবোধকে, তাহার সমস্ত আলো-ছায়া-ঘেরা বিচিত্রতাকে আমাদের অন্তরের অন্তঃপুরে বরণ করিয়া আনে; এবং সেই সঞ্চিত মেঘরাশির চতুর্দিকেই আমাদের কল্পনার বিদ্যুৎবিলাস স্ফুরিত হয়। শৈশবের প্রতি নিগূঢ় আকর্ষণ মানব-হৃদয়ের সনাতন প্রবৃত্তি এবং এই প্রবৃত্তির বশে যখন আমরা সুদূর শৈশবের প্রতি উৎসুক-ব্যকুল দৃষ্টিক্ষেপ করি তখন তাহার সমস্ত ক্রীড়া-কৌতুক ও উচ্ছ্বাস চাপল্যের মধ্যে সেই বর্ষারাত্রের রূপকথার নিবিড় মোহময় স্মৃতি আমাদের অন্তরে শুকতারার ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে ও আমাদের বৈচিত্রহীন প্রৌঢ়জীবনের উপরও তাহার মায়াময় ইন্দ্রজাল সংক্রামিত করে।

২.১ প্রাবন্ধিক পরিচিতি

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ঃ ২৩/০২/১৮৯২–মৃত্যু ঃ ২৮/২/১৯৭০)

বীরভূম জেলার কুশমোর গ্রামে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক। ১৯০৬ খ্রীঃ হেতমপুর কলেজ থেকে চতুদর্শ স্থান অধিকার করে এফ. এ ও পরে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইংরেজীতে ঈশান স্কলার হয়ে বি.এ. পাশ করেন। ১৯১২ তে এম. এ. পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯২৭ খ্রীঃ পি. এইচ. ডি উপাধি লাভ করেন। তাঁর পি. এইচ. ডি. গবেষণার বিষয় ছিল—'রোমান্টিক থিওরি—ওয়ার্ডসওয়ার্থ অ্যান্ড কোলরিজ'। রিপন কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে অধ্যাপনা ও রাজসাহী কলেজে উপাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করার পরে আবার কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিরে আসেন। এরপর সরকারী চাকরী ছেড়ে দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদে যুক্ত হন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঐ পদেই ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (১৯৩৮); বাংলা উপন্যাস সমালোচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের অপরিসীম।

এখানে তাঁর স্বচ্ছ বিশ্লেষণী প্রতিভা এবং বিপুল জ্ঞানসমুদ্রের প্রমাণ পাওয়া যায়। 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' তাঁর অন্যতম সমালোচনা গ্রন্থ। এটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৬৭ সালে। তাঁর রচিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে' (১৯৬২) এবং 'রবীন্দ্রসৃষ্ট-সমীক্ষা' (দুই খণ্ড ১৯৬৫-১৯৬৯) উল্লেখযোগ্য রচনা। সমালোচক হিসেবে তিনি রসবাদী ও ঐতিহ্যপন্থী।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার ধারা ছিল স্বতন্ত্র। তাঁর সমালোচনার ধারা নিয়ে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "তীব্র রসানুভূতির সহিত সূক্ষ্মবিচারশক্তির, মর্মগ্রাহীতার সহিত মননশীলতার, ভাবোল্লাসের সহিত স্থির বুদ্ধির যে অসামান্য সহযোগ তাঁহার সমালোচনায় দেখা যায়, তাহা মনস্বিতার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ"।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করতেন সাহিত্যক্ষেত্রে যত রকম রীতি, তত রকম মতবাদ। তবে তাঁর সমালোচনা সম্পর্কে অনেক সময়ে পাঠকরা দুরূহতার অভিযোগ তুলেছেন। এই দুরূহতার কারণ মূলতঃ তীব্র রসবোধজনিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। তাঁর উপলব্ধিকে তিনি সবসময়ই বুদ্ধিগ্রাহ্য ও যুক্তিসম্মত করার চেষ্টা করতেন। তাঁর 'রূপকথা' নামে প্রবন্ধটি 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য এটিই তাঁর লেখা প্রথম প্রবন্ধ।

২.২ প্রবন্ধ সংক্ষেপ

'রূপকথা' বা 'উপকথা' ব্যাকরণগত শুদ্ধ রূপ যেটাই হোক, তার বিচারের ভার বৈয়াকরণদের। কিন্তু 'উপকথা' আখ্যার পেছনে আছে একধরণের প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার ভাব। বিপরীতে 'রূপকথা' নামটি ঘিরে আছে রহস্যময়তা, যা আমাদের হৃদয়ের বিভিন্ন সুপ্ত বাসনাকে জাগিয়ে দেয়। সাহিত্য সমালোচকের 'উপকথা' নামটি পছন্দ হলেও রসপিপাসু পাঠক 'রূপকথা' নামটিরই পক্ষপাতী হবে।

এখন নানাদিক থেকে সাহিত্যের যে পুরোনো সুরটিকে ধরার চেষ্টা হচ্ছে, রূপকথা ও তার মধ্যে একটি। এই অতীতে প্রত্যাবর্তন সব দেশের সাহিত্যেরই একটা সনাতন রীতি। বাংলা সাহিত্যে এই অতীত রোমন্থনের একাধিক কারণ আছে। প্রথম এবং প্রধান কারণ বর্তমানের জটিল সমস্যা থেকে পালানোর উপায় খোঁজা। দ্বিতীয় কারণ অতীত সাহিত্যে নিজেদের জাতীয়ত্বের রহস্য খোঁজা। সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে দু'দল অতীত সাহিত্যচর্চা করে চলেছে। একদল অতীতের মধ্যে শান্তির আশ্রয় খুঁজেছে, অন্যদল নিজেদের নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধারের অতীত সাহিত্যের আশ্রয় নিচ্ছে। আর এর ফলে আধুনিক সমালোচকরা রূপকথাকে ঠাকুরমার মুখ থেকে টেনে এনে (আধুনিক) সাহিত্যের মূলধারা নিয়মে বিচার করতে শুরু করেছে। কিন্তু রূপকথা আধুনিক সাহিত্যের আদর্শে গড়ে ওঠে নি। রূপকথাকে বিচার করতে হলে এর জন্মমুহূর্তের অনুষঙ্গে একে বিচার করা উচিত। রূপকথা বলার পরিবেশ, শ্রোতা এবং বক্তার সক্রিয় ভূমিকায় রূপকথা যে রহস্যময় হয়ে ওঠে, ছাপার বইয়ে তা পাওয়া যায় না। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি অর্থাৎ যাদের কাছে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার কার্যকারণ পরিষ্কার, রূপকথার আবেদন তাদের কাছে নয়। রূপকথার প্রভাব মূলতঃ শিশুচিত্তের ওপর। শিশুমনের অভ্যন্তরে যে অন্ধকার তা কল্পনাময়। সম্ভব-অসম্ভবের আশা কল্পনায় রঙীন নেশায় সে মশগুল। রূপকথার সৌন্দর্যসম্ভার তারই জন্য যে পৃথিবীর সংকীর্ণ আয়তনের মাঝে নিজের কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করেনি।

(২)

রূপকথার বিরুদ্ধে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রধান অভিযোগ এর অবাস্তবতা । কিন্তু মানবসংসারে অবাস্তবের প্রয়োজন আছে। নীল আকাশ অবাস্তব হলেও তা নানাভাবে বাস্তব জীবনের সঙ্গে আমাদের জড়িয়ে রেখেছে। এর ঘন নীল রূপ আমাদের উগ্র কোলাহল মুখর জীবনের ওপর এক স্নিগ্ধ শান্তির প্রলেপ। ফলে এই হিসেবে আমাদের জীবনে রূপকথারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রূপকথা অবাস্তব নয়। বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যা স্থূল বা আমাদের জীবনের বাস্তব প্রয়োজন মেটায় তা একমাত্র বাস্তব এমন নয়। আমাদের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি, যেগুলির আমাদের বাহ্যজীবনে প্রায় কোনোরকম স্থায়ী প্রভাব নেই, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা নিজেরাই অচেতন। সেগুলিও বাস্তব। ফলে রূপকথা আমাদের মনে যে আবেগ, কল্পনা জাগিয়ে তোলে, তা অবাস্তব নয়।

রূপকথা ছদ্মবেশের মাধ্যমে আমাদের মনের সঙ্গে এর প্রকৃত ঐক্যের কথা গোপন রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু রূপকথার রাজ্যেও আসলে মানব মনের আদিম সনাতন রীতি অর্থাৎ সুখের সন্ধান, দুঃখের অবসান ইত্যাদিরই আধিপত্য। পৃথিবীর পরিচিত মূর্তিগুলিই এক অতিরঞ্জিত হয়ে, কল্পনায় সামান্য রূপান্তরিত হয়ে রূপকথার রাজ্যে হাজির হয়। রূপকথার রাক্ষস-খোক্ষস আসলে আমাদের পার্থিব বাধা বিপত্তির রূপান্তরিত প্রকাশ। রূপকথার বেঙ্গমা-বেঙ্গমি আমাদের পার্থিব জীবনের কল্পনার দৈবশক্তি। সাত সমুদ্র তের নদীর পারের রাজকন্যা আসলে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত প্রেয়সী। রাজপুত্রের রাজকন্যালাভে বাধাবিপত্তি আসলে বর্তমান বণিকধর্মী বিয়ের ওপর আদর্শ প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাস। পাতালপুরের নাগকন্যার প্রাসাদও আসলে আমাদের পরিচিত এই পৃথিবী।

(৩)

সমস্ত লৌকিক সাহিত্যের মতই রূপকথারও কোন রচয়িতার নাম পাওয়া যায়না। ব্যক্তিবিশেষ নয়, সমস্ত জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাই রূপকথায় ধ্বনিত হয়েছে। মহাকাব্যেও লৌকিক গানগাথা সহ সমস্ত পুরনো সাহিত্যেই এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের অভাবটি লক্ষ্য করা যায়। এই রচনাগুলি যেন কোন ব্যক্তি রচয়িতার নয়, সমস্ত জাতির সম্পত্তি। রূপকথাতেও লেখকের কোন ছাপ থাকে না, মূলতঃ রাজারানীর কথা হলেও সাধারন মানুষের প্রতি এগুলিতে অবজ্ঞার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। রাজপুত্রও বাধ্য হয়ে শৈশব অবস্থায় দরিদ্রের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে ক্ষমতা ফিরে পেলে সেই দরিদ্র পরিবারও তার দ্বারা উপকৃত হয়েছে। ব্যক্তিলেখক এমনভাবে এখানে সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে যে, তাঁর ব্যক্তিজীবন কোনভাবেই এখানে প্রতিফলিত হয়নি।

রূপকথার রচনার কাল যথাযথভাবে বলা না গেলেও এটা ঠিক যে, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার দৃঢ়করণের পরেই এগুলি সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন রূপকের মধ্যে দিয়ে এগুলিতে আমাদের বাংলার পরিবার ও সমাজের ছবি পাই। আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি কল্পনায় উজ্জ্বল হয়ে এখানে হাজির হয়েছে। রাজপুত্র শ্বেতবসন্তের রূপকথা, যা শুনে যে কোনো বয়সী শ্রোতার চোখেই জল আসবে। সেই কাহিনীর মধ্যে রামায়ণের ছাপ থাকলেও তার একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে যা আড়ম্বরহীন। সাহিত্যিকতাবর্জিত ভাষার সাহায্যে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। এই রূপকথার মধ্যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানান সমস্যার আদর্শ ও কল্পিত সমাধান থাকে, যা বাস্তব জীবনে দুর্লভ এবং যার অভাব আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে করুণ করে তোলে। এইভাবে রূপকথা বাস্তব জীবনের সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করে নিস্করুণ দৈবের বিচারকে উল্টে দেয় এবং মানুষ নিজের ভাগ্যবিধাতা হলে কেমন সুখ শান্তিতে দিন কাটাত তার আভাস দেয়।

(৪)

ফলে দেখা যাচ্ছে যে, রূপকথার বিরুদ্ধে যে অবাস্তবতার অভিযোগ, তার বিশেষ কোন ভিত্তি নেই। রূপকথা আমাদের জীবনের ওপর কিছু স্থায়ী প্রভাবও বিস্তার করে। যেমন—যারা কবি স্বভাবের অধিকারী, রূপকথা তাদের কল্পনা উন্মেষে সাহায্য করে। বাস্তব জীবন যেখানে গতানুগতিক, সেখানে রূপকথার মাধ্যমেই কল্পলোকের দরজা খুলে যায়। ইংরেজ কবিদের মধ্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, লৌকিক গল্প কিভাবে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে কল্পনার রাজ্যে ভ্রমনের সুখ দিয়েছিল। আমাদের রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর 'শিশু' নামক কাব্যে শিশুর মননে রূপকথার স্পর্শটি সজীব করে রেখেছেন।

যাঁরা কবিস্বভাবের নয়, তাঁরাও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান সত্ত্বেও প্রতিটি মানুষ প্রাত্যহিক কাজের অবসরে নিজ অন্তরের কল্পলোকে আশ্রয় নিয়ে আকাশকুসুম চয়ন করে। আমাদের জীবনের যা কিছু অপ্রাপ্য, দুর্বোধ্য, রহস্যময় সে সবই এই কল্পলোক রচনায় সাহায্য করেছে। কিন্তু নিজ অন্তরে এই কল্পরাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের প্রধান কৃতিত্ব রূপকথারই প্রাপ্য। রূপকথার সূত্রেই শিশুহৃদয়ে এই কল্পলোকের সূচনা। শৈশবের প্রতি যে আমাদের আসক্তি, তার কারণ শৈশবের বর্ষা রাতের রূপকথা শোনার সেই অপরূপ স্মৃতি, যা আমাদের বৈচিত্র্যহীন প্রৌঢ় জীবনের ওপরও তার ইন্দ্রজাল সংক্রামিত করে।

২.৩ প্রবন্ধ বিশ্লেষণ

বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত সাহিত্যতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যসমালোচক শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর 'রূপকথা' নামে প্রবন্ধে রূপকথার চরিত্র, রূপকথার নন্দনতত্ত্ব, রূপকথার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে ওঠা অভিযোগ ও তার যথার্থতা এবং আমাদের জীবনে রূপকথার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার প্রথম অংশে, লোককথার মধ্যে থেকে যে একটি নির্দিষ্ট রূপকে উপকথা বা রূপকথা বলা হয়, সেই নামের ঔচিত্য নিয়ে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে এক শ্রেণির লোক থাকে যাদের 'উপকথা' বলার মধ্যে এক ধরণের অবজ্ঞা মিশ্রিত থাকে। মানুষের মধ্যে 'উপভাষা' সম্বন্ধে যেমন অজ্ঞানতাজনিত অবজ্ঞা দেখা যায়, এই অবজ্ঞা অনেকটা যেন সেই জাতীয়। তাঁর মতে 'রূপকথা' নামটির সঙ্গেই আমাদের হৃদয়ের একটা যোগ আছে।

সাহিত্যের অতীত কীর্তিগুলিকে বর্তমানের চোখ দিয়ে দেখার। বর্তমানে প্রতিস্থাপিত করার প্রচেষ্টা শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী সময়ে সারা পৃথিবী জুড়েই দেখা গিয়েছিল। ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে রেনেসাঁর বৈশিষ্ট্যকে এদেশের সাহিত্যেও অনুকরণ করা হয়েছিল। ১৮১২ সালে জার্মানিতে প্রকাশিত হয় 'ছেলে ও লোকভুলানো গল্পাবলী'। জেকব ও উইলহেম গ্রীম দুইভাই ছিলেন এর সংকলক। ইউলিয়াম কেরির 'ইতিহাসমালা' এই বছরেই ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গভীর অনুসন্ধান চালিয়ে সঙ্কলিত হয়। এগুলির ঐতিহাসিকত্বও স্পষ্ট। রুশ লেখক ক্রীলকের গল্প বাঙলায় রূপান্তরিত করে প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে। মধুসূদনের রূপান্তরিত এই গল্পগুলিও রূপকথা সংগ্রহের ও তার পাঠকসমুদায়ের আকর্ষণের কথা স্মরণ করায়। আমাদের সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই প্রচেষ্টা প্রথম সফলভাবে করেছিলেন। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই লোককথা সংগ্রহের কাজও শুরু হয়। রেভারেন্ড লালবিহারী দে এই ধরনের লোককথার সংকলনটি ১৮৮৩ খ্রীঃ প্রকাশ করেন। প্রাবন্ধিকের মতে বাংলা সাহিত্যে এই অতীতচারিতার কিছু গভীর কারণ আছে। প্রথম এবং প্রধান কারণ হ'ল—বর্তমানের তীক্ষ্ণ জটিল সমস্যা থেকে পালানোর একটা উপায় বের করা। কারণ অতীতের যে সরল জীবন তা এই বর্তমানের সমস্যাকন্টকিত জীবনকে প্রবলভাবে আকর্ষন করে। আর দ্বিতীয় কারণ হল বাঙালি জাতির জাতীয়তার শিকড় খোঁজা। ফলে বাঙালি জাতির বাংলা সাহিত্যের অতীত চর্চার মধ্যে দুধরণের ছবি দেখা যায়, একদল বর্তমানের সমস্যাসঙ্কুল জীবন থেকে শান্তি খোঁজেন, অপরদল অতীত সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের মধ্যে আত্মসত্তা অনুসন্ধান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে লোককথাগুলি সংগ্রহের যে কাজ প্রথম ফিনল্যান্ডে শুরু হয় সেখানে প্রেরণা হিসেবে ছিল জাতীয়তাবোধ।

সাহিত্যের এই অতীতচর্চার অঙ্গ হিসেবে রূপকথা, যা ছিল নাতি-নাতনীদের কাছে ঠাকুরমার মুখের গল্প, তাকে সাহিত্যের প্রকাশ্য দরবারে টেনে এনে আধুনিক সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বের নিরিখে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। প্রাবন্ধিকের মতে এই পদ্ধতি ঠিক নয়। রূপকথার সৃষ্টি আধুনিক অনুষঙ্গে নয়, ফলে এর নন্দনতত্ত্ব আলাদাভাবে তৈরি করতে হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে উনিশ শতকের শেষে বা বিশ শতকের শুরুতে যারা লোকগল্পগুলিকে সংগ্রহ করছিলেন তাদের অনেকেই আধুনিক শহুরে মনন থেকে লোককথাগুলির বহু শব্দ 'অশ্লিল' বলে তার বদল ঘটাচ্ছিলেন, তার ফলে এগুলি বিকৃতভাবে আমাদের কাছে এসেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথ নিজেও সংগৃহিত একটি ছড়ায় 'ভাতার' শব্দটির বদলে 'স্বামী' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। প্রাবন্ধিকের মতে শিশুমনে এই রূপকথা গুলি বাধাবন্ধনহীন কল্পনারাজ্যের দরজা খুলে দেয়, যার কাছে সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা স্থায়ীভাবে টানা হয়ে গেছে রূপকথার আবেদন তার কাছে নয়।

পরের অংশে প্রাবন্ধিক রূপকথার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে রূপকথার বিরুদ্ধে অবাস্তবতার অভিযোগ এনে রূপকথাকে অপ্রয়োজন বলা যাবে না। প্রথমতঃ আমাদের জীবনে অবাস্তবতার প্রয়োজন আছে। আকাশ অবাস্তব হলেও আমাদের জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়তঃ রূপকথা সবসময় অবাস্তবের কথাই

বলে না। বাস্তব জীবনের নানা ঘটনা বাস্তব মানুষের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা অবাস্তবতার ছদ্মবেশে রূপকথাতে হাজির হয়। রূপকথার রাক্ষস আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনের বিপদ, রূপকথার রাজকন্যা আসলে আমাদের বাস্তব জীবনের আকাঙ্খিত প্রেয়সী। প্রসঙ্গাতঃ উল্লেখ করা যায় লোককথা বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পরে গবেষকরা প্রাবন্ধিকের এই বক্তব্যের সাথে সহমত প্রকাশ করবেন। অন্যান্য লোককথার মত রূপকথাও বিভিন্ন রূপক, প্রতীকে পূর্ণ। গভীরে প্রবেশ করে রূপক, প্রতীকগুলির অর্থোদ্ধার করতে পারলেই অতিরঞ্জনের জায়গাগুলো সরিয়ে যথার্থ অনুধাবন করা যাবে।

রূপকথার রচয়িতার কোন নাম না পাওয়া সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য যে কোন লোকসাহিত্যেই রচয়িতার নাম থাকে না। কারণ লোকসাহিত্যে শুধু ব্যক্তি নয় আসলে একটা জাতি আত্মগোপন করে থাকে। লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই হল এগুলিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নয়, জাতির সামগ্রিক ইচ্ছাই প্রকাশিত হয়েছে, এবং এটি এক ধরণের উদারতা। এই উদারতা যেমন ব্যক্তিনামের অভাবের মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট হয়, তেমনি লোকসাহিত্যের, লোককথাও এই উদারতায় পরিপূর্ণ। রাজপুত্র বিপদে পড়ে দরিদ্রের কুটিরে আশ্রয় নিলেও বিপদ কাটিয়ে উঠলে সেই দরিদ্রেরও ভাগ্য ফিরে যায়। এই রূপকথাগুলির রচনার কাল নির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও এটা পরিস্কার যে, বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণের পরেই এগুলির সৃষ্টি। এই রূপকথাগুলির মধ্যে বাঙালির সামাজিক জীবনের নানা ছবিকেই ফুটে উঠতে দেখা যায়। এই রূপকথাগুলির মধ্যে আমাদের সমস্ত সামাজিক বৈষম্য ও পারিবারিক সমস্যার এক আদর্শ সমাধান দেখা যায়। ফলে প্রাবন্ধিকের মতে রূপকথা আমাদের জীবনে নানা কারণেই প্রয়োজনীয়, একদিকে এগুলি আমাদের বাস্তবজীবনের নানা অবাস্তবতা পূর্ণ করে তোলে। অন্যদিকে মানুষ নিজের ভাগ্যবিধাতা হলে যে জীবন সুখ ও শান্তির মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হত তার আভাস দেয়।

প্রাবন্ধিকের মতে রূপকথার বিরুদ্ধে যে অবাস্তবতার অভিযোগ আনা হয় তার ভিত্তি তো নেইই বরং রূপকথা আমাদের মনে কিছু স্থায়ী প্রভাব ফেলে। যারা কবিত্ব শক্তির অধিকারী তাঁদের অধিকাংসের কল্পনার উন্মেষ প্রথম ঘটে রূপকথার সূত্রে। এ প্রসঙ্গো প্রাবন্ধিক ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং রবীন্দ্রনাথের নাম করেছেন। তবে, যারা কবিত্ব শক্তির অধিকারী তাদের মনেই শুধু রূপকথার আবেদন, এমন নয়;যারা কবিত্ব শক্তির অধিকারী নয় তাদের মনেও তর্ক, যুক্তি, বাস্তবতার প্রভাব কাটিয়ে রূপকথা কল্পলোক সৃষ্টি করে। যার ফলে এই সমস্ত মানুষরাও নিজেদের জীবনে যা কিছু অপ্রাপ্য, দুর্বোধ্য সেগুলিকে এই কল্পনার সাহায্যে প্রাপ্য করে তোলে। এই যে কল্পলোক, এই যে রহস্যময়তা, তা একদম শিশুবয়সে রূপকথা শোনার মধ্যে দিয়েই তৈরি হয়। ফলে প্রাত্যহিক বৈচিত্র্যহীন, অপ্রাপ্তির জগত থেকে মুক্তি পেতে প্রতিটি মানুষই শৈশবে ফিরে যেতে চায়। কারণ শৈশবের সেই বর্ষা রাত্রির মোহময় রূপকথা শোনার স্মৃতি। প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য যে বর্তমান পৃথিবীতে একটি মানবশিশু জন্মের পর থেকেই যে ইঁদুর দৌড়ে ঢুকে যায়, তাঁর ফলে তার মনের বিকাশ ভালো মাত্রাতেই বাধাপ্রাপ্ত হয় বলে মনে করেন মনস্তাত্বিকরা যে কারণে বর্তমান পৃথিবী তে মনস্তাত্বিক সমস্যা, সব থেকে বড় সমস্যা বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে যেহেতু আর ঠাকুমা-দিদিমাদের পক্ষে নাতি-নাতনিদের রূপকথার জগতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, ফলে নির্মাণ হচ্ছে নতুন ধরণের রূপকথা। এখন আর রূপকথায় রাজা-রানী থাকে না থাকে ‘হ্যারি পটার’ বা ‘পোকেমন’রা। তবে শিশু মনস্তত্বের ওপর কাল্পনিক জগতের প্রভাব আজও বিতর্কিত এক বিষয়।

প্রাবন্ধিক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রবন্ধ বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের অন্তর্গত সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। কথানুযায়ী এটি তাঁর প্রথম লেখা প্রবন্ধ। কিন্তু এ প্রবন্ধের বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং যৌক্তিকতাকে তিনি এত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন যে প্রবন্ধটির গভীরতা যে কোন পাঠকের কাছে মনস্কতার দাবী করে। ভাষা এবং উপস্থাপন ভঙ্গীর সরলতা এ প্রবন্ধের একটি বড় সম্পদ।

একক ৩ ❑ জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৩.০ প্রবন্ধ ঃ 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' (নির্বাচিত অংশ)—সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

৩.১ প্রাবন্ধিক পরিচিতি

৩.২ প্রবন্ধ সংক্ষেপ

৩.৩ প্রবন্ধ বিশ্লেষণ

৩.০ প্রবন্ধ ঃ 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য (নির্বাচিত অংশ)—সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

....মোগল যুগের মধ্যেই, বাঙ্গালা দেশে ইউরোপীয়—পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার ও ইংরেজ আসিল। ইংরেজ ধীরে-ধীরে দেশের রাজা হইয়া বসিল। বাঙ্গালীর সংস্কৃতিতে ও সাহিত্যে, ইংরেজের সহিত সাহচর্য্যের ফলে, আর একবার যুগান্তর উপস্থিত হইল।

এই যুগান্তর এখনও চলিতেছে। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্ত, এই যুগান্তর ব্যাপারে আমরা চারিটি পর্য্যায় বা ক্রম দেখিতে পাই। [১] রামমোহন যুগ, [২] "ইয়ং-বেঙ্গাল"-এর যুগ, [৩] বঙ্কিম-ভূদেব-বিবেকানন্দ যুগ, ও [৪] অতি আধুনিক যুগ, বা লড়াইয়ের পরের যুগ।

[১] প্রথম পরিচয়ের যুগে ইউরোপীয় মনের সহিত বাঙ্গালী মনের প্রথম পরিচয়। এই প্রথম পরিচয়ের সময়ে, ভারতের প্রাচীন শিক্ষায় সুশিক্ষিত মন একটু সাবধানতা অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিল, একেবারে নিজেকে বিকাইয়া দিতে চাহে নাই। রামমোহন এই যুগের প্রতীক। ইনি অসাধারণ-মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তখনকার দিনের সামাজিক জীবন ও নৈতিক আদর্শের ঊর্ধ্বে উঠিতে না পারিলেও, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সার কথা উপনিষৎকে আশ্রয় করিয়া তিনি ইউরোপের চিন্তার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের সভ্যতা যে একটা dynamic বা গতিশীল ব্যাপার, উপনিষদেই ইহার পর্য্যবসান নহে,—এই বোধ আংশিক ভাবে রামমোহনের ও পরে তাঁহার বহু অনুগামীদের মনে না থাকায়, রামমোহনের প্রস্তাবিত সমাধান বা সামঞ্জস্য একদেশদর্শী রহিয়া গেল; এবং বৈরাগ্য-যুক্ত চিত্তের মানুষ না হওয়ায়, রামমোহন এ দেশের মন যাহা চায়—তদনুরূপ ঈশ্বরে একান্তভাবে নিমজ্জিত লোকপূজিত ধর্মগুরু হইতে পারিলেন না।

[২] দ্বিতীয় যুগে, বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার সহিত পরিচয়ের অভাবে, ইহার প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহারা নানা উপায়ে ইউরোপীয় মনোভাব—এমন কি ইউরোপীয় রীতিনীতি ও জীবন-যাত্রার প্রণালী—সমস্ত-ই ভারতবর্ষের উপর আরোপ করিতে চাহিলেন। এরূপ উলট-পালট করিবার মতো সংখ্যা বা শক্তি তাঁহাদের ছিল না; কিন্তু ইংরেজি-শিক্ষিত অথবা ইংরেজি-শিক্ষাকারী জনগণের মনে তাঁহারা একটি ছাপ দিয়া গেলেন।

[৩] তারপরে আসিল যথার্থ সাংস্কৃতিক সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা—এই চেষ্টায় ছিল—প্রাচীন ভারতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহাকে রক্ষা করিয়া, ইউরোপীয় সংস্কৃতির যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও আমাদের পক্ষে হিতকর তাহা আত্মসাৎ করা। বঙ্কিম, ভুদেব ও বিবেকানন্দের যুগে—অর্থাৎ মোটামুটি ১৮৬০ হইতে ১৯০০ পর্য্যন্ত—জীবন ধীরমন্থর গতিতে চলিতেছিল; ইউরোপীয় সভ্যতা আজকালকার মতো এতটা সর্বগ্রাসী ভাবে আমাদের সমক্ষে তখন দেখা দেয় নাই, আমাদের জীবনে আজকালকার মতো এত জটিল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাও আসে নাই। তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া ধীরে সুস্থে বিচার করিবার অবকাশ ছিল, তাই আমরা বঙ্কিমে ভূদেবে বিবেকানন্দে বাঙালী জাতির পক্ষে হিতকর—তাহার সংহতি-শক্তিকে দৃঢ় করিবার উপযোগী এবং তাহাকে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিবার যোগ্য—কথা পাই; সমীক্ষা ও অনুশীলন ছিল বলিয়াই বঙ্কিম ও মধুসূদন বাঙ্গালীর জন্য এমন চিরন্তন রস-সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন যাহা বাঙ্গালীর সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

[২] এখন বাঙ্গালা সংস্কৃতিতে যে যুগ চলিতেছে, তাহার মূল কথা হইতেছে—বাঙ্গালীর জীবনে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রচণ্ড আঘাত, বাঙ্গালীর জীবনে ক্রমবর্ধনশীল অর্থনৈতিক অবনতি ও তাহার আনুষঙ্গিক মানসিক ও নৈতিক অবনমন, এবং আদর্শ-বিপর্য্যয়। বাঙ্গালীর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বনাশকর হিন্দু-মুসলমান বিরোধও এই যুগের চারিত্রিক এবং অর্থনৈতিক অবনতির একটা প্রধান কারণ। এখনকার কালে চারিদিক হইতে ইউরোপীয় সমাজের প্রভাব বাঙ্গালীর জীবনে আসিয়া পড়িতেছে। এই যে দ্রুত ভাব-বিনিময়—সংবাদপত্রের ও সাহিত্যের বহুল প্রচার, চলচ্চিত্র ও সবাক্চিত্র প্রভৃতির যুগে এরূপটি হইয়া অবশ্যম্ভাবী। অর্থনৈতিক অবস্থা-বৈগুণ্যে বাঙ্গালীর সামাজিক আদর্শও পরিবর্তিত হইতেছে; প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ, যাহা এতাবৎ কন্যাপণ এবং কন্যার সংখ্যাল্পতা হেতু নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, অর্থনৈতিক সংকটে বেশি করিয়া ক্লিষ্ট হওয়ায় তাহা মধ্যবিত্ত ঘরেও আসিয়া পড়িতেছে; অকৃতদার পুরুষ, ও অবীরা বা কুমারী নারী,—নূতন যুগের এই বৈশিষ্ট্য বেহুশঃ বাঙ্গালী সমাজে ও পরিব্যাপ্ত হইতেছে ও হইবে। সহশিক্ষা-রূপ নূতন সমস্যাও আসিতেছে।

বুদ্ধিমান জাতি বলিয়া বাঙ্গালীর খ্যাতি আছে। পূর্বে বিচারিত আধুনিক যুগান্তরের কালের তৃতীয় যুগে অর্থাৎ মোটামুটি ১৮৪০ হইতে ১৯০০ পর্যন্ত, বাঙ্গালী ইংরেজি শিখিয়া ইংরেজের আনুগত্য করিয়া আসিয়াছে; ইংরেজের বিশ্বস্ত অনুচর হিসাবে তাহার অর্থনৈতিক সংকট হয় নাই, সে সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষ জুড়িয়া বড়ো চাকুরী ও প্রভূত সম্মান, উভয়ই পাইয়া আসিয়াছে। অখ্যাত, অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত, সুদূর প্রান্তিক প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া, দিল্লীতে বা অন্যত্র পাঁচজনের সমাজে এতাবৎ বাঙ্গালী বিশেষ প্রতিষ্ঠা পায় নাই। ইংরেজের অনুচর হইয়া এবং রাজধানী কলিকাতার অধিবাসী বলিয়া, এখন সে এক অতি উচ্চ স্থান দখল করিয়া বসিল; ইহাতে তাহার কিঞ্চিৎ মাথা-গরমও হইল। তাহার সে সুখের দিন আর নাই। এখন সে বাহির হইতে বিতাড়িত হইতেছে; অন্নাভাবে তাহাকে নিজ বাসভূমেও পরবাসী হইতে হইতেছে। বাঙ্গালী হিন্দু এতদিন ধরিয়া যে সংস্কৃতি ও সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছিল, যাহার গঠন-কার্য্যে বাঙ্গালী মুসলমানেরও সাহচর্য্য ছিল, সেই সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মূলোৎপাটনের চেষ্টা হইতেছে—নূতন প্রচারিত বিনাশ-ধর্মী সাম্প্রদায়িক মুসলমান মনোভাবের ফলে। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী নিজেকে যে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছে, সে শিক্ষা আর তাহার জীবনে কার্য্যকর হইতেছে না; সে পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে নিজের বৃত্তি ও নিজের জীবন-যাত্রার সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারিতেছে না, কেবল ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের বোঝা ঘাড়ে করিয়া চলিয়াছে। দেশে তেমন বড়ো চিন্তানেতা নাই, যিনি তাহাকে যথার্থ দিগ্‌দর্শন করান,তাহার কর্তব্য বলিয়া দেন, বজ্রনির্ঘোষ আহ্বানে তাহাকে পরিচালিত করেন।

এই অবস্থার মধ্যেও শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত বাঙ্গালী সাহিত্য-সৃষ্টি করিবার জন্য লালায়িত—কেবল যা তা সাহিত্য নহে—বড়ো সাহিত্য। জাতির মধ্যে স্ফুর্ত জীবনী-শক্তি, অদম্য আশা, অটুট কর্মশীলতা না থাকিলে সে জাতির মধ্যে কি প্রকারের সাহিত্য জন্মলাভ করিবে? এই যুগের পূর্ববর্তী কালের দুই-চারিজন সাহিত্যরথী বিদ্যমান, তাঁহাদের লইয়াই আমরা গৌরব করি। যুগ-ধর্মের ফলে, বাঙ্গালীর অতি-আধুনিক সাহিত্য-চেষ্টা (অল্প কয়েক জন প্রতিভাশালী লেখককে বাদ দিলে) উৎকৃষ্ট সৃষ্টিতে সার্থক হইয়া উঠিতেছে না।

বাঙ্গালীর উৎপত্তি ও তাহার ইতিহাস এবং কৃতিত্ব বিচার করিয়া, উপস্থিত সংকট-কালে তাহার মানসিক চর্চা সম্বন্ধে এই কয়টি কথা বলা যায়—

[১] বাঙ্গালী ভাব-প্রবণ জাতি, ইহা সত্য বটে,—কিন্তু এই ভাব-প্রবণতাই তাহার পূর্ণ পরিচয় নহে। বাঙ্গালী লক্ষণীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু সেই সাহিত্য, জগতে এমন অপূর্ব কিছু বস্তু নহে;—তাহার প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে গোটা পঞ্চাশেক কি শতখানেক বৈষ্ণব পদ এবং কতকগুলি আখ্যায়িকা, এবং আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে কতকটা মধূসূদনের কাব্যাংশ, বঙ্কিমের খানকয়েক উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধ ও অন্য রচনা—মাত্র এই কয়টি জিনিস আমরা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থাপিত করিতে পারি। ভাটিয়া বা মারোয়াড়ী, অথবা পাঞ্জাবী বা হিন্দুস্থানীর তুলনায় বাঙ্গালী ব্যবসায়-বাণিজ্যে তেমন সুবিধা করিতে পারিতেছে না; ইহার কারণ নির্দেশ করিবার জন্য অমনিই সিদ্ধান্ত করা হইল, বাঙ্গালী কবি জাতি, ভাব-প্রবণ জাতি তাহার মধ্যে কর্মশক্তি নাই, তাহার উৎসাহ ও উদ্যোগের সমস্তটাই ভাবুকের খেয়ালে, কবির কল্পনায় নিঃশেষিত হইয়া যায়। আমরাও এই কথাটা যেন পাকে-প্রকারে মানিয়া লইয়াছি; রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির পর হইতে, আমাদের সাহিত্যের সম্বন্ধে বেশ সচেতন গৌরব-বোধ আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, একটা গর্ব-সুখে আমাদের চিত্ত ভরিয়া গিয়াছে। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গান কার্য্যতঃ ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-সংগীত রূপে গৃহীত হইয়া গিয়াছে। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে মারোয়াড়ীর মতো কৃতিত্ব আমাদের মধ্যে না দেখিয়া, সকলেই আমাদের কল্পনা-শক্তিরই তারিফ করিতেছে; আমরাও সেই কথা সত্য ভাবিয়া, প্রেমানন্দে নাচিতেছি,—আমাদের ব্যর্থতাকে আমরা কেবল আমাদের প্রতিকূল অবস্থা দৈব-দুর্বিপাক হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহার প্রতিকারের শক্তিকে খর্ব করিতেছি। আমাদের দেশের নেতারা কেহ-কেহ সাহিত্যে, কীর্তনের গানে, আমাদের ভাবুক প্রাণের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে বলিয়া প্রচার করিতেছেন। কবিতা ও গান, ইহা-ই যেন হইল আমাদের মানসিক সংস্কৃতির চরম ফল। বার-বার একটা কথা শুনিয়া, সেই কথা ক্রমাগত মন্ত্রের মতো জপ করিয়া, আমরা সেই কথাটাকে সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতেছি।

কিন্তু বাস্তবিক এই কথাটাই কি ঠিক? আমরা কি কেবল ভাব-প্রবণ জাতি? আমাদের মধ্যে কি জ্ঞানের সাধনা, কর্মের সার্থকতা নাই—হয় নাই? আমার মনে হয়—ভাবুকতা, কল্পনা-প্রবণতা, সাহিত্য-রসে মশগুল হইয়া থাকা—ইহা আমাদের মানসিক সংস্কৃতির একটা দিক্ মাত্র—ইহ সর্বপ্রধান দিক্ও নহে। প্রাচীনকালে কীর্তনের সভায় ও কবি বা পাঁচালী-গানের আখড়ায়, বাউলের জমায়েতে ও মারফতী গানের মজলিসে যেমন বাঙ্গালীর সংস্কৃতি প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি পণ্ডিতের টোলে এবং বিচার-সভায় তাহার জ্ঞানের দিক্‌টা প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষের জ্ঞান-মন্দিরে বাঙ্গালী রিক্ত-হস্তে যায় নাই। ভারতের সংগীতোদ্যানে বাঙ্গালা কীর্তন একটি বিশিষ্ট সুরভি পুষ্প, সন্দেহ নাই; কিন্তু নব্য ন্যায়, বাঙ্গালার সংস্কৃত কাব্য, বাঙ্গালার বৈষ্ণব-গোস্বামীদের সংস্কৃত গ্রন্থাবলী; বাঙ্গালার মধুসূদন সরস্বতী, এবং আধুনিক কালে বাঙ্গালার রামমোহন, বাঙ্গালার বিদ্যাসাগর, বাঙ্গালার কেশবচন্দ্র সেন, বাঙ্গালার

বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বাঙ্গালী গবেষক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক—ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাড়াইতে ও ভারতের চিন্তাকে পুষ্ট করিতে ইহাদের দান কম নয়; ইঁহারা বাঙ্গালার মানসিক সংস্কৃতির অপর একটি দিক্—নিছক ভাব-প্রবণতার অত্যাবশ্যক প্রতিষেধক দিক্‌কে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দুর এখন জীবন-মরণ সংকট উপস্থিত; আমাদের ভাবুকতা, কল্পনা-প্রবণতা সব-ই শুখাইয়া যাইতেছে এবং অন্নের অভাবে তাহা আরও শুখাইয়া যাইবে। জাতির জীবনের স্ফুর্তি, আশা, আনন্দ, উৎসাহ, জয়ের আগ্রহ না থাকিলে, সেই জাতির মধ্যে সত্যকার প্রাণবন্ত সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। আমাদের এখন সাহিত্য-সৃষ্টির সাহিত্য-চর্চার চেষ্টা, কল্পনার আবাহন, ভাবুকতার সাধন,—সে যেন যে গাছের গোড়া শুখাইয়া আসিতেছে, শিকড়ে যাহার রস নাই, সেই গাছের আগডালে বারি-সেচন করা। আমাদের জীবনে ভোগ করিবার, ত্যাগ করিবার কী আছে? অর্জন করিবার, জয় করিবার কী আছে? যেটুকু আছে, তাহা তো রক্ষা করিবারও পথ পাইতেছি না। এ অবস্থায় কি প্রকারের সাহিত্য আমাদের হাত দিয়া বাহির হইতে পারে? বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে আগুন লাগিয়াছে; রসচর্য্যা লইয়া মাতামাতি করা এখন তাহার পক্ষে নিতান্তই অশোভন দেখায়। এখন প্রাণধারণের, দুর্দিনের রাত্রি কোনও রকমে টিকিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। এখন তাহাকে সর্ব বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। এখন তাহার আত্মবিশ্লেষণ-কার্য্যে তাহাকে জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তির আবাহন করিতে হইবে; যে শক্তির পরিচয় সে দিয়াছে, সে শক্তি তাহার আছে, এবং সে শক্তি তাহার কল্পনা বা ভাবুকতা হইতে কোনও অংশে কম নহে।

[২] প্রত্যেক সমাজের মধ্যে দুই প্রকারের কার্য্য করে—কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রাপসারী, আত্মসমাহিতকারী এবং আত্মপ্রসারকারী; এই দুইয়ের সামঞ্জস্যে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয়। কবিত্ব ও কল্পনাশক্তির অনুপ্রেরণায় বাঙ্গালী সম্প্রতি একটু বেশি রকম করিয়া বর্হির্মুখী হইতে চাহিতেছে। এখানে জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া তাহাকে একটু অন্তর্মুখী করা, এখন তাহার প্রাণরক্ষার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিস্ফুরণের দোহাই দিয়া, ব্যক্তিগত জীবনে অবাধ স্বাধীন গতি এই কেন্দ্রাপসারিত্বের একটি বাহ্য প্রকাশ। কিন্তু সমাজ-গত সমষ্টির বিভিন্ন অংশ-স্বরূপ ব্যক্তিগত ব্যষ্টি, যদি এই রূপে মুক্ত, স্বতন্ত্র ও সংঘ-বিচ্যুত হইয়া অবাধ গতি অবলম্বন করিয়া চলিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সমাজ-সমষ্টি আর সমষ্টি-বন্ধ থাকে না। এক কথায়, Social Discipline বা সমাজগত চর্যা বা নীতি বা বিনয় না থাকিলে, সমাজ ও জাতি টিকিতে পারে না। এখন বাঙ্গালীর জীবনে বাহিরের ও ভিতরের নানা প্রতিকূলতার বিপক্ষে সংগ্রাম শুরু হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তিত্বের অবাধ প্রসারের সময় ইহা নয়; একমাত্র সংঘ-গতভাবে অবস্থান দ্বারাই ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন ও স্বার্থ উভয়-ই রক্ষিত হইতে পারে। বাঙ্গালীর জীবনে এই রক্ষয়িত্রী শক্তির উজ্জীবন করিতে হইবে,—আবার সমাজকে, সংঘকে, জাতিকে ব্যক্তি বা ব্যষ্টির ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হইবে। কি ভাবে এ কার্য্য করা উচিত, তাহা অবশ্য বিচার-সাপেক্ষ। রক্ষয়িত্রী শক্তি অর্থে নিছক গোঁড়ামি নহে। দেশ ও কালের উপযোগী ভাবে, নিজ জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি হইতে বিচ্যুত না হওয়া-ই হইতেছে সামাজিক জীবনে কার্য্যকর রক্ষণশীলতা। এ কাজের জন্য প্রথম আবশ্যক—জ্ঞান, আলোচনা, অনুশীলন; নিজের জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে, এবং বাহিরের জগতের প্রগতি বিষয়ে। বাঙ্গালীকে আবার একটা বাঁধা-ধরা discipline মানিতে হইবে—'ন্যায় আঁকড়িয়া' হইয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে রাশ ছাড়িয়া দিলে, তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় বলিতে হইবে।

[৩] বাঙ্গালী কর্মী নহে, তাহার এই একটা অপবাদ আছে। সত্য বটে, হাজারে হাজারে লাখে-লাখে বাঙ্গালী অন্ন-উপার্জনের জন্য বাঙ্গালাদেশ ছাড়িয়া বাঙ্গালার বাহিরে যায় নাই—যেমন পাঞ্জাবী বা হিন্দুস্থানীরা বাঙ্গালায়

আসিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, এতাবৎ বাঙ্গালীর ঘরে একমুঠা ভাতের অভাব হয় নাই। সেদিন পর্য্যন্ত মধ্যবিত্ত ঘরের অন্নচিন্তা ছিল না। গরীব লোকে দেশে বসিয়াই পেট ভরাইতে পারিত, বা আধ-পেটা খাইয়া কোনও রকমে থাকিতে পারিত, ১৫/২০ টাকার জন্য কাঁচা মাথা দিবার আবশ্যকতা তাহার ছিল না, 'রুটী-অর্জন' করিতে বাহিরে ছুটিতে হইত না। এখন সে আবশ্যকতা আসিতেছে। আমার মনে হয়, তথাকথিত ভাব-প্রবণ বাঙ্গালী, কবি বাঙ্গালী এখন দরকার পড়িলে কর্মী বাঙ্গালী হইতে পিছপাও হইবে না। আবশ্যকতা পড়িয়াছে বলিয়াই ময়মনসিংহের বাঙ্গালী কৃষক এখন ঘর ছাড়িয়া আসাম প্রদেশ ছাইয়া ফেলিতেছে, বর্মা ও শ্যামে গিয়া বসবাস করিতেছে। দেখা গিয়াছে, কার্য্যক্ষেত্রে বাঙ্গালী অন্য জাতির লোকেদের চেয়ে কিছু কম কৃতিত্ব দেখায় নাই। মানুষের কর্ম-শক্তি তাহার আভ্যন্তর urge বা তাড়নার উপরে নির্ভর করে। বাঙ্গালীর অবস্থা বৈগুণ্যে সে তাড়না আসিতেছে। বাঙ্গালীকে নূতন করিয়া শ্রমী ও কর্মী হইতেই হইবে। 'তুমি কবি ও ভাবুকের জাতি, তোমার দ্বারা এসব কিছু হইবে না',—এইরূপ নিরুৎসাহ বাক্যে তাহার শত্রুরাই তাহাকে নিবৃত্ত করিবে।

[৪] বাঙ্গালীর বাঙ্গালীপনার বা বাঙ্গালীত্বের দিকে ঝোঁক দিয়া কেহ-কেহ তাহাকে অসম্ভব রকমে বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার মনে শক্তি জাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালীর মতন শিল্পী জাতি দুনিয়ায় নাই—প্রমাণ, বাঙ্গালী পটুয়ার পট, বাঙ্গালী ছুতারের কাঠ-খোদাই, মধ্য-যুগের বাঙ্গালার ইটে-কাটা মন্দিরের নক্‌শা; বাঙ্গালীর নাচ অপূর্ব—প্রমাণ, বাঙ্গালীর মল্ল-নৃত্য; রায়বেশে নাচ, বাঙ্গালার কোনও-কোনও জেলার মেয়েদের মধ্যে বিলোপ-শীল ব্রত-নৃত্য। আমাদের দেশের গ্রাম-শিল্পকে আমরা প্রাণ দিয়া ভালোবাসিব, যতটা সাধ্য তাহাকে রক্ষা করিব; এই শিল্প আমাদের গ্রামীণ জীবনের একটি মনোহর অভিব্যক্তি; কিন্তু তাই বলিয়া জগতের অন্য সমস্ত শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর জিনিসকে টেক্কা দিয়াছে আমাদের বাঙ্গালার এই শিল্প ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, এরূপ কথা প্রত্যেক চিন্তাশীল বাঙ্গালীর মুখে হাস্যের উদ্রেক করিবে। সাহিত্যে একজন রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গমাতা অঙ্কে ধারণ করিয়াছেন, তাই বলিয়া যেমন ইহা প্রমাণিত হয় না যে, বাঙ্গালী মাত্রই কবি, তেমনি একজন অবনীন্দ্র বা নন্দলাল ভারতীয় নিজ হস্ত হইতে তুলিকা পাইয়াছেন বলিয়া, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির শিল্প-বিষয়ে অসাধারণত্ব সূচিত হয় না।

আমরা ভারতের আর পাঁচটি জাতির মতোই একটি প্রধান ভারতীয় জাতি। আমাদের ভাবুকতা আছে, আমাদের বুদ্ধি আছে, আমাদের যথেষ্ট শিল্প-বোধ আছে; ভারতের সভ্যতার ভাণ্ডারে হাত পাতিয়া আমরা কেবল লই নাই, দিয়াছিও যথেষ্ট; আমাদের সাহিত্য, আমাদের সংগীত, আমাদের বিদ্যা, গবেষণা ও আবিষ্কার, আমাদের হিন্দু-যুগের ও মধ্য-যুগের মন্দির-শিল্প ও ভাস্কর্য্য, পট ও ইটে-খোদাই,—এসব গর্ব করিবার বস্তু, ভারতের সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট প্রকাশ-স্বরূপ এগুলি বিশ্বজন-সমাজে দেখাইবার যোগ্য; এবং আমাদের সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব কোনও-কোনও বিষয়ে বিশ্বজনও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছে ও করিবে; এইখানেই আমাদের পূর্ণ সার্থকতা। আমরা অনুচিত গর্ব করিতে চাহি না; তবে যে কোনও অবস্থায় আমরা যে অকৃতকার্য্য হইব না, আমরা পূর্ব কৃতিত্ব আলোচনা করিয়া সেইটুকু আত্মবিশ্বাস আমাদের প্রত্যেকের মনে আনিতে চাহি।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। শেষ এই কথা বলি—অনার্য্য এবং আর্য্য পিতৃপুরুষ ও সংস্কৃতি-গুরুদের নিকট হইতে আমরা বাঙ্গালীরা যে মনঃপ্রকৃতি পাইয়াছি, তাহা নিন্দার নহে; আমাদের নৈসর্গিক পারিপার্শ্বিক ও ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া আমাদের মধ্যে যে সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনও পূর্ণাঙ্গ হয় নাই—আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম দিয়া তাহাকে প্রবর্ধমান করিয়া তুলিতে হইবে। উপস্থিত আমাদের মানস-প্রকৃতিতে কল্পনা ও ভাবুকতা এবং

রসানন্দের দিকে ঝোঁক না দিয়া, আত্মরক্ষার জন্য আমাদের জ্ঞান ও কর্মের দিকেই বেশি করিয়া ঝোঁক দিতে হইবে—ইহাই আমার নিবেদন।

৩.১ প্রাবন্ধিক পরিচিতি ঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ২৬.১১.১৮৯০— মৃত্যু ২৯.৫.১৯৭৭)

প্রখ্যাতভাষাতত্ত্ববিদ ও জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হাওড়ার শিবপুরে। পিতার নাম হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ ও ১৯১৩ খ্রীঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে এম.এ পাশ করার পর কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। পরের বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের ইংরেজীর অধ্যাপক হয়ে ১৯১৯ খ্রীঃ পর্যন্ত কর্মরত থাকেন। ইতিমধ্যে ১৮১৮ খ্রীঃ সংস্কৃতের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়েই তিনি বেদকে ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিতে বুঝতে চেষ্টা করেন। আদ্য-মধ্যের দাবি ছাড়িয়ে নিজের তাগিদে নিরুক্ত, পাণিনি, পতঞ্জলির সঙ্গে এসে যুক্ত হল দুটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ঃ পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ এবং ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত। এই সময়ে 'An essay towards an Historical and comparative Grammar of the Bengali Language' বিষয়ে 'The Sounds of Modern Bengali' নামে গবেষণাপত্র প্রস্তুত করে ‘প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ’ বৃত্তি ও 'Comparative Philology with Special reference to the Bengali Dialeces' প্রসঙ্গে গবেষণার ফলস্বরূপ ‘জুবিলি’ গবেষণা পুরস্কার পান। তিনি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'Origin and Development of Bengali Language'। পরবর্তীতে এই নামে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের (১৯২৬)পরে সারা বিশ্বে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। লন্ডনে তিনি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের কাছে ধ্বনিতত্ত্ব, প্রাকৃত, পুরনো আইরিশ ভাষা পড়েন। পরে প্যারিসে সরবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় আর্যভাষাতত্ত্ব, স্লাভ ও ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষাতত্ত্ব, অস্ট্রো-এশিয় ভাষাতত্ত্ব, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার ইতিহাস ইত্যাদি পড়েন ও গবেষণা করেন। ১৯২৭ খ্রীঃ তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও ও শ্যামদেশ ভ্রমণে যান। তাঁর ‘দ্বীপময় ভারত’ গ্রন্থটিতে সে সময় ও সে সব দ্বীপ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আছে। ১৯৩৫ খ্রীঃ ইউরোপের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে লোকগাথা সংগ্রহ করেন। বাল্টিক রাজ্যগুলির জাতিগোষ্ঠির ওপর তাঁর লিখিত পুস্তিকা সেখানে ভ্রমণকালে খুব সমাদৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ‘ভাষাচার্য্য’ উপাধি দেন। তবে শুধু ভাষাতত্ত্ব বা ভাষাবিজ্ঞান নয়, সাহিত্য দর্শন, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের প্রায় সমস্ত শাখাতেই তিনি নিজের প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অনুসন্ধিৎসা ছিল। হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নের সহযোগিতায় তিনি চন্ডীদাসের প্রামান্য সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইংরেজীতে জয়দেবের পরিচিতি লেখেন এবং বিশ্ব সাহিত্যের পটভূমিকায় রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচার করেন। শেষজীবনে ‘রামায়ণ’ এর উৎস সম্বন্ধে তাঁর রচনা ও আলোচনা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সঙ্গীত, চিত্রকলা বিষয়েও তাঁর অসীম আগ্রহ ছিল। বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল : ‘দ্বীপময় ভারত’ (১৯৪০); ‘ইউরোপ’ (১৯৩৮), ‘ইউরোপ ভ্রমণ’ (প্রথম খণ্ড : ১৯৩৮); দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯৪৫), ‘সাংস্কৃতিকী’ (প্রথম খণ্ড : ১৯৬১, দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯৬৫) ; তাঁর আত্মজীবনী ‘জীবন কথা’ প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে, মৃত্যুর পরে।

৩.২ প্রবন্ধ সংক্ষেপ ঃ

মোগল যুগ চলাকালীনই বাংলাদেশে ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতি আসে। পরবর্তী সময়ে ইংরেজও এদেশে আসে ও এখানে ক্ষমতায় আসীন হয়। ইংরেজদের সঙ্গে বাঙ্গালির সাহচর্য্যে বাংলা সংস্কৃতিতে যে যুগান্তর আসে, তা এখনও চলছে। এই যুগান্তরের চারিটি পর্য্যায় বা ক্রম দেখা যায়—

(১) রামমোহন যুগ—ইউরোপীয় মনের সঙ্গো বাঙালি মনের প্রথম পরিচয়ের সময় প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। রামমোহন এই যুগের প্রতীক, তিনি উপনিষদের সঙ্গো ইউরোপীয় চিন্তার সামঞ্জস্য সাধন করেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় সমাজের গতিশীলতার বোধটি না থাকায় এই সামঞ্জস্য ঠিক পথ পেল না। তিনি নিজেও ব্যক্তিজীবনে বৈরাগ্যযুক্ত না হওয়ায় লোকপূজিত ধর্মগুরু হতে পারেন নি।

(২) ইয়ং-বেঙ্গল এর যুগ—দ্বিতীয় যুগে কিছু তীক্ষ্ণধী বাঙালি যুবক প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার সঙ্গো অপরিচয়ের ফলে এর প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে। তারা নানাভাবে ইউরোপীয় রীতিনীতি জীবনযাত্রার প্রণালী ভারতবর্ষের ওপর আরোপ করতে চাইল। একাজে তারা সাফল্য না পেলেও এখানকার ইংরেজী শিক্ষিত বা শিক্ষাকামী জনগনের মনে তারা একটা ছাপ রাখতে পেরেছিল।

(৩) বঙ্কিম-ভূদেব-বিবেকানন্দ যুগ—এই যুগে (১৮৬০-১৯০০) প্রাচীন ভারতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গো ইউরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ জিনিসের মিশ্রণে যথার্থ সাংস্কৃতিক সমন্বয়সাধনের চেষ্টা হয়েছিল। ইউরোপীয় সভ্যতা তখনও এত সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠেনি। ফলে সে সময়ে বঙ্কিম-ভূদেব-বিবেকানন্দে বাঙালির পক্ষে হিতকর, আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধকর কথা পাওয়া যায়। সমীক্ষা ও অনুশীলন ছিল বলেই বঙ্কিম-মধুসূদন বাঙালির জন্য চিরন্তন রস সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

(৪) অতি আধুনিক যুগ বা লড়াইয়ের পরের যুগ—এই যুগের মূল কথা, বাঙালির জীবনে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রচন্ড আঘাত, বাঙালির জীবনে ক্রমবর্ধনশীল অর্থনৈতিক অবনতি ও তার আনুষঙ্গিক মানসিক ও নৈতিক অবনমন এবং আদর্শ-বিপর্যয়। হিন্দু-মুসলিম বিরোধ ও এই আর্থিক অবনতির এক প্রধান কারণ, অর্থনৈতিক সংকট বাঙালির সামাজিক আদর্শকেও প্রভাবিত করেছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ে বাঙালি, ইংরেজী শিখে ইংরেজের আনুগত্য করেছে। ফলে তার অর্থনৈতিক সংকট ছিল না। সমগ্র ভারতের সম্মান ও সে পেয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বাঙালি বাইরে থেকেও বিতাড়িত, নিজভূমেও পরবাসী। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান মিলিতভাবে যে সংস্কৃতি ও সাহিত্য গড়ে তুলেছিল, তারও মূলোৎপাটনের চেষ্টা হচ্ছে বিনাশধর্মী সাম্প্রদায়িক মুসলমান মনোভাবের ফলে। এই পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গো মানিয়ে নিতে না পেরে ও যথার্থ চিন্তা নেতার অভাবে বাঙালি ক্রমশঃ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তবে এই অবস্থার মধ্যেও বাঙালি মহান সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করছে। কিন্তু যথার্থ জীবনীশক্তির অভাবে অল্প কয়েকজনের কথা বাদ দিলে সেই চেষ্টা সার্থক হচ্ছে না। বাঙালির মানসিক চর্চা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যায়—

(ক) বাঙালি ভাব-প্রবণ জাতি একথা সত্যি হলেও ভাবপ্রবণতাই বাঙালির একমাত্র পরিচয় নয়। প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে শতেক বৈষ্ণবপদ ও কিছু আখ্যায়িকা, আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে মধুসূদনের কিছু কাব্য, বঙ্কিমের কিছু উপন্যাস ও রবীন্দ্রসাহিত্য—এটুকুই বাঙালির লক্ষ্যনীয় সাহিত্যকীর্তি। কিন্তু অন্য প্রদেশের মানুযের তুলনায় বাঙালি ব্যবসার ক্ষেত্রে সুবিধা না করতে পারার জন্য, বাঙালিকে কল্পনাপ্রবন ভাবুক জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তি আমাদের নিজেদেরও গর্বিত করেছে, ফলে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে আমরা দৈব-দুর্বিপাক বলে মনে করেছি। সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই আমাদের ভাবুক প্রাণের চরম প্রকাশ ঘটেছে—এই প্রচারকে আমরা বাঙালিরাও সত্য বলে মনে করতে শুরু করেছি।

কিন্তু বাস্তবত আমরা জ্ঞানের সাধনাহীন, কর্মহীন—শুধুই ভাবপ্রবণ জাতি নই। কল্পনা প্রবণতা আমাদের মানসিক সংস্কৃতির একটি দিক মাত্র। প্রাচীনকালে কীর্তন, কবি, পাঁচালীগানের আখড়ায় যেমন বাঙালি সংস্কৃতির

প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি পণ্ডিতের টোলেও বাঙালির জ্ঞানের দিকের প্রকাশ ঘটেছে। বাংলার নব্যন্যায়, সংস্কৃত কাব্য, মধুসূদন সরস্বতী বা আধুনিক কালে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশব সেন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য গবেষক, প্রত্নতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিকদের দান ভারতের জ্ঞানের ধারাকে পুষ্ট করেছে। বর্তমানে বাঙালি হিন্দুর সংকট উপস্থিত। তার কল্পনাশক্তি লুপ্ত হচ্ছে, ফলে এখন সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা সফল হবে না। এই সংকটকালে সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা করাও অশোভনীয়। এখন প্রয়োজন, বাঙালির যে জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তি আছে, তার অনুশীলন।

(খ) প্রত্যেক সমাজের মধ্যে যে কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রাপসারী, দুই প্রকার শক্তি কাজ করে, তার সামঞ্জস্য সাধনেই কল্যাণ। বাঙালির অতিরিক্ত বহির্মুখী প্রবণতাকে এখন কিছুটা অন্তর্মুখী করা প্রয়োজন। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের দোহাই দিয়ে বহির্মুখীনতাকে প্রশ্রয় দিলেও সমষ্টিগত উন্নয়নে উল্টোটাই প্রয়োজন। সমষ্টিগত চর্যা ছাড়া সমাজ টিকতে পারে না। বর্তমানে বাঙালিকে ব্যক্তিস্বার্থের ওপরে সমাজস্বার্থকে স্থান দিতে হবে। দেশ-কালের উপযোগী নিজ সংস্কৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেই সংকট থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে হবে। একাজের জন্য প্রয়োজন নিজ জাতীয় ইতিহাস-সংস্কৃতি ও অপরের প্রগতিশীলতা সম্বন্ধে জ্ঞান আলোচনা ও অনুশীলন।

(গ) কর্মী নয় বলে বাঙালির একটা অপবাদ আছে, কারণ নিজভুমে ভাতের অভাব না হওয়ায় অন্য প্রদেশের মানুষের মত বাঙালিকে দেশছাড়া হতে হয়নি। কিন্তু প্রয়োজনে বাঙালি তা পারে, তার প্রমাণ ময়মনসিংহের বাঙালি কৃষক এখন আসাম, বর্মা, শ্যামদেশে কাজের প্রয়োজনে যাচ্ছে। বাঙালির মধ্যে এই যে কর্মশক্তির তাড়না আসছে, তাকে উৎসাহিত করা উচিত। 'কবি ও ভাবুকের জাতি' আখ্যা দিয়ে নিরৎসাহিত করা উচিত নয়।

(ঘ) কেউ কেউ আবার বাঙালির বাঙালিত্বের দিকে ঝোঁক দিয়ে তার শক্তি জাগাবার চেষ্টা করছে। তারা বলছেন, বাঙালি বিশ্বের সেরা শিল্পী জাতি। কিন্তু এই দাবী হাস্যকর, যদিও বাংলার শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে মনোহরত্ব আছে। বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ বা শিল্পে নন্দলাল বসু আছেন বলেই প্রমাণ হয় না যে সমস্ত বাঙালি জাতিই কবি বা শিল্পী।

ভারতের অন্যান্য জাতির মত বাঙালি ও একটি প্রধান জাতি। আমাদের ভাবুকতা, বুদ্ধি, শিল্পবোধ সবই আছে। ভারতের সভ্যতায়, সাহিত্যে, সংগীতে বিদ্যায়, গবেষণায় শিল্পে, ভাস্কর্যে বাঙালির দান বিশ্বজনের মাঝেও কৃতিত্বের। বিশ্ব তা কিছু পরিমাণে স্বীকারও করেছে। তবে এ নিয়ে আমরা অনুচিত গর্বও যেমন করব না, তেমনি যে কোনো অবস্থায় আমরা যে কৃতকার্য হতে পারি, এ আত্মবিশ্বাসও আমাদের থাকা উচিত।

শেষের কথা এই যে, অনার্য এবং আর্য পূর্বসূরিদের থেকে বাঙালি যে মনন পেয়েছে তা নিন্দার নয়। নৈসর্গিক চারিপাশ ও ইতিহাসকে আশ্রয় করে আমাদের মধ্যে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা এখনো পূর্ণ হয়নি—আমাদের জ্ঞান ও কর্ম দিয়ে তাকে পুষ্ট করতে হবে। বর্তমান সময়ে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কল্পনা ভাবুকতার তুলনায় জ্ঞান ও কর্মের দিকেই আমাদের ঝোঁক হওয়া উচিত। এই আমার নিবেদন।

৩.৩ প্রবন্ধ বিশ্লেষণ

'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধটি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাঁচীতে 'হিন্দু ফ্রেন্ডস্ ইউনিয়ন ক্লাব' কর্তৃক আহূত সাহিত্য-সম্মেলনে (কার্তিক ২১, ১৩৪১) সভাপতি হিসেবে ভাষণ দেন। পরে স্বল্প সংযোজন সহ ১৩৪১ বঙ্গাব্দের মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যার 'বঙ্গশ্রীর' পত্রিকাতে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে এটি সহ মোট সাতটি প্রবন্ধ নিয়ে 'জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য' নামে প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তিনটি সংস্করণের পর এই প্রবন্ধটি বাকী পাঁচটি

প্রবন্ধের সঙ্গো 'ভারত-সংস্কৃতি' নামে প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশ নিয়ে এখানে বিশ্লেষণ করা হবে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' নামে তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে বাঙালি জাতির গঠন, বাঙালি সংস্কৃতির নানা দিক ও বাঙালির সাহিত্যিক প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর আরো আলোচনা পাওয়া যাবে বিশেষ করে 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' এবং 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস' প্রবন্ধগ্রন্থে। 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশে প্রাবন্ধিক মূলতঃ দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমটি হল, বাংলাদেশে ইংরেজদের আসার পরে ইংরেজদের সঙ্গো সংস্পর্শে বাঙালি সংস্কৃতির বিবর্তন। দ্বিতীয়টি হল—বাঙালির তথাকথিত ভাবালু পরিচয় পরিত্যাগ ও জ্ঞান এবং কর্মানুশীলনে মনোযোগী হওয়া।

প্রথম অংশের বক্তব্যে প্রাবন্ধিক উনিশ শতকের প্রথম থেকে প্রবন্ধ রচনা পর্যন্ত সময়কালকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। কারণ তাঁর মতে ইংরেজদের সঙ্গো বাঙালির সাহচর্যে বাঙালি সংস্কৃতির যে পরিবর্তন, তা চারটি আলাদা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে গেছে। এই চারটির মধ্যে প্রথম পর্যায়কে তিনি বলেছেন—রামমোহন যুগ। তাঁর মতে ইংরেজদের সঙ্গো বাঙালি সাহচর্যের প্রথম যুগের যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যের মূর্ত সংকটে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতেও অকৃতদার পুরুষ ও কুমারী মেয়ের সংখ্যা বাড়তে দেখা যাচ্ছে।

বাংলা সংস্কৃতির এই চারটি পর্যায় সম্বন্ধে আলোচনা করে প্রাবন্ধিক মতপ্রকাশ করেছেন যে, একদিকে বুদ্ধিমান জাতি বলে বাঙালির খ্যাতি আছে, অন্যদিকে ইংরেজী ভাষা শিখে ইংরেজদের আনুগত্য করে আসায় একটা বড় সময় ধরে বাঙালি অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাও পেয়েছে। ফলে সম্মান এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা দুইই বাঙালির ছিল। কিন্তু বাঙালির সে সুখের দিন আর নেই, একদিকে অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হয়েছে অন্যদিকে বাঙালি হিন্দু এবং মুসলমান মিলে যে বাংলা সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছিল, আজ তাকেও ভাগ করার চেষ্টা চলছে। এই অবস্থায় বাঙালি যদি আগের মত মহৎ সাহিত্য সৃষ্টিকেই প্রধান কাজ বলে মনে করে তবে তা সফল হবে না।

প্রবন্ধের প্রথম অংশ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এই যে, তিনি চারটি পর্যায়ে ভেঙে বাঙালির সংস্কৃতির বিকাশ নিয়ে যে ব্যাখ্যা করেছেন তা সাধারণভাবে গ্রাহ্য। তবে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি বা নির্দিষ্টভাবে বললে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি-শিক্ষা নিয়ে তাঁর দুর্বলতা আছে সেটি চারটি পর্যায়ের আলোচনা থেকেই পরিস্কার। প্রথম পর্যায় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সেকারণেই বলেন সে সময় বাঙালির 'ভারতের প্রাচীন শিক্ষায় সুশিক্ষিত মন' ছিল, ফলে তাঁরা সাবধানী হতে পেরেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে 'প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার সহিত পরিচয়ের অভাবে' এই পর্যায়ের বাঙালি ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে নির্বিচারে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। আর তৃতীয় পর্যায়কে তিনি যাদের নামে নামাঙ্কিত করেছেন তাঁদের মধ্যে বিবেকানন্দ সরাসরি হিন্দু পুনরুত্থানবাদের নেতা ছিলেন, আর বঙ্কিমচন্দ্রও হিন্দুত্বের ভিত্তিতে একটি জাতীয়তাবাদ তৈরি করতে চেয়েছিলেন তা আজ বহু গবেষক দেখিয়েছেন।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে প্রাবন্ধিক বাঙালিকে জ্ঞান ও কর্মমুখী করে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর মতে 'বাঙালি ভাবপ্রবণ জাতি' এই প্রচারের মধ্যে অত্যুক্তি আছে। বহুল প্রচারের ফলে বাঙালি নিজেও এ কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, সে শুধুই ভাবপ্রবণ জাতি, কারণ বাঙালি বঙ্কিমচন্দ্রের গান রাষ্ট্রীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে, বাঙালি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পাচ্ছেন। ফলে যেন কবিতা আর গানই বাঙালির মানসিক সংস্কৃতির চরম ফল। কিন্তু এই প্রচার ঠিক নয়। ভাবুকতা, কল্পনা প্রবণতা, সাহিত্য প্রীতি—এগুলি বাঙালির মানসিক সংস্কৃতির একটা দিক মাত্র।

প্রাচীন কালে সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা দিকে বাঙালি যেমন কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তেমনি পণ্ডিতের টোল থেকে বিচারসভায়, দর্শনে, প্রত্নতত্ত্বে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বাঙালির জ্ঞানের দিকও প্রকাশ পেয়েছে। এখন বাঙালি হিন্দুর প্রবল সংকট উপস্থিত। এই সময়ে সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা ত্যাগ করে জ্ঞান ও কর্মশক্তির আবাহন করা উচিত।

রামমোহন রায় উপনিষদের সঙ্গে ইউরোপের চিন্তার একটা সামঞ্জস্যসাধন তিনি করতে চেয়েছিলেন এটি প্রাবন্ধিকের মতে যথাযথ প্রচেষ্টা হলেও উপনিষদেই যে ভারতের সভ্যতার শেষ নয়, ভারতের সভ্যতা যে গতিশীল এই বোধ রামমোহন বা তাঁর অনুগামীদের ছিল না। এদেশের মানুষের কাছে রামমোহনের পূজনীয় না হয়ে ওঠার কারণ হিসেবে তিনি মনে করেছেন যে, এদেশের মানুষ বৈরাগ্য চিত্ত যুক্তদেরই ধর্মগুরু হিসেবে পুজো করে, যে চিত্তের অধিকারী ছিলেন না রামমোহন।

দ্বিতীয় পর্যায়কে প্রাবন্ধিক বলেছেন 'ইয়ং বেঙ্গালের যুগ', তাঁর মতে এই সময় কিছু তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার সঙ্গে পরিচয়ের অভাবে ইউরোপের সমস্ত কিছুকে অন্ধভাবে অনুকরণ করতে শুরু করল। তারা ভারতীয় সমাজকে ইউরোপের আদলে বদলে দিতে চাইল। প্রাবন্ধিকের মতে 'ইয়ং বেঙ্গালের' সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের এমন শক্তি বা সংখ্যা ছিল না, যাতে তারা তৎকালীন সমাজকে ওলট-পালট করে দিতে পারে। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত বা ইংরেজী শিক্ষাকর্মী মানুষদের মধ্যে ইয়ং বেঙ্গালের চিন্তাধারা কিছু ছাপ রেখে যেতে পেরেছিল।

তৃতীয় পর্যায়কে প্রাবন্ধিক যথার্থ সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের যুগ বলে বর্ণনা করেছেন এবং এ পর্যায়ের নামকরণ করেছেন বঙ্কিম-ভূদেব-বিবেকানন্দের নামে। তাঁর মতে উনিশ শতাব্দীর ছয়ের দশক (১৮৬০) থেকে বিশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত সময়ে ইউরোপীয় সভ্যতা, প্রবন্ধ রচনার সময়কালের মত সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠেনি। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বা স্বামী বিবেকানন্দের মত ব্যক্তিরা প্রাচীন ভারতের শিক্ষণীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সমসাময়িক ইউরোপীয় প্রগতিশীল ঐতিহ্যের এক ধরণের সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিলেন, যা বাঙালির পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছিল। এই সমন্বয়কে অনুভব এবং অনুশীলন করেছিলেন বলেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাঙালির জন্য এমন চিরস্মরণীয় সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

চতুর্থ পর্যায়কে প্রাবন্ধিক বলেছেন 'অতি আধুনিক যুগ' বা 'লড়াইয়ের পরের যুগ' অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কে তিনি এই নামে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে এই সময়ের মূল বৈশিষ্ট্য ইউরোপীয় সভ্যতার ভয়ানক আগ্রাসী রূপ। এই সময়ে বাঙালির জীবনেও অর্থনৈতিক অবনতি ও তার আনুষঙ্গিক মানসিক ও নৈতিক অবনমন দেখা গেল। এর সাথে ঘটনা হিসেবে যুক্ত হয়েছিল হিন্দু-মুসলিম বিরোধ। প্রাবন্ধিকের মতে এই সময়ে বাঙালি জীবনে যে ইউরোপীয় প্রভাবের প্রচন্ডতা, তা অবশ্যম্ভাবী ছিল। কারণ সংবাদপত্র সাহিত্য ইত্যাদির বহুল প্রচারের হাত ধরে ইউরোপের জীবন বাঙালির আজ অতি পরিচিত। এই সময়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল অর্থনৈতিক সংকটের ফলে বাঙালি জীবনের সামাজিক আদর্শেরও পরিবর্তন। কন্যাপণ প্রচলিত থাকার কারণে এবং পুরুষের তুলনায় মেয়ের সংখ্যা সমাজে কম থাকায় এতদিন নিম্নশ্রেণীর অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া বাঙালির মধ্যে প্রৌঢ় বয়সে বিয়ের চল ছিল। কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক প্রাবন্ধিকের আরো বক্তব্য হল এই যে, বর্তমানে বাঙালির ব্যক্তিত্ব বিকাশের তুলনায় সামগ্রিক জাতিগত বিকাশ প্রয়োজন। সে কারণে বাঙালিকে সমাজগত চর্যার দিকেই বেশী জোর দেওয়া উচিত। ব্যক্তিত্বের প্রসারের পরিবর্তে সমষ্টিগতভাবে অবস্থান নেওয়াই এখন বেশী প্রয়োজন। এখন বাঙালির উচিত অন্তর্মুখী হওয়া। নিজ জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে জ্ঞান, আলোচনা ও অনুশীলনের মাধ্যমেই

বাঙালি আবার নিজেকে রক্ষা করতে পারে। যতদিন বাঙালির নিজভূমে ভাত-কাপড়ের অভাব হয়নি ততদিন সে পরবাসে যায়নি;; কিন্তু যখনই আবশ্যক হবে তখনই বাঙালিকে যে কোন জায়গায় যেতে হবে। বাঙালিকে নতুন করে শ্রমিক ও কর্মি হতে হবে। কোনো কোনো মহল থেকে বাঙালির শক্তিকে অন্যভাবে জাগানোর চেষ্টা চলছে। প্রচার চালানো হচ্ছে সারা পৃথিবীতে বাঙালির মত শিল্পী-সাহিত্যিক কোনো জাতি নেই। আমাদের গ্রাম শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রচার চলছে। কিন্তু এ প্রচার হাস্যকর। এই শিল্পগুলির মধ্যে মনোহারিত্ব থাকলেও এগুলি বিশ্বের সেরা এ বক্তব্য ঠিক নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে বাঙালিও ভারতের অন্য জাতির মতই আরেকটা জাতি আমরা ভারতীয় সভ্যতাকে সাহিত্যে-শিল্পে-সংস্কৃতিতে অনেক কিছু দিয়েছি, যা বিশ্বের দরবারেও স্বীকৃত, কিন্তু তা নিয়ে অনুচিত গর্ব করা উচিত নয়। আর্য-অনার্য মিশ্রণে বাঙালি যে মানসিকতার অধিকারী হয়েছে তা নিন্দার নয়, যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা এখনো পূর্ণতা পায়নি, জ্ঞান ও কর্মানুশীলনের মাধ্যমেই তাকে পূর্ণতা দিতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রাবন্ধিক যখন এ প্রবন্ধ রচনা করছেন তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু যে কারণে বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল অর্থাৎ সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক বাজারকে বিশ্বের কোন্ শক্তি নিয়ন্ত্রণ করবে, বাজারের ভাগ বাটোয়ারায় পুঁজিবাদী বৃহৎ শক্তিগুলির বিন্যাস কি দাঁড়াবে তার সমাধা হয়নি। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিবেশ তৈরি হচ্ছিল বিশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের প্রথম থেকেই। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল সারা পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট, Economic Depression নামে যা পরিচিত। যাকে সামাল দিতে গিয়ে বিশ্ব নতুন অর্থনৈতিক তত্ত্বের জন্ম হ'ল কেইনসীয় অর্থনীতি। এই অর্থনৈতিক সঙ্কট বিশ্বসংকটের অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও এসে পড়েছিল। এর সাথে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিশেষভাবে যুক্ত হয়েছিল হিন্দু-মুসলিম সমস্যা। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি আস্থা না রাখতে পারায় মুসলিমরা বিচ্ছিন্ন হতে চাইছিল। এর কিছু যথার্থ কারণও আজ ঐতিহাসিক-গবেষকরা নির্ণয় করেছেন। তাঁদের মতে, ভারতীয় জাতীয়তার নামে উনিশ শতাব্দীতে যা তৈরি হচ্ছিল তা আসলে বর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদ। জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের বিষয় এবং ভাষাতেও তা ফুটে উঠেছিল। দেশকে মাতৃমূর্তি হিসেবে কল্পনা করানোর মধ্যে দিয়েই মূর্তি পূজায় অবিশ্বাসী মুসলমানদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে কারণেই প্রাবন্ধিক বলেছেন, হিন্দু-বাঙালির সংকট। এ সংকট বাঙালি যেমন সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারছিল না, তেমনি উপলব্ধি করলেও এর থেকে মুক্তির উপায় তার সামনে ছিল না। কারণ বস্তুগতভাবে বাংলাদেশের উর্বর জমি কখনো এ জায়গার অধিবাসীদের খাদ্য সংকটে ফেলেনি। আর এতদিন বাঙালি ইংরেজদের আনুগত্য করায় সম্মান এবং ক্ষমতা দুইই পেয়েছে। প্রাবন্ধিক বাঙালিকে কল্পরাজ্য থেকে বাস্তবে টেনে নামাতে চাইলেন, বাঙালির ভবিষ্যতের কথা ভেবেই। তিনি যে কত দূরদর্শী ছিলেন তা বোঝা যায় এখন, বাঙালি জাতির দুরবস্থা দেখলে, অথচ আমরা সেই ক্লিশে বচন এখনো আউড়িয়ে চলেছি 'What Bengal thinks today, India thinks tomorrow' তবে প্রথম অংশের মত এখানেও বলতে হয় প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির প্রতি তার অসম্ভব আস্থা ছিল বলেই অতীতের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে তিনি বাঙালি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন।

প্রাবন্ধিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর এই বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধে সমাজমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সাধু ও চলিত উভয় গদ্যরীতিতে প্রবন্ধ রচনা করলেও নির্বাচিত প্রবন্ধের গদ্যরীতি সাধুবাংলা। এখানে তিনি মূলতঃ একাধিক কমা বা সেমিকোলন দিয়ে বাক্য সাজিয়েছেন। তবে তাঁর এ প্রবন্ধে যুক্তিপরম্পরা ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ দেখা যায়। এছাড়াও তাঁর 'জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধে আমরা একজন ইতিহাসমনস্ক প্রাবন্ধিককেও পাই।

একক ৪ ❑ গল্পের গাঁটছড়া ঃ সুকুমার সেন

৪.০ প্রবন্ধ—'গল্পের গাঁটছড়া'—সুকুমার সেন

৪.১ প্রাবন্ধিক পরিচিতি

৪.২ প্রবন্ধ সংক্ষেপ

৪.৩ প্রবন্ধ বিশ্লেষণ

৪.০ প্রবন্ধ—'গল্পের গাঁটছড়া'—সুকুমার সেন

মানুষের যেমন স্মৃতি আছে মানুষের গোষ্ঠীরও তেমনি স্মৃতি আছে, তবে তা আর এক ধরনের স্মৃতি। আপাতত মনে হতে পারে যে সে স্মৃতি তো ইতিহাস অথবা ইতিহাস-পুরাণ কাহিনী। কিন্তু তা নয়, ইতিহাসই বলি আর পুরাণ-কাহিনীই বলি তা তো ব্যক্তিবিশেষের বা ব্যক্তি সমষ্টিবিশেষের বুদ্ধি প্রমার্জিত রচনা। তার মধ্যে যা আছে তা মানুষের স্মৃতির পর্যালোচনা অথবা সে পর্যালোচনার তলানি। তাতে মানবগোষ্ঠীর স্মৃতির যেটুকু রঙ বা রস আছে—যদি থাকে—তা ধরা যায় না। মানব-গোষ্ঠীর স্মৃতি জমে আছে লোকসাহিত্যের মধ্যে—ছেলে-বুড়ো ভোলানো ছড়ার ও গল্পের মধ্যে। তবে তা এমনভাবে বিকীর্ণ হয়ে আছে যে টের পাওয়া খুবই দুর্ঘটনা।

মানুষের স্মৃতি মিশরের মমির মতো রক্ষিত হয়ে এসেছে তার লিখিত রচনায়—তার ধর্মকর্মের ব্যবস্থায়, তার পুরাণ-কাহিনীতে, তার জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থাবলীতে। আর মানব-গোষ্ঠীর স্মৃতি রয়ে গেছে—যদি থাকে—তার, যেমন প্রাচীনকালের পরিধেয় বসনের আঁচলের গিঁটে, সে গিঁট হল লৌকিক ছড়া ও গল্প। সে গিঁট খুলতে পারলে তার মধ্যে থেকে সেকালের স্মৃতির ক্ষীণ সৌরভ—নানা ফুলের, কর্পূরের মৃগনাভির, চন্দনের—যেন টের পাওয়া যায়।

বিদেশি পন্ডিতেরা অনেক দিন থেকেই এইসব লৌকিক গল্প-ছড়ার গিঁট খুলে গাঁট ছাড়িয়ে ইতিহাসের নাগালের বাইরে যে প্রত্ন ও প্রাক ইতিহাস আর তারও অগোচর যে কালস্রোতের প্রতিধ্বনি তা কিছু কিছু যেন শুনতে পেরেছেন। আমাদের দেশ—ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করে আমাদের প্রদেশ বঙ্গভূমি লোকসাহিত্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সত্যকার বিদগ্ধ ও যথার্থ পন্ডিত ব্যক্তির সামনে গবেষণার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে এই একটি।

আজ আমার এই আলোচনা তিনটি গল্প নিয়ে। একটি বাংলা ভাষার অপর দুটি জার্মান ভাষার। গল্পগুলির মধ্যে বাইরের মিল নজরে পড়বে না চট করে, তবে গিঁট গাঁট ছাড়িয়ে দেখলে তলায় সমভূমি পাওয়া যাবে। তখন বোঝা যাবে যে (গল্প তিনটি হয়ত একদা—কোন এক সুদূরকালের থেকে একই মানব-গোষ্ঠীর স্মৃতির টুকরো বহন করে এনেছে।)

বাংলা গল্পটি সংগ্রহ করেছিলেন বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতা হ্যালেড (বা হ্যালহেড) ১৮০০ খৃষ্টাব্দের আগে। তাঁর লেখা কাগজপত্র ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। সুতরাং ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে গল্পটি বাংলা লৌকিক গল্পের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রহণযোগ্য নিদর্শন। হ্যালেডের কাগজপত্র থেকে টুকে নিয়ে পুণ্যশ্লোক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছাপিয়ে দিয়েছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩২৮)। গল্পটি হয়ত অনেকেরই পড়া আছে। তবুও বলতে হচ্ছে আলোচনায় সুবিধার জন্যে। গল্পটি ভোজ-বিক্রমাদিত্য গল্পমালার (saga) মত গড়া। তাল-বেতাল

থাকলেও বেতাল পঞ্চবিংশতির মতো আগাগোড়া নয়। সংস্কৃত অথবা অন্য কোন ভারতীয় আর্য-ভাষায় গল্পটি মিলেছে বলে আমার জানা নেই। তবে কাহিনীর মধ্যে বিশিষ্ট বাঙালীত্ব অথবা বাংলা ঢঙ কিছু নেই।

ভোজপুরের রাজা ভোজের এক মেয়ে, অপূর্ব সুন্দরী, ষোল বছর বয়স কিন্তু এখনও বিয়ে হয়নি। তার কারণ মেয়ে প্রতিজ্ঞা করে আছেন, যে ব্যক্তি এক সারারাত্রি ধরে চেষ্টা করে তাকে কথা কওয়াতে পারবে তাকেই সে বিয়ে করবে। এই তার স্বয়ংবরে মৌনব্রত। দিগ্‌বিদিকে খবর দিয়ে রাজা ভোজ অনেক রাজা রাজপুত্রকে আমন্ত্রণ করে আনালেন, কিন্তু কেউই রাজকন্যার মুখ খোলাতে পারে নি, বিফল মনোরথ হয়ে চলে গেছে। বেশ কিছুকাল পরে অবন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্যের কানে ভোজ রাজার অপূর্ব সুন্দরী মৌনব্রতধারিণী রাজকন্যার ব্যাপার পৌঁছল। তাঁর কৌতুহল এবং আগ্রহ জাগল। তিনি কাউকে কিছু না বলে সটান ভোজপুরে চলে গেলেন।

রাজবাড়িতে গিয়ে তিনি অতিথি হলেন কিন্তু আত্মপরিচয় দিলেন না। খবর পেয়ে রাজা তাঁকে ডাকলেন। বিক্রমাদিত্য পরিচয় না দিয়ে বললেন যে তিনি কন্যার মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়ে তাকে বিবাহ করতে এসেছেন।

রাত্রিতে একঘরে দুটি খাটে বিছানা পাতা হল। সে খাটে রাজকন্যা ও বিক্রমাদিত্য শয়ন করলেন, আর কেউ রইল না। একটু রাত হতে বিক্রমাদিত্য হেঁকে বললেন, 'ঘরে কেউ আছে নাকি?' বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে সর্বদা দুটো পোষা ভূত থাকত। কেউ তাদের দেখতে পেতো না। তাদের নাম তাল-বেতাল। ঘরে ঢুকেই রাজা তাদের বলে দিয়েছিলেন রাজকন্যার খাট ও পরিধান আশ্রয় করতে। রাজার হাঁক শুনে তাল-বেতাল সাড়া দিলে, 'কেন মহারাজ?' বিক্রমাদিত্য বললেন, আর তো কেউ নেই। সাড়া দিলে কে তুমি?' তাল-বেতালের একজন বললে 'মহারাজ আমি রাজকন্যার খাট।' রাজা বললেন, 'ভাল তোমার সঙ্গে গল্প করে রাত কাটাই। শোন তুমি।'

'এক দেশে এক সদাগর জাহাজ ভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে বাণিজ্যে গিয়েছিল। পরে তার জাহাজডুবি হয়। মরণাপন্ন হয়ে সে নদীর কিনারায় এসে পড়ে পাটা ধরে ভাসতে ভাসতে। এক মেয়ে জল আনতে গেলে তাকে দেখে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করে তাকে বাঁচায়। সদাগর সেইখানেই থেকে যায়। কিছু দিন পরে সে পড়ে এক ডাইনীর নজরে। ডাইনী মন্ত্র পড়ে সদাগরকে ভেড়া বানিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। রাত্রিবেলায় তাকে মানুষ করে আবার দিনের বেলায় ভেড়া করে দেয়। এক দিন সে ভেড়া, দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গিয়ে রাজবাড়িতে ঢুকে পড়ে। রাজার লোকেরা তাকে কেটে তার মাংস খেয়ে ফেলে। এখন বল দেখি রাজকন্যার খাট, সদাগরের মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে?'

খাট থেকে উত্তর এল, 'দায়ী সেই মেয়েলোক যে তাকে জল থেকে তুলে বাঁচিয়ে ছিল।'

রাজকন্যা এই উত্তর শুনে বিরক্ত হয়ে খাট ছেড়ে মাটিতে শয়ন করলে।

আরও খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর আবার বিক্রমাদিত্য মুখ খুললেন। আর কে আছে হে ঘরে? রাজকন্যার কাছ থেকে কে যেন উত্তর দিলে, 'আজ্ঞে আমি, মহারাজ!' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'তুমি কে বটে ?' উত্তর এল 'আজ্ঞে আমি রাজকন্যার পরিহিত বস্ত্র।' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'বেশ বেশ। একটা গল্প শোন।'

'এক দেশে এক সদাগরের মেয়ের বিয়ের জন্যে একই দিনে চার জন বর হয়ে এল। চার জনেই বিয়ে করতে চায়। বিষম ব্যাপার দেখে কনে ভয়ে মরে গেল রাত্রিবেলায়। সকালে চার জন বর তাকে বাইরে নিয়ে এল। সকলে কান্নাকাটি করতে লাগল। একজন শোকে আত্মহত্যা করলে, একজন নিজের ঘরে ফিরে গেল, একজন ওষুধ খুঁজতে বেরল, আর একজন দেহ আগলে রইল। যে ওষুধ আনতে গিয়েছিল সে ওষুধ এনে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে তুললে।

'এখন বল দেখি রাজকন্যার কাপড়, কার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হওয়া উচিত?'

রাজকন্যার কাপড়ের কাছ থেকে উত্তর এল, 'যে নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছিল তার সঙ্গেই বিয়ে হওয়া উচিত।'

উত্তর শুনে রাজকন্যার খুব রাগ হল। কিন্তু গায়ের কাপড় তো খুলে ফেলা যায় না। তা ভাবতেই হাসি পেল। রাজকন্যা খুব হেসে উঠল। আর অমনি বিক্রমাদিত্য তার হাত ধরে ফেললেন, 'এই তো মুখ খুলেছ।'

পরের দিন রাজকন্যাকে বিয়ে করে বিক্রমাদিত্য নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন।

এই গল্পটির সঙ্গে একটি জার্মান গল্পের গভীর ও অন্তরঙ্গ যোগ আছে। কিন্তু সে যোগ বাইরের থেকে সহজে ধরা পড়ে না। আগে গল্পটি শোনাই।

এক রাজদম্পতি অনেক সাধ্যসাধনা করে অবশেষে একটি কন্যা সন্তান লাভ করে। কিন্তু মেয়েটি প্রায় জন্মাবধিই ভূতগ্রস্ত ছিল। এই অবস্থায়ই যখন তার বয়স চোদ্দ তখন সে মারা যায়। তার দেহ কফিনে পুরে রাজবাড়ির সংলগ্ন গির্জা-ঘরে রাখা হয়। সেই ঘরে সৈনিক পাহারা থাকে। কিন্তু প্রতিদিনই রাত্রি বারোটা বাজলেই সেই ভূতগ্রস্ত মেয়েটি জেগে উঠে পাহারাদার সৈনিকের মুণ্ডপাত করে। পরের দিন নুতন পাহারাদার নিযুক্ত করতে হয়। এই ভাবে অনেকগুলি সৈনিক মারা গেল। রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কী করবেন ভেবে পান না। এত সৈনিক মারা পড়ল।

একদিন পাহারা দেবার ভার পড়ল এক তরুণ অথচ দক্ষ সৈনিকের উপর। তার অত্যন্ত ভয় হল। সে ডিউটিতে যোগ দেবার আগে বিকালে রাজার কাছে তিন চার ঘণ্টা ছুটি চেয়ে নিয়ে কী করবে ভেবে না পেয়ে বনের দিকে গেল। সেখানে সে এক বুড়োর দেখা পেল। সে এক কাঠের গুঁড়ির উপর বসে আছে। তাকে দেখে বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাকে অত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে?' সে বললে যে, তার উপর ভার পড়েছে রাত্রিতে রাজকন্যার মৃতদেহ পাহারা দেবার, কিন্তু যে পাহারা দেয় তারই মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়। শুনে বুড়ো তাকে সাহস দিয়ে বলল, 'ভাবনা নেই। তুমি এক কাজ ক'র। এই মন্ত্রপূত খড়ি নাও আর এই মন্ত্রপুত বস্ত্র নাও। গির্জাঘরে যেখানে বসে তুমি পাহারা দেবে তার চার দিকে এই খড়ি দিয়ে মণ্ডল এঁকে নিয়ো। আর তুমি রাত বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত মনকে কিছুতেই দমতে দিয়ো না। মৃতদেহ যখন কফিন থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসবে তখন সে চীৎকার করে বলবে, "আমি জানি তুমি এখানে রয়েছ, তবে আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।" তার পরে সে ঘরময় ঘুরে বেড়াবে কিন্তু তোমাকে দেখতে ও ছুঁতে পাবে না। এই ভাবে তোমার আজ রাত কাটবে।

সকালে উঠে রাজা লোকজন নিয়ে গীর্জাঘরে গেলেন। তিনি দেখে আশ্চর্য হলেন যে পাহারাদারের মাথা বিচ্ছিন্ন হয়নি, সে স্বচ্ছন্দে আছে। সে সৈনিককে রাজা আদেশ করলেন আরও দু-রাত পাহারা দেবার জন্যে। কী করে সে, অগত্যা রাজি হল।

সেদিনও সে বিকালে ছুটি নিয়ে বনে গেল। বুড়োর সঙ্গে তার দেখা হল। এবারে বুড়ো তাকে উপদেশ দিলে সে রাত্রিতে অর্গানের পিছনে লুকিয়ে থাকতে আগের দিনের মতো খড়ি মণ্ডল এঁকে। পাহারা দিতে এসে সৈনিক বুড়োর কথা মতো কাজ করলো। মাঝরাত্রি হতেই ভূতগ্রস্ত রাজকন্যা ঝাঁপ দিয়ে কফিন থেকে বেরিয়ে এল। আর ঘরময় দাপাদাপি করে ঘুরে বেড়াতে লাগল এই বলতে বলতে 'আমি জানি তুই এখানে আছিস্ কিন্তু তোকে আমি দেখতে পাচ্ছি না।' রাত একটা অবধি সে এই রকম করতে লাগল। তারপর কফিনে ঢুকে পড়ল।

সকাল বেলা দলবল নিয়ে রাজা এলেন সৈনিকের মৃতদেহ সরিয়ে নিতে যেতে। কিন্তু এসে দেখলেন সে আগেকার দিনের মতই সুস্থ বহালতবিয়ৎ। তখন রাজা তাকে বললেন যদি সে আর এক রাত এইভাবে কাটাতে পারে তাহলে রাজকন্যা মানুষ হয়ে বেঁচে উঠবে এবং সে যদি চায় তবে তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিতে পারেন।

তৃতীয় দিনে সৈনিক বিকালে ছুটি নিয়ে বনে গেল। বুড়োর সঙ্গে যথারীতি দেখা হল। বুড়োর উপদেশ সে চাইল। বুড়ো বলল, তুমি এবারে বেদীর পিছনে লুকিয়ে থেকো। ভূত কিন্তু আরও বেশি গোলমাল করবে, চারদিকে ছুটোছুটি করবে। তার মধ্যে ফাঁক পেয়ে সৈনিককে কফিনের মধ্যে ঢুকে পড়ে শুয়ে থাকতে হবে। তার পর ভূত যখন কফিনের কাছে এসে তাকে বেরিয়ে যেতে বলবে তখনও সে যেন সাড়াসুড়ি না দেয়। তার পর যখন তার হাত ধরে টানবে তখন সে যেন ভূতের তর্জনী ধরে ফেলে তাতে খুব জোরে কামড় দেয়।

সৈনিক উপদেশ মতো কাজ করলে পর রাজকন্যার ভূত ছেড়ে গেল, সে সুস্থ মানুষের মেয়ে হল। তখন দুজন বেদীর কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে প্রার্থনা করতে লাগল। লোকজনের সঙ্গে রাজা এসে তাদের দুজনকে এই ভাবেই দেখতে পেলেন। রাজা খুশি হয়ে সৈনিককে বললেন, 'তোমাকে জামাই করব।'

সকলে মহলে ফিলে এল। রাজকন্যার বিয়ে হল সৈনিকের সঙ্গে, প্রচুর খাওয়া-দাওয়া হল।

[গল্পটি গ্রিমদের সংগ্রহে নেই। এটি সংগৃহীত হয় ১৯৩৫ সালে সাইলেসিয়ার হেড্উইগ সুরমান কর্তৃক। কুট রাজ্যে সংকলিত ও লটি বাউম্যান অনুদিত 'ফোক-টেলস অফ জার্মনী' ২৩ সংখ্যক গল্প॥]

—বিক্রমাদিত্যের গল্পের সঙ্গে সৈনিকের গল্পের গভীর মিল খুঁজে পাওয়া যাবে অমিলের মধ্যে দিয়ে। সে কেমন অমিলের মিল তা নিচে ছক্ বেঁধে দেখাতে চেষ্টা করছি। বাংলা ও জার্মান গল্পকে যথাক্রমে 'ক' ও 'খ' বলে চিহ্নিত করছি।

১। ক রাজকন্যা মৌনী, অন্তত রাত্রি বেলায় শয়ন কক্ষে। খ রাজকন্যা ভূতগ্রস্ত মৃত সুতরাং মৌনী। খাটে শুয়ে ক কন্যা মৃতবৎ থাকত। কেন না তা না হলে রাজা ডেকে বলতেন না, কে আছ এ-ঘরে। রাজকন্যা যখন খাটের উপর বিরক্ত হয়ে খাট ছেড়ে দিয়ে মাটিতে শুল তখন রাজা তা লক্ষ্য করেন নি। তবে কি ক কন্যা অদৃশ্য ভূত হয়ে ছিল। সে প্রকট হয়েছিল হাসিতে। তখন রাজা তার হদিস পেয়ে তার হাত ধরেছিলেন।

খ রাজকন্যার কফিনের মতো কি রাজকন্যার খাটও দুষ্টশক্তিসম্পন্ন (enchanted) ছিল। দুজনেই তাদের শয্যাধারের বাইরে এসেই তবে কাবু হয়েছিল। এবং সৈনিক তাতে ঢুকেই তবে ভূত তাড়াতে পেরেছিল। খ কাহিনীতে দু ষ্টশক্তি রাজকন্যাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেছিল। ক কাহিনীতে শক্তির উল্লেখ নেই বটে তবে ছিল বলে মনে হয়। বিক্রমাদিত্যের গল্প বলে সে শক্তি রাজার সহকারী হয়েছে।

২। ক গল্পে কন্যা মৌনী, পাত্র (রাজা) মুখর। খ গল্পে পাত্র সৈনিক মৌনী, কন্যা (বা ভূত) মুখর। এখানে দুটি গল্পে মৌলিক পার্থক্য আছে। ক গল্পে তুক ভেঙে গেল কন্যা মুখ খুলতেই। খ গল্পে তুক ভেঙে গেল পাত্র (সৈনিক) মুখ খুলে কামড় দিতেই। এ দুটি মোটিফের মধ্যে যে মিল তা ভাসা ভাসা।

৩। ক গল্পে নায়ক বিক্রমাদিত্য প্রবীণ অসমসাহসী মন্ত্রবিদ্ গুণী। খ গল্পের নায়ক সৈনিক তরুণ সাহসী এবং বশংবদ। তাকে শক্তি দিয়েছে বনবাসী বুড়ো। বিক্রমাদিত্যকে শক্তি দিয়েছে তাঁর বুদ্ধি ও দুটি পোষা ভূত।

(গল্প দুটি সুদূর কালের কোন একটি গল্প থেকে শাখায়িত হয়েছিল।) জার্মান গল্পটিতে খ্রীষ্টান ধর্মের ছাপ পড়েছে। তবুও এটি মূল গল্পের বেশি কাছাকাছি। অনুমান করা যেতে পারে (১) গল্পটি সেকেলে ভূতের গল্প ছিল। রাজকন্যা ভূতের কবলে পড়ে জড়বৎ ছিল। সে ভূত প্রতি রাত্রিতে পাণিপ্রার্থী যুবককে গ্রাস করত। অথবা গল্পটিতে ভূত মোটেই ছিল না। রাজকন্যা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিল। ব্যর্থ পাণিপ্রার্থীদের সে প্রাণদণ্ড দিত।

গ্রিমদের সংগৃহীত একটি গল্পে (এ গল্পটিকে 'গ' বলব)—নাম সোনার হাঁস—ক গল্পের সঙ্গে মিল আছে শুধু হাসি-সমাধান মোটিফে। গল্পটি সংক্ষেপে বলি।

এক গৃহস্থের তিন ছেলে ছিল। বড় ছেলে দুটি বুদ্ধিমান ও সুরূপ। ছোট ছেলেটি হাবাগোবা ভালো মানুষ। বড় ছেলে একদিন বনে যায় কাঠ কাটতে। মা তার সঙ্গে ভালো ভালো খাবার ও পানীয় দেয়। বনে ঢোকবার পর একটি লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়। লোকটি তার খাবারের কিছু ভাগ চায়। সে দেয় না। তার ফলে গাছ কাটতে গিয়ে সে পা কেটে ফেলে এবং শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে আসে। তারপরে চাষীর মেজ ছেলে বনে গেল কাঠ কাটতে। তার মনোভাব দাদার মতো ছিল সেও তাই আহত হয়ে ফিরে এল। তারপর যখন ছোট ছেলে বনে যেতে চাইলে তখন তার মা খুব অনিচ্ছা করে কিছু শুকনো রুটি আর বিস্বাদ পানীয় তার সঙ্গে দিলে। বনে গেলে পরে সেই লোকটি তার কাছে খাবার চাইলে ছেলেটি খুশি হয়ে তার সঙ্গে বাঁটোয়ারা করে খেলে। তখন লোকটি তাকে একটা গাছ দেখিয়ে তার গোড়া কাটতে বললে। সে গাছটার গোড়া কাটল আর তার মধ্যে পেল এক সোনার পালক হাঁস। হাঁসটি নিয়ে সে চলল শহর পানে। পথে রাত কাটাল সে এক গৃহস্থের বাড়ি অতিথি হয়ে। ভোরবেলা, তখনও ছেলেটি ঘুমচ্ছে, গৃহস্থের বড় মেয়ে এসে হাঁস দেখে তার একটা পালক খুলে নিতে গেল আর অমনি সে হাঁসের সঙ্গে এঁটে গেল। তারপর তার মেজ ও ছোট বোন পর পর এসে বড় বোনের সঙ্গে আটকে গেল।

সকাল হতে কিছু না বলে ছেলেটি হাঁসকে বগলে ধরে শহর মুখে চলল। পথে পাদরি মশায় দেখলেন তিনটি মেয়ে এক হাঁসকে ছুঁয়ে এক ছোকরার পিছু পিছু চলেছে। তিনি দূর থেকে তাদের চলে আসতে বললেন। কেউ এল না দেখে তিনি মেয়েগুলিকে জোর করে আনতে গেলেন, কিন্তু ছোঁয়া মাত্রই তিনিও আটকে গেলেন। তারপরে পাদরি মশায়ের কেরানী তাঁকে এইরকমভাবে তিনটি মেয়ের পিছু পিছু যেতে দেখে তাঁর কাছে ছুটে গেল এবং তাঁকে টেনে আনতে গিয়ে নিজেও আটকে গেল। এই ভাবে চাষী ছোকরার বগলে ধরা হাঁস ও সেই হাঁসের পিছনে সেঁটে থাকা পর পর পাঁচজনের বিচিত্র শোভাযাত্রা শহরের রাজপথ দিয়ে চলল।

এখন সে দেশের রাজার মেয়ে অত্যন্ত গম্ভীর-মেজাজ ও বিষণ্ণস্বভাব। সে হাসতে জানে না। রাজা প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তাকে হাসাতে পারবে তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন। রাজকন্যা জানালা থেকে রাজপথে এই বিচিত্র প্রোসেসন দেখে হেসে ফেললে। রাজা খুশি হয়ে ছেলেটার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন।

হাসির মোটিফটুকু ছাড়া এ-গল্পের সঙ্গে 'ক' গল্পের কোন মিল নেই। 'গ' গল্পের সঙ্গে 'খ' গল্পেরও একটুখানি মিল আছে। দুটি গল্পেই পাত্রকে শক্তি দিয়েছে বনবাসী ব্যক্তি। অরণ্যচারী দেবতা অথবা তার অদৃষ্ট।

তিনটি গল্পের কিন্তু জাত আলাদা দাঁড়িয়েছে। 'ক' গল্প পড়েছে বুদ্ধিদীপ্ত হাসিখুশির শ্রেণীতে, 'খ' গল্প রয়ে গেছে ভয়ভক্তিদৈবশক্তির শ্রেণীতে আর 'গ' গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সরলচিত্তের দৈবপ্রসন্নতার শ্রেণীতে। এর মধ্যে যে হাসিখুশির মোটিফ আছে তা অলঙ্কারের মতো, সমগ্র গল্পটিকে তা উদ্‌ভাসিত করেনি। 'ক' গল্পের যে হাসিখুশি মোটিফ তা সমগ্র গল্পটিকে উজ্জ্বল করেছে। এটা অবশ্য পরবর্তী কালে বুদ্ধিমার্জনার ফলেই রয়েছে।

'খ' গল্পের কফিন ও শবাচ্ছাদন বস্ত্র (shroud) ক গল্পে হয়েছে যথাক্রমে রাজকন্যার খাট ও তার পরিহিত বস্ত্র। (এ পরিবর্তন ভারতবর্ষের আচরণ ধারার অনুসরণেই সংঘটিত হয়েছে, আর এই শেষের পরিবর্তনটিকে ধরেই গল্পটিতে কৌতুকরসের ধারাটুকু উৎসারিত হয়েছে।) গোড়াতে গল্পটি ভয়-ভক্তি-ভূত-দৈবশক্তির শ্রেণীতেই ছিল। রাজকন্যাকে আশ্রয় করেছিল রক্তপায়ী ভূত (Vampire), সে পাহারাদারের মুণ্ড ছিঁড়ে রক্ত পান করতো। কে জানে 'ক' গল্পে আসলে হয়ত অকৃতার্থ পাত্রকে রাত্রি অবসানে কোতল করা হত। গল্পে সে কথা উহ্য রয়ে গেছে। ভালই হয়েছে।

৪.১ প্রাবন্ধিক পরিচিতি ঃ সুকুমার সেন (জন্ম : ১৬.১০.১৯০০-মৃত্যু : ৩.৩. ১৯৯২)

প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেনের জন্ম বর্ধমান জেলায়। বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। সেখানে থেকে বি. এ. পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এম. এ পাশ করেন। ১৯২৪ খ্রীঃ 'The use of Cases in Vedic Prose' বিষয়ে গবেষণাপত্র প্রস্তুত করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ১৯৩৭ খ্রীঃ পি. এইচ. ডি উপাধি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'Historical Syntax of Indo-Arian'. পরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। তিনি প্রাচীন পার্শী আবেস্তার ভাষা ও দক্ষিণ ইরানের প্রাচীন রাজবংশের কথ্যভাষা নিয়ে গবেষণা করেন। তবে শুধু ভাষাতত্ত্বই নয় গোয়েন্দা গল্প থেকে শুরু করে সাহিত্যের নানা শাখার তিনি বিচরণ করেছেন, প্রাচীন সাহিত্য থেকে ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব উদ্ধারেও তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য। তাঁর রচিত সম্পাদিত ও অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দি মিশিয়ে প্রায় একশ। কালিদাসের কাল ও চরিত্রকে অবলম্বন করে তিনি অভিনব পদ্ধতিতে গোয়েন্দা কাহিনি রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-এ হিস্ট্রি অফ্ ব্রজবুলি লিটারেচর' (১৯৩৫), 'শেকসুভদয়া', 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', 'রামকথার প্রাক ইতিহাস'(১৯৭৭), 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য', 'বটতলার ছাপা ও ছবি', 'ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি', 'ভাষার ইতিবৃত্ত' প্রভৃতি। তাঁর রচিত অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থের প্রকাশকাল হল : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চার খন্ডে ১৯৪০-১৯৫৮) এটি একটি তথ্যপূর্ণ আকরগ্রন্থ। ইসলামী বাংলা সাহিত্য (১৯৫১); বাংলা সাহিত্যে গদ্য (১৯৩৪) ; কালিদাস তাঁর কালে (১৯৭৬); যিনি সকল কাজের কাজী (১৯৭৭), এ দুইটি গোয়েন্দা গল্পগ্রন্থ ; তাঁর সঙ্কলিত অভিধান ২ খন্ডে An Etymological Dictionary of Bengali C1000-1800 AD প্রকাশিত হয় ১৯৭১। আত্মজীবনী 'দিনের পর দিন যে গেল' প্রথম পর্ব ১৯৮২ ; দ্বিতীয় পর্ব ১৯৮৬।

৪.২ প্রবন্ধ সংক্ষেপ ঃ

ব্যক্তি মানুষের স্মৃতির মত মানবগোষ্ঠীর ও স্মৃতি আছে। ইতিহাস-পুরাণ প্রভৃতির মধ্যে থাকে ব্যক্তিমানুষের স্মৃতির পর্যালোচনা। মানবগোষ্ঠীর স্মৃতি জমা থাকে লোকসাহিত্যে, ব্যক্তিমানুষের স্মৃতি সঞ্চিত থাকে লিখিত সাহিত্যে আর মানব গোষ্ঠীর স্মৃতি জমা থাকে মৌখিক সাহিত্যে। বিদেশী পন্ডিতেরা এইসব লৌকিক গল্পের গিঁট খুলে ইতিহাসের নাগালের বাইরের প্রাক্ ও প্রত্ন ইতিহাস কিছু কিছু খুঁজে পেয়েছেন। সাধারণভাবে ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলায় লোকসাহিত্যের যে সমৃদ্ধি সেখানে যথার্থ পন্ডিত মানুষের কাছে এই ধরণের গবেষণার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়ে আছে। একটি বাংলা ও দুটি জার্মান মোট তিনটি লোকগল্প নিয়ে আলোচনা করলে দেখানো যাবে যে, গল্প তিনটিতে কোনো এক সুদূর কাল থেকে একই মানবগোষ্ঠীর স্মৃতি বয়ে এসেছে।

বাংলা গল্পটিকে সংগ্রহ করেন 'হ্যালেড' ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে। তাঁর কাগজ থেকে টুকে নিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এটিকে ১৩২৮ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

ভোজপুরের রাজার যোল বছরের সুন্দরী অ-বিবাহিতা মেয়ে মৌনব্রত পালন করেছে, তার প্রতিজ্ঞা এই যে, যে তাকে এক রাত ধরে চেষ্টা করে কথা বলাতে পারবে তাকে সে বিয়ে করবে। রাজা ভোজের আমন্ত্রণে বহু রাজপুত্র এলেও তারা বিফল হয়। শেষে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর দুই অদৃশ্য পোষা ভূত, তাল-বেতালকে সঙ্গে নিয়ে রাজকন্যাকে হাসাতে আসে। এক ভূত আশ্রয় নেয় রাজকন্যার খাটে, আরেক ভূত আশ্রয় নেয় রাজকন্যার গায়ের কাপড়ে। এরপর বিক্রমাদিত্য খাটের ভূতকে উদ্দেশ্য করে একটি গল্প বললেন ও গল্পের শেষে একটি প্রশ্ন করলেন। ভূতের উত্তর মনঃপূত না হওয়ায় বিরক্ত হয়ে রাজকন্যা খাট থেকে মাটিতে নেমে এলেন কিন্তু মৌনতা ভাঙলেন না। রাজা দ্বিতীয় আরেকটি

গল্প রাজকন্যার কাপড়ের ভূতকে উদ্দেশ্য করে বললেন ও গল্প শেষে প্রশ্ন করলেন। এবারও উত্তর শুনে রাজকন্যার রাগ হল। কিন্তু গায়ের কাপড় খুলতে হবে একথা ভেবেই সে হেসে উঠল, আর রাজা অমনি বলল 'এই তো মুখ খুলেছে' পরদিন দুজনের বিয়ে হল।

জার্মান গল্পটি এরকম—এক রাজদম্পতির জন্মাবধি ভূতগ্রস্থ কন্যা চোদ্দ বছর বয়সে মারা গেলে পরে তার মৃতদেহ কফিনে পুরে রাজবাড়ী সংলগ্ন গির্জা ঘরে রাখা হয় ও রাত পাহারার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু দেখা যায় ভূতগ্রস্ত মেয়েটি প্রতি রাতে কফিন থেকে বেরিয়ে প্রহরারত সৈনিককে মেরে ফেলে। একদিন এক তরুণ দক্ষ সৈনিকের পাহারার ভার পরে। সে কি করবে চিন্তা করতে করতে বনে গিয়ে এক বৃদ্ধকে দেখে। বনবাসী বৃদ্ধ তাকে মন্ত্রমূত বস্ত্র ও মন্ত্রপূত খড়ি দেয়, যার সাহায্যে রাতে সৈনিক ভূতগ্রস্ত রাজকন্যার সামনে অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারে ও বেঁচে যায়, এই ভাবে পরের রাতেও বৃদ্ধের সহায়তায় সৈনিক বেঁচে যায় তৃতীয় রাতে বৃদ্ধের পরামর্শে ভূতগ্রস্ত কন্যা থেকে বেরিয়ে এলে সৈনিক ঐ কফিনে ঢুকে পড়ে ও রাজকন্যার তর্জনী কামড়ে দেয়। এর ফলে রাজকন্যা ভূতমুক্ত হয় ও রাজা খুশী হয়ে দুজনের বিয়ে দিয়ে দেন।

এই দুটি গল্প বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে গল্প দুটির মধ্যে গভীর মিল আছে। বাংলা গল্পটিকে 'ক' ও জার্মান গল্পটিকে 'খ' ধরলে দেখানো যায়—

এক) 'ক' ও 'খ' গল্পের দুই রাজকন্যার মধ্যেই মৌনতার মিল আছে। একজন রাতে মৌন থাকে বলে, অপরজন মৃত বলে। 'খ' গল্পে রাজকন্যা মৃত। 'ক' গল্পের রাজকন্যা রাতে মৃতবৎ। দুটি গল্পের শয্যাধারই দুষ্টশক্তিসম্পন্ন। 'খ' গল্পে দুষ্টশক্তি রাজকন্যাকে আয়ত্ত করেছিল। 'ক' গল্পে এই শক্তি বিক্রমাদিত্যের সহকারী।

দুই) 'ক' গল্পে মৌনী কন্যা মুখ খুলতেই তুক ভেঙ্গে গেছে। 'খ' গল্পে সৈনিক মুখ খুলে কামড়াতেই তুক ভেঙ্গে গেছে। অর্থাৎ দুটি গল্পে 'মুখ খোলা' মোটিফের ভাসা ভাসা মিল আছে।

তিন) দুটি গল্পেরই নায়কের অসমসাহস। একজনকে শক্তি দিয়েছে নিজের বুদ্ধি ও পোষা ভূত, অপরকে বনবাসী বৃদ্ধ।

সোনার হাঁস নামে গ্রীম ভাইদের সংগৃহীত আরেকটি গল্প আছে। আলোচনা করলে দেখা যাবে 'ক' গল্পের সঙ্গে এই গল্পের মিল আছে। মিলটি হল 'হাসি-সমাধান' মোটিফ।

এক গৃহস্থের তিন ছেলে বড় দুটি বুদ্ধিমান। বড় ছেলে একদিন বনে যায় কাঠ কাটতে সঙ্গে নেয় ভালো খাবার ও পানীয়। বনে এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়, সে খাবার চায়, বড় ছেলে দেয়না। কাঠ কাটতে গিয়ে পা কেটে ফেলে ও শূন্য হাতে ফিরে আসে। মেজ ছেলের বেলায়ও একই ঘটনা ঘটে। ছোট ছেলে সরল। সে কাঠ কাটতে যাওয়ার সময় মা খারাপ খাবার দেয়, বনবাসী ব্যক্তি খেতে চাইলে তার সঙ্গে ভাগ করে নিজের খাবার খায়। বনবাসী ব্যক্তির কথানুযায়ী এরপর সে একটি গাছের গোড়া কেটে একটি হাঁস পায় ও তা নিয়ে শহরের দিকে যায়। পথে এক গৃহস্থের বাড়ীতে রাত কাটায়। ভোরবেলা গৃহস্থের বড় মেয়ে হাঁসের গায়ে সোনার পালক দেখে খুলতে গিয়ে হাঁসের সঙ্গে আটকে যায়। পরে তার ছোট দুই বোনেরও একই অবস্থা হয়। ছেলেটি হাঁসটিকে বগলে নিয়ে শহরের দিকে হাঁটতে শুরু করলে এঁটে থাকার দরুন তিন মেয়েও হাঁসের সঙ্গে হাঁটতে থাকে। পথে পাদরী মেয়েদের ডাকতে গিয়ে নিজেও এঁটে যায়। এর পর যুক্ত হয় পাদরীর কেরানী। ফলে শহরের পথ দিয়ে চাষী ছেলেটি ও তার বগলে ধরা হাঁসের সঙ্গে পাঁচজনের এক বিচিত্র শোভাযাত্রা যেতে থাকে। তা দেখে রাজ্যের গম্ভীর মেজাজ ও বিষন্ন স্বভাবের রাজকন্যাও হেসে ওঠে। রাজা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, কেউ তাঁর মেয়েকে হাসাতে পারলে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন। ফলে ছেলেটির সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল।

‘ক’ গল্পের সঙ্গে এই গল্পের হাসির মোটিফ মিল, আর ‘খ’ গল্পের সঙ্গে মিল এই যে, উভয় ক্ষেত্রেই পাত্রকে শক্তি দিয়েছে বনবাসী ব্যক্তি। তিনটি গল্পের শ্রেণী আলাদা। ‘ক’ গল্প বুদ্ধিদীপ্ত হাসিখুশী শ্রেণীর। ‘খ’ ভয়ভক্তি দৈবশক্তির, ‘গ’ সরলচিত্তের দৈবপ্রসন্নতার।

‘খ’ গল্পের কফিন ও শবাচ্ছাদান বস্ত্র ভারতবর্ষের আচরণ ধারা অনুসারে ‘ক’ গল্পে রাজকন্যার খাট ও পরিহিত বস্ত্রে পরিণত হয়েছে। এর ফলেই দুটি কৌতুক শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। প্রথমে এটি ভয়-ভক্তি-ভূত-দৈবশক্তি শ্রেণিভুক্ত ছিল। যেমন, ‘খ’ গল্পে রাজকন্যাকে রক্তপায়ী ভূত আশ্রয় করেছিল। সেই ভূত রাতে পাহারাদারের মুণ্ডু ছিঁড়ে নিত। তেমনি ‘ক’ গল্পে ও হয়ত অকৃতার্থ পাত্রকে সকালে কোতল করা হত, যা গল্পে উহ্য থেকে ভালোই হয়েছে।

৪.৩ প্রবন্ধ বিশ্লেষণ ঃ

বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ সুকুমার সেন শুধু যে ভাষার জগতেই তাঁর জ্ঞানস্পৃহাকে সীমাবন্ধ রেখেছিলেন তা নয়, জ্ঞানতত্ত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। এরকম একটি ক্ষেত্র হল লোকসাহিত্য। ‘গল্পের গাঁটছড়া’ নামে তাঁর যে প্রবন্ধ, তার বিষয়ও লোকসাহিত্য। এই প্রবন্ধটি প্রথম ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে আরো কয়েকটি প্রবন্ধের সঙ্গে ‘গল্পের গাঁটছড়া’ নামে প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যেই এটি সংযোজিত হয়। তিনি এই প্রবন্ধে একটি বাংলা লোকগল্প ও দুটি জার্মান লোকগল্পকে বিশ্লেষণ করে, গভীরে তিনটি গল্পের মিলের জায়গা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

প্রাবন্ধিকের মতে ব্যক্তিমানুষের যেমন স্মৃতি থাকে, তেমনি মানবগোষ্ঠীর স্মৃতি থাকে। বক্তিমানুষের স্মৃতি প্রতিফলিত হয় ইতিহাস বা পুরাণ কাহিনিতে। সেখানে থাকে বক্তিমানুষের স্মৃতির পর্যালোচনা। কিন্তু ইতিহাস বা পুরাণ থেকে মানবগোষ্ঠীর স্মৃতি পাওয়া যায়না। মানবগোষ্ঠীর স্মৃতি লুকিয়ে আছে লোকসাহিত্যে, বিশেষ করে লোককথায়। ব্যক্তিমানুষ তার স্মৃতিকে রক্ষিত করেছে লিখিত সাহিত্যের মধ্যে। আর মানব গোষ্ঠীর স্মৃতি রয়ে গেছে মৌখিক সাহিত্যে। সেই মৌখিক সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করে বিশ্লেষণ করতে পারলে পাওয়া যাবে প্রাগৈতিহাসিক মানবগোষ্ঠীর জীবন-যাপন প্রণালী থেকে শুরু করে স্মৃতির বহু টুকরো।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, লোকসংস্কৃতির মধ্যে যে একটি জাতির শিকড় লুকিয়ে থাকে, এই বোধে উনিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই মানুষ পৌঁছে গেছে। উনিশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফিনল্যান্ডে জাতীয়তাবোধের অনুপ্রেরণাতেই লোককথা সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পরে। শুধু সংগ্রহই নয় ফিনল্যান্ডেই প্রথম লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞাননির্ভর ও বস্তুতান্ত্রিক গবেষণার কাজ শুরু হয়েছিল। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এবং মানব সভ্যতার বিবর্তনের ধারাকে উপলব্ধি করার পক্ষে এক প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে হাজির হল। প্রাবন্ধিক সুকুমার সেনও সাধারনভাবে ভারতবর্ষের বিশেষ করে বাংলাদেশের লোকসাহিত্য নিয়ে এই ধরনের গবেষণা হবে আশা প্রকাশ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি হ্যালহেড সংগৃহীত একটি বাংলা লোকগল্প ও দুটি জার্মান লোকগল্প, একটি হেড্উইগ সুরমান, ও অন্যটি গ্রীস ভাইদের (জেকঁব ল্যুডউইগ কার্ল গ্রিম (১৭৮৫-১৮৬৩), উইলল্‌সে কার্ল গ্রিম (১৭৮৬-১৮৫৯) সংগৃহীত, মোট তিনটি গল্পের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। গল্পগুলির শ্রেণীবিশ্লেষণ করেছেন ও গল্পগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ মোটিফে মিল আছে তা দেখিয়ে দেন।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে লোককথা সংগ্রহের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লোককথা বিশ্লেষণের পদ্ধতি, তত্ত্ব ও নানারকম মতবাদ তৈরী হয়। ১৮৩৫ খ্রীঃ জেকব ল্যুডউইগ কার্ল গ্রিম একটি গ্রন্থ প্রকাশ করলেন 'Deutsche Mythopagic',

এখানে জেকঁবের মননশীল আলোচনার ফলে তাকে 'লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের জনক' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এরপর বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ লোককথার পদ্ধতিগত আলোচনা করেছেন। লোককথা বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি হল—ক) **তুলনামূলক পদ্ধতি** : এই পদ্ধতির জনক গ্রিম ভাইরা হলেও পরবর্তীকালে ম্যাক্স ম্যুলার বা থিওডোর বেনফেও এই পদ্ধতিতে লোককথার বিশ্লেষণ করেন।

খ) **ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতি** : ফিনল্যান্ডের দুই লোকসংস্কৃতিবিদ্ জুলিয়াস ক্রোন ও তাঁরপুত্র কার্লে ক্রোন এই পদ্ধতির স্রষ্টা। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেও অসংখ্য লোককথার ইতিহাস ও কালানুক্রমিক ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

গ) **মনঃসমীক্ষাগত পদ্ধতি** : মূলতঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে কার্ল আব্রাহাম লোককথায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটান

ঘ) **ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতি** : মার্কস—এঙ্গেলসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারনার ওপর নির্ভর করে জর্জ টমসন, আর্নর্ঘ ফিশার প্রমুখ লোকসাহিত্যে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করেন।

ঙ) **জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি** : জার্মানিতে অ্যাডলফ্ হিটলার এই পদ্ধতির জনক। পরবর্তীকালে জাপানেও এই পদ্ধতি খুব জনপ্রিয় হয়, জাপানে জার্মানি লোকসংস্কৃতিবিদ ইয়ানাগিত এই পদ্ধতির প্রধান প্রবক্তা।

চ) **নৃবিজ্ঞানগত পদ্ধতি** : এই পদ্ধতির পথিকৃৎ হলেন ফ্রানজ বোয়াজ নামে এক জার্মান-আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী।

ছ) **রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি** : সাম্প্রতিককালে লোকসংস্কৃতি আলোচনায় সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও বিতর্কিত পদ্ধতি এটি। সোবিয়েত ইউনিয়নের লোকসংস্কৃতিবিদ ভ্লাদিমির প্রপ এই পদ্ধতির জন্মদাতা। পরবর্তীকালে ফরাসী নৃবিজ্ঞানী ক্লাদ লেভি-স্ট্রস (নোয়াম চমস্কি, অ্যালান ভানডেস প্রমুখ) এই পদ্ধতিকে আরো বিকশিত করেন।

এর মধ্যে ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পদ্ধতি থেকে পরবর্তীকালে দুটি ধারনার জন্ম হয় টাইপ ইনডেক্স ও মোটিফ্ ইনডেক্স। এই দুটি ধারনা লোকসংস্কৃতি চর্চায় ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। বিশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অ্যান্টি আর্নে ও স্টিস টমসন এই ধারনা হাজির করেন। বিপুল পরিমানে সংগৃহীত লোককথার শ্রেণিবিন্যাস করার জন্য টাইপের ধারণা আনা হয়। অ্যান্টি আর্নে টাইপের সংজ্ঞায় বলেছেন—'A type is a traditional tale that has an independent existence. It may be told as a complete narrative and does not depend for its meaning on any other tale, but the fact that it may appear alone attests its independence.' মোটিফ এর সংজ্ঞা নির্ধারণে টমসন বলেছেন, 'A motif is the smallest elements in a tale having a power to persist in tradition.'

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন লোককথাগুলি সংগৃহীত হচ্ছিল এবং তার পরবর্তীতে যখন লোককথাগুলি বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল, তখন লোকসংস্কৃতিবিদ্‌দের মধ্যে যে বিতর্কগুলি ছিল, সেগুলি হল—সমস্ত লোককথা একই উৎস থেকে উদ্ভূত কিনা? একই উৎস হলে উৎসটি কোথায়? একস্থান থেকে অন্যস্থানে যখন লোককথাগুলি পরিভ্রমণ করেছে তখন এর পরিবর্তনগুলি কিভাবে বোঝা যাবে ইত্যাদি। প্রাবন্ধিকও এখানে তিনটি ভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত লোককথাকে তুলনামূলক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেছেন এবং এই বিশ্লেষণে তিনি সাহায্য নিয়েছেন টাইপ ও মোটিফ এর ধারণার। মোটিফ শব্দটি তিনি ব্যবহার করলেও টাইপ শব্দটি তিনি ব্যবহার করেননি, করেছেন 'জাত' বা 'শ্রেণী' শব্দটি।

প্রথম গল্পটিকে তিনি বলেছেন 'বুদ্ধিদীপ্ত হাসিখুশি' শ্রেণির। দ্বিতীয় গল্পটিকে তিনি বলেছেন 'ভয়ভক্তি-দৈবশক্তি'

শ্রেণির এবং তৃতীয় গল্পটিকে তিনি 'সরলচিত্তের দৈবপ্রসন্নতা' শ্রেণিভুক্ত করেছেন। তিনটি ভিন্ন উৎসের এবং ভিন্ন 'জাতের' গল্প নিয়ে তিনি গল্প তিনটির মিল দেখিয়েছেন কতগুলি 'মোটিফ্' এর সাহায্যে। 'ক' ও 'খ' গল্পে তিনি যে মোটিফগুলির মিল পেয়েছেন, সেগুলি—

১. মৌনতা

২. দুষ্টশক্তিসম্পন্ন শয্যাধার

৩. দুষ্টশক্তির অস্তিত্ব

৪. মুখ খোলার মধ্যে সমস্যার সমাধান

৫. অসমসাহসী পাত্র।

'ক' ও 'গ' গল্পে মিল হ'ল উভয় ক্ষেত্রেই—বনবাসী ব্যক্তি শক্তিদাতা। এই মোটিফগুলির মধ্যে যেহেতু মিল আছে, ফলে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, গল্প তিনটি একই উৎস থেকে উৎসারিত হয়ে বিভিন্ন শাখায় শাখায়িত হয়েছে এবং তাতে নানা প্রভাব পড়েছে। জার্মান গল্পটিকে তিনি মূল গল্পের বেশী কাছেরবলে অনুমান করেছেন, এবং ভারতবর্ষে যে গল্পটি সংকলিত হয়েছে, অর্থাৎ 'ক' গল্পটি তাতে 'খ' গল্পের কফিন ও শবাচ্ছাদন ভারতবর্ষের সংস্কৃতিক ধারা অনুযায়ী খাট ও রাজকন্যার পরিহিত বস্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ গল্পতিনটির উৎসস্থল হিসেবে তিনি জার্মানী বা তার আশেপাশের অঞ্চলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, লোককথা বিশ্লেষণের যে তুলনামূলক পদ্ধতি সেখানে গ্রীম ভাইরা একটা বক্তব্যকে খুব জোরের সঙ্গে হাজির করার চেষ্টা করেছিলেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় সংগৃহীত যে লোককথাগুলির সঙ্গে জার্মান ভাষায় সংগৃহীত লোককথার মিল পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলি আসলে জার্মান ভাষা থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল। এই তত্ত্বের নাম দেওয়া হয় 'পুরাকাহিনীর ভগ্নাংশ তত্ত্ব'। পরবর্তীকালে জোহানেস বোল্ট ও জর্জ সোলিভকা গ্রীম ভাইদের সংগৃহীত কাহিনী সমূহের সমকালীন ও সমধর্মী অনেক কাহিনী উল্লেখ করে সেগুলির তুলনামূলক আলোচনা করে গ্রীস ভাইদের তত্ত্বকে সমর্থন জানালে ও পরবর্তী সময়ে লোকসংস্কৃতিবিদ্‌রা গ্রীম ভাইয়ের এই তত্ত্ব বাতিল করে দেন।

এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক 'মোটিফ' নিয়ে যে খুব গভীরে আলোচনা করেছেন তা নয়, প্রাবন্ধিক শুধু সেই মোটিফগুলো নিয়েই আলোচনা করেছেন। যে মোটিফগুলি গল্প তিনটির এক উৎস নির্ণয়ে সহায়ক হবে। এই মোটিফগুলি ছাড়াও গল্প তিনটিতে আরো মোটিফ আছে যেমন—

'ক' গল্পে — কাজের ভার : কাউকে হাসাতে হবে,

'খ' গল্পে — নিষেধাজ্ঞা : রাজকন্যারূপী ভূতের সামনে মুখ না খোলা (কথা না বলা)

— যাদুপোষাক

— যাদুবস্তু অদৃশ্য হতে সাহায্য করে

'গ' গল্পে — অস্বাভাবিক গাছ

— কাজের ভার : কাউকে হাসাতে হবে

— উদারতার পুরস্কার

— জাদুপালক

প্রভৃতি। এই মোটিফগুলি ভারতে প্রাপ্ত গল্পে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, ফলে ম্যাক্স ম্যুলারের মত কেউ সিদ্ধান্ত করতেই পারত সমস্ত লোকগল্পের উৎস ভারতবর্ষ। ফলে উৎস নির্ণয়ে না গিয়ে, মানবস্মৃতি যে লোকগল্পে জমা থাকে সেই দিক থেকেই লোকগল্পের আলোচনার মূল জায়গা হওয়া উচিত। প্রবন্ধের নামটির মধ্যে দিয়ে প্রাবন্ধিক যে ভাষাবিজ্ঞানী

তার পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ ভাষাবিজ্ঞানে লিপির আলোচনায় শাড়ির গিঁট কে লিপির পূর্বসূরী বলা হয়। এই গিঁট এর সঙ্গে কোনো স্মৃতির অনুষঙ্গ থাকে।

❑ অনুশীলনী

বিস্তৃত প্রশ্নাবলী ঃ

১. ‘ভেজাল ও নকল’ প্রবন্ধে রাজশেখর বসু মূলত যে কথা বলতে চেয়েছেন, সে সম্পর্কে বিশদভাবে আলোকপাত করুন।

২. ভেজাল এবং নকল রোধের জন্য রাজশেখর বসু তাঁর প্রবন্ধে যেসব ব্যবস্থা নেবার কথা বলেছেন, সেগুলি কী-কী, বলুন।

৩. ‘ভেজাল ও নকল’ ঠিক কোন্ শ্রেণির প্রবন্ধ, বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলুন।

৪. ভেজাল এবং নকলের প্রসার ও প্রাদুর্ভাবের জন্য বস্তুতপক্ষে কারা দায়ী, বিশ্লেষণ করে দেখান।

৫. ভেজাল-নকল রোধ করতে গিয়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা কী হওয়া উচিত, রাজশেখর বসুর অনুসারে বলুন।

৬. আমাদের মানসিকতার উপরে রূপকথা কতখানি প্রভাব ফেলতে পারে বলে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছেন, আলোচনা করুন।

৭. রূপকথার বিরুদ্ধে কী-কী অভিযোগ ওঠে? কেন? এগুলি কতখানি গ্রহণযোগ্য, বিচার করুন।

৮. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রূপকথা সম্পর্কে যে তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করেছেন, তার বিশ্লেষণ করুন।

৯. প্রকৃতি এবং ইতিহাসকে অবলম্বন করে বাঙালির সংস্কৃতি যেভাবে গড়ে উঠেছে, আলোচনা করুন।

১০. ‘জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য’ প্রবন্ধে ইংরেজ-সংস্পর্শে আসার পরে বাঙালি সংস্কৃতির যে পর্যায়-বিবর্তন ঘটেছে বলে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেছেন, সে-সম্পর্কে আপনার অভিমত জানান।

১১. ‘জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য’ প্রবন্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কী-কী বলতে চেয়েছেন, বিশ্লেষণ করুন।

১২. ‘জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য’ প্রবন্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙালি জাতিকে কর্মে ও শ্রমে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করার কথা বলেছেন কেন, আলোচনা করুন।

১৩. ‘গল্পের গাঁটছড়া’ বলতে সুকুমার সেন কী বোঝাতে চেয়েছেন, আলোচনা করুন।

১৪. ‘গল্পের গাঁটছড়া’ সুকুমার সেন কীভাবে তিনটি গল্পের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন, বিশ্লেষণ করুন।

১৫. লোককথা বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে কী-কী পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় বলে সুকুমার সেন বলেছেন, বিশ্লেষণ করে দেখান।

১৬. লোককথা বিশ্লেষণে, মোটিফ ব্যাপারটি কী? সুকুমার সেন তাঁর ‘গল্পের গাঁটছড়া’ প্রবন্ধে কোন্-কোন্ মোটিফের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়েছেন? আলোচিত গল্পগুলিতে আর কী কী মোটিফ দেখা যায়? আলোচনা করুন।

অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১. নন্দ গোয়ালা এবং শিউরাম পাঁড়ের বক্তব্য কী ছিল? সংক্ষেপে প্রতিবেদন করুন।

২. সরকারি কর্তাদের লোকে কেন সন্দেহ করবে বলে রাজশেখর বসু মনে করেছেন?

৩. ব্যবসায়ীরা কীভাবে তাদের দস্তুর বদলাতে বাধ্য হয়?

৪. 'সত্যমেব জয়তে' এই রাষ্ট্রীয় মন্ত্রের মর্যাদা হানি কী ভাবে হচ্ছে?

৫. রূপকথাকে প্রকৃত সাহিত্যের নিয়মে বিচার করলে তার প্রতি অবিচার কেন করা হবে?

৬. রূপকথা বাস্তব জীবনের সমস্ত অপূর্ণতা কীভাবে পূর্ণ করে তোলে, সংক্ষেপে বলুন।

৭. রূপকথার সৌন্দর্যসম্ভার কার জন্যে? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৮. রূপকথা কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

৯. রামমোহন রায় কেন "লোকপূজিত ধর্মগুরু" রূপে গণ্য হন নি?

১০. "রক্ষয়িত্রী শক্তি অর্থে নিছক গোঁড়ামি নয়"—এই কথার তাৎপর্য কী?

১১. বাঙালির "পূর্ণ সার্থকতা" কোথায় নিহিত?

১২. কী অবস্থা ঘটলে সমাজ ও জাতি টিকতে পারে না?

১৩. বিক্রমাদিত্য রাজকন্যাকে কীভাবে বিয়ে করতে সক্ষম হয়েছিলেন?

১৪. জার্মন গল্পে উল্লেখিত রাজা সৈনিককে কেন জামাই করতে চেয়েছিলেন?

১৫. গ্রিমের গল্পে, রাজা "ছেলেটার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন" কী কারণে?

১৬. 'গল্পের গাঁটছড়া' প্রবন্ধে বর্ণিত তিনটি অনুরূপ গল্পের জাত কীভাবে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. নন্দ গোয়ালা "গলার কণ্ঠির দিব্যি" দিয়ে কি বলেছিল?

২. শিউরাম পাঁড়ে "এ ছিয়া ছিয়া" কখন বলেছিল?

৩. 'Hydrogenated Oil' কী কাজে অসৎ ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করে?

৪. কোথা থেকে আনা ময়দা লুচি বেলার সময়ে "স্থিতিস্থাপক" বলে মনে হয়?

৫. দুর্ভিক্ষের সময়ে কুকুরের মাংস কে খেয়েছিলেন?

৬. ইংরেজি সাহিত্যে ১৮ শতাব্দীর মধ্যভাগে কী হয়?

৭. রূপকথার "ছদ্মবেশ" খুললে কী ঘটবে?

৮. "আমাদের গোপন অন্তঃপুরশায়িনী প্রেয়সী" কে?

৯. শ্বেতবসন্তের গল্পে কিসের ছায়াপাত ঘটেছে?

১০. রবীন্দ্রনাথের কোন্ কাব্যে "রূপকথার মায়াময় স্পর্শটি সজীব" হয়ে আছে?

১১. ১৮৬০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত কার "জীবন ধীরমন্থর গতিতে" চলেছিল?

১২. বাঙালির কী বলে খ্যাতি আছে?

১৩. বাঙালির জ্ঞানের দিকটা কোথায় প্রকাশ পেয়েছে?

১৪. মল্লনৃত্য, রায়বেঁশে নাচ ও ব্রত-নৃত্য কিসের প্রমাণ?

১৫. হ্যালেডের সংগৃহীত গল্পটি কবে, কোথায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল?

১৬. ১৯৩৫ সালে হেড্‌উইগ সুরম্যান কী করেছিলেন?

১৭. Vampire মানে কী?

১৮. মানুষের স্মৃতি কিসের “মতো রক্ষিত হয়ে এসেছে”?

১৯. বিক্রমাদিত্য কোথায় রাজত্ব করতেন?

২০. তাল-বেতাল কী করেছিল?

বাংলা (পঞ্চম পত্র)

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পর্যায় ঃ ৪

একক ঃ ১—৩

একক ১ □ সংস্কৃতির সংজ্ঞা

গঠন

১.১ গোপাল হালদারের সমকালে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য

১.২ গোপাল হালদারের জীবনী ও সাহিত্যচর্চা এবং 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' সম্পর্কিত আলোচনা

১.৩ গোপাল হালদারের প্রবন্ধ : সামগ্রিক পরিচয়

১.৪ 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' : রচনার পটভূমি ও বিশেষত্ব

১.৫ 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' : সারসংক্ষেপ

১.৬ সংস্কৃতির গোড়ার কথা

১.৭ গোপাল হালদার প্রদত্ত সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও লক্ষণ

১.৮ গঠন শিল্প : সংস্কৃতির সংজ্ঞা

১.৯ প্রশ্নাবলী

১.১০ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.১ গোপাল হালদারের সমকালে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য

উনিশ শতকের শেষে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য পরিণত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল তা পূর্ব পাঠে আলোচিত হয়েছে। বিশ শতকে যে সাহিত্যের সীমা হল বিস্তৃত।

বিশ শতকের ত্রিশের দশকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের এবং চিন্তন জগতের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হল। ফলে গল্প-কবিতা-উপন্যাসের মতো প্রবন্ধেও দেখা দিল পরিবর্তন।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে 'সবুজ পত্র' (১৯১৪-১৯২৮) এবং 'কল্লোল'-এ পরিবর্তনের ভূমিকা রচনা করেছিল। বিশেষত 'সবুজ পত্র' ইউরোপীয় সাহিত্যের মননসমৃদ্ধির সঙ্গে বাঙালির পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাঙালি মন হয়ে উঠেছিল আন্তর্জাতিক। রুশ বিপ্লব তার মনোভুবনকে নাড়া দিয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আর রুশ বিপ্লবের পর পৃথিবীর পরিস্থিতির ঘটেছিল আমূল পরিবর্তন। বিশ শতকে বাঙালির পরিণত আত্মবিশ্বাসী মনোভুবন পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। ফলে তার দৃষ্টিভঙ্গি গিয়েছিল পালটে। সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্যতত্ত্ব—সব দিকেই দেখা দিয়েছিল পরিবর্তন। প্রবন্ধ সাহিত্যেও পড়েছিল তার প্রভাব।

এ সময়ের প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি নতুন দিক সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনার প্রকাশ। সাম্যবাদের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ঘটেছিল আগেই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' তার প্রমাণ। দেশত্যাগী বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে রাশিয়ার তাসখন্দ-এ স্থাপন করেন ভারতীয় কমিউনিস্ট দল। ক্রমে ভারতেও প্রসারিত হয় তার শাখা। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লব এবং রাশিয়ায় সাম্যবাদী সরকারের প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃত্ব এবং সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মনীষীগণ নবোৎসাহে সাম্যবাদ প্রচারে মন দিলেন। ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট দলকে নিষিদ্ধ করল। তার ফলে কমিউনিজম-এর প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ল। ক্রমে অর্থনীতি, সমাজ-

ইতিহাস, সংস্কৃতি—সব বিষয়েই মার্কসবাদের তাত্ত্বিক প্রয়োগ লক্ষিত হল। শ্রেণিশোষণ আর শোষক-শোষিত শ্রেণির দ্বন্দ্বের দৃষ্টিতে বিচার করা হতে লাগল দেশ ও জাতির ইতিহাস।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা পঠন-পাঠন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাস বাংলায় রচনার প্রবণতা বাড়তে লাগল।

এই পটভূমিতে বিশ শতকে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে দেখা দিল মোটামুটি দুটি প্রবণতা—(ক) সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কিত প্রবন্ধ রচনা, (খ) মননপ্রধান পাশ্চাত্য-চিন্তন প্রভাবিত প্রবন্ধ। তার সঙ্গে ছিল আত্মগত নিবন্ধ বা রম্য রচনার পূর্বগত ধারা। সেধারাটিও বিশ শতকের তিরিশের দশকে পুষ্ট হয়েছিল।

(ক) **সাহিত্য-সাহিত্যিক সংক্রান্ত প্রবন্ধ**—এ ধারার প্রাবন্ধিকদের মধ্যে আছেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, মুহদ শহীদুল্লাহ্, মোহিতলাল মজুমদার, সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, প্রমথনাথ বিশী, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু।

(খ) **মননপ্রধান পাশ্চাত্য-চিন্তন প্রভাবিত সমকাল-সচেতন প্রবন্ধ ধারা**—কাজী আবদুল ওদুদ এই ধারার প্রাবন্ধিক। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, রেজাউল করীম, সৈয়দ মুজতবা আলী, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিনয়কুমার সরকার, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণু দে, বিনয় ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট বুদ্ধিপ্রধান লেখক এই ধারার প্রাবন্ধিক।

দুই ধারার প্রাবন্ধিকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু ও কাজী আবদুল ওদুদ পাঠক্রমভুক্ত প্রাবন্ধিক হওয়ায় তাঁদের সম্বন্ধে পৃথক আলোচনা করা হয়নি।

(ক) সাহিত্য ও সাহিত্যিক সংক্রান্ত প্রবন্ধ ধারা :

অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৪-১৯৬১) : অতুলচন্দ্র গুপ্ত খুব কমই লিখেছেন। 'কাব্যজিজ্ঞাসা' (১৯২৮) নামের ক্ষুদ্র প্রবন্ধগ্রন্থে ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত এবং নিটোল আলোচনা তাঁর বিশিষ্ট কীর্তি। চিন্তার স্বচ্ছতা ও ভাষার স্পষ্টতা তাঁর প্রবন্ধের বিশেষ গুণ। 'নদীনীরে' তাঁর ভ্রমণনিবন্ধ।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯) : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র প্রথম প্রবন্ধ 'মদনভস্ম' ('ভারতী' অগ্রহায়ণ ১৩১৬ ব.)। তিনি 'আল এসলাম' (১৯১৫) 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' (১৯১৮) 'আঙুর' (প্রথম মুসলিম শিশু পত্রিকা), 'দ্য পিস' (১৯২২-১৯৩০), মাসিক 'বঙ্গভূমি' (১৯২২), পাক্ষিক 'তকবীর' (১৯৪৭)—এইসব পত্রিকার সঙ্গে সম্পাদনা সূত্রে যুক্ত ছিলেন।

নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করলেও বাংলা ভাষা ও বাঙালির সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনাই শহীদুল্লাহ্‌র প্রধান কাজ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান নিয়ে তাঁর পূর্বে আর কেউ এমন বিশদ বিশ্লেষণ করেননি। ধর্মের তুলনাত্মক আলোচনাভিত্তিক বহু প্রবন্ধও তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর অন্যতম কীর্তি 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (১ম ১৯৫৩, ২য় ১৯৬৫) রচনা। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে আছে 'ভাষা ও সাহিত্য' (১৯৩১—শহীদুল্লাহ্-র ১ম প্রবন্ধ সংকলন), 'আমাদের সমস্যা' (১৯৪৯), 'ইসলাম প্রসঙ্গ', 'কুরআন' প্রসঙ্গ (মরণোত্তর প্রকাশনা)। বাংলা প্রবন্ধের ইসলাম সম্পর্কিত শাখাটিকে পুষ্ট করেছিল মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র প্রবন্ধ।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮১-১৯৫২) ছিলেন প্রাচীনপন্থী সাহিত্য-সমালোচক। সাহিত্য ও সাহিত্যিক সংক্রান্ত প্রবন্ধ ভিন্ন কয়েকটি সমাজ-বিষয়ক প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন।

সাহিত্য সংক্রান্ত প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (১৯৩৬) সংকলনের তেরোটি প্রবন্ধে মোহিতলাল মূলত উনিশ শতকে বাংলা কাব্য-কবিতা, উপন্যাস প্রবন্ধের উদ্ভব-কারণ এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশেষত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন। 'সাহিত্য কথা' (১৯৩৮)-র চোদ্দোটি প্রবন্ধে আছে সাহিত্যের

আদর্শ, সমস্যা বিষয়ক আলোচনা। 'সাহিত্য-বিজ্ঞান' (১৯৪২)-এর পঁচিশটি প্রবন্ধে আছে বাংলা সাহিত্যে ট্র্যাজেডি, হাস্যরস প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা। এইসব প্রবন্ধ তাঁর সূক্ষ্ম সাহিত্যবোধ এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্বের সঙ্গে গভীর পরিচয়ের প্রমাণ দেয়। 'সাহিত্য-বিচার' (১৯৪৭) তাঁর এ শ্রেণির আর একটি গ্রন্থ। তাঁর ছন্দ বিষয়ক প্রবন্ধ-সংকলন 'বাংলা কবিতার ছন্দ' (১৯৪৫)। 'কবি শ্রীমধুসূদন' (১৯৪৭), 'বঙ্কিমবরণ' (১৯৪৯), 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' (১৯৬১), 'রবিপ্রদক্ষিণ' (১৯৪৯), 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র কাব্য' (১ম ১৯৫২, ২য় ১৯৫৩),—এই সব প্রবন্ধ-সংকলনে তিনি সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিকগণের রচনা-বিশেষত্ব ও সাহিত্যিক-সত্তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছেন।

'বাংলার নবযুগ' (১৯৪৫), 'বাংলা ও বাঙালী' (১৯৫১), 'জীবন জিজ্ঞাসা' (১৯৫১)—তাঁর সমাজভাবনামূলক প্রবন্ধের সংকলন। 'বাংলার নবযুগ'-এ তিনি যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন মানবতাবাদই ছিল উনিশ শতকে বাঙালির নব জাগরণের ভিত্তি। 'জয়তু নেতাজী' এবং 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' (১৯৬২) মোহিতলালের জীবনীপ্রবন্ধের নিদর্শন।

কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সাহিত্য-সমালোচকে মোহিতলালের প্রবন্ধ সমূহ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সমালোচনা ধারাটিকে পুষ্ট করেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের বিশিষ্ট আলোচক **সুশীলকুমার দে (১৮৯০-১৯৬৮)**-র অধিকাংশ প্রবন্ধই ইংরেজিতে লেখা। পুঁথি, শিলালেখ—প্রভৃতির সাহায্যে সংস্কৃত আলংকারিক কুন্তকের কাল নির্ণয় এবং অভিনব গুপ্ত কৃত 'ধ্বন্যালোক'-এর 'লোচন' টীকার সম্পাদনা তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। 'বাংলা প্রবাদ' (১৯৪৭) সংকলন গ্রন্থটি সুশীলকুমারের বাংলা বিদ্যা চর্চার মূল্যবান নিদর্শন। তাঁর বাংলা প্রবন্ধ-গ্রন্থ মাত্র দুটি—'দীনবন্ধু মিত্র' (১৯৫১) (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা হিসেবে রচিত) এবং 'নানা নিবন্ধ' (১৯৫৩ বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন)। ঈষৎ রক্ষণশীল মানসিকতা-সম্পন্ন লেখক সুশীলকুমার দে-র প্রবন্ধের বিশেষত্ব যুক্তি ও তথ্যের বিন্যাস-সৌষম্য।

ভাষাতত্ত্বের বিশিষ্ট গবেষক **সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭০)** ভাষা, সংস্কৃতি, ভ্রমণ—প্রভৃতি বিষয়েও বহু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। বেশির ভাগ প্রবন্ধ ইংরেজিতে লিখলেও বাংলায়ও বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন সুনীতিকুমার। তাঁর লেখা ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা তিন—'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' (১৯১৯), 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা' (১৯৪৪) এবং 'বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে'।

'জাতি সংস্কৃতি সাহিত্য' (১৯৩৮), 'ভারত-সংস্কৃতি' (১৯৪৪), 'সাংস্কৃতিকী' (১ম খণ্ড ১৯৬২, ২য় খণ্ড ১৯৬৫, ৩য় খণ্ড ১৯৮২), 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস' (১৯৭৬) এবং 'বাঙালীর সংস্কৃতি' (১৯৯০)—তাঁর সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন।

'পশ্চিমের যাত্রী' (১৯৩৮), 'রবীন্দ্র-সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' (২য় সংস্করণ ১৯৬৫), 'বৈদেশিকী' (১৯৪৩, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ ১৯৪৭), 'ইউরোপ' (১ম খণ্ড ১৯৪৪, ২য় খণ্ড ১৯৪৫), 'পথ-চলতি' (১ম ১৯৬২, ২য় ১৯৬৪)—এগুলি তাঁর ভ্রমণ-নিবন্ধ। 'মনীষী স্মরণে' (১৯৭২) এবং 'জীবন-কথা' (১৯৭৯ মরণোত্তর প্রকাশনা) তাঁর স্মৃতিচিত্রমূলক প্রবন্ধ-গ্রন্থ।

প্রজ্ঞার দীপ্তি, ভাষার প্রাঞ্জলতা, সরল বক্তব্য উপস্থাপন ভঙ্গি—সুনীতিকুমারের প্রবন্ধের বিশেষত্ব।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৭০) : ইংরেজি সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান নিয়ে বাংলা প্রবন্ধ রচনা আরম্ভ করেছিলেন। রোমান্টিক গোষ্ঠীর সাহিত্য-সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধই লিখেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (১৯৩৯)। গ্রন্থটি বাংলা কথাসাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনার পথপ্রদর্শক। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' (১৯৪৬), 'বাংলা উপন্যাস' (১৯৪৭), 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' (১৯৫৯), 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ-সঙ্গমে' (১৯৬২), 'রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা' (১ম ১৯৬৫, ২য় ১৯৬৯)।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-আলোচনার ভিত্তি ছিল সাহিত্যের অন্তর্গত জীবনদর্শনের সন্ধান। সংবেদনশীলতা

ও মননের সমন্বয় তাঁর সাহিত্য-আলোচনার বৈশিষ্ট্য। গভীর উপলব্ধি এবং সময়চেতনা যে সার্থক সাহিত্যের ভিত্তি—এ সত্যও তাঁর সাহিত্য-সমালোচনায় উপেক্ষিত হয়নি।

তবে বিশ শতকের নতুন রীতির সাহিত্যের তাৎপর্য তিনি তেমন অনুভব করতে পারেননি। জটিল বাক্যবিন্যাস এবং কিছু শব্দের পৌনঃপুনিকতা তাঁর সাহিত্য-সমালোচনাকে কিছুটা দুর্বল করেছে বলা যায়।

ঈষৎ প্রাচীনপন্থী হলেও **সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯২)** ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-ইতিহাসের বিশিষ্ট পন্ডিত। তাঁর প্রধান কাজ চার খন্ডে বিভক্ত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৪০-১৯৫৫) এবং বাংলা ভাষা সংক্রান্ত 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৩৯) গ্রন্থ।

বাংলা বিদ্যাচর্চায় নিপুণ সুকুমার সেন নানা বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ-গ্রন্থ রচনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি গ্রন্থের নাম করা যায়। যেমন 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৪০), 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী' (১৯৪৩), 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী' (১৯৪৫), 'বনফুলের ফুলবন' (১৯৫১), 'পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্রবিকাশ' (১৯৬২), 'বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ' (১৯৭০), 'রামকথার প্রাক্ ইতিহাস' (১৯৭৭), 'ভারত কথার গ্রন্থিমোচন' (১৯৮১), 'গল্পের ভূত' (১৯৮২), 'চৈতন্যাবদান' (১৯৮৫), 'ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি' (১৯৮৮), 'দিনের পরে দিন' ('স্মৃতিকথা' ১ম ১৯৮২, ২য় ১৯৯৩) প্রভৃতি।

তথ্যের যুক্তি সংগত বিন্যাস, অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং আকর্ষক সরল ভাষা সুকুমার সেনের প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য।

প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫) মূলত সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধের রচয়িতা। তবে কয়েকটি ব্যঙ্গ-তির্যক নিবন্ধ, আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থ এবং জীবনীও তিনি রচনা করেছিলেন।

তথ্যসন্ধিৎসু গবেষক মনের অধিকারী প্রমথনাথের বেশির ভাগ প্রবন্ধের কেন্দ্রবিন্দু রবীন্দ্রনাথ। তাঁর রচিত রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা মূলক প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে আছে—'রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ' (১৯৩৯, লেখকের প্রথম প্রবন্ধ সংকলন। পরে এটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয়; ১ম খণ্ড ১৯৪৮, ২য় খণ্ড ১৯৪৯), 'রবীন্দ্রকাব্য নির্ঝর' (১৯৫৬), 'রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহ' (১ম ১৯৫৩, ২য় ১৯৫৮), 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' (১৯৫৪), 'মহারাষ্ট্র ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬১), 'রবীন্দ্রসরণী' (১৯৬২) এবং 'শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ' (১৯৭২) প্রভৃতি।

তাঁর অন্যান্য সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে উল্লেখ্য 'বঙ্কিম সরণী' (১৯৬৩), 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী' (১৯৬৬), 'বঙ্কিম সাহিত্য বিচার' (১৯৭০), 'বাংলার মনীষা ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৮৪) প্রভৃতি।

তাঁর রচিত জীবনী গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ্য 'মাইকেল মধুসূদন' (১৯৪১), 'বাংলার লেখক' (১৯৫০), 'জওহরলাল নেহরু : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' (১৯৫১), 'বাংলার কবি' (১৯৫৯), 'গান্ধী জীবনভাষ্য' (১৯৭১) প্রভৃতি। 'বিচিত্র উপল' (১৯৫১), 'নানা রকম' (১৯৫৮), 'বিচিত্র সংলাপ' (১৯৫৮), 'কমলাকান্তের আসর' (১৯৫৫), 'কমলাকান্তের জল্পনা' (১৯৬২)—প্রভৃতি গ্রন্থ প্রমথনাথ বিশীর লেখা বিভিন্ন রসের প্রবন্ধ-সংকলন। সাহিত্যবোধ, সাহিত্যজ্ঞান এবং সৃষ্টিপ্রতিভার সংমিশ্রণ, প্রমথনাথ বিশীর মননদীপ্ত এবং আকর্ষক প্রবন্ধসমূহের বৈশিষ্ট্য।

বাংলা ছন্দ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার পথিকৃৎ **অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের (১৯০২-১৯৮৪)** স্মরণীয় কাজ বাংলা ছন্দ-সংক্রান্ত প্রবন্ধের সংকলন 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' (১৯৩২)। সুকুমার সেন ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অমূল্যধন-প্রদত্ত ছন্দ-পরিভাষা গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা ছন্দে পর্ব-পর্বাঙ্গ বিভাগের প্রথম প্রবক্তা অমূল্যধনের অন্যান্য ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখ্য 'রবীন্দ্রছন্দের বৈশিষ্ট্য' (আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা', ১৯৬১ গ্রন্থের প্রবন্ধ), 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও সৃষ্টি' ('কবিগুরু' ১৯৬৪)।

বাংলা সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও তিনি কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সেই সব প্রবন্ধের সংকলন 'আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা' (১৯৬১), 'কবিগুরু' (১৯৬৪), 'রবীন্দ্রনাথের মানসী' (১ম খণ্ড ১৯৬১, ২য় খণ্ড ২০০০) গ্রন্থ তিনটি।

সহজ ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপনা অমূল্যধনের প্রবন্ধের বিশেষত্ব।

নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১) : সাহিত্য, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি নিয়ে বহু বিশ্লেষণভিত্তিক তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', 'চতুরঙ্গ', 'বারোমাস', 'ক্রান্তি' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত প্রবন্ধ-রচয়িতা নীহাররঞ্জনের মূল্যবান গ্রন্থ পনেরো অধ্যায়ে বিন্যস্ত 'বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব' (১৯৪৯) গ্রন্থটি। বাংলা ও বাঙালি জীবনের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে 'বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ' (১৯৪৫), 'প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন' (১৯৪৭), 'বাংলার নদনদী', 'কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি' (১৯৭৯)। 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' (১৯৪১)—রবীন্দ্রসাহিত্য-সংক্রান্ত এই প্রবন্ধ-সংকলনে নীহাররঞ্জন রবীন্দ্র-মানস ও রবীন্দ্রসাহিত্যের বিবর্তনের সময়ভিত্তিক আলোচনা করেছেন। ভাষার স্পষ্টতা তথ্যের সুচারু বিন্যাস, মননের ভারহীন উদ্ভাস নীহাররঞ্জন রায়ের প্রবন্ধের বিশেষ গুণ।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯১১-১৯৬৪) ছিলেন গবেষণা-ভিত্তিক প্রবন্ধের দক্ষ রচয়িতা। বেশির ভাগ প্রবন্ধ ইংরেজিতে লিখলেও তাঁর বাংলা প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা কম নয়। ধর্ম, দর্শন আর সাহিত্য—তিন বিষয়েই বেশ কিছু বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন শশিভূষণ। তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব গভীর পাঠজনিত জ্ঞান এবং মৌলিক চিন্তনশক্তির সুমিত অন্বয়। 'বাংলা সাহিত্যে নবযুগ' (১৯৩৮), 'ভারতীয় সাধনার ঐক্য' (১৯৪৫), 'শ্রীরাধার ক্রম বিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে' (১৯৫২), 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য', 'ঘরে বাইরের সাহিত্যচিন্তা' (১৯৬২) শশিভূষণ দাশগুপ্তের স্মরণীয় প্রবন্ধ-সংকলন।

(খ) মননপ্রধান, প্রতীচ্য চিন্তন-প্রভাবিত সমকাল সচেতন প্রবন্ধধারা :

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১) ছিলেন 'সবুজপত্র'-ধারার মননদীপ্ত প্রবন্ধ-রচয়িতা। সংগীত, সাহিত্য, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, সংস্কৃতি—প্রায় সব বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন মার্কসবাদে আস্থাশীল সমকালের রাজনীতি সম্ভবন্ধে সচেতন ধূর্জটিপ্রসাদ। বিষয়-বিস্তৃতি, যুক্তিপ্রাধান্য, নিরাসক্ত বিশ্লেষণ প্রবণতা তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। তাঁর প্রবন্ধের লক্ষ্য পাঠকের অন্তর্দৃষ্টির উন্মোচন। তাঁর প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা সাত। এদের মধ্যে 'চিন্তয়সি' (১৯৩৪), 'বক্তব্য' (১৯৫৭) বিষয়-গভীর প্রবন্ধের সংকলন। 'সুর ও সংগীত' (১৯৩৭) ও 'কথা ও সুর' (১৯৩৮)—সংগীতকেন্দ্রিক প্রবন্ধের সংকলন। 'আমরা ও তাহারা' (১৯৩১), 'মনে এলো' (১৯৫৬) এবং 'ঝিলিমিলি' (১৯৬৫)—বুদ্ধিদীপ্ত রম্য প্রবন্ধের সংকলন। তাঁর প্রবন্ধভাষার বিশেষত্ব বুদ্ধি-উজ্জ্বল বাক্যের ব্যবহার।

সাহিত্য দর্শন, রাজনীতি এবং মার্কসবাদের মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল **নীরেন্দ্রনাথ রায়ের (১৮৯৬-১৯৬৬)** চিন্তন-ধারা। 'পরিচয়'-এ দেশবিদেশের প্রসিদ্ধ লেখকদের নিয়ে তিনি লিখেছিলেন বহু প্রবন্ধ। সেইসব প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করেছেন মহৎ সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রগতিমনস্কতা থাকেই। তাঁর প্রবন্ধের আর এক বিশেষত্ব শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রেণিদ্বন্দ্বের সাহিত্য-রূপের বিশ্লেষণ। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনা তিনি মার্কসীয় এই তত্ত্বের প্রয়োগে বিচার করেছেন। মার্কস-এর তত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে পত্রিকার পৃষ্ঠায়। তাঁর একটি মাত্র প্রবন্ধ সংকলনের নাম 'সাহিত্যবীক্ষা'।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) ছিলেন মননশীল প্রবন্ধ ধারার লেখক। তাঁর উদ্যোগে প্রকাশিত হয় বুদ্ধিবৃত্ত বাংলা ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' (১৯৩১)। এ পত্রিকা পাশ্চাত্যের সাহিত্য ও মননচর্চার সঙ্গে বাঙালি মনের যোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছিল।

সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা মাত্র দুটি—'স্বগত' (১৯৩৮) এবং 'কুলায় ও কালপুরুষ' (১৯৫৭) প্রথম সংকলনের আঠারোটি প্রবন্ধের বিষয় সাহিত্য ও সাহিত্যিক। 'কুলায় ও কালপুরুষ' সংকলনের উনিশটি প্রবন্ধের মধ্যে পাঁচটি 'স্বগত' (১ম সংস্করণ) থেকে গৃহীত। এ সংকলনে মানবস্বভাব, বিজ্ঞান ও মার্কসীয় দর্শন সম্বন্ধে রচিত কিছু প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

চিন্তার গভীরতা, বহুপাঠ জনিত অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ মেধা, পর্যবেক্ষণ শক্তি, শ্রমশীল রচনাক্ষমতা, প্রখর শব্দচেতনা, সংহত বহু স্তর বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গি—সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিশেষত্ব।

রেজাউল করীম মহম্মদ জওয়াদ (১৯০২-১৯৯৩) : রেজাউল করীম নামেই পরিচিত। তাঁর প্রবন্ধে লক্ষিত হয় জাতীয়তা চেতনা ও ধর্মীয় উদারতার প্রকাশ। ধর্মীয় সমন্বয় সাধন এবং স্বদেশের বৌদ্ধিক মুক্তি ছিল তাঁর প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য। ইংরেজি ও বাংলা—উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধ করেছেন তিনি। 'জাতীয়তার পথে' (১৯০৯), 'নয়া ভারতের ভিত্তি' (১৯৩৫), 'তুর্কি বীর কামাল পাশা' (১৯৩৮), 'পাকিস্তান বিচার' (১৯৪২), 'সাধক দারাশুকো' (১৯৪৪), 'মনীষী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ' (১৯৪৭), 'সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও গান্ধিজী (১৯৪৭), 'সংস্কৃতি সমন্বয়' (১৯৪৭)—এই কয়টি তাঁর বাংলা প্রবন্ধের সংকলন।

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪) ছিলেন বহু ভাষাবিদ, প্রশ্নাতীত পাণ্ডিত্যের অধিকারী প্রাবন্ধিক। তিনি বিষয়-গভীর প্রবন্ধ, রম্য রচনা, ভ্রমণ নিবন্ধ—তিন ধরনের প্রবন্ধই লিখেছেন। তবে ঈষৎ শৃঙ্খলাহীন অনুভব-প্রধান রম্য নিবন্ধ-রচয়িতা হিসেবেই তিনি খ্যাত। রম্য নিবন্ধের লঘু কাঠামোয় গভীর বিষয়ের অনায়াস বিন্যাসে তিনি ছিলেন দক্ষ। ভাষা, সহিত্য, রাষ্ট্রনীতি, ব্যক্তিজীবন—সর্ব বিষয়ে প্রাঞ্জল, আন্তরিক ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করেছেন মুজতবা আলী। তাঁর বহু প্রবন্ধই সমকালীন ঘটনার অভিঘাতে রচিত। কিন্তু উপস্থাপন-কৌশলে সেগুলি হয়ে উঠেছে চিরকালীন। মননের হৃদয়গ্রাহী প্রকাশ তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। তাঁর প্রবন্ধ-সংকলনের আছে 'পঞ্চতন্ত্র' (১ম খণ্ড ১৯৫২, ২য় খণ্ড ১৯৬৬), 'ময়ূরকণ্ঠী' (১৯৫৩), ' পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' (১৯৫৬), 'ধূপছায়া' (১৯৫৮), 'চতুরঙ্গ' (১৯৬০), 'বহু বিচিত্র' (১৯৬২), 'ভবঘুরে ও অন্যান্য' (১৯৬৫), 'বড়বাবু' (১৯৬৫), 'হিটলার' (১৯৭১), 'মুসাফির' (১৯৭১) প্রভৃতি। তাঁর ভ্রমণ-নিবন্ধ 'দেশে-বিদেশে' (১৯৪৯) ও 'জলে-ডাঙায়' (১৯৫৭) প্রভৃতি।

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২) : ভ্রমণ কথা ভিন্ন নানা বিষয়ে প্রচুর বুদ্ধি-উজ্জ্বল প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত প্রবন্ধ 'পারিবারিক নারী সমস্যা' (১৯১৫) সমকালে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল।

প্রথম পর্যায়ে সাহিত্য-সংক্রান্ত প্রবন্ধ অধিক লিখলেও পরে তিনি রাজনীতি, জাতীয় সমস্যা, শিল্পতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম-সমস্যা ভাষা সমস্যা, স্মৃতিচিত্র—বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। স্বীয় মানবিকতাবাদী মনের প্রকাশ দেখা যায় তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যে। যুক্তিনির্ভর-বিশ্লেষণ, চিন্তার স্বচ্ছতা, বৈদগ্ধ্যের দীপ্তি, উপস্থাপন ভঙ্গির বিচিত্রতা—তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। তাঁর প্রবন্ধের ভাষা সরল, শব্দ নির্বাচন ও বাক্যবিন্যাস সুন্দর। ছোটো ছোটো বাক্যে বক্তব্যের উপস্থাপন তাঁর বিশেষত্ব। দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ-সংকলনের নাম দেওয়া গেল—ভ্রমণকথা 'পথে-প্রবাসে' (১৯৩১), 'ফেরা' (১৯৬৫) ; আত্মবিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ 'বিনুর বই' (১৯৪৪), 'চক্রবাল' (১৯৭৮), 'সাতকাহন' (১৯৭৯) ; অন্যান্য প্রবন্ধসংকলন 'আর্ট' (১৯৪৪ থেকে ১৯৬৮-এই কুড়ি বছরে লেখা প্রবন্ধের সংকলন), 'দেশকালপাত্র' (১৯৪৯), 'প্রত্যয়' (১৯৫১)—বইদুটি সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধের সংকলন। 'কণ্ঠস্বর' (১৯৫৪) পত্রপ্রবন্ধের সংকলন। 'সন্ধিক্ষণ' (১৯৯০) ও 'সেতুবন্ধন' (১৯৯৫) ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কিত প্রবন্ধের সংকলন। 'শতাব্দীর মুখে' (২০০১) সংকলনে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। 'জীবন শিল্পী রবীন্দ্রনাথ'—তাঁর রবীন্দ্রবিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ। সমকালের কয়েকজন মনীষী সম্বন্ধে অন্নদাশঙ্কর রচিত প্রবন্ধের সংকলন 'আমার কাছের মানুষ'।

বিনয়কুমার সরকার (১৯০৫-১৯৫৯) সহজ ভাষায় সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য, রাজনীতি মার্কসীয় তত্ত্ব, শিল্পকলা—বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজ বিন্যাসে উচ্চ ও নিম্ন বর্গের সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রণের দিকটি তাঁর প্রবন্ধে স্পষ্ট হয়েছে। অর্থনীতি বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন বিনয়কুমার।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ তাঁর উদ্যোগে গঠিত হয়। এ পরিষদের মুখপত্র 'আর্থিক উন্নতি' তাঁর উৎসাহে প্রকাশিত হয়েছিল। বেশ কিছু বিদেশি প্রবন্ধ-সংকলনের অনুবাদও তিনি করেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে আছে 'নয়া বাংলার গোড়াপত্তন', 'হিন্দু সাহিত্যে প্রেম', 'একালের ধনদৌলত' (মার্কসীয় তত্ত্বের বিষয়ে আলোচনা)। তাঁর অনুবাদ

প্রবন্ধের মধ্যে আছে বুকার টি. ওয়াশিংটন-এর রচিত 'আপ ফ্রম স্লেভারি' অবলম্বনে রচিত 'নিগ্রো জাতির কর্মবীর'। 'ধনদৌলতের রূপান্তর'-এর অবলম্বন ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর তত্বভিত্তিতে রচিত একটি ফরাসি গ্রন্থ। বিষয়ের নতুনত্ব এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিনয়কুমার সরকারের বিশেষত্ব।

আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-১৯৮২)-এর প্রবন্ধের বিশেষত্ব চিন্তন-গভীরতা, যুক্তিপ্রাধান্য এবং আন্তরিক অনুভবের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক কবিতা বিষয়ে তিনি অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে বিশ্লেষণমুখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম বাংলা প্রবন্ধ 'বুদ্ধিবিভ্রাট ও অপরোক্ষ অনুভূতি' প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের 'পরিচয়' পত্রিকার একটি সংখ্যায়। তাঁর প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা মাত্র তিনটি—'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৮), 'পান্থজনের সখা' (১৯৭৩), 'পথের শেষ কোথায়' (১৯৭৭)। তাঁর রবীন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত প্রবন্ধের অনন্যতা রবীন্দ্র-চেতনায় অমঙ্গালের উদ্ভাস বিশ্লেষণে।

বিষয় উপস্থাপনের স্বাতন্ত্র্য, দার্শনিকসুলভ নিরাসক্তি, যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ পদ্ধতি, অ-জটিল প্রকাশভঙ্গি, সুবোধ্য ভাষা আবু সয়ীদ আইয়ুবকে করে তুলেছে স্বতন্ত্র এক প্রাবন্ধিক।

বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) বিচিত্র বিষয়ে মননসমৃদ্ধ বহু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। বহু পাঠজনিত গভীরতা, সমাজ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। সাহিত্য, সাহিত্যিক, সাহিত্যতত্ত্ব, চিত্রশিল্প বিষয়ক প্রবন্ধ ভিন্ন স্মৃতিচিত্রণমূলক প্রবন্ধও তিনি লিখেছিলেন। 'পরিচয়' পত্রিকায় নিয়মিত গ্রন্থ সমালোচনা করতেন বিষ্ণু দে। তাঁর প্রবন্ধ সংকলনের সংখ্যা নয়। এদের মধ্যে 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প-সাহিত্যে আধুনিকতা' (১৯৬৬) রবীন্দ্র-রচনার বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধমালা। 'যামিনী রায়' (১৯৭৭) জীবনভিত্তিক প্রবন্ধ। 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' (১৯৫২), 'এলোমেলো জীবন ও শিল্প-সাহিত্য' (১৯৫৮) সাহিত্য সংক্রান্ত প্রবন্ধ-সংকলন। 'সেকাল থেকে একাল' (১৯৮০) স্মৃতিচারণাভিত্তিক প্রবন্ধ-সংকলন।

বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০) প্রথম জীবনে ছিলেন সক্রিয় কমিউনিস্ট কর্মী। 'ফরওয়ার্ড', 'সাপ্তাহিক অরণি', দৈনিক 'বসুমতী', 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেছিলেন তিনি। সমাজ-সংস্কৃতি, ব্যক্তিজীবন রাজনীতি, সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন বিনয় ঘোষ। মার্কসীয় দৃষ্টিতে সমাজ ও সংস্কৃতির আলোচনা তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। তাঁর সমাজ-সংস্কৃতিমূলক প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে আছে 'শিল্প সংস্কৃতি সমাজ' (১৯৪০), 'সংস্কৃতির দুর্দিন' (১৯৪৫), 'বাংলার নবজাগৃতি' (১৯৪৮), 'কলকাতা কালচার' (১৯৫৩), 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (১৯৫৭) প্রভৃতি। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ-সংকলন 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'।

তাঁর জীবনী গ্রন্থের মধ্যে বিশিষ্ট 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' (১ম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৫৭, ৩য় খণ্ড ১৯৫৯)।

'আন্তর্জাতিক রাজনীতি' (১৯৪১), 'ফ্যাসিজম ও জনযুদ্ধ' (১৯৪২) প্রভৃতি তাঁর রাজনীতিমূলক প্রবন্ধ-সংকলন। 'জনসভার সাহিত্য' (১৯৫৫), 'মেহনত ও প্রতিভা' (১৯৭৮) তাঁর সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ-সংকলন। পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (১-৫ খণ্ড; ১৯৬১-১৯৬৮) বিনয় ঘোষের বিশেষ কীর্তি।

'কালপেঁচা' ছদ্মনামে তিনি বেশ কিছু রম্য নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। 'কালপেঁচার নকসা' (১৯৫১), 'কালপেঁচার দু'কলম' (১৯৫২), 'কাল পেঁচার বৈঠক' (১৯৫৭)—গ্রন্থত্রয় তাঁর সেসব নিবন্ধের সংকলন।

বিনয় ঘোষ ছিলেন গবেষক মনোবৃত্তি সম্পন্ন সৃষ্টিসক্ষম প্রাবন্ধিক।

এই আলোচনা প্রমাণ করে কোন সমৃদ্ধ প্রবন্ধসাহিত্য-প্রেক্ষিতে গোপাল হালদারের প্রবন্ধচর্চার শুরু এবং বিকাশ সম্ভব হয়েছিল।

১.২ গোপাল হালদারের জীবনী ও সাহিত্যচর্চা এবং 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' সম্পর্কিত আলোচনা

অবিভক্ত বাংলার ঢাকা জেলার বিদগাঁও-এ ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি সীতাকান্ত হালদারের দ্বিতীয় সন্তান ও প্রথম পুত্র গোপাল হালদারের জন্ম।

বাড়িতে ছিল সংস্কৃতিচর্চা ও দেশপ্রেমের আবহ। গোপাল হালদারের প্রথম পাঠ পরিবারেই শুরু হয়। পরে জীবিকার সন্ধানে তাঁদের পরিবার নোয়াখালি শহরে চলে যান। সীতাকান্ত ও তাঁর বড়ো ভাই অন্নদাকান্ত একত্রে থাকতেন। অন্নদাকান্তের পুত্র পরবর্তী সময়ের প্রসিদ্ধ মনীষী ও মনস্তত্ত্ববিদ রঙিন হালদার।

শিক্ষা ও রাজনৈতিক জীবন : ১৯০৯ সালে গোপাল হালদার আর. কে. জুবিলি স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলে পড়ার সময়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের রচনা পড়েছিলেন। তাঁকে মুগ্ধ করেছিল রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের লেখা। সমকালের অন্যান্য উজ্জ্বল ছাত্রের মতো গোপাল হালদারকেও টেনেছিল বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন। চোদ্দো বছর বয়সে নবম শ্রেণির ছাত্র গোপাল হালদার যুক্ত হয়েছিলেন বিপ্লবী দল 'যুগান্তর'-এর সঙ্গে। তবে এ যোগ তেমন গভীর হয়নি বলেই মনে হয়। ১৯২৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করে তিনি কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে আই. এ. শ্রেণিতে ভরতি হন। থাকতেন স্কটিশ চার্চ নিয়ন্ত্রিত ওগিলভি হস্টেল-এ। এখানে তাঁর পরিচয় হয় সজনীকান্ত দাস ও পরিমল রায়ের সঙ্গে। এই তিন জন সাহিত্যচর্চার একটি পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন। তবে তাঁর নিয়মিত পাঠ বাধা পায়নি।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে আই. এ. পাস করে তিনি এই কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়া শুরু করেন। এসময় গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে তিনি পরীক্ষা না দিয়ে যোগ দেন কংগ্রেসে—এবং চলে যান নোয়াখালি। কিন্তু এ সময় বিহারের চৌরিচৌরায় উত্তেজিত জনতা পুলিশে ভরতি থানায় আগুন দিয়ে কয়েকজন কনেস্টবলকে হত্যা করে। ফলে গান্ধিজি আন্দোলন থামিয়ে দেন। হতাশ গোপাল হালদার ফিরে আসেন কলকাতায় এবং পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে অনার্স সহ পাস করেন। তবে তিনি কংগ্রেস ছাড়েননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম. এ. পড়ার সময় ১৯২৩-এ দিল্লির কংগ্রেস অধিবেশনে ডেলিগেট হিসেবে যোগদান করেন তিনি। এসময় কংগ্রেসে দেখা দিয়েছিল বহু মতবিরোধ। ফলে কংগ্রেসি রাজনীতি সম্পর্কে ক্রমে তাঁর মন হয়ে ওঠে সংশয়ী। এর মধ্যে তিনি এম. এ. (১৯২৪) ও আইন (১৯২৫) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন। দ্বিতীয় পরীক্ষায় তিনি লাভ করেছিলেন 'টেগোর ল অ্যাওয়ার্ড'। বি. সি. এস. পরীক্ষার পাশ করলেও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ায় তিনি নোয়াখালি গিয়ে আইন ব্যবসায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর মন টানত সাহিত্য ও রাজনীতি। নানা পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন আর দাঙ্গার ক্রম-ব্যাপ্তিতে উদ্বেগ বোধ করতেন গোপাল হালদার। এর মধ্যে ১৯১৭ সালে ঘটেছে রুশ বিপ্লব। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কমিউনিজম প্রচারের প্রয়াস স্বরূপ 'ভ্যানগার্ড' ও 'অ্যাডভ্যান্সড গার্ড' পত্রিকা দুটি প্রকাশিত হয়েছে। 'দেশের বাণী' সংবাদপত্রটি ছিল স্বরাজ্য দলের সমর্থক। এ পত্রিকায় উক্ত দুই পত্রিকার সংবাদ উদ্ধৃত হত। ১৯২৫-এ কানপুরে স্থাপিত কমিউনিস্ট দল আর সোভিয়েত রাষ্ট্রসংক্রান্ত সংবাদ মুদ্রিত হত এই পত্রিকাটিতে। এভাবেই সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে আগ্রহ জাগতে থাকে গোপাল হালদারের মনে।

১৯২৬-এ তিনি আবার কলকাতায় আসেন এবং ভাষাতত্ত্বজ্ঞ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে আরম্ভ করেন 'পূর্ব বঙ্গের উপভাষা' নিয়ে গবেষণা। কলকাতার সাহিত্য-জগতে তাঁর পরিচিতি বেড়ে যায়। বন্ধুত্ব হয়

সুশীলকুমার দে, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, কালিদাস নাগ, মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে। 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে যোগ স্থাপিত হয় তাঁর। ১৯২৭-এ তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকা গোষ্ঠীর ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ওয়েলফেয়ার'-এর সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন।

তখন রাজনীতির সঙ্গে তেমন যোগ ছিল না তাঁর। যদিও ১৯২৮-এ কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে প্রতিনিধি রূপে তিনি উপস্থিত ছিলেন।

১৯২৯-এ পূর্ববঙ্গের ফেনি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন গোপাল হালদার। ১৯৩০ সালে তিনি পদত্যাগ করেন এবং কলকাতায় এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক হিসেবে সুনীতিকুমারের তত্ত্বাবধানে কাজ শুরু করেন। এই সময়ে ভারতের রাজনীতি জগৎ খুবই উত্তপ্ত ছিল। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯২৯-এ লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। ১৯৩০-এর ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস রূপে ঘোষণা করে কংগ্রেস। সে বছরের মার্চ মাসে গান্ধিজির নেতৃত্বে শুরু হয় লবণ সত্যাগ্রহ। গোপাল হালদার গবেষণা ছেড়ে যোগ দিলেন আন্দোলনে। এই বছর সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া যান আর নভেম্বর মাস থেকে 'প্রবাসী'-তে বের হতে থাকে 'রাশিয়ার চিঠি'। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে গোপাল হালদারের আগ্রহ বাড়তে থাকে।

১৯৩২-এ হয় 'গান্ধি-আরউইন' চুক্তি। সুনীতি চৌধুরী ও শান্তি ঘোষ হত্যা করেন ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স-কে, হিজলি জেলে পুলিশের গুলি চলে আর রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে প্রতিবাদসূচক বক্তৃতা করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হয় গোপাল হালদারের।

প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন আইনে কংগ্রেস-সদস্য হিসেবে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল গ্রেপ্তার হন গোপাল হালদার। বিচারে ছ-বছরের কারাদণ্ড হয় তাঁর। প্রথমে তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হয়; পরে পাঠানো হয় বক্সা ক্যাম্পে। আবার তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয় এই জেলে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে নিজের বাড়িতে অন্তরীন করা হয়। জেলে থাকার সময় তাঁর সাহিত্যচর্চার বিকাশ; আরব্ধ গবেষণা-কর্মও তিনি জেলে বসেই শেষ করেন।

এই সময়ে ফ্যাসিবাদের উত্থানে বিশ্বের বিবেকী ব্যক্তিগণ হন বিচলিত; সম্মিলিত প্রতিবাদ ঘোষিত হয়, সমাজতন্ত্রীগণ সংঘবদ্ধ হন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। ভারতেও দেখা যায় এর প্রতিফলন। প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'। এই প্রেক্ষিতে বন্দী গোপাল হালদার সমাজতন্ত্র সম্পর্কে চিন্তা ও পাঠ শুরু করেন।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে মুক্ত গোপাল হালদার পরিচিত হন সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে; যুক্ত হন 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামের ইংরেজি সাপ্তাহিকটির সঙ্গে। এবছরই কমিউনিস্ট দল পরিচালিত 'কৃষক সভা'র সঙ্গে তাঁর যোগ স্থাপিত হয়।

১৯৩৯-এ 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা'-র তৃতীয় অধিবেশনের প্রচারসচিব হন গোপাল হালদার। এ বছরের ত্রিপুরী অধিবেশনে কংগ্রেস-সভাপতি নির্বাচিত হন সুভাষচন্দ্র। পরের বছর তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। এবছরই অর্থাৎ ১৯৪০ সালে গোপাল হালদার কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এবং 'হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড'—এই দৈনিক ইংরেজি সংবাদপত্রের সম্পাদক হন। ১৯৪১-এ তিনি কমিউনিস্ট দলের সদস্য হন।

কমিউনিস্ট সদস্য হিসেবে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'-র সংগঠকদের একজন গোপাল হালদার সংগঠনের মুখপত্র 'সোভিয়েত দেশ'-এর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। ক্রমে কমিউনিস্ট দলের প্রথম শ্রেণির নেতা হয়ে উঠেছিলেন গোপাল হালদার। তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছিলেন। ১৯৪২-এ সোমেন চন্দের হত্যার প্রেক্ষিতে গঠিত 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'-এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন গোপাল হালদার। ১৯৪৩-এর মন্বন্তর-কালে

কমিউনিস্ট দল দুর্গত ত্রাণের কাজ শুরু করেন। গোপাল হালদার এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হন। তারই ফল তাঁর তিন পর্বের উপন্যাস ‘পঞ্চাশের পথ’, ‘তেরশ পঞ্চাশ’ ও ‘উনপঞ্চাশী’। ‘সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি’-র প্রতিনিধি হিসেবে তিনি এসময়ে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র পরিদর্শনের জন্য নির্বাচিত হন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার পাসপোর্ট না দেওয়ায় তাঁর যাওয়া হয়নি।

১৯৪৪-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত ‘ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘ’-এর দ্বিতীয় সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীর একজন ছিলেন গোপাল হালদার।

১৯৪৪-এ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্ব-সম্পাদিত ‘পরিচয়’ পত্রিকাটির স্বত্ব প্রদান করেন তাঁর সাম্যবাদী বান্ধবদের কাছে। পত্রিকাটির দায়িত্ব পড়ে নীরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল হালদার ও রবীন্দ্র মজুমদারের হাতে। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮—এই চার বছর তিনি ‘পরিচয়’ সম্পাদনা করেন। ১৯৪৪-এ কলকাতায় গণনাট্য সংঘ গঠিত হয়। এই সংস্থার উদ্যোগে অভিনীত বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ নাটকের ছোটো এক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন গোপাল হালদার। এ ছাড়া কমিউনিস্ট দলের প্রায় সব সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কাজেই তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

স্বাধীনতার পর কমিউনিস্ট দল ভারত সরকারের তীব্র সমালোচনা করে। পরিণতিতে ১৯৪৮-এর মার্চ মাসে কমিউনিস্ট দল নিষিদ্ধ হয়। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গোপাল হালদারও বন্দী হন। ১৯৪৯-এর জুন মাসে তিনি মুক্তি পান।

সাম্যবাদে দৃঢ়বিশ্বাসী হলেও কোনো গোঁড়ামি ছিল না গোপাল হালদারের। তিনি ছিলেন উদারমনা মানবতাবাদী। ক্রমে তিনি (১৯৪৮-এর পর) দলের সক্রিয় কর্মপ্রণালী থেকে সরে যান এবং জ্ঞানচর্চায় নিরত হন। ১৯৫১ সালে আবার তিনি ‘পরিচয়’-এর সম্পাদক হন। ১৯৬৭ সালে সম্পাদনা ভার ত্যাগ করলেও আ-মৃত্যু তিনি পত্রিকাটির উপদেষ্টামণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেট ও সিন্ডিকেট সদস্য (১৯৫২-৫৭) থাকাকালে তিনি বাংলা-বিহার সংযোগের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের লখনউ অধিবেশনে সমাজ ও সংস্কৃতি শাখার সভাপতি ছিলেন গোপাল হালদার। ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৮—এই তিনবার তিনি বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। বিদেশের নানা সম্মেলনে গোপাল হালদার যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫৮-তে সুইডেন-এর স্টকহোল্‌ম-এ আয়োজিত বিশ্বশান্তি কংগ্রেস-এ তিনি ভারতের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। এরপর যোগ দিয়েছিলেন মস্কো-র স্লাভিস্ত কনফারেন্স ও তাসখন্দ-এ আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে। এবছরই তিনি আমন্ত্রিত হয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে চিন যান। ১৯৬০ ও ১৯৬২-তে মস্কোর ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স ও বিশ্বশান্তি সম্মেলনেও তিনি আমন্ত্রিত সভ্য হিসেবে যোগ দান করেন।

১৯৭৬ থেকে ১৯৮০—এই সময়ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের সাহিত্য ও শিল্পকলা বিভাগের নির্বাচিত ফেলো হিসেবে কাজ করেছিলেন।

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ অক্টোবর গোপাল হালদারের মৃত্যু হয়।

সাহিত্য চর্চা—বেশির ভাগ বাঙালি সাহিত্যিকের সাহিত্যজীবনের শুরু কবিতা দিয়ে। গোপাল হালদারের প্রথম মুদ্রিত রচনা একটি প্রবন্ধ এবং সে প্রবন্ধের বিষয় রাজনীতি। অমৃতকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় ছদ্মনামে লেখা ‘বাঙালী যুবক ও নন-কো-অপারেশন’ শীর্ষক এই প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয় ১৩২৭ বঙ্গাব্দের (১৯২১) মাঘ সংখ্যা ‘সবুজ পত্র’ পত্রিকায়। যেন তাঁর সাহিত্য জীবনের একটি রেখাচিত্র এখানে আঁকা হয়েছিল। ১৯২৩ থেকে ১৯২৫-এর মধ্যে ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় তাঁর কিছু প্রবন্ধ ও প্রফুল্ল হালদার ছদ্মনামে লেখা কিছু গল্প বের হয়েছিল।

এর পরে তিনি 'দেশের বাণী', 'প্রবাসী', 'ওয়েলফেয়ার' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় নিয়মিত বাংলা এবং ইংরেজিতে লিখতে থাকেন। 'দেশের বাণী'-তে মুদ্রিত হত গোপাল হালদারের রাজনৈতিক প্রবন্ধ। ১৯২৬-এ ওই পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধের জন্য ব্রিটিশ সরকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা করে। কারণ এ ব্যাপারে সরকার ও পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করা হয়েছিল প্রবন্ধটিতে। গোপাল হালদার বেশ কিছু উপন্যাসও লিখেছিলেন। তাঁর লেখা উপন্যাস ও প্রবন্ধ সংকলনের একটি তালিকা দেওয়া হল—

উপন্যাস : 'একদা' (১৯৩৯), 'পঞ্চাশের পথ' (১৯৪৪), 'তেরশ পঞ্চাশ' (১৯৪৫), 'উনপঞ্চাশী' (১৯৪৬), 'ভাঙন' (১৯৪৭) : এ উপন্যাসের নতুন সংস্করণের নাম 'ভাঙনী কুল' (১৯৬৬), 'উজানগঙ্গা' (১৯৫০), 'অন্যদিন' (১৯৫০), 'স্রোতের দীপ' (১৯৫০), 'আর এক দিন' (১৯৫১), 'ভূমিকা' (১৯৫২), 'নবগঙ্গা' (১৯৫৩), 'জোয়ারের বেলা' (১৯৫৪), 'ত্রিদিবা' (১৯৭৮)—'একদা', 'অন্যদিন', 'আর এক দিন' এই তিন উপন্যাসের একত্রিত রূপের নাম। মন্বন্তর-কেন্দ্রিক তিনটি উপন্যাস ভিন্ন বাকি ছ-টি উপন্যাসকে 'ভদ্রাসন' নামে পরে একত্রিত করা হয়।

ছোটো গল্প-সংকলন : 'ধূলিকণা' (১৯৪৮)। এছাড়া অনেক গল্প এখনও সংকলিত হয়নি।

প্রবন্ধ সংকলন : 'সংস্কৃতির রূপান্তর' (১৯৪১), 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' (১৯৪৭), 'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' (১৯৫৬), 'বাংলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি' (১৯৫৬), 'ভারতের ভাষা' (১৯৬৭), 'বাণিজ্য জিজ্ঞাসা' (১৯৬৯), 'বাঙালীর আশা বাঙালীর ভাষা' (১৯৭২), 'সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা' (১৯৭৮) 'জাতীয় সংহতি ও ভারতের ভাষা সমস্যা' (পুস্তিকা) (১৯৮৫), 'প্রসঙ্গ : বিদ্যাসাগর' (১৯৯১)

'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ' (১৯৮৬)—এটি 'সংস্কৃতির রূপান্তর', 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' ও 'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ'—গ্রন্থ তিনটির সংকলন।

সাহিত্যের ইতিহাস : 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খণ্ড ১৯৫৩, ২য় খণ্ড ১৯৫৮), 'বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা' (১৯৫৯), 'ইংরেজি সাহিত্যের রূপরেখা' (১৯৬১),

'রুশ সাহিত্যের রূপরেখা' (১৯৬৬), 'বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ' (১৯৮৬)।

রম্য নিবন্ধ : 'বাজে লেখা' (১৯৪২), 'আড্ডা' (১৯৫৬), 'বন চাঁড়ালের কড়চা' (১৯৬০)—'স্বপ্ন ও সত্য' (১৯৫১) 'বাজে লেখা'-র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ।

আত্মকথা : 'রূপনারায়ণের কূলে' (১ম খণ্ড ১৯৬৯, ২য় খণ্ড ১৯৭৮)। এটির তৃতীয় খণ্ডের সামান্য অংশ, 'পরিচয়' ও 'পাক্ষিক বসুমতী'-তে মুদ্রিত হয়। বইটি অসমাপ্ত।

ইংরেজি গ্রন্থ : 'Vidyasagar-A Reassessment' (১৯৭২), 'Quazi Nazrul Islam' (১৯৭২), গবেষণা-গ্রন্থ 'A Comparative Grammar of East Bengal Dialects' (১৯৮৬)।

হিন্দি : 'কাজী নজরুল ইসলাম' (১৯৬২), 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' (১৯৬২)।

গোপাল হালদার বেশ কিছু উপন্যাস, সংকলন ও রচনা সংগ্রহের সম্পাদনাও করেছেন। সেগুলির তালিকা—'সোভিয়েট দেশ' (১৯৪১), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'বিষবৃক্ষ', 'সীতারাম' (১৯৫০) 'সোনার বাংলা' (১ম খণ্ড ১৯৫৬, ২য় খণ্ড ১৯৫৭, ৩য় খণ্ড ১৯৫৭), 'রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬১), 'দূর সুদূর (গল্প-সংকলন' : ১৯৬৬), 'বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ' (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড : ১৯৭২), 'বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ' (১ম ও ২য় খণ্ড ১৯৭৫), 'দীনবন্ধু রচনা সংগ্রহ' (১৯৭৩), 'কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ' (১৯৭৪), 'মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত' (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড ১৯৭৪, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড ১৯৭৫, ৫ম খণ্ড ১৯৭৬), 'Revolutionary Art : A Symposium'।

১.৩ গোপাল হালদারের প্রবন্ধ : সামগ্রিক পরিচয়

গোপাল হালদারের সাহিত্য-সত্তার ধর্ম ছিল মননশীলতা এবং মানবপ্রীতি। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন 'I am a man and I am interested in everything human', (তারিখ ১৯/৭/১৯৮৯; স্থান পাটনা। চিঠিটি লেখা হয়েছিল সুবীর চক্রবর্তীকে)। ওই চিঠিতেই তিনি বিশুদ্ধ কৌতুককে মানবপ্রীতি এবং মার্জিত বুদ্ধির সূক্ষ্ম প্রকাশ বলে মত প্রকাশ করেছেন। কমিউনিজমকে তিনি মানবতার প্রকাশ বলেই মনে করতেন। তাই কখনও সংকীর্ণ মত আবিষ্ট করেনি তাঁকে।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য যখন চিন্তন, গবেষণামূলকতা আর অনুভবসমৃদ্ধ রচনা—সর্ব শাখায় লাভ করেছে পূর্ণতা, তখনই গোপাল হালদারের প্রবন্ধ রচনার সূচনা। বিশ্লেষণপ্রবণতা চিন্তনগভীরতা এবং সহজবোধ্য অথচ ব্যঞ্জনাশক্তিসম্পন্ন ভাষা তাঁর বিচিত্রমুখী প্রবন্ধসমূহের বিশেষত্ব। গোপাল হালদারের প্রবন্ধ-সমষ্টিকে বুদ্ধিপ্রধান আলোচনা, অ্যাকাডেমিক প্রবন্ধ, রসনিবন্ধ আর আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধ—এই চার ভাগে বিন্যস্ত করা যায়।

(ক) **বুদ্ধিবৃত্ত প্রবন্ধ**—এই পর্যায়ে রয়েছে তাঁর সংস্কৃতি, সাহিত্য আর ভাষা সংক্রান্ত প্রবন্ধ। সংকলনগুলির নাম যথাক্রমে 'সাংস্কৃতির রূপান্তর' (১৯৪১), 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' (১৯৪৭), 'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' (১৯৫৬)। এই তিন গ্রন্থের পরিমার্জিত সংস্করণ 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ' নামে মুদ্রিত হয় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে।

তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে আছে 'একালের যুদ্ধ' (১৯৪৭)। সাহিত্য ও সাহিত্যিক সংক্রান্ত প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে আছে 'বাঙলা সাহিত্য ও মানব সংস্কৃতি' (১৯৫৬), 'বাঙলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ' (১৯৮৩), 'সতীনাথ ভাদুড়ী : জীবন ও সাহিত্য' (১৯৮৩), 'প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর' (১৯৯১)।

'ভারতের ভাষা' (১৯৬৭), 'বাঙালীর আশা বাঙালীর ভাষা' (১৯৭২) তাঁর ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করলেও সংস্কৃতি-বিশ্লেষক হিসেবেই গোপাল হালদারের খ্যাতি। সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রবন্ধ-সংকলন তিনটিতে তিনি সংস্কৃতির সামগ্রিক এবং দেশজ রূপ বিশ্লেষণ করেছেন। সমাজ, সাহিত্য এবং ভাষা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান আর সমকালের সংস্কৃতির তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন গোপাল হালদার। সর্বোপরি ছিল গাঢ় মানবপ্রীতি। ফলে তাঁর সংস্কৃতি-বিশ্লেষণ হয়েছে সামগ্রিক ও সুষম। মার্কস বর্ণিত শোষক ও শোষিত—এই শ্রেণি বিভাজনের তত্ত্ব দিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন সংস্কৃতির রূপ। সংস্কৃতিকে তিনি বিচ্ছিন্ন করে বিচার করেননি। মানব জীবনের সামগ্রিকতার মধ্যেই তিনি সন্ধান করেছেন সংস্কৃতির স্বরূপ। তাঁর বিশ্বাস 'সমস্ত বিবর্তনের মধ্য দিয়া মানুষ ক্রমেই বেশি করিয়া মানুষ হইতেছে প্রাচীন সংস্কৃতি হইতেছে এক ব্যাপকতর বিশ্বসংস্কৃতিতে রূপান্তরিত।' বিশ্ব সংস্কৃতির পরিবর্তমানতা আর ভারত সংস্কৃতির বিকাশ সম্পর্কে তাঁর আলোচনা মননদীপ্তিতে অনন্য।

'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' ও 'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' গ্রন্থ দুটিতে গোপাল হালদার সমাজ-সচেতন মন নিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান করেছেন। তাঁর মতে "বাঙালী সংস্কৃতির আসল কাঠামো (form) হওয়া চাই বাঙালী হিন্দু মুসলমানের যৌথ সংস্কৃতি"। প্রথম গ্রন্থে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির সমন্বয়ের দিকটি বিশ্লেষণ করেছেন। তবে উনিশ শতকে বাঙালি সংস্কৃতির নব জাগরণ যে কেবলমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির মধ্যে সীমিত ছিল—এ সত্য তাঁর নিবিড় পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'বাঙলা সাহিত্য ও মানব সংস্কৃতি' ও 'বাঙলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ' সংকলন দুটিতে তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্পর্ক এবং বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা ও বিকাশ সম্পর্কে বিচার করেছেন। দুই ক্ষেত্রেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন মানবতাকে। সাহিত্যে, আধুনিকতা বলতে তিনি যথার্থই বুঝেছেন মানব-স্বীকৃতিই সাহিত্যে আধুনিকতার ভিত্তি। আর

বাংলা সাহিত্যে এ স্বীকৃতি দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকে বাংলার নব জাগরণের সময়ে। আংশিকতা সত্ত্বেও তার মূল্য স্বীকার করতেই হয়; এ সত্য স্পষ্ট হয়েছে তাঁর আলোচনায়।

'সতীনাথ ভাদুড়ী; সাহিত্য ও সাধনা' নামের মিতকায় সংকলনটিতে গোপাল হালদারের সাহিত্যমনস্কতার প্রকাশরূপ লক্ষিত হয়। তিনি লিখেছেন "সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য মানবসত্তার আত্মান্বেষণ। শিল্প তাঁর অন্বেষণের বাণীরূপ। তাঁর সাহিত্য তাঁর কালের তাঁর দেশের বিশেষ মানব আধারে সকল কালের সকল দেশের জীবন-সত্যের ও মানব-সত্যের স্বরূপ সন্ধান" ('সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা' পৃ. ১১)।

'প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে উনিশ শতকের নব জাগরণের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার, সাহিত্যচর্চা—সব কিছুর সামগ্রিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'এ কালের যুদ্ধ' (১৯৪২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী বিশ্ব-পরিস্থিতির বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ। এ গ্রন্থ তাঁর সাংবাদিক সত্তার প্রকাশরূপ।

গোপাল হালদার ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে পূর্ববঙ্গের উপভাষা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। এই ভাষাজ্ঞানের সঙ্গে মিশেছে তাঁর মুক্ত চিন্তা। তার প্রমাণ ভারত ও বাংলার ভাষা সমস্যা নিয়ে রচিত 'ভারতের ভাষা' ও 'বাঙালীর ভাষা ভাঙালীর আশা' প্রবন্ধ-সংকলন দুটি।

'ভারতের ভাষা'-র পটভূমি হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের ফলে উদ্ভূত জটিলতা। গোপাল হালদার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দিকে মেনে নিতে সম্মত ছিলেন। তাঁর আপত্তি ছিল জোর করে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে। কারণ বহু ভাষা সমন্বিত দেশে এই জবরদস্তির ফলে হিন্দি-বিরোধিতা বৃদ্ধি পাবে। ভাষা হিসেবে হিন্দি ততটা উন্নতও নয়। তাঁর মতে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দিকে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে হবে স্বাভাবিক বিকাশের পথে।

'বাঙালীর আশা বাঙালীর ভাষা' গ্রন্থে তিনি বাংলা ভাষার উন্নতির দিকটি বিশ্লেষণ করেছেন। তবে প্রশাসন ও শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষা যে গুরত্ব পায়নি সে সত্যের দিকেও তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' গ্রন্থেও বাংলা আর ভারতের ভাষা সমস্যা নিয়ে আলোচনামূলক কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। এসবই ভাষাতাত্ত্বিক গোপাল হালদারের প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়।

(খ) অ্যাকাডেমিক প্রবন্ধ এবং সাহিত্যের ইতিহাস :

প্রাতিষ্ঠানিক পঠন-পাঠনের দিকে দৃষ্টি রেখে রচিত হয়েছিল গোপাল হালদারের প্রথম সাহিত্য ইতিহাস 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা'র দুটি খণ্ড। গ্রন্থ দুটির বিশেষত্ব তথ্য-সংগ্রহে নয়, বিশ্লেষণ-গভীরতায়। তিনি প্রমাণ করেছেন সাহিত্যের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে জাতির আত্মবিকাশের ইতিহাস। দেশের অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা আর রাজনীতির প্রতিফলন সাহিত্যে দেখা যায়। আবার সময়-পরিবর্তন সাহিত্যকেও পালটে দেয়। গোপাল হালদার নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন সে পরিবর্তনের প্রকৃতি এবং কারণ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্ম যে হয়ে উঠেছিল প্রতিরোধ-প্রতিবাদের মাধ্যম—তা গোপাল হালদারই প্রথম স্পষ্টভাবে বলেছেন।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে মুক্ত দৃষ্টিতে আলোচনা করেছেন গোপাল হালদার। এই সময়ের বাংলা সাহিত্য জাতীয় চেতনার জাগরণের ইতিহাসচিত্র। কিন্তু সে জাগরণের বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কেও তিনি সচেতন। সাধারণ মানুষ ও মুসলিমদের সঙ্গে দূরত্ব ছিল সাহিত্যের দুর্বলতা। সে সত্য তিনি পাঠকদের বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। 'রুশ সাহিত্যের রূপরেখা' রচিত হয়েছিল তৎকালীন লেনিনগ্রাদ-এর পুশকিন ইন্সটিটিউট-এ ছয়মাস পড়াশোনার পর। রুশ সাহিত্যে দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের সংযোগ দেখেছিলেন তিনি। তা ছাড়া সে সাহিত্যেই প্রতিফলিত হয়েছিল জারতান্ত্রিক দুর্বল রাশিয়ার স্থলে সমাজতান্ত্রিক শক্তিমান রাশিয়ার উত্থানের ইতিহাস। এই ইতিহাসের সঙ্গে বাঙালি

পাঠকের পরিচয় করানোর জন্যই রচিত হয়েছিল 'রুশ সাহিত্যের রূপরেখা'।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালির নব জাগরণের উৎস ইংরেজি সাহিত্যের মাধ্যমে সঞ্চারিত পাশ্চাত্য রেনেসাঁস-এর ভাবৈশ্বর্য। তাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যথার্থ উপভোগের জন্যও ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। এজন্যই রচিত হয়েছিল গোপাল হালদারের 'ইংরেজি সাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থটি।

(গ) আত্মস্মৃতি : গোপাল হালদারের আত্মজীবনী 'রূপনারাণের কূলে'-র (১ম খণ্ড ১৯৬৯, ২য় খণ্ড ১৯৭৮, ৩য় খণ্ড ১৯৮৫) বিশেষত্ব নির্মোহ দৃষ্টিতে স্বদেশ ও স্বকালের ভাষাচিত্র অঙ্কন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, সশস্ত্র ও অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রাম, কমিউনিজম-এর আত্মপ্রকাশ—প্রভৃতি ঘটনার সমন্বয়ে অসরল-দোলায়মান সময়ের ছবি এই তিন খণ্ড আত্মজীবনী। বিশ শতকের বাঙালি জীবনের রাজনীতি, সাহিত্য আর শিক্ষা জগতের উৎস-দলিল এই জীবনচিত্রত্রয়ী। ইতিহাস ও রাজনীতির সামাজিক চিত্রায়ন গ্রন্থ তিনটির বিশেষত্ব।

(ঘ) রম্য নিবন্ধ : প্রাণপ্রাচুর্য, ইতিহাস চেতনা আর সমাজদায়িত্বের সুষম অন্বয় দেখা যায় গোপাল হালদারের চরিত্রে। তাঁর রম্য নিবন্ধ-সংকলন তিনটি 'বাজে লেখা' (রচনা ১৯০৬, প্রকাশ ১৯৪২, সংশোধিত রূপ—'স্বপ্ন ও সত্য' ১৯৫১। এ থেকে বাদ পড়েছে 'বাজে লেখা'। যুক্ত হয়েছে 'সোনার কাঠি' আর 'সাধনা ও সৌখিনতা' নামের দুটি প্রবন্ধ)। 'আড্ডা' (১৯৫৬), 'বনচাঁড়ালের কড়চা' (১৯৬০)। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ—প্রায় সকলেই লিখেছিলেন ব্যক্তি অনুভব প্রধান প্রবন্ধ। গোপাল হালদারের বিশেষত্ব মননশীলতা, সমাজচিন্তা আর প্রসন্ন জীবন-দৃষ্টির সুষম মিশ্রণ।

'বাজে লেখা'-র প্রবন্ধগুলি রচিত হয় বক্সা ক্যাম্প বন্দীশালায় ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যে। কয়েকটি প্রবন্ধ প্রেসিডেন্সি জেলে বসে লেখা। এ গ্রন্থের আলাপ আর স্বগত চিন্তার ভঙ্গিতে রচিত প্রবন্ধগুলির বিশেষত্ব প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলাচল। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন 'আমার কলম অনুসরণ করেছে মনের ধারা, বুদ্ধির ধারায় তা চলেনি।' লেখকের শীলিত বিদগ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যায় এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে। এ গ্রন্থে যেমন আছে 'কয়েদির আকাশ'-এর মতো কাব্যস্বাদী প্রবন্ধ তেমনই আছে 'মুদ্রাদোষ'-এর মতো শ্লেষমধুর নিবন্ধ।

'আড্ডা' (১৯৫৬) পুরোপুরি রস-নিবন্ধ সংগ্রহ। দশটি প্রবন্ধের এই সংকলনের পাঁচটির বিষয় বাঙালির আড্ডা দেশ-বিদেশের 'অবসর' বিনোদন-ব্যবস্থা প্রভৃতি। মননের সঙ্গে রস-উপভোগের সম্মিলন ঘটেছে বলেই তিনি লিখতে পেরেছেন অবকাশ 'মুদ্রামূল্যে' ক্রয় করা যায়। বাকি পাঁচটি প্রবন্ধের বিষয় বাংলা ও ফ্রান্স, গ্রিস, ইতালির ভোজনকলার বিশ্লেষণ।

'বনচাঁড়ালের কড়চা' ১৯৬০ সালে মুদ্রিত হলেও লেখা হয় তার আগে বন্দীশালায় বসে। গ্রন্থের নামটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বনচাঁড়াল নামের গুল্মশ্রেণির (বৈজ্ঞানিক নাম Hedsarun Gyrans) উদ্ভিদটির আলোকস্পর্শে স্পন্দিত হওয়ার বিশেষত্ব। এই স্পন্দন আলো চলে গেলেও কিছুক্ষণ স্থায়ী থাকে। জগদীশচন্দ্র বসু 'অব্যক্ত' গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে বনচাঁড়াল নিয়ে করা তাঁর পরীক্ষার বিবরণ দিয়ে বস্তুজগতের শক্তি কীভাবে জীব আত্মস্থ করে স্বশক্তিতে পরিণত করে তার বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন।

কারাগারে বন্দীর দিনযাপনের বিবরণ এই কড়চার বিষয়। লেখক বনচাঁড়ালের এই স্পন্দনরহস্য জানতেন। বন্দীজীবনে তাঁর সজীব মন পার্শ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে চয়ন করে নিত সঞ্জীবন শক্তি। তাই তিনি লিখেছেন এ গ্রন্থ 'বনচাঁড়ালের চিৎস্পন্দনের অলক্ষ্য একটি ইতিবৃত্ত।' প্রবন্ধধর্মী লেখাও রসনিবন্ধের পাশে স্থান পেয়েছে গ্রন্থটিতে। 'বিদূষকের সঙ্গসুখ' এ গ্রন্থের একটি উল্লেখ্য নিবন্ধ। সহবন্দীদের অভিনীত কমেডির আলোচনা সূত্রে রচিত নিবন্ধটি কমেডি সম্পর্কে তুলনাহীন একটি আলোচনা।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় গোপাল হালদারের মন ছিল প্রগতিশীল, মনন ছিল গভীর, মানবপ্রীতি ও প্রসন্ন

স্নিগ্ধতা ছিল তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। এইসব বিশেষত্বের প্রকাশ লক্ষিত হয় তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যে। সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিও নয় তার ব্যতিক্রম।

১.৪ 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' : উৎস, পটভূমি ও বৈশিষ্ট্য

'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' কোনো পৃথক গ্রন্থ নয়। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' নামে গোপাল হালদারের একটি গ্রন্থ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়ে তুমুল আলোড়ন তুলেছিল বাংলার সংস্কৃতি জগতে। সেই গ্রন্থটির 'সংস্কৃতি জিজ্ঞাসা' নামক প্রথম ভাগ 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' নামে পাঠসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে মানবসংস্কৃতির বিপন্নতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন মানব-মানসের প্রেক্ষিতে রচিত হয় 'সংস্কৃতির রূপান্তর'। ভূমিকায় গোপাল হালদার লিখেছেন—"নাৎসিবাহিনী তখন মস্কোর দুয়ারে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তখন অনেকের নিকট মনে হইয়াছিল অনিশ্চিত। বিশ্ব-সংকটের সেই বিশেষ মুহূর্তে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির মূল পরিচয় আমরা এই গ্রন্থে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলাম। ..."

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবী জুড়ে শুরু হয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ফলে বহুল প্রচারিত এই গ্রন্থের প্রতি সংস্করণে বহু পরিবর্তন করেছেন লেখক। কিন্তু গ্রন্থের মূল বক্তব্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে একনায়কতন্ত্রের প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। ফলে রাষ্ট্রের নিকট মানবমূল্য হয়ে গিয়েছিল তুচ্ছ। হিটলার ঘোষিত তথাকথিত আর্য সংস্কৃতির শুদ্ধতা রক্ষার জন্য ইহুদি নিধন, জার্মান সংস্কৃতির প্রসারের জন্য জনক্ষয়কর যুদ্ধের ক্রমবিস্তৃতির প্রেক্ষিতে শঙ্কিত হয়েছিলেন বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষ। সমূহ সর্বনাশের সম্মুখীন মুক্তবুদ্ধি প্রগতিমনস্ক মানুষ সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন এর বিরুদ্ধে। সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে অনেক মনীষী দেখেছিলেন আশার আলো।

এই প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগে মানব-সংস্কৃতির মূল্যায়ন করেছিলেন মানবতায় আস্থাশীল মুক্তবুদ্ধি মার্কসবাদী গোপাল হালদার। তিনি স্বীকার করেছেন প্রতিটি জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণের গুরুত্ব। যুক্তি, তথ্যসহ তিনি বিশ্লেষণ করেছেন সংস্কৃতির স্বরূপ আর প্রমাণ করেছেন মানুষের সঙ্গে সংস্কৃতির অচ্ছেদ্যতার দিকটি।

'সংস্কৃতির রূপান্তর' রচনার দ্বিতীয় একটি পরোক্ষ কারণও ছিল। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের পরে গঠিত হয় সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র। এই সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল মধ্য এশিয়ার নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির ছোটো ছোটো রাষ্ট্র ও জাতিগোষ্ঠী। সাম্যবাদ বলে মানুষে মানুষে সমতার কথা। তাই শাসনশক্তি সাম্যবাদী গোষ্ঠীর হাতে যাওয়ায় বিশ্বের বহু মানুষ ভীত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, এই সব গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সংস্কৃতি-বিশেষত্ব লুপ্ত হবে। আরও ভয় ছিল ব্যক্তিমনের সৃষ্টির উপর চলবে সরকারি নিয়ন্ত্রণ। সমতার আদর্শের ফলে সকলকেই সম শ্রমে নিযুক্ত হতে হবে। পরিণামে রাশিয়ার বহু যুগের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির অস্তিত্ব মুছে যাবে।

এই সব আশঙ্কা থেকে উঠে আসে এই প্রশ্ন যে সংস্কৃতি কি কয়েক জন ধনী অবসরভোগীর অবকাশ যাপনের উপায় হিসেবে উদ্ভূত ও অনুশীলিত হয়ে থাকে? প্রাচীন সংস্কৃতির ক্রমানুশীলনই কি যথার্থ সংস্কৃতি? সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কি কোনো সংস্কৃতি নেই?

আবার প্রথম যুগের কিছু হঠকারী সাম্যবাদী যা কিছু প্রাচীন তাকে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিলেন; জোর করে শিল্পে-সাহিত্যে আনতে চেয়েছিলেন সাম্য—এসবই অশুভের ইঙ্গিত দেয়।

এই জটিল পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মার্কসবাদের প্রকৃত অনুসারী ও বুদ্ধির মুক্তিতে বিশ্বাসী মানবতায় আস্থাশীল বিদগ্ধ মনীষী গোপাল হালদার লিখেছিলেন 'সংস্কৃতির রূপান্তর'।

বৈশিষ্ট্য :

গোপাল হালদার সৃষ্টিশীল মনের অধিকারী। মানবতায় ছিল তাঁর দৃঢ় আস্থা। কমিউনিজম তাঁর কাছে ছিল মানবতার এক নামান্তর। বিদগ্ধ এই মনীষী সংস্কৃতি নিয়ে কোনো গম্ভভীর গবেষণা করেননি। তিনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদীর দৃষ্টিতে সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তত্ত্ব তাঁর প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করেনি। তাঁর প্রবন্ধ মানবজাতির পরিবর্তমান আত্মপরিচয় ও আত্মানুসন্ধানের দলিল।

গোপাল হালদার ইতিহাস সচেতন মনোভাব নিয়ে সংস্কৃতির সংজ্ঞাটিকে চিনে নিতে চেয়েছেন। তার সঙ্গে অন্বিত হয়েছে গভীর মানবপ্রীতি। তাই 'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এর 'কথারম্ভ'-এর পরিচ্ছেদ শেষে পাই—'সংস্কৃতির অর্থ শুধু সংস্কারের পুনরাবর্তন নয়, সংস্কারের ঐতিহাসিক বিবর্তন। সমস্ত বিবর্তনের মধ্য দিয়া মানুষ ক্রমেই বেশী করিয়া মানুষ হইতেছে, প্রাচীন সংস্কৃতিও হইতেছে এক ব্যাপকতর বিশ্বসংস্কৃতির রূপান্তর।"

ইতিহাসের অনিবার্য অগ্রগমনে বিশ্বাসী গোপাল হালদারের মতে মানবসংস্কৃতি পুরাতনের অনুবর্তন নয়—রূপান্তর। ইতিহাসের কোনো স্তরই অবজ্ঞেয় নয়। কারণ মানুষের প্রগতির জন্যই তার বিকাশ এবং বিবর্তন ঘটে। ইতিহাসের সেই স্তরপরম্পরার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে মানবপ্রগতির ধারাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন লেখক।

গোপাল হালদার সাধারণ শিক্ষিত বাঙালিকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন মার্কসীয় তত্ত্বানুসৃত সংস্কৃতির সংজ্ঞা। কারণ তিনি স্বীকার করেন সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বা কমিটমেন্ট। তথাপি তাঁর রচনায় লক্ষিত হয় প্রকৃত জ্ঞানীর নিরভিমান সহৃদয় মনের প্রকাশ। মার্কসীয় দৃষ্টিতে সংস্কৃতির ভিত্তি সন্ধান করেছেন তিনি। তার সঙ্গে মিশে গেছে তাঁর সত্তার নিজস্বতা।

এত ব্যাপ্তভাবে সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা বাংলায় আর কেউ করেছেন কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখ মনীষী সংস্কৃতি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও গভীর আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের আলোচনায় নেই বিস্তৃতি। শোষক ও শোষিত—দুই শ্রেণির মানুষের চিরকালীন অস্তিত্বের ভিত্তিতে সংস্কৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করেননি তাঁরা।

গোপাল হালদারের সমকালে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বসু প্রমুখ বহু মনীষী সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের লেখায় নেই ধারাবাহিকতা।

ব্যাপ্তি, গভীরতা এবং ধারাবাহিকভাবে মানব-সংস্কৃতি নিয়ে সামগ্রিক আলোচনাই গোপাল হালদারের রচনার বিশেষত্ব।

১.৫ 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' : প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ

গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির রূপান্তর' তিন খণ্ডে বিভক্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের 'সংস্কৃতি-জিজ্ঞাসা' নামের প্রথম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায় 'সংস্কৃতির গোড়ার কথা' পাঠ্য হিসেবে নির্দিষ্ট। তার পূর্বে 'কথামুখ' নামের প্রথম অধ্যায়ে তিনি তৎকালীন সোভিয়েত রাষ্ট্রের উদাহরণ দিয়ে কমিউনিজম-এর মানবতা-পোষক দিকগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণের মধ্যে সোভিয়েত রাষ্ট্রের ত্রুটিগুলিও তিনি দেখিয়েছেন—যা তাঁর সমদর্শী মনের পরিচায়ক।

'সংস্কৃতির রূপান্তর' প্রথম মুদ্রিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে। পরে এর আরও সংস্করণ হয় এবং প্রতি সংস্করণেই কিছু না কিছু পরিবর্তন-পরিমার্জন লক্ষিত হয়। ব্যবহৃত সপ্তম সংস্করণের (১৯৬৫) 'কথামুখ' শুরু হয়েছে ১৯৬২

খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিউবা অবরোধ দিয়ে। এই সময় চিন ভারত আক্রমণ করে। দুটি ঘটনাই বিশ্বকে উত্তেজিত, শঙ্কিত করে। কিন্তু মস্কো তথা রাশিয়ার জনগণ শান্ত স্থিরতার সঙ্গে সম্মুখীন হয়েছিল পরিস্থিতির। মূলত রাশিয়ার স্থিরতার জন্যই যুদ্ধ শুরু হয়নি। বাস্তব এই পরিস্থিতি আর রুশ জাতির অবস্থা বিশ্লেষণ করে গোপাল হালদারের সিদ্ধান্ত "...কমিউনিজম্ এ যুগের মানবতার নাম। 'সবার উপরে মানুষ সত্য', এই মানবসত্যের বাস্তব রূপায়ণই এই যুগের সংস্কৃতির, তাহার অধ্যাত্ম চেতনার প্রাণ-সম্পদ। সোভিয়েত সেই মানব সত্যকেই পরম মূল্য দেয়—এই কথাই কুবার সংকট-উপলক্ষে বিশ্বের মানুষের সম্পর্কে প্রকটিত হইয়া গেল। ...যদি এই মানব সত্যকে সোভিয়েত রূপায়িত করিতে পারে, তাহা হইলে মানুষের ইতিহাস তাহার দান—তাহার সমস্ত সফলতা নিস্ফলতার উপর জয়ী হইবে, কমিউনিজ্‌মও 'মানবতার ধর্ম' বলিয়া স্বীকৃত হইবে।"

'ধ্বংস নয়—Not to Destroy But to Fulfil' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন রুশ জনতা অভাবমুক্ত হয়ে ভোগের নেশায় মাতেনি। তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানব উন্নতির কর্মে ব্যাপৃত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাদের অবিচল সংগ্রাম প্রমাণ করেছে শোষণ-মুক্ত সমাজেই দেশপ্রীতির সম্যক বিকাশ সম্ভব।

সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থা শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্বজনীন বিকাশ ঘটাতে পেরেছে; প্রতি মানুষের স্বাধীন সত্তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব করেছে। এই রাষ্ট্রব্যবস্থাই আর্থিক পরিকল্পনার সাহায্যে মানুষকে আপন উন্নতি সাধনের দায় ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত সমাজবিন্যাস ও বিজ্ঞানের সুষম বিকাশে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের সদ্ব্যবহার দ্বারা মানব-উন্নতির কর্মে পথপ্রদর্শক হয়েছে। গৃহযুদ্ধ, বিদেশি আক্রমণ, অর্থসংকট, বণিকতন্ত্রের ষড়যন্ত্র, ফ্যাসিজম্-এর আক্রমণ, নিজেদের ভুল—এসব সত্ত্বেও সোভিয়েত রাষ্ট্রের উন্নতি রুদ্ধ হয়নি। তাই গোপাল হালদার বুঝেছিলেন কমিউনিজম চালিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষের সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব। তাঁর মতে 'সর্বাঙ্গীণ বিজ্ঞানের সাধনা' আর 'সার্বজনীন মানবতার সাধনা'—এই দুটিতেই সোভিয়েত সংস্কৃতির আসল পরিচয় প্রকাশিত। বিপ্লবের সর্বকালীন বাণী 'আই কাম টু ফুলফিল, নট টু ডেস্ট্রয়' ('I come to fulfil, not to destroy')।

'বিজ্ঞান ও বিশ্ববিপ্লব' পরিচ্ছেদে গোপাল হালদার বিশ্লেষণ করেছেন বিজ্ঞান কেমন করে হয়ে উঠেছে মানবমুক্তির সহায়ক। বিদ্যুৎ ও পেট্রল আবিষ্কার, অ্যাটমিক শক্তির আবিষ্কার ক্রমে মানুষকে শ্রমনির্ভরতা থেকে দিয়েছে মুক্তি। ফলে মানুষের চিন্তাজগৎ হয়েছে সমৃদ্ধ। উন্নত চিন্তার প্রভাবে শোষিত মানব শোষক শ্রেণির স্বরূপ বুঝতে পেরেছে, খুঁজে পেয়েছে সংগ্রামের পথ।

আবার পারমাণবিক শক্তির প্রসারের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর সোভিয়েত শক্তির অ্যাটমিক শক্তিলাভ) ফলে যুদ্ধ প্রবণতা সংকুচিত হয়েছে। তাই বলা যায় বিজ্ঞান এনেছে বিপ্লব। যার ফলে মানুষের জাতিগত একাধিপত্য চূর্ণ হবে; কোনো বিশেষ জাতির স্বার্থে মানবজাতির ধ্বংস হবে না।

বিজ্ঞানের আর একটি বিশেষত্ব সে পৃথিবীর জাতিতে জাতিতে দূরত্ব লুপ্ত করেছে। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ অক্টোবর রুশ উপগ্রহ স্পুৎনিক-এর মহাকাশ যাত্রা ও ১৯৬১ তে প্রথম ভোস্তক-এর মহাকাশ পরিক্রমা বিশ্ব বিপ্লবের আর একটি ধাপ। কারণ এর ফলে মহাবিশ্ব থেকে পৃথিবীকে মানব বাসস্থান হিসেবে দেখা যায়। সমস্ত দ্বন্দ্ব দূর হয়ে মনে জাগে বিশ্বমানের সঙ্গে আত্মীয়তার বোধ। বিপ্লবের অর্থ আমূল রূপান্তর। রাষ্ট্রীয় শক্তি দখল ব্যতীতও নানাভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক স্তরে পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং ঘটে থাকে।

প্রবন্ধ রচনার সমকালে পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র ক্রমশ নানা দেশে রাষ্ট্রশক্তি দখল করেছিল। ফলে সমাজতন্ত্রের ক্রমবিস্তৃতি এবং তার ফলে মানবমূল্যবোধ বৃদ্ধি সম্পর্কে আশা পোষণ করেছিলেন লেখক। তাঁর আশা ছিল এর ফলে দেশে দেশে সাধারণ শ্রমজীবীরা রাষ্ট্রশক্তির চালক হবে, আর্থিক বিষয়ে ব্যক্তির পরিবর্তে সমাজের মালিকানা স্বীকৃত হবে; বুদ্ধিজীবীগণ সমাজতন্ত্রস্বীকৃত দায়িত্ব পালন করবেন। ফলে মানবিক মূল্যবোধ বিস্তৃত হবে।

এই পরিবর্তন দেশভেদে হবে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের।

এরপরে গোপাল হালদার যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন ধনতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ছে; তার প্রমাণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া বিশেষত কৃষ্ণ আফ্রিকার বহু দেশের স্বাধীনতা লাভ। এসব দেশে সমাজতন্ত্রবাদ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যদিও সব দেশে তা সমান গুরুত্ব পায়নি। তবে একথা স্পষ্ট যে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদ লুপ্ত হয়েছে। এখন চলছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুগ।

সাম্রাজ্যবাদ এখন রাজনৈতিক অধিকারের পরিবর্তে আর্থিক শোষণ-শাসন চালাতে চাইছে। 'সাহায্য' দান ও পুঁজি লগ্নি করা তার এক রূপ; অন্য রূপ জোটবদ্ধতা, যুদ্ধের আয়োজন, যুদ্ধ-আতঙ্কের প্রসার, যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবসা। নাটো, সিয়াটো প্রভৃতি চুক্তি তার প্রমাণ।

গোপাল হালদারের মতে পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রী দেশ সমূহ এবং এশিয়ার ধনতন্ত্রী দেশ জাপান—বিশুদ্ধ শিল্প নৈপুণ্যের দিক থেকে যথেষ্ট শক্তিমান। ছবিতে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, সংগীতে, নাটক, নৃত্যকলার দিক থেকে এসব দেশের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু এইসব শিল্পের সঙ্গে জীবনের যোগ নেই। সেজন্যই এদের দুর্বলতা দূর হয়নি। শিল্প কখনও শুদ্ধমাত্র শিল্প নয়। জীবনের সাধনাতেই তার সার্থকতা। অন্যদিকে লেখকের মতে শিল্প ও জীবনের অন্বয়ের আধিক্য সোভিয়েত শিল্পের রসোত্তীর্ণ না হওয়ার কারণ। তবে মানবতার দিকে লক্ষ রেখেছে সোভিয়েত দেশ। তার বিজ্ঞান, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি—সব কিছুরই মূল মন্ত্র মানবতার প্রতি আনুগত্য। তাই সোভিয়েত রাষ্ট্রে যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা বা প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আরও নিষিদ্ধ মানুষের সঙ্গে মানুষের জাতি, ধর্ম বা অন্য কোনো বিভেদ প্রচার। সে কারণে সোভিয়েত রাষ্ট্রে বর্ণজনিত বৈষম্যও নিষিদ্ধ।

তাই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকা, এশিয়ার তরুণদের জন্য শিক্ষা, সংস্কৃতি বিজ্ঞান শিল্পবিদ্যার সুব্যবস্থা আছে। এ কারণে বিবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সে নির্দ্বিধায়। এর উপর আছে 'এশিয়ার লোকজীবন পরিষদ' ও 'আফ্রিকার লোকজীবন পরিষদ'। এই দুটি পরিষদের মাধ্যমে সে চেষ্টা করেছে পৃথিবীর সব জাতির ভাষা, সাহিত্য, আধ্যাত্মিক সম্পদের সম্যক পরিচয় লাভের। ইউরোপেয় বহু দেশের তুলনায় সোভিয়েত রাষ্ট্র অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল। তথাপি সোভিয়েত রাষ্ট্র বিনা শর্তে এশিয়া-আফ্রিকার দুর্বল দেশগুলিকে আর্থিক সহায়তা দান করে। এসবই তার মানবতায় বিশ্বাসের প্রমাণ।

'মুনাফার পলিটিক্‌স্ ও মানবতার পলিটিক্‌স্' পরিচ্ছেদে গোপাল আলোচনা করেছেন কমিউনিজম প্রচারই সোভিয়েত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য—এই মতের। লেখক তা স্বীকার করে বলেছেন সাম্রাজ্যবাদও অধিকৃত দেশের অধিবাসীদের সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গঠন করেছিল British Society of Oriental and African Studies। কিন্তু এসব দেশের শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য বিষয়ে উচ্চতর আলোচনার কোনো প্রয়াস পৃথকভাবে করেনি। কারণ তাদের মনে কাজ করেছিল লাভের কামনা। আর সোভিয়েত দেশের কাম্য মানুষের সার্বিক উন্নতি। অর্থাৎ তার রাজনীতি মানবতার রাজনীতি।

সোভিয়েত দেশের নিজস্ব ত্রুটি-দুর্বলতা আছে। তথাপি সে মানুষের সার্বিক উন্নতি চায়। তার বিজ্ঞানসাধনা, তার বিশ্বশান্তির প্রয়াস সবই তার মানবতায় বিশ্বাস ও সমুন্নতি-প্রয়াসের প্রমাণ।

পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার ও সে শক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ সমগ্র মানবজাতিকে এক দিকে পূর্ণতার পথ দেখিয়েছে; অন্যদিকে সার্বিক বিনাশের সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সোভিয়েত দেশ শান্তির জন্য চেষ্টা করে চলেছে। কারণ তার সাধনা মানবতার সাধনা : আর এই সাধনাতেই সংস্কৃতির মহত্তর রূপ আত্মপ্রকাশ করে।

১.৬ সংস্কৃতির গোড়ার কথা

'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের নাম 'সংস্কৃতি-জিজ্ঞাসা'। এই খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বারোটি শিরোনাম যুক্ত পরিচ্ছেদে লেখক গোপাল হালদার সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন এবং তার স্বরূপ সন্ধান করেছেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদীর দৃষ্টিতে।

'সংস্কৃতির গোড়ার কথা' নামের প্রথম পরিচ্ছেদে গোপাল হালদার সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার ত্রুটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ব্যাখ্যা করেছেন সংস্কৃতির প্রচলিত সংজ্ঞা।

সংস্কৃতি বিষয়ে সাধারণ ধারণা ততটা স্পষ্ট নয়। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞানই সংস্কৃতি—এমন ধারণা অনেকেরই আছে। কারও ধারণা আচার, আচরণ, ভদ্রতা, শিষ্টতাই সংস্কৃতি। অনেকে বলেন ধর্মই সংস্কৃতি। এই মতভেদ আছে বলেই সংস্কৃতির বিজ্ঞান-সম্মত সংজ্ঞা স্থির করা প্রয়োজন।

বাংলায় 'কালচার' অর্থে 'সংস্কৃতি' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়। 'কৃষ্টি'—শব্দটির বৈদিক অর্থ সমুদয় কৃষকদল। সেটিও 'কালচার'-এর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল কিছুকাল। ব্যবহারটি ভুল ছিল না। তথাপি 'কালচার' অর্থে আর এক বৈদিক শব্দ সংস্কৃতিই অধিক প্রচলিত। কারণ শব্দটির মধ্যে মানুষের কৃতির বা সৃষ্টিমূলক প্রচেষ্টার ইঙ্গিত আছে। সংস্কৃতি মনের বিনাশ, বা কেবলমাত্র মানসসম্পদ নয়। মানুষের জীবনের বাস্তব প্রয়োজনে তার উদ্ভব। সংস্কৃতি থেকে মানুষ পায় জীবন-সংগ্রামের শক্তি। জীবনের বাস্তব উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যই তার আবির্ভাব। আবার জীবনযাত্রার ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সংস্কৃতির প্রকৃতি পালটে যায়। সংস্কৃতি জীবনের পরিবর্তনের সহায়ক। সেই পরিবর্তনের ফলে সংস্কৃতিরও ঘটে পরিবর্তন। অর্থাৎ সংস্কৃতির সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। তাই সে সচল এবং পরিবর্তনশীল তার রূপ।

সংস্কৃতির পরিবর্তনের নিয়ম এবং সংস্কৃতির মূল তত্ত্ব কাকে বলে—তা জানা সংস্কৃতি আলোচনার অন্যতম ভিত্তি। তাহলে সংস্কৃতির রূপ আর কোন কোন বিষয় অবলম্বনে সে রূপ গড়ে ওঠে—সেটি যেমন জানা যায় তেমনই উভয়ের সম্পর্ক হয়ে ওঠে স্পষ্ট।

ইতিহাসের গতির সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক বুঝে নেওয়া চাই। তা হলেই সংস্কৃতির রূপান্তর ধারাটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

সংস্কৃতির অধিকারী কেবলমাত্র মানুষ; অন্য কোনো জীবের সংস্কৃতি নেই। কারণ সব জীবের মতো মানুষেরও জীবনের মূল কথা বেঁচে থাকার, টিকে থাকার অবিরাম প্রয়াস। কিন্তু সে চায় প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন যতটা সম্ভব সহজ ও আনন্দময় করতে। জীবিকাকে আয়ত্ত করার এই প্রয়াসই পরিশ্রম। এটাই তার সভ্যতার ভিত্তি। তাই সংস্কৃতির মূল শ্রমশক্তি আর অর্থ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলনে-বিরোধে মানবপ্রকৃতির স্বাতন্ত্র্যের সাধনা।

অন্য সব জীব প্রকৃতির নিয়মের অধীন হয়ে বাঁচে, মরে। তাই তাদের সংস্কৃতি নেই। মানুষ প্রকৃতি থেকে পৃথক হতে চায়। মানুষের এই স্বতন্ত্রতার সাধনার আছে নানা স্তর। তাই সংস্কৃতিরও ঘটে রূপান্তর? 'সংস্কৃতির প্রচলিত নাম ও রূপ' অধ্যায়ে গোপাল হালদার সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাসমূহের ত্রুটি স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। সাধারণত সংস্কৃতি বলা হয় সাহিত্য, শিল্প, দর্শন বিজ্ঞান-প্রভৃতি মানবিকী বিদ্যাকে। আবার দেশ, কাল, ধর্ম, জাতি দিয়েও সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যার মনোভাব বেশ প্রবল। যেমন ভারতীয় সংস্কৃতি মধ্যযুগের সংস্কৃতি, হিন্দু সংস্কৃতি প্রভৃতি। আরও আছে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি, জড়বাদী সংস্কৃতি প্রভৃতি পৃথক নাম।

সংস্কৃতি বিচারের এইসব পদ্ধতি পুরোপুরি অবজ্ঞেয় নয়। আবার এদের যুক্তিসম্মতও বলা যায় না। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে হিন্দু সংস্কৃতি, প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংস্কৃতিও বোঝায়। তথাপি এরূপ নাম দেওয়ার কারণ জনতার যৌথ অহ্‌ম এর ফলে তৃপ্ত হয়। কিন্তু এর কুফল হল মানুষ বিস্মৃত হয় সংস্কৃতির ব্যাপ্তি অর্থ; তার মনে আসে জাতিগোষ্ঠীর রক্তনির্ভর সংস্কৃতির অবৈজ্ঞানিক ধারণা। সংস্কৃতি সম্পর্কে এইসব ধারণাকে বলা যায় অর্ধসত্য এবং আপেক্ষিক। কারণ ঘটনা-সংঘাতের ফলে তা পালটে যায়। জীবনযাত্রার সৌকর্য সাধনেও এধরনের সংস্কৃতির তেমন কোনো প্রভাব থাকে না। প্রকৃতির উপর মানব অধিকার বিস্তারের কোনো দিক এই সংস্কৃতি-ধারণা-সমূহ উদ্‌ভাসিত করে না।

যথার্থ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় সংস্কৃতির অর্থ মানুষের জীবন সংগ্রামের বা প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের পূর্ণ প্রচেষ্টা। তার ভিত্তি বেঁচে থাকার প্রয়াসকে সহজ করার প্রয়াস।

বেঁচে থাকার চেষ্টার মধ্যে মানুষের জৈব প্রবৃত্তিই প্রকাশিত। জীব মাত্রেরই আছে এ প্রচেষ্টা। কিন্তু মানুষের প্রয়াস কেবল প্রকৃতি নির্ভরতায় সীমিত নয়। প্রকৃতিকে অধিকার করে সে ছিনিয়ে আনে বাঁচার উপকরণ। তার এই চেষ্টাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তার সংস্কৃতি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃতি জয়ের ধরন পরিবর্তিত হয়। তাই সংস্কৃতিরও ঘটে বর্ণান্তর। কিন্তু ধীরতা হেতু সহজে তা বোঝা যায় না। তবে এক যুগের শেষে ঘটে যায় আমূল পরিবর্তন—আসে বিপ্লব। তখন সমাজের রূপান্তরের সঙ্গে সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটে। এভাবেই সভ্যতা এগিয়ে যায়—পশুচারণজীবী মানুষ হয় কৃষিজীবী। কৃষিনির্ভরতার পরে আসে শিল্পযুগ।—প্রকৃতিকে জয় করার যুগ। স্টিম ইঞ্জিন, বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে জলে-স্থলে-আকাশে—প্রকৃতির বিরুদ্ধে তার জয়যাত্রা। কিন্তু সে যাত্রার বিস্তৃতি সত্ত্বেও এখনও প্রকৃতির বিপুল শক্তি মানুষের আয়ত্তের বাইরে রয়ে গেছে।

মানুষ একই সঙ্গে প্রকৃতির অঙ্গ আর প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রকৃতির সঙ্গে অবিরত চলে তার সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মাধ্যমে প্রকৃতিকে সে পালটে দিতে পারে এবং দেয়ও। ফলে সভ্যতা বদলে যায়; সংস্কৃতি লাভ করে নতুন রূপ।

'রূপান্তরের মূলতত্ত্ব' পরিচ্ছেদে গোপাল হালদার লিখেছেন জানতে হবে এই পরিবর্তনের নিয়ম। নতুবা অ-বোধ্য থেকে যাবে সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ রূপান্তরের পন্থা। বোঝা যাবে না কেন ফ্যাসিজম পরাস্ত হয়, জয় হয় সোভিয়েত-এর; জয়ী হয় কমিউনিজম—তৎকালীন পরিস্থিতিতে যাকে মানবতার মূর্ত রূপ বলেই দেখেছিলেন লেখক। এই মানবতার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংগ্রাম থেমে যায় না কোনো দিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে সদ্য স্বাধীন এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলিতে দেশ ভাগ, শর্তকণ্টকিত অর্থ সহায়তা দান, অ্যাটমিক যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের মাধ্যমে চলেছে তার আগ্রাসন।

সংস্কৃতির রূপান্তরের মূল তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক বর্তমান। কিন্তু সে তত্ত্ব জানা থাকলে সংস্কৃতির বিপদের প্রকৃতি সহজে বোঝা যাবে; বিশ্লেষণ করা যাবে ইতিহাসের যথার্থ প্রবাহ আর সংস্কৃতির অন্য রূপ গ্রহণের প্রকৃতি।

গোপাল হালদারের মতে জীবনের ভিত্তি বস্তু। আর বিজ্ঞানের মতে বস্তু গতিশীল। কারণ প্রতি বস্তু গঠিত বহু কণা দিয়ে। আর কণাগুলি নির্মিত প্রোটন-কেন্দ্রিক ইলেকট্রনের আবর্তনের ভিত্তিতে। এছাড়া আছে নিউট্রন, পজিট্রন প্রভৃতি অসংখ্য কণা; সেগুলিও গতিময়। 'বিজ্ঞানের সাক্ষ্য' পরিচ্ছেদে এই গতিশীল কণা কেমন করে বস্তুর রূপ পরিবর্তিত করে তার উদাহরণ দিয়ে জগৎপ্রবাহের ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেখক।

বস্তু-মধ্যস্থ কণাসমূহের দ্বন্দ্ব আর সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় নতুন বস্তু। যেমন হাইড্রোজেন-এর দুটি অণু আর অক্সি জেন—এর একটি অণু মিলে সৃষ্টি হয় জল। আবার তাপ প্রয়োগে জল হয় বাষ্প। এভাবে কণিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয় নতুন বস্তু। তবে এজন্য চাই বড়ো রকমের কোনো আঘাত বা বাধা—যার ফলে গতি যাবে বেড়ে; বস্তু পাবে নতুনতর রূপ।

মানব সমাজে এরূপ বাধার নাম বিপ্লব। বিরোধ ও সমন্বয়ে নতুনের উদ্ভব আর নতুন থেকে নবীনতরের উদ্ভব—এরই নাম দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ—ডায়লেক্‌টিকাল বস্তুবাদ।

শুধু প্রকৃতি জগতে নয় মানব ইতিহাসেও দেখা যায় এই দ্বন্দ্ব-সমন্বয় আর তার ফলে নতুন যুগের উন্মেষ। তাই এ তত্ত্বের আর এক নাম ঐতিহাসিক বস্তুবাদ—হিস্টরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম। গোপাল হালদার এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ তত্ত্ব দিয়ে মানব-প্রগতি তথা মানব-সংস্কৃতির বিকাশের ধারাটিকে বিশ্লেষণ করেছেন।

বস্তুর সংঘাত-মিলনের সূত্রে উদ্ভূত হয়েছে প্রোটোপ্লাজম—প্রাণপঙ্ক। মানুষের আবির্ভাব এই প্রাণপঙ্কের ক্রমবিকাশের বস্তুনির্ভরতার স্রোতে। আর বস্তুবিকাশের শেষ স্তরে মানব-চেতনার উদ্ভব। এই চেতনা তথা মস্তিষ্ক-বলে মানুষ প্রকৃতির অধীন থাকেনি। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে সে। আর বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষ, সংগ্রামের পথে বিকশিত হয়েছে তার সংস্কৃতি আর সভ্যতা।

'ইতিহাসের সাক্ষ্য' পরিচ্ছেদটিতে গোপাল হালদার দেখিয়েছেন ইতিহাসে আছে মানুষের এই ক্রমোন্নতির বিবরণ। বার বার এসেছে নানা সংকট আর সেই সংকটের পর মানব-ইতিহাস, মানব-সংস্কৃতি লাভ করেছে নব রূপ।

মানুষের জীবিকা অর্জনের প্রয়াস থেকে শুরু হয়েছে তার ইতিহাস। কিন্তু তারপর মানব ইতিহাসে শুরু হয়েছে বিরোধ। শোষক আর শোষিতের অবিরাম দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলেছে মানুষের ইতিহাস তাই মানব-ইতিহাস আসলে শ্রেণি-বিভক্ত মানবসমাজের শ্রেণি-বিরোধের বিবরণ।

এর কারণ মানুষ অন্য জীবের মতো প্রকৃতি নির্ভর নয়। দুটি হাত আর মস্তিষ্ক দিয়ে সে পরিবেশকে করে তুলেছে জীবন-উপায়—ইকোলজি হয়েছে ইকনমিক্স। আর এই জীবন-উপায় তথা আর্থিক উন্নতি তার সংস্কৃতির উৎস। জীবনকে উন্নত করার জন্য মানুষ চায় জীবিকার উন্নতি। কিন্তু শোষক শ্রেণি চায় না শোষিতের উন্নতি। ফলে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। একটির অবস্থা উন্নত হলে বেড়ে যায় তার উৎপাদন ক্ষমতা। ফলে অন্যটি চূর্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। বস্তু-বিশ্বের দ্বন্দ্ব হয়ে যায় উৎপাদন শক্তি ও উপাদানের দ্বন্দ্ব। উৎপাদন করে শোষিত শ্রেণি আর উৎপাদনের উপাদান থাকে শোষক শ্রেণির দখলে। শোষিত শ্রেণি জোর করে কেড়ে নেয় উপাদানের উৎস; দেখা দেয় বিপ্লব। পুরোনো সংস্কৃতি বার বার ভেঙে যায়। কিন্তু বার বারই তার সারবস্তু আয়ত্ত করে নেয় নতুন শ্রেণি। ফলে সমাজ বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিরও ঘটে পরিবর্তন।

তাই মানুষের প্রকৃত ইতিহাস উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের দ্বন্দ্ব তথা শ্রেণি-বৈষম্য ও তজ্জনিত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে মানব জাতির ক্রমোৎকর্ষ লাভের ইতিহাস।

সংস্কৃতির ভিত্তি আর্থিক অবস্থা। তবে তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও অন্যান্য শক্তি সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

এই দীর্ঘ বিশ্লেষণাত্মক ভূমিকার পর গোপাল হালদার মূল বিষয়ের অবতারণা করেছেন। 'সংস্কৃতির তিন অংশ' পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন মানুষের জীবন-সংগ্রামের সার্বিক প্রয়াস, তার বাস্তব ও মানসিক সকল প্রকার 'কৃতি' বা সৃষ্টি নিয়েই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি।

এই সংস্কৃতির মূল অঙ্গ তিনটি—(১) জীবন সংগ্রামের বাস্তব উপকরণ সমষ্টি (material means), (২) সমাজের বাস্তব গঠন (Social Structure) এবং (৩) মানস-সম্পদ। সবার উপরে এই মানস-সম্পদের অবস্থান বলে তার নাম Superstructure।

সংস্কৃতিকে দেশগত, জাতিগত ও ধর্মগত বলা এবং সাহিত্য, চারুশিল্প, কারুশিল্প, দর্শন-বিজ্ঞানকে সংস্কৃতি সংজ্ঞা দেওয়া—উভয়ই আংশিক সত্য। সংস্কৃতি সমাজ-দেহের সমগ্র রূপ; তাকে সমাজের লাবণ্য বলা যায় না কোনো মতেই।

সমাজের পরিচয়েই সংস্কৃতির পরিচয়। আবার সমাজ-পরিচয় নিহিত তার জীবন-ধারণের উপাদান সমূহের (means of living) উপর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় প্রস্তর যুগের মানুষের জীবন-প্রয়াস ছিল সমবেত শক্তির মধ্যে নিহিত। কারণ তখন মানুষের জীবন-ধারণের উৎস ছিল পাথরের অস্ত্র দিয়ে পশু শিকার। সমবেত শ্রম ভিন্ন তা সম্ভভব ছিল না। তাই এ সমাজ ছিল সম্মেলক সমাজ।

সংস্কৃতির রূপায়নের প্রথমটিকে তাই বলা যায় জীবন-ধারণের উপকরণ নির্ভরতা। প্রস্তর যুগের মানুষ পারস্পরিক সংযোগ-স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলেছিল ভাষা। ব্যবহৃত উপকরণকে সুন্দর করে তোলার প্রয়াসও তার ছিল। এই দ্বিবিধ উপকরণ দিয়েই গড়ে উঠেছিল তার সমাজ। জাতিধর্ম নয় মানুষ আর তার জীবনোপকরণ দিয়েই সমাজ গড়ে ওঠে। সেভাবে সমাজের নামকরণ বিজ্ঞানের বিচারে সঠিক নামকরণ।

সংস্কৃতির দ্বিতীয় অঙ্গ সামাজিক রূপ; তথা ব্যবহৃত উপকরণ দ্বারা সেই সময়ের মানসিক রূপ চিনে নেওয়ার পদ্ধতি। যেমন প্রস্তর যুগের মানুষের মন ক্ষুধা ও ক্ষুধাতৃপ্তির উপায় নিয়ে ব্যস্ত থাকত। তাই এ সমাজে ভাষার ও সৌন্দর্যচর্চার (ব্যবহৃত উপকরণগুলির সৌকর্য সাধনপ্রয়াস) সম্যক বিকাশ হয়নি। এ সমাজ ছিল সমষ্টিগত শ্রমের সমাজ। তাদের মানস-রূপের পরিচয় মেলে সমাধিতে দেওয়া জীবনোপকরণ থেকে। বোঝা যায় মৃত্যু পরবর্তী জীবনের ধারণা তার মনে দানা বাঁধছিল।

এর পরে এল কৃষিযুগ। তখন নদী, ঋতু, আবহ নিয়ে তার মানস জগৎ গড়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে এসেছিল জমির মালিকানা সংক্রান্ত চিন্তা। এভাবেই সমষ্টিগত জীবন-সংস্কৃতি ভেঙে গিয়ে গড়ে উঠেছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন সংস্কৃতি। কিন্তু এই মূল স্তরের মধ্যে ছিল জমির মাপ, নদী, মেঘকে তুষ্ট করা ফসল অনিষ্ট রোধ করার জন্য নানা বিদ্যা ও প্রক্রিয়ার চর্চার স্তর।

সংস্কৃতির শেষ অবয়ব মানসসম্পদ। যখন জীবিকা-প্রয়াস কিছুটা সহজ হয়েছে তখনই এসেছে মানসসম্পদের বিকাশের কাল। আদিম স্তরে এই মানসসম্পদের সঙ্গে জীবিকার যোগ ছিল দৃঢ়। তাই পশুপালক জাতির গীতবাদ্য-নৃত্যাদির সঙ্গে মিল ছিল না কৃষিজীবী জাতির গান, নাচ, সাহিত্য, বিজ্ঞান চর্চার। মানস-প্রয়াস তাদের জীবিকা-প্রয়াসকে করেছিল পুষ্ট আর শক্তিমান—তাদের সংস্কৃতি পেয়েছিল পূর্ণতা।

জীবিকা আর সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা আছে 'পরস্পরের সম্পর্ক' অধ্যায়ে। গোপাল হালদারের মতে জীবিকা সহজ হয়েছে নতুন নতুন উপকরণ আবিষ্কারের ফলে। জীবনযাত্রার অগ্রগতির ফলে সমাজ-সম্পর্ক হয়ে উঠেছে নতুন। পরিণতিতে মানসক্ষেত্রে এসেছে নতুন নতুন চেতনা আর সৃষ্টি। আবার মানসিক উন্নতির ফলে জাত নতুন চেতনা, নতুন সৃষ্টি—জীবিকার দিকটিকেও পুষ্ট করেছে। এইভাবে বাস্তব ও মানস সৃষ্টি পরস্পরকে সমৃদ্ধ করেছে। পরিণতিতে সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতি হয়েছে সমুন্নত, ব্যাপ্ত ও গভীর।

জীবিকার বস্তুনির্ভর উপাদান, সমাজের বাস্তব রূপ আর মানস সম্পদ—এই তিনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, ঘাত-প্রতিঘাতে প্রতি যুগে গড়ে ওঠে সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপ। গোপাল হালদার সংস্কৃতিকে তুলনা করেছেন বৃক্ষের সঙ্গে।

মানুষের জীবিকানির্বাহ-পদ্ধতি এ গাছের মূল; সমাজ তার কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা আর সাহিত্য, শিল্প, অভিনয়, নৃত্য, গীত, বাদ্য, দর্শন, বিজ্ঞান—এই সব মানসসম্পদ এ বৃক্ষের ফুল ও ফল। ফুল-ফল ভিন্ন বৃক্ষ সার্থক নয়; আবার মূল, কাণ্ড ব্যতীত ফল-ফুলের অস্তিত্ব অসম্ভব। এই তিনের সুষম মিলনেই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি।

সমাজদেহের প্রতি অঙ্গের পারস্পরিক যোগ গভীর ও সক্রিয়। এবং তাদের সম্মিলিত গতিশীল রূপ সংস্কৃতি।

প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে মানুষের জয়লাভের অস্ত্র সংস্কৃতি। আবার তার সেই যুদ্ধে জয়ের নিদর্শনও সংস্কৃতি। সংস্কৃতির যথার্থ স্বরূপ ও সংজ্ঞা এই সত্যের মধ্যেই নিহিত।

এভাবে গোপাল হালদার তাত্ত্বিক মার্কসবাদের সুষ্ঠু প্রয়োগে বিশ্লেষণ করেছেন সংস্কৃতির; রূপ নির্ণয় করেছেন তার সংজ্ঞা। এই কঠিন কর্মে তিনি সফল যা তাঁর গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়।

১.৭ গোপাল হালদার প্রদত্ত সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও লক্ষণ

'সংস্কৃতি' বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় 'কালচার'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে। 'কালচার' এর মূল উৎস লাতিন 'কুলতুরা' (cultura) শব্দ। লাতিনে শব্দটি এসেছে 'কোল' (col) ধাতু থেকে—যার অর্থ চাষ করা। 'কৃষ্' শব্দটির সাহায্যে সাধারণত মানুষের মার্জিত মানস সম্পদ—সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, চিত্র প্রভৃতি বোঝায়। আমরা মনে করতে পারি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত সংস্কৃতির সংজ্ঞাটি—যা আছে তাঁর 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস' গ্রন্থের 'সংস্কৃতি' অধ্যায়ে (পৃ. ৬)। সংজ্ঞাটি এই "ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, সুসংবদ্ধ জীবন-রীতি—প্রভৃতির অতিরিক্ত আর একটা কিছু জাতির জীবনে পাওয়া যায়, যেটা তার বাহ্য সভ্যতার ভিতরের ব্যাপার রূপে প্রতিভাত হয়। সেটা একদিকে তার বাইরের সভ্যতার আভ্যন্তর প্রাণ বা অনুপ্রেরণা বটে, আর একদিকে তার বাহ্য সভ্যতার প্রকাশও বটে। সভ্যতার এই আভ্যন্তর অথচ বাইরেও প্রকাশমান এই অতিরিক্ত বস্তুটিই কালচার বা সংস্কৃতি।"

গোপাল হালদার সংস্কৃতিকে কেবলই 'আভ্যন্তর প্রাণ' বা সভ্যতার বাইরের রূপ বলে গ্রহণ করেননি। তিনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে সংস্কৃতির বিচার করেছে। ক্রিয়া এবং তার বিপরীত ক্রিয়ার দ্বন্দ্ব—সব কিছুর মূল—একেই সংক্ষেপে বলা যায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া—উভয়ের দ্বন্দ্ব এবং তার ফলে নতুনের আবির্ভাব। আবার এই নতুনের মধ্যে দেখা দেয় বিরোধ এবং তার সাময়িক বিনাশও ঘটে। দেখা দেয় নতুনতর রূপ। অবিচ্ছিন্ন চলে এই প্রক্রিয়া। এরই নাম দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বা 'ডায়লেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম্'। যখন ইতিহাসের মধ্যে এই প্রক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় তখন তা হয় হিস্টরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম—ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

গোপাল হালদার সংস্কৃতিকে মানস-বিলাস বলেননি। তাঁর মতে সংস্কৃতি মনের সৃষ্টিসম্পদ মাত্র নয়; তার উদ্ভব বস্তুজগতের প্রয়োজনে। মানুষ টিকে থাকার সংগ্রামে শক্তি পায় সংস্কৃতি থেকে, আবার জীবনের উৎসও সংস্কৃতি। জীবনযাত্রার সংঘাতে-আঘাতে সংস্কৃতির বাইরের রূপ ও অন্তরের ভাব পালটে যায়। জীবনযাপনের সহায়ক বলেই জীবনযাত্রার উন্নতির সঙ্গে সংস্কৃতিরও হয় মানোন্নয়ন।

তাঁর মতে মানুষের সংস্কৃতি আছে অন্য কোনো জীবের নেই। কারণ মানুষ জীবিকার জন্য, জীবন ধারণের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল নয়। সে 'জীবিকার পথ আবিষ্কার করিতে পারে। অর্থাৎ মানুষের একটা আর্থিক জীবন আছে, তাই মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনও সম্ভব হইয়াছে। সংস্কৃতির বনিয়াদ তাহার আর্থিক অবস্থায়। মূলত তাহা প্রধান বস্তু, কিন্তু একমাত্র বস্তু নয়। বাস্তব ও আধ্যাত্মিক আরও অনেক শক্তি থাকে।'

এই সংজ্ঞাটিকে ব্যাখ্যায় বিশদ করেছেন লেখক। প্রথমে তিনি জীবতত্ত্বের দিক দিয়ে সংস্কৃতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন।

বেঁচে থাকার, টিকে থাকার প্রয়াস জীব মাত্রেরই মৌল প্রেরণা। অন্য সব জীব প্রকৃতির নিয়মের অধীন থেকেই জীবনের উপকরণ সংগ্রহ করে নেয়। মানুষ তার দুটি হাতের ব্যবহার এবং মস্তিষ্কের শক্তিতে শক্তিমান। এই দুই শক্তির সহায়তায় সে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জন করে তার জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য। অতএব সংস্কৃতির অর্থ মানুষের কাজ বা কৃতি।

দেহ আর মনের মিলিত শ্রমে মানুষ জীবিকা আয়ত্ত করে এবং ক্রমে তাকে সহজ করে নিতে চায়। এই শ্রমের শক্তি মানুষকে অন্য জীবের থেকে পৃথক করেছে। আবার এই শক্তিই তার সংস্কৃতির ভিত্তি। তাই মানুষ একই সঙ্গে প্রকৃতির অধীন অথচ প্রকৃতি-নিরপেক্ষ। প্রকৃতির সহায়তায় মানবের এই স্বাধীনতার সাধনাই তার সংস্কৃতি। মানুষের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি তার স্ব-শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠার নিদর্শন।

প্রকৃতির সঙ্গে তার এই সংগ্রাম শেষ হয়নি। তা এখনও চলেছে। কেবল সময়ভেদে তার সংগ্রামের উপকরণ আর জয়ের চিহ্ন গেছে পালটে।

সংস্কৃতির এই চলমানতার ব্যাখ্যা করেছেন গোপাল হালদার বিজ্ঞানের তত্ত্ব দিয়ে। সংস্কৃতি যে স্থাণু নয়, তা যে বিকাশশীল বাস্তব জীবন প্রয়াস—বিজ্ঞানের সত্য তার প্রমাণ।

বিজ্ঞান মতে বস্তুই বিশ্বের মূল। এই বস্তু সতত গতিমান—জড় নয়। বিশ্বের তাবৎ বস্তু গঠিত অ্যাটম-এর বিন্যাসগত রূপ হিসেবে। অ্যাটম-এর মধ্যে থাকে প্রোটন-এর চারপাশে ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রন সমূহ। এছাড়া নিউট্রন পজিট্রন প্রভৃতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চলনশীল কণাও অ্যাটম-এর মধ্যে বিদ্যমান—বিজ্ঞানই সে কথা বলেছে। এইসব কণার মধ্যে আছে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি—ক্রিয়া এবং তার প্রতিক্রিয়া। এই সংঘাত-মিলনের চক্রপথে সৃষ্টি হয় নতুন বস্তু। যেমন জল—দুটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন কণার মিলনে সৃষ্টি হয় জল। তার মধ্যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন-এর কোনো গুণই লক্ষিত হয় না। তা সম্পূর্ণ একটি নতুন বস্তু। আবার তাপ প্রয়োগে জল হয় বাষ্প—নতুন আর এক বস্তু। অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগে বস্তুর রূপ যায় পালটে।

মানব সমাজেও বর্তমান এই গতি। সেই গতির মধ্যে আছে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ; এই গতির পরিবর্তন ঘটায় বিপ্লব রূপ বাধা বা চাপ। উদ্ভব হয় নতুন গতি আর নতুন সংস্কৃতির।

বস্তুর সংঘাত-সূত্রে এসেছে আদিম প্রাণপঙ্ক-প্রোটোপ্লাজম। বস্তুর দ্বন্দ্বমূলক গতির সূত্রে প্রাণপঙ্ক থেকে একাকোষী প্রাণীর আবির্ভাব। একইভাবে সেই এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী প্রাণীর উদ্ভব—যার শ্রেষ্ঠ রূপ মানুষ। মস্তিষ্ক তথা বুদ্ধির শক্তি মানুষকে করেছে উন্নত। প্রকৃতির কাছ থেকে সে ছিনিয়ে নিয়েছে জীবনকে টিকিয়ে রাখার উপকরণ (means)। এভাবেই প্রকৃতি-জয়ের পথে এগিয়ে গেছে মানুষ। প্রকৃতি-বিজয়ের পথেই এসেছে তার সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির মূল তাই জীবিকা-প্রয়াস। জীবিকা-প্রয়াসকে মানুষ ক্রমাগত সহজ করতে চায়। ফলে পরিবর্তিত হয় তার অর্থনীতি।

ইতিহাসের দিক দিয়েও গোপাল হালদার সংস্কৃতির সংজ্ঞা বিচার করেছেন। জীবিকা-প্রচেষ্টার অর্থ উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের সংঘাত-সমন্বয়ের মাধ্যমে মানব সমাজের ক্রমিক অগ্রগতির বিবরণ।

উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন শ্রম আর উৎপাদন-উপকরণ। একেবারে সূচনায় দুটির মধ্যে অধিকারী-ভেদ ছিল না। কিন্তু জীবিকা-প্রয়াস যত উন্নত হল ততই তার মধ্যে এল উৎপাদন-শক্তি আর উৎপাদন-সম্পর্কজনিত ভেদ। সৃষ্টি হল

শ্রমিক শ্রেণি আর মালিক শ্রেণি—উৎপাদন শক্তি আর উৎপাদন-উপকরণের অধিকারী শ্রেণি। দ্বিতীয় শ্রেণি প্রথম শ্রেণিকে ব্যবহার করে উৎপাদিত বস্তুর অধিকারী হতে চায় আর দ্বিতীয় শ্রেণি চায় উৎপন্নের সম অধিকার। ফলে দেখা দেয় শ্রেণি-বৈষম্য। এই বৈষম্য থেকে সৃষ্টি হয় দুই শ্রেণির সংঘাত। সেই সংঘাতের পথে আসে বিপ্লব। উৎপাদন-উপাদান ও উৎপাদন-সম্পর্কের ঘটে পরিবর্তন। সে পরিবর্তনের ফলে পালটে যায় সমাজ আর সংস্কৃতি।

গোপাল হালদার জীবিকাপ্রয়াস তথা আর্থিক জীবনকে সংস্কৃতির মূল উপকরণ বলেছেন। কিন্তু তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে আর্থিক-বল সংস্কৃতির একমাত্র শক্তি নয়। আর্থিক শক্তির সঙ্গে বস্তুগত ও মানসিক আরও অনেক শক্তির মিলনে গড়ে ওঠে সংস্কৃতি।

গোপাল হালদার সংস্কৃতির প্রচলিত সংজ্ঞার আংশিকতার দিকটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাঁর রচনায়। সংস্কৃতি বিচারের কোনো স্থির আদর্শ সাধারণত দেখা যায় না। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানস-সম্পদকে সংস্কৃতি বলার প্রবণতাই সবচেয়ে প্রবল। তা ছাড়া কাল, ধর্ম আর জাতির ভিত্তিতে সংস্কৃতির বিচারের প্রবণতা লক্ষিত হয় সব দেশেই। তাই বলা হয় পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, মধ্যযুগের সংস্কৃতি, বাঙালির সংস্কৃতি, হিন্দু সংস্কৃতি বা মুসলিম সংস্কৃতি। এইসব সংজ্ঞায় জনমানসের অহম্ তৃপ্ত হয়।

আবার আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি, জড়বাদী সংস্কৃতি ইত্যাদি তত্ত্বগত দিক দিয়েও সংস্কৃতি ব্যাখ্যার প্রবণতা পৃথিবীর সর্বত্রই বেশ প্রবল। এই সব ধারণা ভ্রান্ত নয়। কিন্তু এসব ধারণার ত্রুটি এখানেই যে এগুলি আসলে অর্ধ-সত্য বা অংশ-সত্য। আবার এই ধারণার আংশিকতা অনেক সময়ই সত্য দর্শনের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে। জাতিগত সংস্কৃতি-ধারণার বিকৃতি কীভাবে মানবতার শত্রু হয়ে দাঁড়ায় তার প্রমাণ হিটলার-এর ইহুদিনিধনব্রত। তাই মানবতার স্বার্থে, মানব জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সংস্কৃতির বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব জানা প্রয়োজন। সেই তত্ত্ব বলে মানুষের টিকে থাকার সংগ্রামের বাস্তব ও মানসিক সকল কৃতি বা চেষ্টা নিয়েই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির উপকরণ : সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তিনটি মূল উপকরণকে নিয়ে; প্রথমত মানুষের জীবন সংগ্রামের বাস্তব উপকরণ সমূহ (material means), দ্বিতীয়ত সমাজ-ব্যবস্থা (social structure)—যা সংস্কৃতির আশ্রয়, তৃতীয়ত মানস-সম্পদ (super structure)। সংক্ষেপে বলা যায় সমাজ যদি হয় সংস্কৃতির সৌধ তবে মানস-সম্পদ তার শিখর অর্থাৎ উপরিতলের উপকরণ। অতএব সংস্কৃতিকে জাতি, দেশ বা ধর্মনির্ভর মনে করাও যেমন অর্ধ-সত্য তেমন মানস-সম্পদকে সংস্কৃতি বলাও অংশ-সত্য। কারণ সংস্কৃতি সমাজদেহের সমগ্র রূপ, কেবল তার লাবণ্যকে সংস্কৃতি বলা যায় না।

(১) বাস্তব উপকরণ : জীবিকা নির্বাহের উপাদানই (means of living) সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। জীবন যাপনের উপাদান দেয় সমাজের প্রকৃত পরিচয়। যেমন প্রস্তর যুগের মানুষের জীবন ধারণের উপায় ছিল পাথরের তৈরি হাতিয়ার দিয়ে পশুনিধন। ফলে তাদের সমাজ তথা সংস্কৃতি ছিল যৌথ সংস্কৃতি। কারণ একক প্রয়াসে প্রস্তরাস্ত্র দিয়ে পশুনিধন সম্ভব ছিল না। পরে এসেছে তাম্র আর লৌহ যুগ। কৃষিজীবী হয়েছে মানুষ। ভূমি বা জমি জীবন ধারণের মূল উপাদান হয়ে উঠেছে। ফলে এসেছে জমির মালিকানা সংক্রান্ত চেতনা; এসেছে আবহ, নদীস্রোত প্রভৃতি সম্পর্কে চিন্তা। সংস্কৃতির রূপ গেছে পালটে।

আবার প্রস্তর যুগ থেকেই মানুষ পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের উপায় হিসেবে গড়ে তুলেছিল ভাষা। মৃত্যু-পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল। কারণ মৃতের সমাধিতে তারা দিত জীবনোপকরণ।

এই সব উপকরণের প্রয়োগ-বিশেষত্বের ভিত্তিতে সেই সব প্রাচীন মানুষের সংস্কৃতির নাম দেওয়া হয়। এভাবেই জীবনোপকরণ হয়ে ওঠে সমাজ-সংস্কৃতির মূল।

(২) সামাজিক গঠন : জীবনোপকরণ দ্বারা যে মানব-সম্পর্ক বিন্যাস গঠিত হয় তাকেই বলা যায় সমাজ। এই

সম্পর্ক বিন্যাসের প্রমাণ হিসেবে বলা যায় প্রস্তর যুগের মানুষ ছিল অনুন্নত। জীবনোপকরণ তাদের যূথবদ্ধ জীবন গড়ে তুলতে বাধ্য করেছিল। সে সমাজে ব্যক্তির স্বতন্ত্র মালিকানা ছিল না। দল বেঁধে সে যুগের মানুষ শিকার করত আর সমবেতভাবে গ্রহণ করত শিকার।

আবার যখন চাষ করতে শিখল মানুষ তখন তার জীবন-ধারণের ভিত্তি হল উৎপন্ন ফসল। তখন মানুষ নদীর স্রোত, মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করতে শিখেছিল। প্রকৃতির শক্তিকে আয়ত্ত করতে পারেনি বলে তাদের চিন্তায় প্রধান হয়ে উঠেছিল প্রকৃতির নানা রূপ থেকে জাত অপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বের ধারণা। ফসলের মালিকানার প্রশ্ন থেকে এসেছিল জমির মালিকানার চিন্তা। যৌথ জীবন ভেঙে গিয়ে গড়ে উঠেছিল ছোটো ছোটো একক যুক্ত সমাজ-বিন্যাস।

এভাবেই উপকরণের প্রয়োগ-ভিন্নতা দ্বারা সংস্কৃতির রূপ গড়ে ওঠে। অর্থাৎ সমাজবিন্যাস হয়ে ওঠে সংস্কৃতির আশ্রয়।

(৩) মানস সম্পদ : যে সব উৎস থেকে আমরা জীবনোপকরণ ও সমাজ-বিন্যাসের আদিম রূপটি জানতে পারি—সে সব উৎস থেকেই সেকালের গান, নাচ, ছবি প্রভৃতি মানস-সম্পদেরও সন্ধান পাই। এইসব মানস-সম্পদের সঙ্গে জড়িত ছিল আচার-অনুষ্ঠান। সেগুলি সর্বত্রই জীবিকা-প্রয়াসের সঙ্গে অন্বিত ছিল। তাই পশু-পালনকারী সমাজের নৃত্য, গীত, চিত্র ছিল পশুপালনের সঙ্গে যুক্ত। কৃষিজীবীর গান, নাচ, ছবি, আখ্যানের সঙ্গে যোগ ছিল কর্ষণের। এভাবে তৎকালের জীবিকা-প্রয়াস অর্জন করেছে শক্তি—সংস্কৃতি পেয়েছে পূর্ণতা।

সংস্কৃতির এই তিন উপকরণ পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। জীবিকা-প্রয়াস নতুন উপকরণ আবিষ্কারের দ্বারা হয়েছে অগ্রগামী। ফলে সমাজকাঠামো হয়েছে উন্নত। উভয়ের সংযোগে মানসিক ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে নব নব চিন্তা-চেতনা আর সৃষ্টি।

মানস ক্ষেত্রের এই সব নতুন চিন্তা, চেতনা, সংস্কৃতি মানুষকে প্রাণিত করেছে সমাজ সম্পর্কের নব বিন্যাসে। এমনইভাবে বাস্তব সৃষ্টি ও মনের সৃষ্টি পরস্পরের সহায়ক ও পুষ্টিদায়ক হয়ে উঠেছে। পরিণতিতে সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতি হয়েছে উন্নত, ব্যাপ্ত, গভীর এবং গতিমান।

জীবিকার বাস্তব উপকরণ, সমাজের বাস্তব কাঠামো আর মানস-সম্পদ—এই তিনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, সংঘাত-প্রতিঘাতে প্রতি দেশে প্রতি যুগে সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপ গঠিত হয়েছে।

উপমা দিয়ে ব্যাপারটি সহজবোধ্য করেছেন লেখক। তাঁর মতে জীবিকার উৎপাদন প্রথা যেন সংস্কৃতিবৃক্ষের মূল, সমাজদেহ তার কাণ্ড আর শাখা-প্রশাখা, এবং নৃত্য, গীত, সাহিত্য, শিল্প দর্শন, বিজ্ঞান—সেই সংস্কৃতির ফল-ফুল।

আবার সংস্কৃতিকে যদি সৌধ ভাবা যায় তবে জীবনোপকরণ উৎপাদনের পদ্ধতি সেই সৌধের ভিত্তি। সমাজ-সম্ভবন্ধ এই গৃহের নিম্নতল আর শিল্পকলা, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য—এইসব মানস-সৃষ্টি যেন সে গৃহের কারুকার্য-সমৃদ্ধ উপরিতল।

আসলে সমাজ-দেহের প্রতি অঙ্গের সঙ্গে প্রতি অঙ্গের আছে গভীর অথচ সক্রিয় সংযোগ। সর্ব অঙ্গের মিলিত রূপই সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি কিন্তু স্থাণু নয়, গতিশীল—মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে প্রতিনিয়ত অগ্রসর হয়ে চলেছে আর একই সঙ্গে পরিবর্তিত, গতিময় হয়ে উঠেছে তার সংস্কৃতি। তাই সংস্কৃতি আর মানবজীবনের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ও গভীর। কোনোভাবেই তাই সংস্কৃতিকে পৃথক কোনো অস্তিত্ব বলা যায় না।

১.৮ গঠন শিল্প : সংস্কৃতির সংজ্ঞা

যুক্তির সাহায্যে তথ্য বিশ্লেষণ দ্বারা বিষয়ের বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাষারূপ দান—প্রবন্ধশিল্পের ভিত্তি। গোপাল হালদার ছিলেন মননপ্রধান রচয়িতা। সে কারণে প্রবন্ধ নির্মাণে তাঁর সহজাত দক্ষতা ছিল। পাঠবিস্তৃতি সেই নিপুণতাকে দিয়েছিল ব্যাপ্ত গভীরতা। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' (১ম প্রকাশ ১৯৪১) গ্রন্থের 'সংস্কৃতি জিজ্ঞাসা' শীর্ষক প্রথম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায় 'সংস্কৃতির গোড়ার কথা' (যা 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' নামে পাঠ্য হিসেবে নির্বাচিত) অংশটি গোপাল হালদারের প্রবন্ধ শৈলীর একটি সুন্দর নিদর্শন।

এই প্রবন্ধে গোপাল হালদার সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাহায্যে। এই তত্ত্বের মূল কথা প্রতি ঘটনা এবং বস্তু ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বজনিত ফল। সব ক্রিয়ার থাকে প্রতিক্রিয়া। উভয়ের সংঘাতের পরিণামে উৎপন্ন হয় বস্তু। বিশ্বের সব কিছুর মতো সংস্কৃতিও একটি বস্তু। তা মানুষের জীবন-ধারণ প্রক্রিয়া ও তার উপকরণের প্রতিক্রিয়ায় সঞ্জাত। অর্থাৎ ভাববাদ দিয়ে সংস্কৃতির সংজ্ঞা সন্ধান করেননি গোপাল হালদার।

তিনি সংস্কৃতির সন্ধান করেছেন মানব-অস্তিত্বের সূচনা থেকে। প্রোটোপ্লাজম থেকে মানুষের জন্ম। ক্রমে দুই হাত আর মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে শিখেছে মানুষ। ফলে অন্য জীবের মতো জীবিকার জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করেনি সে। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে সে ছিনিয়ে আনে জীবনধারণের উপকরণ। তার এই জীবিকা-প্রয়াসের সমগ্র রূপেরই নাম সংস্কৃতি—যা স্থির নয়; পরিবর্তনশীল এবং ক্রমোন্নতির পথযাত্রী।

এই জটিল বিষয়টিকে স্পষ্ট বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করেছেন লেখক। বিষয়টিকে তিনি নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান আর ইতিহাসের তথ্য দিয়ে যুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের দ্বারা লেখক আপন বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু এই বিশ্লেষণ কখনও পাঠকমনকে ক্লান্ত করে না—পাঠকচিত্তকে করে তোলে আগ্রহী এবং উৎসুক।

সংযম গোপাল হালদারের এই প্রবন্ধটির বিশেষত্ব। মিতকায় বারোটি প্রথম শিরোনাম যুক্ত পরিচ্ছেদে তিনি প্রতিপাদ্য বিষয়কে স্বচ্ছভাবে রূপ দিয়েছেন।

সংস্কৃতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ কালে তাঁর লেখায় এসেছে শ্রমবিভাজন, শ্রেণি বৈষম্যের বিবরণ। সভ্যতার স্তরানুক্রমিক বিকাশের কথাও গোপাল হালদার বলেছেন।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা বিচারকালে তিনি প্রাঞ্জলতার প্রয়োজনে কার্লমার্কস (Karl Marx : ১৮১৮-১৮৮৩) ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ (Friedrich Engles : ১৮২০-১৮৯৫)—এঁদের রচনার প্রাসঙ্গিক অংশ ব্যবহার করেছেন। এবং বিবিধ উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট করে দিতে সমর্থ হয়েছেন লেখক।

তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ ভার হয়ে ওঠেনি গোপাল হালদারের এই প্রবন্ধটিতে। বরং তার ফলে প্রবন্ধটি হয়েছে আকর্ষক।

এই রচনায় সংস্কৃতির সমগ্র রূপ বিচার করেছেন লেখক সংস্কৃতির মূল ভিত্তি, প্রধান আশ্রয় এবং মানস সম্পদ—এদের ব্যাখ্যার মাধ্যমে। এই তিন উপাদান এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক-নিবিড়তা স্বচ্ছ হয়ে গেছে তাঁর যুক্তি-বিন্যাসের গুণে।

আরম্ভ, বিকাশ আর সমাপ্তি—এই তিন ভাগে বিন্যস্ত করা যায় তাঁর প্রবন্ধ-আঙ্গিককে। বিষয়টি প্রথমে গোপাল হালদার সূত্রাকারে উপস্থাপিত করেছেন। তারপরে ব্যাখ্যায় বিস্তৃত হয়েছে তাঁর প্রতিপাদ্য। সমাপ্তিতে তথ্য ও বিশ্লেষণের সুমিত অন্বয় ঘটেছে। ফলে প্রবন্ধটি হয়ে উঠেছে নিটোল এবং সহজ লাবণ্যে সুন্দর।

ভাষা : গোপাল হালদারের এই প্রবন্ধটির ভাষার প্রধান বিশেষত্ব ভারহীনতা। বিষয়ের গুরুভার তাঁর ভাষাকে কঠিন বা জটিল করেনি। সাবলীল শব্দবিন্যাস তাঁর ভাষাকে করে তুলেছে নমনীয় এবং প্রাণবন্ত।

প্রয়োজনে তিনি ব্যবহার করেছেন উদাহরণ। সে সব উদাহরণকে বিষয়কে দিয়েছে স্পষ্টতা। সংস্কৃতির গতিশীলতা বোঝাবার জন্য পরমাণুর গঠন তত্ত্বের ব্যবহার, মানব-সংস্কৃতির অতীত নিদর্শন হিসেবে আলতিমারা ও দর্দঞ-এর গুহাচিত্রের উল্লেখ প্রভৃতির কথা আমরা প্রসঙ্গত মনে করতে পারি।

পরিমিতি তাঁর ভাষার আর এক বৈশিষ্ট্য। ছোটো ছোটো বাক্য ব্যবহার, আবশ্যকীয় শব্দ প্রয়োগ—তাঁর ভাষাকে করেছে সংহত।

গোপাল হালদার ব্যবহার করেছেন সাধুরীতির গদ্য। কিন্তু এরূপ বলিষ্ঠতা চলিত গদ্য ভাষায় কমই দেখা যায়। উদাহরণ রূপে সংস্কৃতি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল। "... মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, কারণ মানুষ জীবিকার পথ আবিষ্কার করিতে পারে। অর্থাৎ, মানুষের একটা আর্থিক জীবন আছে, তাই মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনও সম্ভভব হইয়াছে। সংস্কৃতির বনিয়াদ তাহার আর্থিক অবস্থায়।"

সরল এই গদ্য ভাষা প্রবন্ধটিকে করে তুলেছে মনোগ্রাহী আর আকর্ষক। বিন্যাস পদ্ধতির সঙ্গে ভাষার সুষম অন্বয়ে 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' গোপাল হালদারের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে।

১.৯ প্রশ্নাবলী

১। সংস্কৃতি বলতে গোপাল হালদার কী বুঝিয়েছেন? তাঁর প্রদত্ত সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' প্রবন্ধটির গঠনসৌকর্য ও ভাষা প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৩। গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা' কোন ধরনের প্রবন্ধ? সেই প্রবন্ধ-আঙ্গিক ব্যবহারে তিনি কি সফল হয়েছেন? সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করুন।

১.১০ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। গোপাল হালদার : সংস্কৃতির স্বরূপ দ্রষ্টা—সম্পাদনা সুনীলবিহারী সেনশর্মা, করুণাসিন্ধু দাস, পল্লব সেনগুপ্ত।

২। গোপাল হালদার রচনা সমগ্র (১-২) সম্পাদনা অমিয় ধর।

৩। পরিচয় গোপাল হালদার সম্মান সংখ্যা ১৯৮০।

৪। পরিচয় গোপাল হালদার স্মরণ সংখ্যা ১৯৮৪।

৫। প্রসঙ্গ গোপাল হালদার—অতএব প্রকাশনী ১৯৯২।

৬। মার্কসবাদী সাহিত্যবিচার—ধনঞ্জয় দাস (অখণ্ড)।

একক ২ □ বাংলার রেনেসাঁস

গঠন

২.০ বাংলার রেনেসাঁস : কাজী আবদুল ওদুদ

২.১ প্রবন্ধ সংকলন তালিকা

২.২ প্রবন্ধ বিশেষত্ব

২.৩ পাঠ্য প্রবন্ধ : পরিচিতি ও সারসংক্ষেপ

২.৪ বাংলার নবজাগরণ বিষয়ে কাজী আবদুল ওদুদের মতামতের বিশ্লেষণ

২.৫ বাংলার রেনেসাঁস : কাজী আবদুল গঠনশিল্প

২.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

২.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

২.০ বাংলার রেনেসাঁস : কাজী আবদুল ওদুদ

২.০ সূচনা : কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) :

কাজী আবদুল ওদুদের জন্ম অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার বাগমারা গ্রামে। জন্ম সময় ২ এপ্রিল ১৮৯৪।

ওদুদের পিতা কাজী সগীর উদ্দিন পেশায় ছিলেন রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার। তাঁর প্রকৃতি ছিল রসিক, স্বভাবে ছিল লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করার প্রবণতা। তাঁর কথায় লক্ষিত হত স্পষ্টতা; মত প্রকাশের ক্ষেত্রে ছিল দৃঢ়তা। প্রখর ছিল তাঁর আত্মসম্মানবোধ।

তাঁদের পরিবার সম্ভ্রান্ত হলেও তেমন সঙ্গতিপন্ন ছিল না। তুলনায় তাঁর মাতৃকুল ছিল কিছুটা সচ্ছল।

তাঁর জননীর চরিত্রে ছিল দৃঢ়তা, কর্তৃত্বের ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর বুদ্ধি। বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার গুণে তিনি হতে পেরেছিলেন পরিবারের প্রধান।

পিতা ও মাতার সূত্রে কাজী আবদুল ওদুদও হয়ে উঠেছিলেন দৃঢ়চরিত্র, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বলিষ্ঠ চরিত্র, উদারচেতা।

শিক্ষা : কাজী আবদুল ওদুদের প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছিল ফরিদপুর জেলারই জগন্নাথপুর মাইনর স্কুলে। দু বছর পরে তাঁর ছোটো মামা নাজিরউদ্দিন দারোগার চাকরি পাওয়ার পর ওদুদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু মামার চাকরি বদলির হওয়ায় তাঁকে বার বার স্কুল পরিবর্তন করতে হয়েছিল। ঢাকার স্কুল, নরসিংদির শাটির পাড়া হাইস্কুল, বূপগঞ্জের মুরাপাড়া স্কুল—এই তিনটি স্কুলে পড়ার পর ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে দশম শ্রেণিতে ভর্তি হন। স্কুলে তিনি ছিলেন ভালো ছাত্র। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে দশ টাকার জেলাবৃত্তি সহ তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে আই.এ.-তে ভর্তি হন। এসময় তিনি বকুলবাগানে এক শিক্ষকের বাসায় থাকতেন। এখানেই তাঁর পরিচয় হয় রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে; ক্রমে সেই পরিচয়-পরিধি বিস্তৃত হয়। স্নাতক শ্রেণিতে পাঠকালে তিনি বেকার হস্টেল-এ স্থান পান। এখানে তাঁর পরিচয় হয় কয়েকজন সাহিত্যমনস্ক উজ্জ্বল তরুণের সঙ্গে এঁদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ আফজল হক (ইনি পরে 'মোসলেম

পাবলিশিং হাউস' প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রকাশ করেন 'মোসলেম ভারত' পত্রিকা) ও মুজফ্‌ফর আহমদ। মোহাম্মদ আফজল হকের উদ্যোগে হস্টেল থেকে একটি হাতে লেখা পত্রিকাটি বের হয়। তাতে 'শ্রীদীক্ষিত' ছদ্মনামে রচিত ওদুদের যে লেখাটি স্থান পায় সেটিই তাঁর প্রথম সাহিত্য-প্রয়াস।

ওদুদের সঙ্গে যাঁরা পড়তেন তাঁদের মধ্যে রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, দিলীপকুমার রায়, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখের নাম উল্লেখ করতে হয়। কারণ এঁদের সাহচর্য ওদুদের মনে দেশপ্রীতি ও সাহিত্য-অনুরাগ বিকাশ লাভ করেছিল।

১৯১৭-তে তিনি বি.এ. পাস করেন এবং ১৯১৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পলিটিকাল ইকনমি অ্যান্ড পলিটিকাল ফিলজফি (Political Economy & Political Philosophy Group B) নিয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আরবি-ফারসি ভিন্ন সংস্কৃতও জানতেন তিনি।

সাহিত্যবোধের সঙ্গে রাজনৈতিক অর্থনীতি ও দর্শনের সঙ্গে এই পরিচয় ওদুদের প্রাবন্ধিক সত্তাকে করে তুলেছিল যুক্তিনির্ভর আর বলিষ্ঠ—এমত অনুমান করা অসংগত নয়।

কর্মজীবন : রাজনীতিবিদ্যার ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যচর্চার সূত্রে তিনি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে লেকচারার পদে যোগ দেন। কুড়ি বছর দক্ষতার সঙ্গে তিনি একাজ করেন। ১৯৪০-এ তিনি বাংলার সরকারি টেকস্‌ট বুক কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। এই পদ থেকে তিনি যথাসময়ে অবসর নিয়েছিলেন। এই কাজের সূত্রেই ১৯৪০ থেকে আমৃত্যু তিনি কলকাতায় বাস করেন। কেবল ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই সময়টুকু তিনি রাজশাহিতে ছিলেন। কারণ তখন সরকারি শিক্ষা দপ্তর রাজশাহিতে চলে গিয়েছিল। ১৯৭০ সালে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সাহিত্যচর্চা : সাহিত্য জীবনের সূচনায় কাজী আবদুল ওদুদ প্রবন্ধের সঙ্গে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক—সবই লিখতেন। তবে মননশীল প্রাবন্ধিক হিসেবেই তিনি খ্যাত এবং পরবর্তী সময়ে তিনি সৃষ্টিশীল সাহিত্যচর্চা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কাজী আবদুল ওদুদের প্রথম মুদ্রিত রচনা সমালোচনা-প্রবন্ধ 'বিরাজ বৌ'। শরৎচন্দ্রের উক্ত নামের উপন্যাসের এই সমালোচনাটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১৩২৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। যখন তিনি স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্র তখনই মুদ্রিত হয় তাঁর প্রথম গল্পগুচ্ছ 'মীর পরিবার' (১৯১৮) ও উপন্যাস 'নদীবক্ষে' (১৯১৯)। মুসলিম জীবনভিত্তিক গ্রন্থ দুটি সমকালে প্রশংসিত হয়। তাঁর তিনটি গল্প ও একটি নাটিকার সংকলন 'তরুণ' বের হয় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর লেখা একটি মাত্র একাঙ্ক নাটক 'পথ ও বিপথ' মুদ্রিত হয় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে। 'জয়তী' পত্রিকায় 'খেলাধূলা' নামে একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি রোমা রোলাঁ-এর 'জাঁ ক্রিস্‌তফ্‌' উপন্যাসের আদলে। পরে এটি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'আজাদ' নামে বের হয়। একই সঙ্গে প্রবন্ধ চর্চাও চলেছিল। তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধ 'সাহিত্যিকের সাধনা' ('মোসলেম ভারত', বৈশাখ ১৩২৭ বঙ্গাব্দ)। প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধটির প্রশংসা করেছিলেন ১৩২৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'সবুজপত্র'-এ।

তিনি সম্পাদনা করেছেন 'সংকল্প' (১৩৬১ ব.) এবং 'তরুণপত্র' (১৩৭২ ব. নব পর্যায়) নামে দুটি ক্ষীণায়ু পত্রিকা। এছাড়া 'যুগের আলো', 'অভিযান', 'শিখা', 'নওরোজ', 'জাগরণ', 'সঞ্চয়', 'জয়তী' 'বুলবুল', 'ছায়াবীথি' 'সঞ্চয়' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যোগ ছিল তাঁর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। বুদ্ধির মুক্তি ছিল এই সাহিত্য ও সংস্কৃতি নির্ভর প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য। সংস্কারমুক্ত চিত্তের অধিকারী কাজী আবদুল ওদুদ যুক্ত ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে।

২.১ প্রবন্ধ সংকলন তালিকা

তাঁর প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা মোট তেরো। এগুলির মধ্যে জীবনী প্রবন্ধও আছে। তিনি দুই ভাগে কোরআন অনুবাদ করেন। (১) 'পবিত্র কোরআন' ১ম ভাগ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় ভাগ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ। এবং দুখণ্ডে সংকলন করেন 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' (১৩৬০ বঙ্গাব্দ) নামে একটি শব্দকোষ।

এখানে তাঁর প্রবন্ধ-সংকলন ও জীবনী প্রবন্ধের তালিকা দেওয়া গেল।

(১) 'নবপর্য্যায়' ১ম খণ্ড (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৯২৬), ২য় খণ্ড (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ১৯২৯), দুটি খণ্ডে নানা বিষয়ে ষোলোটি প্রবন্ধ আছে।

(২) 'রবীন্দ্রকাব্য পাঠ' (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, ১৯২৭) রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধের সংকলন।

(৩) 'সমাজ ও সাহিত্য' (১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ১৯৩৪), 'সমাজ' শীর্ষক অংশে আছে আটটি প্রবন্ধ, 'ছিন্নপত্র' নামে তিনটি পত্র-প্রবন্ধ, এবং 'সাহিত্য' শীর্ষক বিভাগে আছে সাতটি প্রবন্ধ।

(৪) 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজাম বক্তৃতার (১৯৩৫) গ্রন্থরূপ। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা যুক্ত গ্রন্থটি বের হয় ১৩৪২ বঙ্গাব্দ (১৯৩৫)।

(৫) 'আজকার কথা' (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, ১৯৪১) বারোটি বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন।

(৬) 'নজরুল-প্রতিভা' (১৯৪৯)—নজরুল বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে আছে আবদুল কাদির রচিত 'নজরুলের জীবন ও সাহিত্য' প্রবন্ধটি।

(৭) 'স্বাধীনতা দিনের উপহার' (১৯৫১) সংকলনটিতে ছ-টি প্রবন্ধের সঙ্গে একটি কবিতা ('সুভাষচন্দ্র') আছে।

(৮) 'শাশ্বত বঙ্গ' (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, ১৯৫১), পূর্বে প্রকাশিত সংকলনগুলির প্রবন্ধের সঙ্গে এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে আরও পনেরোটি প্রবন্ধ।

(৯) 'বাংলার রেনেসাঁস'—১৯৫৬-এর জুলাই-এ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া ছ-টি বক্তৃতার সংকলন (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, ১৯৫৬)।

(১০) 'শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর' (১৯৫৭-এর ডিসেম্বর-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া 'শরৎস্মৃতি' বক্তৃতা-মালার গ্রন্থরূপ, ১৯৬১)। সাহিত্যিকের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে তিনি লিখেছিলেন দুটি গ্রন্থ (১) 'কবিগুরু গ্যেটে' ১ম ও ২য় খণ্ড (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, ১৯৪৬) (২) 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' ১ম খণ্ড (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, ১৯৬২) ২য় খণ্ড (১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, ১৯৬৯)।

এছাড়া আছে 'হজরত মোহম্মদ ও ইসলাম' নামে একটি গ্রন্থ (১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, ১৯৬৬)। এ গ্রন্থে মোহম্মদ-এর জীবনী ও ইসলাম ধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংকলিত হয়েছে।

২.২ প্রবন্ধ বিশেষত্ব

সমকালে আবদুল ওদুদের প্রবন্ধ বাঙালির চিন্তাজগতে জাগিয়েছিল আলোড়ন। তিনি ছিলেন যুক্তিমনস্ক মননশীল প্রবন্ধ রচয়িতা। তাঁর বিশ্লেষণ ছিল নিরপেক্ষ যদিও তিনি ছিলেন স্বধর্মনিষ্ঠ। তাঁর স্বজাতিপ্রীতিও ছিল গভীর। তাঁর কাম্য ছিল বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন অথচ হৃদয়বান মানবসত্তার জাগরণ। মানুষের চেতনা পরিবর্তনের দ্বারা সমাজ ও দেশকে

ত্রুটিমুক্ত করা ছিল তাঁর স্বপ্ন। সমাজের কোনো অংশকে দূরে রেখে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়—এ সত্য তিনি বুঝেছিলেন।

মানবতায় গভীর বিশ্বাসী, বুদ্ধির মুক্তিতে আস্থাশীল ওদুদ চাইতেন অন্ধ সংস্কার এবং মূঢ় জাতীয়তার সম্মোহন থেকে বাঙালির মুক্তি।

ধর্ম আর সমাজ-সংস্কার সম্পর্কিত চিন্তাই ছিল তাঁর বেশির ভাগ প্রবন্ধের বিষয়। তিনি বুঝেছিলেন বাঙালির উন্নতির সর্বাধিক বাধা প্রচলিত ধর্মের প্রতি অনুরক্তি আর জাতিগত বিদ্বেষ। তাই তাঁর রচনায় ধর্ম বিষয়ক নিয়ম আর হিন্দু-মুসলিম বিরোধ প্রধান ভূমিকা নিয়েছে।

স্বধর্মে গভীর আস্থাশীল হলেও ধর্ম সম্পর্কে কোনো মোহ ছিল না তাঁর। তাই তিনি লিখতে পেরেছেন ধর্মের মোহ বাঙালি মুসলমানের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। 'মহাপুরুষ সর্বজ্ঞ নন মানুষের জীবনে বড় বন্ধু মাত্র'—কাজেই তাঁর কথা বা চিন্তাকে চিরন্তন মনে করা আসলে তাঁর সাধনাকে অপমান করা। এবং এটাই মানুষের বিভ্রান্তির কারণ। একথা বলেছেন তিনি 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধে। তিনি আরও বলেছেন 'যুক্তি বিচার যতই অপূর্ণাঙ্গ হোক, জীবনপথে বাস্তবিকই এ যে মানুষের অতি বড় সহায়। এর সাহায্যের অভাব ঘটলে পূর্বানুবর্তিতা পাষাণ ভারের মতনই মানুষের জীবনের উপরে চেপে বসে, দেখতে দেখতে তার সমস্ত চিন্তা ও কর্মপ্রবাহ শুষ্ক ও জীর্ণ হয়ে আসে।' ('সম্মোহিত মুসলমান')

ওদুদের ধর্মনিষ্ঠার প্রমাণ তাঁর আল্লাহ্-এ বিশ্বাস। তবে তাঁর কাছে "আল্লাহ.....জীবনের এক অন্তহীন অগ্রগতির তাগিদ।" তাঁর ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ এই বিশ্বাসের আলোকেই ভাস্বর।

'হিন্দু মুসলমানের বিরোধ' বক্তৃতামালায় তিনি নিরপেক্ষভাবে বিচার করেছেন হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধের কারণ। যুক্তি দিয়ে এ বিরোধের সমাধানের পথ খুঁজেছেন তিনি। রাজনীতিকে তিনি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করতে চাননি।

সমকালের জাতিবিদ্বেষের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ ওদুদের মতকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

'বাংলার রেনেসাঁস' প্রবন্ধে তাঁর চিন্তার বলিষ্ঠ প্রকাশ লক্ষণীয়। নবজাগরণের প্রেক্ষিত এবং প্রকৃতি তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে।

ওদুদের সাহিত্যচিন্তার প্রকাশরূপ গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুল সম্পর্কিত প্রবন্ধসমূহ। তবে পরবর্তী সাহিত্যধারাকেও তিনি অস্বীকার করেননি।

কাজী আবদুল ওদুদের প্রবন্ধের ভিত্তি মুক্ত বুদ্ধির প্রকাশ। চিন্তার স্বাধীনতা তিনি স্বীকার করেছেন। সামাজিক ও ধর্মীয় বাধাবিহীন স্বপ্রকাশে উজ্জ্বল মানবতার সন্ধান প্রয়াসেই ওদুদের প্রবন্ধসম্ভার হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট।

২.৩ পাঠ্য প্রবন্ধ : পরিচিতি ও সারসংক্ষেপ

মুক্ত মননের অধিকারী প্রাবন্ধিক কাজী আবদুল ওদুদ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ছ-টি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তথ্যনির্ভর, যুক্তিপ্রধান, বিশ্লেষণধর্মী এই বক্তৃতামালার বিষয় ছিল উনিশ শতকে বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণ। বক্তৃতামালার কোনো শিরোনাম ছিল না। প্রতিটি বক্তৃতা ক্রমানুযায়ী সংখ্যাশীর্ষক-সমেত মুদ্রিত হয় ওই বছরেই।

প্রথম বক্তৃতার বিষয় ছিল নবজাগরণের অগ্রদূত রামমোহনের জীবন ও কর্মের বিশ্লেষণ।

মধ্যযুগের শেষভাগে পশ্চিম ইউরোপ-এর ফ্রান্স, ইতালি, ইংল্যান্ড, জার্মানি ও আরও কয়েকটি দেশে মানুষের মনে আর জীবনাচরণে দেখা দেয় ব্যাপক এক পরিবর্তন। চতুর্দশ শতক থেকে যোড়শ শতক বা আরও সংক্ষেপে ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চলেছিল এই পরিবর্তন। এরই সাধারণ নাম নবজাগরণ বা রেনেসাঁস। নবজাগরণের তিনটি লক্ষণ (১) পুরোনো জ্ঞানসাধনা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সাগ্রহ সচেতনতা, (২) জীবনকে আনন্দ-উৎস হিসেবে গ্রহণ করা; (৩) ধর্ম এবং জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে নতুন চিন্তন।

নবজাগরণের পরিসর ছিল ব্যাপ্ত এবং এর ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। ইউরোপ তথা পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে মধ্য যুগের অন্ধকার অপসৃত করে আধুনিক করে তুলেছিল নবজাগরণ।

উনিশ শতকে বাংলায় হয়েছিল এমনই এক দূরপ্রসারী প্রভাবযুক্ত নবজাগরণ। ধর্ম, সংস্কৃতি সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি—সর্বক্ষেত্রে আধুনিক ভারতের পরিবর্তনের উৎসে কাজ করেছে এই জাগরণ। নবজাগরণের বা রেনেসাঁস-এর সর্বোন্নত প্রকাশ বিশ শতকের প্রথম দশকের স্বদেশি আন্দোলন। তারপরে সন্ত্রাসবাদ, শাসকশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষজাত পরিস্থিতি রেনেসাঁস-এর সুফলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বাংলায় নবজাগরণের সূচনা সম্বন্ধে আছে মতভেদ। পরলোক থেকে যখন মানুষ ইহলোকের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিল তখনই রেনেসাঁস-এর সূচনা, এ ধারণা বশে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদকে নবজাগরণের উদ্গাতা মনে করেন অনেক মনীষী। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যের মানবিকতার মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থার প্রভাবই প্রবল। তা ভিন্ন এরূপ মানবিকতা মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যেও দেখা যায়। রামপ্রসাদের জীবনবোধ এবং সাধনা ছিল আসলে মধ্যযুগের এবং জীবনবিমুখ। বাংলার রেনেসাঁস একান্তভাবে জীবনমুখী।

বাংলায় ইংরেজশাসন ও যন্ত্রযুগের শুরুকে রেনেসাঁস-এর উৎস বলা যায় না। কারণ ভারতের অন্যান্য স্থানেও ইংরেজশাসন ও যন্ত্রযুগ শুরু হয়েছিল। কিন্তু রেনেসাঁস সে সব স্থানে সংঘটিত হয়নি।

১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনও রেনেসাঁস শুরু হওয়ার কারণ নয়। কারণ এ কলেজ তৈরি হয় ব্রিটিশ শাসকদের এদেশের ভাষায় শিক্ষিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। বাংলা গদ্যের সূচনায় এ কলেজের কিছুটা ঐতিহাসিক মূল্য থাকলেও বাংলা সাহিত্যকে তা তেমন প্রভাবিত করতে পারেনি।

রেনেসাঁস প্রধানত কোনো জাতির চেতনার জাগরণ। বস্তুগত বিকাশ তার আনুষঙ্গিক ক্রিয়া মাত্র।

বাংলায় রেনেসাঁস-এর সূচনা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) কলকাতায় বাস এবং তাঁর 'বেদান্ত' গ্রন্থ ও তার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ থেকে। সময় ছিল ১৮১৫ থেকে ১৮১৬। এর আগে অবশ্য রামমোহনের মূল্যবান আরবি-পারসি ভাষায় রচিত পুস্তিকা 'তুহ্‌ফাতুল্ মুওহ্‌হিদীন' ('একেশ্বরবাদীদের জন্য উপহার') মুদ্রিত হয়েছিল। বইটি নিয়ে কিছুটা বাদ-প্রতিবাদ হয়। কিন্তু এটি নিতান্ত সাময়িক ঘটনা। তাঁর 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ রেনেসাঁস-এর উৎস। কারণ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকের মনে এ গ্রন্থ জাগায় নতুন চেতনা। ভারত এবং বহির্ভারতের মনীষীদের মধ্যে পুরোনো ভারতের পরিচয় বিস্তৃত হয়।

'বেদান্তগ্রন্থ' ধর্ম-সংস্কার ভিত্তিক গ্রন্থ। কিন্তু রামমোহন ধর্ম বলতে বুঝেছিলেন জীবনের উৎকর্ষসাধন—বিধিবিধান-নির্ভরতা বা পরকাল-সর্বস্বতা নয়।

১৭৭২-এর মে মাসে হুগলি জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগরের নিকটস্থ রাধানগর গ্রামে পুরোনো জমিদার পরিবারে রামমোহনের জন্ম। অল্প বয়সেই তাঁর প্রতিভা ও ধর্মপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালের রীতি অনুযায়ী আরবি-পারসি ভাষায় তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। মূল কোরআন এবং আরবি-পারসি সাহিত্য পাঠের ফলে তিনি

একেশ্বরবাদ, যুক্তিনির্ভরতা এবং উদার মানবতা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। পাটনা-প্রত্যাগত রামমোহন আরবি-পারসি ভাষায় রচনা করেন 'মনাজেরাতুল আদিয়ান' ('বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ে আলোচনা')। তাঁর প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কার-বিরোধী মতে পিতা অসন্তুষ্ট হওয়ায় পনেরো বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং তিব্বত পর্যন্ত যান। তিন বছর পরে প্রত্যাগত তাঁকে পিতা গ্রহণ করেন। এবার রামমোহন কাশী গিয়ে হিন্দু শাস্ত্র চর্চা করেন। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাপ্ত পৈতৃক সম্পত্তি এবং পিতার মৃত্যুর পর ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি তাঁকে ঐশ্বর্যশালী করে। চাকরিসূত্রে জন ডিগবির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। এই বন্ধুত্ব তাঁকে ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য এবং সমকালের ইউরোপের রাজনীতি সম্পর্কে অবহিত করে। ডিগবির দেওয়ান হিসেবে নানা স্থানে বিশেষত রংপুরে কাজ করার সময় বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হয় তারই ফল 'তুহফাত' (১৮১১)। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের সূচনায় রামমোহন কলকাতায় আসেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সম্পদ বলে বলীয়ান তিনি কলকাতার পদস্থ সমাজে সহজেই স্থান করে নেন। তারপর একেশ্বরবাদ ও যুক্তিবাদ সম্পর্কে বন্ধুদের অবহিত করার জন্য তিনি স্থাপন করেন 'আত্মীয়সভা'; মুদ্রিত হয় তাঁর 'বেদান্ত গ্রন্থ', 'বেদান্ত সার' ও কয়েকটি উপনিষদ এবং সেগুলির ইংরেজি অনুবাদ। কলকাতার শিক্ষিত ধনী সমাজে গ্রন্থগুলি আলোড়ন জাগায়।

ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী এবং প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র কলকাতায় তখন কিছু মানুষ হয়ে উঠেছিল উচ্ছৃঙ্খল ও বিলাসী। জীবনের প্রধান দায়িত্ব সম্বন্ধে অচেতন এই মানুষগুলি সাধারণ মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিল আদর্শ। রামমোহনের শাস্ত্রবিচার ভিত্তিক একেশ্বরবাদ তাদের আঘাত করে। কারণ তিনি বেদান্ত মতে বিচার করে একেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠতা এবং পৌত্তলিকতার হীনতা প্রমাণ করেন। তার সঙ্গে সমকালের ধর্মভিত্তিক আচরণের অসারতাও তিনি প্রমাণ করেছিলেন।

রামমোহন স্বীয় মতানুবর্তী কয়েকজন বন্ধু লাভ করলেও তাঁর বিরোধীপক্ষ ছিলেন প্রবল। বিরোধীপক্ষের কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত রামমোহনের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় বিতর্কে অবতীর্ণ হন। গতানুগতিক চিন্তাধারার বাহক এইসব পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত জজ-পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর বিতর্কের বিষয় লিপিবদ্ধ হয়েছে 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' গ্রন্থে। ভট্টাচার্যের কাছে ধর্ম কেবল বিধিবদ্ধ পদ্ধতির অনুসরণ এবং মন্ত্রপ্রয়োগে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পন্থা। আর রামমোহনের মতে ধর্ম মানুষের নৈতিক বা আত্মিক সমুন্নতির কারণ। মাদ্রাজের (বর্তমান চেন্নাই) সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সঙ্গেও রামমোহনের শাস্ত্রবিচার হয়। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী প্রমাণ করতে চান বেদ জ্ঞান ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। রামমোহন প্রমাণ করেন বেদে অনেক অব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞানীর উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের বেদে অধিকার নেই; অতএব এঁদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ প্রমাণ করে বেদপাঠ ভিন্ন বিশ্বসৃষ্টিকৌশল সম্বন্ধে চিন্তন দ্বারাও বিশ্বকর্তা পরমেশ্বর সম্বন্ধে স্থির ধারণা লাভ করা যায়।

রামমোহনের রচনার সাহিত্যগুণও ছিল। তাঁর ব্যঙ্গ ছিল মার্জিত ও তীক্ষ্ণ।

১৮১৫ থেকে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর-এর মধ্যভাগ—এই ষোলো বছর রামমোহন সংস্কারক হিসেবে বহু ধরনের কাজ করেন এবং বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় অনেক পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন। হিন্দিতেও তিনি কয়েকটি বই লিখেছিলেন।

বাঙালিদের ইংরেজি শেখার ভালো প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়ে প্রথম আলোচনা করেন রামমোহন ও তাঁর বন্ধুবর্গ। কিন্তু দেশীয় প্রধান ব্যক্তিগণও এব্যাপারে রামমোহনের সংযোগের প্রতিবাদে সরে যেতে চান। রামমোহনের কাম্য ছিল বাঙালিদের জন্য উত্তম একটি ইংরেজি বিদ্যালয়। তাই তিনি সরে আসেন সে উদ্যোগ থেকে। ১৮১৭

খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয় হিন্দু কলেজ। রামমোহন আপন অর্থে একটি অবৈতনিক ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন—সেখানে বাংলা ভাষা চর্চার ব্যবস্থাও ছিল।

রামমোহন ধর্ম সম্পর্কে সর্ব প্রকার সংস্কার মুক্ত ছিলেন। তাই খ্রিস্টধর্মের ত্রিত্ব, জিশুর রক্তমাংস ইত্যাদি দুর্বোধ্য তত্ত্ব থেকে মুক্ত নীতি-উপদেশ নিয়ে তিনি রচনা করেন 'Precepts of Jesus–the guide to Peace and happiness' (১৮২০)। শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ এর প্রতিবাদে বলেন দুর্বোধ্য তত্ত্বই খ্রিস্টধর্মের বিশেষত্ব। রামমোহন মূল হিব্রু ও গ্রিক বাইবেল থেকে প্রমাণ দিয়ে তাঁদের আপত্তি খন্ডন করেন।

রামমোহন ধর্মের ব্যাপারে সুনীতি, লোকহিত ইত্যাদিকেই বেশি মূল্য দিতেন। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান—তিন ধর্ম সম্পর্কে আলোচনার পর তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল বিশ্বস্রষ্টার চিরন্তন অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষ স্বভাবগতভাবে চিন্তা করে; কিন্তু উপাসনা পদ্ধতিতে আছে প্রভেদ। সব ধর্মের মধ্যেই আছে ভ্রান্তি। অবতার, পয়গম্বর ইত্যাদির অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস এবং তাঁকে ঈশ্বরের মধ্যবর্তী ভাবা ভুল। মানুষের যথার্থ ধর্ম জগৎ-স্রষ্টা ও পালয়িতার সন্ধান করা এবং নীতি পালন করা। প্রকৃতিই মানুষকে দিতে পারে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের সন্ধান।

'তুহফাত'-এ প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রের কথা অস্বীকার করা হয়নি। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র চর্চার সময় রামমোহনের চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয়। তিনি শাস্ত্রকে প্রামাণ্য রূপে অবলম্ভবন করে ধর্মপথ বা কল্যাণপথের সন্ধান করেন। অনেকে বলেন 'তুহফাত' রচনার সময় পর্যন্ত তাঁর ধর্মমত ছিল শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিনির্ভর। পরে তিনি শাস্ত্রাশ্রয়ী যুক্তিবাদ অবলম্বন করেন। কিন্তু ধারণাটি ভুল। কারণ যুক্তি ও শাস্ত্র—উভয়ের সাহায্য গ্রহণের কথা রামমোহন বলেছেন, কখনও তিনি বলেছেন কেবল যুক্তিনির্ভরতার কথা। কিন্তু কেবলমাত্র শাস্ত্রনির্ভরতার কথা তিনি কোনো ধর্মশাস্ত্র আলোচনা কালেই বলেননি। হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা সময়ে শাস্ত্রনির্ভর যুক্তিবাদের কথা বললেও পরে তিনি আবার শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদের কথাই বলেছেন; লর্ড আমহার্স্টকে লেখা পত্র এবং ব্রাহ্ম সমাজের ট্রাস্ট ডিড তার প্রমাণ। এই ডিড-এ পরমেশ্বরকে জগতের স্রষ্টা ও পালক হিসেবে স্মরণ, মানুষের মনুষ্যত্ববাচক গুণ সমূহের উৎকর্ষসাধন ও পরস্পরের হিতসাধনের কথা বলা হয়েছে। কোনো বিশেষ শাস্ত্র বা মধ্যবর্তীর কথা সেখানে নেই।

লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত পত্র দেশের পক্ষে এবং রামমোহনের পক্ষে একটি বড়ো ঘটনা।

উনিশ শতকের সূচনায় ইংরেজ সরকার দেখেছিলেন দেশে মিথ্যা সাক্ষ্য, জালিয়াতি প্রভৃতি দুর্নীতির আধিক্য শাসনকার্যকে বিঘ্নিত করছে; হিন্দু-মুসলিম কোনো সম্প্রদায়েই নীতিশিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দের ৬ মার্চ লর্ড মিন্টো তাঁর 'মিনিট'-এ লেখেন এজন্য দরকার দেশের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স এক লক্ষ টাকা দেশীয় সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন, পুনরুজ্জীবন এবং বিদ্বন্মণ্ডলীর উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট করেন। ১৮২৩-এ ড. হোরেস হেম্যান উইলসন (Horace Hayman Wilson : ১৭৬৬-১৮৬০) এবং কয়েকজন প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদদের নিয়ে গঠিত হয় এ জেনারেল কমিটি অব ইন্সট্রাকশন (A General Committee of Instruction)। এঁদের মন্ত্রণায় লর্ড আমহার্স্ট ঠিক করেন কলকাতায় সংস্কৃত তথা প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে একটি কলেজ যেখানে কিছু বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকবে। সংস্কৃতের পরিবর্তে যাতে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয় এ মর্মে রামমোহন একটি চিঠি লেখেন লর্ড আমহার্স্টকে। কারণ "....সরকার চাচ্ছেন এদেশের লোকের মানসিক উন্নতি, সেজন্য প্রয়োজন হচ্ছে গণিত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, শরীরবিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের চর্চার সুব্যবস্থা করা ..."। চিঠিটির উত্তর সরকার দেননি। তবে নথিতে এ বিষয়ে মন্তব্য করা হয়—রামমোহন সরকারের উদ্দেশ্য ভুল বুঝেছেন এবং তাঁর মত দেশের লোকমত নয়। পরে অবশ্য সরকার পাশ্চাত্যবিদ্যা শেখানোর দিকেই জোর দেয়।

রামমোহনের শিক্ষানীতিতে পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম শিক্ষা, ভারতীয় দর্শনের চর্চা এবং মাতৃভাষা চর্চার দিকটিও উপেক্ষিত হয়নি। যদিও বহু আলোচিত উক্ত চিঠিটিতে তিনি পাশ্চাত্যবিদ্যা চর্চার দিকেই জোর দেন। কারণ এদেশের মানুষের ঝোঁক ছিল বাস্তব জ্ঞানহীন পরমার্থ চর্চার দিকে। রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল দেশের এই ত্রুটি দূর করা। তিনি যখন এ চিঠি লেখেন তখন ইংল্যান্ড-এ বিজ্ঞান শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল না। এর তেরো বছর পরে সে দেশে কলেজ অফ কেমিস্ট্রি স্থাপিত হয়। সাঁইত্রিশ বছর পরে লন্ডন ইউনিভার্সিটি-তে ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স খোলা হয় আর ছেচল্লিশ বছর পর অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ-এ বিজ্ঞান-অধ্যাপনা রীতিমতো শুরু হয়।

এ সময়ে রামমোহনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে আছে একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি সংবাদপত্র পরিচালনা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা। এ বিষয়ে রামমোহনের আবেদন শাসকপক্ষ উপেক্ষা করে। এর অনেক পরে ১৮৩৫-এ লর্ড মেটকাফ-এর প্রয়াসে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

খ্রিস্টীয় শাস্ত্র আলোচনা কালে রামমোহন ব্যাপটিস্ট পাদরি উইলিয়ম অ্যাডাম-কে বন্ধু রূপে পান। ইনি রামমোহনের সঙ্গে আলোচনার ফলে ত্রি-তত্ত্ব ত্যাগ করে খ্রিস্টীয় একত্বে বিশ্বাসী হন। ফলে এ দেশের খ্রিস্টান সমাজে বিশেষ আলোড়ন জেগেছিল।

অ্যাডাম-এর সহায়তায় রামমোহন স্থাপন করেন একত্ববাদী একটি প্রার্থনা সমাজ। প্রয়াসটি ফলপ্রসূ হয়নি। কয়েকজন বাঙালি বন্ধু মতান্তরে অ্যাডাম-এর সহায়তায় ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট রামমোহন স্থাপন করেন ব্রাহ্ম সমাজ। এদেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে রামমোহন স্থাপিত ব্রাহ্ম সমাজের মূল্যবান ব্যাপ্ত ভূমিকা অবশ্য স্বীকার্য। ক্রমশ ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতি হয়। ১৮৩০-এর প্রথমে ব্রাহ্ম সমাজের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয় এবং এ সম্বন্ধে সুখ্যাত 'ট্রাস্ট ডিড অফ দ্য ব্রাহ্ম সমাজ' ('Trust Deed of the Brahma Samaj') রচিত হয়। ব্রাহ্ম সমাজের ক্রমোন্নতি দর্শনে সংস্কার-বিরোধী দল একই বছরে গঠন করে ধর্মসমাজ। সতীদাহ রোধ সংক্রান্ত আইন নাকচ করা এ সমাজ গঠনের অন্যতম কারণ।

সতীদাহ রোধের কথা কোনো কোনো মুসলিম শাসকও ভেবেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাবে ইংরেজ সরকার সতীপ্রথার নৃশংসতা সম্পর্কে সচেতন হন। কতিপয় খ্রিস্টান যাজকও এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ধর্মাচারে আঘাত জনসাধারণকে শাসনবিরোধী করে তুলবে—এ আশঙ্কায় সতীপ্রথার বিপক্ষে সরকার কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি। ১৮০৫-এ জজ-পণ্ডিতগণ বলেন সতীপ্রথা আবশ্যিক ধর্মাচার নয় এবং এবিষয়ে বলপ্রয়োগ সমর্থন করা যায় না। ক্রমে সরকার নিয়ম করেন বলপ্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পুলিশী তদন্তের পরই সতীদাহ করা যাবে। সতীপ্রথার সমর্থক সনাতনীগণ এরূপ নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে দরখাস্ত করে। এই প্রেক্ষিতে রামমোহন রচনা করেন 'সহমরণ বিষয়ক' দুটি প্রস্তাব। পুস্তিকা দুটি রামমোহনের সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন।

সহৃদয়তার সঙ্গে রামমোহন এদেশের অবহেলিত অত্যাচারিত মেয়েদের কথা ভেবেছেন এবং যুক্তিপূর্ণ ভাষায় তা উপস্থাপিত করেছেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন সতীদাহ অনাবশ্যক—বিধবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম ব্রহ্মচর্য।

রামমোহনের পূর্বে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯) বলেছিলেন সতীদাহ অবশ্যকর্তব্য নয়। তিনি মত প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু করেননি। কাজেই তিনি যে এ প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন—এ মত সত্য নয়। ১৮২৯-এর ৪ ডিসেম্বর সতীদাহ রোধ আইন পাস করেন লর্ড বেন্টিক (Lord Willam Cavendish Bentink : ১৭৭৪-১৮০৯)। তার ফলে সতীপ্রথা বন্ধ হয়। অনেকে এজন্য লর্ড বেন্টিককে সতীদাহ বন্ধ করার

কৃতিত্ব দিতে চান। কিন্তু তিনি তাঁর ‘মিনিট’ (Minute)-এ লিখেছেন জনমত পক্ষে ছিল বলেই তিনি সতীপ্রথা রদ বিষয়ে আইন প্রণয়নে সাহসী হন। জনমত গঠনের পক্ষে যে রামমোহন রায়ের বাংলা ও ইংরেজি রচনার মনুষ্যত্ব ও বিচারবুদ্ধি উদ্দীপক আবেদন কাজ করেছে তা অনস্বীকার্য।

রামমোহন বেন্টিঙ্ককে সতীপ্রথা রহিত সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের পরামর্শ প্রদান করেননি। কারণ তিনিও ভেবেছিলেন তাহলে হিন্দুরা ব্রিটিশ শাসকদের ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হবে। তবে আইন পাস হওয়ার পর তিনি বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন জানান। তাঁর ইংল্যান্ড যাত্রার অন্যতম কারণ সতীরোধক আইন বহাল রাখার প্রয়াস। কয়েকজন শিক্ষিত ইংরেজ (যথা ড. হোরেস হেম্যান উইলসন) সতী প্রথা বিষয়ে সনাতনীদের পক্ষে ছিলেন। প্রিভি কাউন্সিল সনাতনীদের যুক্তি অগ্রাহ্য করেন এই যুক্তিতে যে সমকালের বহু শ্রেষ্ঠ হিন্দু প্রথাটিকে পাপ মনে করেন।

হিন্দু মেয়েদের দায়াধিকার অর্থাৎ সম্পত্তিতে অধিকার পুরোনো শাস্ত্রে স্বীকৃত হলেও সমাজে অপ্রচলিত ছিল। রামমোহন তা পুনরায় প্রচলনের চেষ্টা করেন।

তিনি যে শৈব বিবাহের সমর্থক ছিলেন তা অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা বিবাহ স্বীকার করে।

রামমোহনের সমকালে দেশে ও বিদেশে তাঁর চিন্তাধারার প্রভাব পড়েছিল। ১৮১৭-এর ডিসেম্বর-এ ‘ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল’ (‘Calcutta Monthly Journal’)-এ মুদ্রিত হয় শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গোঁসাই রাধামোহন ভট্টাচার্যের মৃত্যুকালে প্রকাশ্যে বেদান্ত ও একমাত্র ব্রহ্মে আস্থা জ্ঞাপনের সংবাদ। এ ছাড়া ১৮৩১-এর ফেব্রুয়ারিতে কলকাতার কাছে নানা ধর্মের পাঁচশো লোকের এক পঙ্‌ক্তিভোজ হয়। সে ভোজসভায় পণ্ডিত গীতা, মুসলমান কোরআন ও পাদরি বাইবেল পড়েছিলেন। ১৮১৬ খিস্টাব্দে আমেরিকা পর্যন্ত রামমোহনের খ্যাতি বিস্তৃত হয়। অনেকে মনে করেন সে দেশের ট্রানসেনডেন্টিয়ালিজম (Transcendentalism) বা ব্রহ্মবাদের উপর রামমোহনের প্রভাব পড়েছিল।

রামমোহনের কলকাতা আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপ-এর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে ইউরোপীয় বিদ্যার চর্চা। কিন্তু বিবিধ কারণে তা সম্ভব হয়নি। তারপরে তাঁর বড়ো ছেলের বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপের একটি মোকদ্দমা করা হয়—যার কারণ ছিল রামমোহনের মতবাদের বিরোধিতা করা। কয়েকজন দেশীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং কোনো কোনো পদস্থ ইংরেজ এ ব্যাপারে যুক্ত ছিলেন। দু বছর পরে মোকদ্দমার শেষে রামমোহন-পুত্র নির্দোষ প্রমাণিত হন। এরপর রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন ১৮৩০-এর ১৫ নভেম্বর যখন সমুদ্রযাত্রা ছিল হিন্দুদের পক্ষে নিষিদ্ধ। রামমোহনের বিলাত যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সতীদাহ রোধ আইনের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিল-এ করা দরখাস্তের বিরোধিতা এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মেয়াদ শেষে ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থায় ভারতের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা। এছাড়া সম্রাটের কাছে দরবার করার দায়িত্বও তিনি নিয়েছিলেন। স্বাধীনতাপ্রিয় রামমোহন যাত্রাপথে উত্তমাশা অন্তরীপে ফরাসি জাহাজের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা চিহ্নিত পতাকাকে অভিবাদন করেন। তাঁর স্বাধীনতা প্রিয়তার আর একটি প্রমাণ স্পেন-এর স্বাধীনতালাভে নিজ ব্যয়ে ভোজসভার আয়োজন আর নেপলস-এর পরাধীনতার অবসান না হওয়ায় বন্ধুর কাছে লেখা চিঠিতে বেদনা প্রকাশ।

১৮৩১-এর ৮ এপ্রিল রামমোহন বিলাত পৌঁছোন। এখানে তিনি সতীদাহ-সমর্থকদের চেষ্টা বিফল করেন এবং পার্লামেন্ট-এর এক কমিটিকে ভারতের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বীয় সুচিন্তিত অভিমত জানান। তাঁর বিলাত গমনের পরোক্ষ ফল—অসাধারণ জ্ঞানী রামমোহনের সংস্পর্শে ইংল্যান্ড-এর সাধারণ মানুষ ও সুধীবৃন্দের মনে অধীন ভারতের ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধার জাগরণ।

রামমোহন ইংল্যান্ড-এর পার্লামেন্ট কমিটির নিকট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ ও গুণ বিশ্লেষণ করে তার ত্রুটি সংশোধনের পথও নির্দেশ করেন। তাঁর মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ লাভবান হয়েছে। কারণ তারা

পূর্বে পেত আদায় করা রাজস্বের শতকরা দশ ভাগ, এখন পায় কুড়ি থেকে তিরিশ ভাগ। কিন্তু প্রজার দেয় খাজনা বেড়েছে। সরকারের উচিত প্রজার খাজনা বৃদ্ধি না করার ব্যবস্থা করা। সেজন্য জমিদারদের দেয় রাজস্ব কমানো সংগত। বিলাস-দ্রব্যের উপর ট্যাক্স বসিয়ে সরকার এ ক্ষতি পূরণ করতে পারেন। তিনি দেশের মানুষদের নিয়ে ভারতের জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠনের কথাও বলেন।

রামমোহনের এই বক্তব্যের মুদ্রিত রূপ ভারতে পৌঁছোলে দেখা দেয় মিশ্র প্রতিক্রিয়া। অনেকে বলেন এর ফল ভারতের পক্ষে ভালো হবে। আবার সংস্কারবিরোধী দলের মুখপত্র 'সংবাদচন্দ্রিকা' বলে রামমোহন জমিদারদের দুঃখের দিকটি উপেক্ষা করেছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধী ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল ইংরেজদের কাগজ 'বেঙ্গাল হরকরা' মন্তব্য করে রামমোহন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে খাতির করে কথা বলেছেন। কোম্পানির আইনের সুযোগে জমিদারগণ প্রজাদের উপর যে অত্যাচার চালায় তা আরও স্পষ্ট করে বলাই তাঁর পক্ষে উপযুক্ত কাজ হত।

রামমোহন কেন কোম্পানির সমালোচনা করেননি তা জানা যায় তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী উইলিয়ম অ্যাডাম-এর বস্টন-এ দেওয়া ১৮৩৮ সালের বক্তৃতা থেকে। তিনি বলেন রামমোহন দেখেছিলেন ইংরেজ-শাসনব্যবস্থায় ত্রুটি সত্ত্বেও আছে কিছু উত্তম গুণ। দেশীয় কোনো শাসন প্রণালীতে তা নেই। তাই তিনি চেয়েছিলেন এ ব্যবস্থার সংস্কার। ভারতের মানুষ ধর্মনীতি আর উন্নত শিক্ষার বিস্তৃতির দ্বারা আরও অধিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগের যোগ্যতা লাভ করুক—এটাই ছিল রামমোহনের কাম্য। তিনি বলেছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট রিফর্ম বিল পাস না করলে তিনি আমেরিকায় চলে যাবেন। এটি তাঁর গভীর দেশপ্রীতির প্রমাণ। তাঁর বিশ্বাস ছিল ভারতবর্ষ শীঘ্রই স্বাধীন হবে।

রামমোহন সাধারণ মানুষের দুর্দশা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তা দূর করার জন্য তিনি বিপ্লবের পরিবর্তে অশ্রান্ত প্রয়াসের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা কিন্তু ছিল বিপ্লবী। একটি ভাবধারা বা জীবনধারার অবসানে আসছে নতুন এক যুগ—এবিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। কিন্তু নবযুগের রূপায়ণের জন্য তিনি খুব কম কাজই করতে পেরেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য প্রায়শ সিদ্ধ হয়নি। যেমন ব্রাহ্ম সমাজ-এর ট্রাস্ট ডিড অনুসারে তিনি এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের সভ্য মার্জিত ব্যক্তিদের ধর্মীয় মিলনকেন্দ্র স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষ প্রীতিবশত পরস্পরের মঙ্গলসাধনে যত্নশীল হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন দুটি কক্ষ বিশিষ্ট একটি গৃহ। এক কক্ষে প্রাচীন রীতিতে অব্রাহ্মণের প্রবেশ রোধ করে বেদ পাঠের ব্যবস্থা আছে। অন্য কক্ষে মূলত হিন্দু শাস্ত্র থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যার সঙ্গো গাওয়া হয় কিছু ধর্মসংগীত। অবশ্য এখানে সকল ধর্মের শিক্ষিত ভদ্রজনের প্রবেশাধিকার ছিল।

এই অসাফল্যের কারণ তাঁর যুগান্তকারী ভাবনা ও আদর্শ গ্রহণে দেশের মানুষের অক্ষমতা। তথাপি সম্ভাবনাপূর্ণ চিন্তনের আংশিক রূপায়ণ-সামর্থ্যের জন্যই তাঁর প্রশংসা করা উচিত।

ব্যক্তিস্বাধীনতায় দৃঢ় বিশ্বাসী রামমোহন আপন সন্তানদের তাঁর ধর্মের অনুবর্তী করার চেষ্টা করেননি। প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রেরা স্বেচ্ছায় পিতৃধর্ম গ্রহণ করেছিল।

চিন্তানায়কদের দু দলে বিভক্ত করা যায়। একদল চিন্তা ও কাজে প্রভেদ করতে অনিচ্ছুক। অন্য দল পরিচ্ছন্ন সত্যাশ্রয়ী চিন্তা এবং চিন্তার সঙ্গো কর্মের সংগতি সাধনে বিশ্বাসী হলেও কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বনের পক্ষপাতী। তাঁদের মত—ভাবনা শুরু হলে কাজও শুরু হবে। রামমোহন ছিলেন শেষোক্ত ধারার চিন্তাবিদ। বৃহৎ সম্ভাবনাপূর্ণ নতুন ভাবনা ছিল তাঁর মনে এবং তা প্রকাশের পথ খুঁজেছিল বিচিত্রভাবে। এটাই একটি ঘটনা; সময় সার্থক করে এ ঘটনাকে।

ইংল্যান্ড-এ রামমোহনের ভারতের বাজেয়াপ্ত নিষ্কর সম্পর্কে পুর্নবিচারের দাবি বিফল হয়। ছাড়পত্র সংক্রান্ত

জটিলতার জন্য তাঁর সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার জন্মভূমি ফ্রান্স দর্শনের বাসনাও সফল হয়নি। এ বিষয়ে ফ্রান্স-এর বিদেশমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে তিনি জানান শান্তিকামী নাগরিকদের বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রবেশের অধিকার হওয়া উচিত অবাধ। পরবর্তী কালের লিগ অফ নেশনস বা ইউ. এন. ও-র মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন তিনি। এ থেকে বোঝা যায় তাঁর মনে ছিল বিশ্বমানবের মৈত্রীর ভাবনা। এরূপ ভাবনা বহু চিন্তানায়ক পূর্বে করেছেন। তাঁদের ভাবনার সমন্বিত রূপ দেখা যায় রামমোহনের মধ্যে।

বেদান্ত আর সুফিদের অদ্বৈতবাদ এবং জ্ঞান ও প্রেমের সাধনা, ইউরোপীয় মনীষীদের জীবনের বিকাশ তত্ত্ব আর বস্তুনিষ্ঠ সাধনা—এইসব ভাবনা ও সাধনার সমন্বয় দেখা যায় রামমোহনের মধ্যে। বাংলার নবজাগরণের ধারায় রামমোহনের এই বিশিষ্ট সাধনা শক্তি সঞ্চার করেছিল। জাগরণ-ধারার পরবর্তী শক্তিমান সাধকদের সাধনা ও সিদ্ধির তুলনা করলে বোঝা যাবে তাঁর সাধনার বিশেষত্ব।

'বাংলার রেনেসাঁস'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাজী আবদুল ওদুদ রামমোহন পরবর্তী বাংলার নবজাগরণের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। এ অংশে আছে ডিরোজিয়ো প্রভাবিত ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) নেতৃত্বে ব্রাহ্মধর্মের পুনরুজ্জীবনের কথা। প্রসঙ্গত আছে বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহ, ব্ল্যাক অ্যাক্টস (Black Acts), বাংলার রাজনৈতিক চিন্তাধারার সূচনা আর বাংলার কৃষকদের দুর্দশার কথা। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ক্রমোৎকর্ষের কথাও বলা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

রামমোহনের জীবিতাবস্থায় ব্রাহ্মসমাজ জনসমাগমে বিশেষত ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের আগমনে ছিল উজ্জ্বল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি দেশবাসীর আকর্ষণ কমে গেল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আত্মচরিত'-এ লিখেছেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন—এই দু জনের নেতৃত্বে অতি অল্প সংখ্যক উপাসক ব্রাহ্ম সমাজে আসত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে। তারপরই ব্রাহ্ম সমাজের শ্রীবৃদ্ধির সূচনা।

রামমোহনের পরে ব্রাহ্ম সমাজের অবনতির কারণ—তাঁর অনুবর্তীগণের শ্রদ্ধা ছিল রামমোহনের প্রতি; তাঁর নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনার প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা তেমন ছিল না। তার উদাহরণ রামমোহন-অনুগামী 'রিফর্মার' ('Reformer') পত্রিকা-পরিচালক প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়িতে দেবীপূজা। তৎকালীন সংবাদপত্র 'ইন্ডিয়া গেজেট', 'সমাচার দর্পণ' তাঁর এ আচরণের সমালোচনা করে। সতীদাহ নিষিদ্ধ হওয়ায় ব্রাহ্ম সমাজের বিরুদ্ধে ধর্মসভার আন্দোলন প্রবল হয়। তখন এই সব দুর্বলমনা মানুষ ব্রাহ্ম সমাজ ত্যাগ করেন। তবে তাঁরা জনহিতকর কাজ ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম বন্ধ করেননি। এঁদের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, টাকির কালীনাথ মুন্সী, বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সী, জোড়াসাঁকোর জয়কৃষ্ণ সিংহ, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, তেলেনিপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীমোহন ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি।

রামমোহনের পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অথবা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪) ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দান—মধ্যবর্তী সময়ে রেনেসাঁস-এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিয়ো (Henry Vivian Derozio : ১৮০৯-১৮৩১)। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বা ইস্ট ইন্ডিয়ান পরিবারের সন্তান ডিরোজিয়ো তৎকালীন কলকাতার শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য-শিক্ষালয় ডেভিড ড্রামন্ড-এর ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্কটল্যান্ড-এর অধিবাসী অষ্টাদশ শতকের ফরাসি চিন্তাধারায় প্রভাবিত ড্রামন্ড প্রাচীন ও প্রচলিত বলেই কোনো কিছুকে মূল্যবান মনে করতেন না। তাঁর প্রিয় কবি ছিলেন বার্নস (Robert Burns : ১৭৫৯-১৭৯৬)। সাহিত্যপ্রতিভা-সম্পন্ন

নাস্তিক হিসেবে অভিহিত ড্রামন্ড কলকাতার ইউরোপীয় সমাজে সমাদৃত ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ডিরোজিয়ো-প্রতিভার লালন।

১৮২৬-এর শেষে ডিরোজিয়ো হিন্দু কলেজের অ্যাসিস্টান্ট মাস্টার নিযুক্ত হন। তখন তাঁর 'ফকির অফ জাঙ্গিরা' ('Fakir of Jangheera') কাব্য মুদ্রিত ও প্রশংসিত হয়েছে। ডেভিড হেয়ার, রিচার্ডসন (ক্যাপটেন ডি. এল রিচার্ডসন : ১৮০১-১৮৬৫) গ্রান্ট, পার্কার প্রমুখ গুণী ইউরোপীয়দের বন্ধু ছিলেন ডিরোজিয়ো। শীঘ্রই তিনি কলেজের 'মাস্টার অফ ইংলিশ লিটারেচার অ্যান্ড হিস্ট্রি' (Master of English Literature and History) পদে উন্নীত হন। দর্শনও তিনি পড়াতেন। মাত্র আঠারো-উনিশ বছরের যুবক ডিরোজিয়োর আশ্চর্য মনন-সমৃদ্ধিই এর কারণ। বায়রন (George Gardon Byron : ১৭৬৮-১৮২৪) প্রভাবিত হলেও প্রকৃত কবি ছিলেন ডিরোজিয়ো। কান্ট (Cante Anguste : ১৭৯৮-১৮৫৭) দর্শন সম্পর্কে তাঁর আলোচনা সমকালে প্রশংসিত হয়।

জাত-শিক্ষক ডিরোজিয়ো চাইতেন তরুণ ছাত্রদের মন হয়ে উঠুক জিজ্ঞাসু এবং সত্যানুরাগী। ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি লিখেছিলেন একটি সনেট। এই সব কারণে তিনি ছাত্রদের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ছাত্রদের গড়া অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন (সিংহবাবুদের মানিকতলার বাগানে হত এর অধিবেশন)-এর সভাপতি ছিলেন তিনি। এখানে ডিরোজিয়ো-র ছাত্রগণ রচনা পাঠ ও বিতর্ক দ্বারা স্ব স্ব প্রকাশক্ষমতাকে পুষ্ট করে তুলত। সমকালের অনেক মান্য ইংরেজ যোগ দিতেন এ সভায়। তরুণ ছাত্রদের মনে সংস্কারকের উদ্দীপনা জাগিয়েছিল হিউম (David Hume : ১৭১১-১৭৭৪)-এর সংশয়বাদ। তৎকালীন হিন্দুসমাজের তীব্র সমালোচনা করত তারা। আসলে এই যুগটি ছিল সার্বিক সংস্কারের যুগ। ইউরোপ ও কলকাতা তথা বাংলায় তা সমভাবে দেখা দেয়। সংশয়বাদ তাদের প্রচলিত হিন্দুধর্মের অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিঃসংশয় করেছিল; আর যুগ তাদের উদ্‌বোধিত করেছিল নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে। তাদের মতে ব্রাহ্মদের সংস্কার প্রয়াস ছিল আংশিক। আসলে দেশকে তারা করতে চেয়েছিল ইউরোপ। এই তরুণদের অস্থিরতা সম্পর্কে অনেকেই প্রকাশ করেছেন অবজ্ঞা। কিন্তু এদের বলিষ্ঠ আন্তরিকতাকে অস্বীকার করা যায় না।

ইয়ং বেঙ্গলদের প্রাণোচ্ছ্বাস শুধু অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন-এ প্রবন্ধ পাঠ ও উত্তেজক বক্তৃতা দেওয়াতেই সীমিত ছিল না; দৈনন্দিন জীবনেও দেখা দিয়েছিল তার প্রভাব। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ডিরোজিয়োর সঙ্গে গ্রহণ করতেন ইউরোপীয় খাদ্য। ইনি পরে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে পরিচিত হন। এই তরুণ দল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দেখলেই উচ্চস্বরে বলত গোমাংস ভোজনের কথা। বিদ্যা ও সত্যানুরাগ প্রশংসিত হলেও এদের পানাহার সম্বন্ধীয় অনাচার, দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি অশ্রদ্ধা হিন্দু সমাজপতিদের ক্ষুব্ধ করেছিল।

এই পরিস্থিতিতে জনৈক গল্পজীবী ব্রাহ্মণ বৃন্দাবন ঘোষাল কলকাতার বড়ো বড়ো বাবুদের বাড়ি ঘুরে ঘোষণা করে ডিরোজিয়ো ছেলেদের অনাচারী করে তুলেছেন। তাদের বলেছেন পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধার প্রয়োজন নেই; ভাইবোনে বিবাহ দূষণীয় নয়। ছেলেরা সাহেবের সঙ্গে খানা খায়। সাহেবের বোনের সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ আসন্ন।

শুধু এই রটনাই নয়—হিন্দু কলেজের ছাত্রদের আচরণে তাদের অভিভাবকগণও প্রায়ই অপ্রস্তুত ও সামাজিক ব্যাপারে বিপন্ন হতেন। সমকালের সংবাদপত্রে মুদ্রিত হয়েছে এরকম বহু সংবাদ। ১৮৩১-এর ১৪ মে-র 'সংবাদ প্রভাকর'-এ মুদ্রিত হয় এক ব্যক্তি পুত্র সহ কালীঘাটে গিয়েছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্র ছেলেটি দেবীকে প্রণামের পরিবর্তে 'গুড মনিং' বলে সম্ভাষণ করায় ক্রুদ্ধ পিতা জানান এই পুত্রের জন্য তাঁকে হতে হয়েছে একঘরে।

১৮৩১-এর ১৬ জুলাই 'সংবাদ প্রভাকর' হিন্দু কলেজের সদস্যদের নিকট অনুরোধ জানায় তাঁরা যেন ছাত্রদের হিন্দু জনোচিত পোশাক পরিধান ও আচার পালনের নির্দেশ দান করেন। এ বছরের মে মাসে 'সমাচার চন্দ্রিকা' সরকারের শরণ নেয় হিন্দুদের স্বধর্ম পালনে বাধ্য করার জন্য।

সংবাদপত্রে এই সব বিবরণ প্রকাশ ও অনুরোধ প্রার্থনা মুদ্রিত হবার অল্প আগে ১৮৩১-এর ১৫ এপ্রিল হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটি এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের জন্য একটি সভা আহ্বান করেন। ডেভিড হেয়ার (David Hare : ১৭৭৫-১৮৪২) আর উইলসন ডিরোজিয়োর শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রশংসা করায় তাঁর বিরুদ্ধে পড়ানোর অযোগ্যতার অভিযোগ টেকে না। তখন প্রশ্ন ওঠে হিন্দু সমাজ কি ডিরোজিয়োর অপসারণ চায়? চারজন হিন্দু সদস্য চান ডিরোজিয়োর অপসারণ। এক জন মাত্র বিরোধিতা করেন। হিন্দু সমাজের মনোভাবের প্রশ্ন ওঠায় ডেভিড ও উইলসন ভোট দেন না। ডিরোজিয়োকে অপসারিত করাই স্থির হয়।

বৃন্দাবন ঘোষালের কুৎসা রটনা ডিরোজিয়ো-র অপসারণের প্রত্যক্ষ কারণ। কেন না উইলসন একটি চিঠিতে বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহ জানিয়ে সে সম্বন্ধে ডিরোজিয়ো-র বক্তব্য জানতে চান। প্রশ্নগুলি ছিল এই—(১) ডিরোজিয়ো কি ঈশ্বরবিশ্বাসী? (২) পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করা সন্তানের নৈতিক কর্তব্য—এই কি ডিরোজিয়োর বিশ্বাস? (৩) ভাইবোনের বিবাহ তিনি পবিত্র মনে করেন কি? (৪) ছাত্রদের তিনি এবিষয়ে শিক্ষা দেন কিনা।

ডিরোজিয়ো প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বিস্তৃতভাবে জানান যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না বলেই দার্শনিকদের মতো ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁর সন্দেহ আছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করা সন্তানের কর্তব্য—একথাই তিনি বলেন। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর ছিল 'না'। চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে ডিরোজিয়ো বলেন ছাত্রদের তিনি হিউম ও অন্যান্য দার্শনিকদের দর্শন শিক্ষা দেন; তত্ত্ব ও তথ্য বিচারের ক্ষমতা যাতে তাদের মনে জাগ্রত হয় সে চেষ্টা করেন। সচেতনভাবে তিনি তাদের ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হতে শেখাননি।

যথার্থ জ্ঞানানুরাগী হৃদয়বান শিক্ষক ডিরোজিয়ো ইউরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ গ্রহণ করেছিলেন এবং ছাত্রদের আপন চিন্তনসমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা শ্রদ্ধা ও সংকোচহীন দৃঢ়তার সঙ্গে উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যে বাড়াবাড়ি দেখা দেয় তার কারণ সমকালের হিন্দু সমাজের ধর্মভিত্তিক কপটতা আর নীতিহীনতার আধিক্য। তার সঙ্গে ছিল তরুণোচিত চপলতা। এটাই ছাত্রদের অদ্ভুত আচরণের কারণ—যা ছিল নিতান্তই সাময়িক। হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সম্যক বিচার না করেই ডিরোজিয়ো-র পদচ্যুতির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ডিরোজিয়ো তার পূর্বেই পদত্যাগ করেন। কয়েক মাস পরে তাঁর মৃত্যু হয়। মধ্যবর্তী সময়ে তিনি 'ইস্ট ইন্ডিয়ান' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করে হিন্দু ও ইস্ট ইন্ডিয়ান তথা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করেন। ডিরোজিয়ো দেখতেন বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্ন। তার প্রমাণ বার্নস (Robert Burnes : ১৭৫৯-১৭৯৬)-এর কবিতা থেকে তিনি আপন পত্রে উদ্ধৃত করেন দুটি পঙ্ক্তি "... Man to man the world O'er shall brothers be and a that". ডিরোজিয়ো আগে 'পার্থেনন' ('Partheon') নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এক সংখ্যা মুদ্রিত হওয়ার পর পত্রিকাটি বের করতে দেওয়া হয়নি। প্রথম সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা, ইংরেজদের ভারতবাস, হিন্দুধর্মের কুসংস্কার, গভর্নমেন্ট বিচারালয়ে ব্যয়াধিক্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা ছিল।

সতীদাহ নিষেধ আইন পাস হওয়ার পর ডিরোজিয়ো দীর্ঘ এক কবিতায় এ আইনের পশ্চাতের উদার অতীত-অপসারী মনোভাবকে অভিনন্দিত করেন।

রামমোহন, লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এবং ডিরোজিয়ো—এই ত্রয়ীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পৃথক। কিন্তু ভারতবর্ষ তথা নতুন ভারতীয় জাতির গঠনের পিছনে এই তিন জনের মনেই ছিল স্বার্থশূন্য সক্রিয় প্রীতি।

ডিরোজিয়োর শিষ্যগণ—যাঁরা ইয়ং বেঙ্গল নামে খ্যাত তাঁদের জীবনে গুরুর জ্ঞান ও মনুষ্যত্বানুরাগ আশ্চর্য ফল দেয়। তাঁদের দেওয়া অভিনন্দনের (এপ্রিল ১৮৩১) উত্তরে ডেভিড হেয়ার জানিয়েছিলেন দেশ তাঁদের সংস্কারক ও শিক্ষাদাতা হিসেবে দেখতে চায়। ইয়ং বেঙ্গল দল সে আশা পূর্ণ করেন।

ডিরোজিয়ো-শিষ্যদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী—এই নয় জন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫) : মাতুলালয়বাসী কৃষ্ণমোহন বন্ধুদের সে বাড়িতে মাংসভক্ষণ ও 'গোমাংস' বলে চিৎকারজনিত কারণে বহিষ্কৃত হন। যদিও তিনি সে সময় বাড়িতে ছিলেন না। কৃষ্ণমোহন খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সে ধর্ম প্রসারে সচেষ্ট হন। তাঁর লেখা 'পারসিকিউটেড' ('Perisecuted') নাটকে ব্রাহ্মণ ও হিন্দুদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কলকাতা কর্পোরেশন-এর সঙ্গে যুক্ত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো কৃষ্ণমোহন নির্ভীকতা ও বিদ্যার জন্য দেশবাসীগণের শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮) : তরুণ রসিককৃষ্ণ আদালতে সাক্ষ্যদানকালে গঙ্গাজলের পবিত্রতা অস্বীকার করায় পরিজনগণের দ্বারা লাঞ্ছিত হন। পরে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির অধিকারী রসিককৃষ্ণ ছিলেন কয়েকটি ইংরেজি বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত এবং 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার অন্যতম পরিচালক। তিনি রামমোহনকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন।

রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮) : ডিরোজিয়ো-শিষ্যদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাত রামগোপাল ঘোষ সদুপায়ে ব্যবসা করে ধনী হন। বন্ধুবৎসল ও দানশীল রামগোপাল 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গাল স্পেকটেটর' পত্রিকার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন। ইংরেজি আদব-কায়দার অনুরাগী হলেও নীলকর-অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন রামগোপাল। তিনি 'ব্ল্যাক অ্যাক্টস' (১৮৪৯) আইনের ব্যাপারেও উচ্চকণ্ঠ হয়েছিলেন।

তখন কলকাতা, বোম্বাই (বর্তমান মুম্বই) ও মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই)-শহরের বাইরে ইউরোপীয়দের বিচার দেশীয় আদালতে হত না। সমকালীন ইউরোপীয়গণ কর্তৃক 'ব্ল্যাক অ্যাক্টস' নামে অভিহিত আইনে সরকারের অর্থব্যয় কমানোর জন্য প্রস্তাব করা হয় ইউরোপীয়দের বিচার সর্বত্র দেশীয় বিচারকের আদালতে হবে। কেবল প্রাণদণ্ড দেওয়ার অধিকার এ আদালতের থাকবে না।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আসেন সেকালের বিখ্যাত ইংরেজবক্তা জর্জ টমসন। রামগোপাল ঘোষ ও তাঁর বন্ধুরা পেয়েছিলেন এঁর সাহচর্য। নানা ব্যাপারে এর দ্বারা তাঁরা বিশেষ উপকৃত হন। 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপনের অন্যতম সহায়ক রামগোপাল ঘোষকে ভারতীয় রাজনীতির পথিকৃৎ মনে করা হয়। তিনি কলকাতার প্রথম বিধবা বিবাহে বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০)

তেজস্বী ও গণিতবিশেষজ্ঞ রাধানাথ শিকদারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিমালয়ের এভারেস্ট শৃঙ্গ আবিষ্কার ও উচ্চতা নির্ণয়। জরিপ বিভাগের কর্মচারী রাধানাথ উপরওয়ালা ইংরেজদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে কুণ্ঠিত হতেন না। তাঁর আর একটি বড়ো কাজ বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে চলিত ভাষায় মেয়েদের উপযোগী 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় বলা হয় ধনীমাত্রেই পুণ্যবান নয়। স্বর্গের অধিকার পুণ্যবানেরই আছে। আর সত্য-কথন, নিরভিমানতা, মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি ত্যাগ, সদ্ব্যবহার, পিতামাতার সেবা, পত্নীপ্রীতি, সন্তানদের শিক্ষা ও আচরণের প্রতি দৃষ্টি এবং পরোপকারই পুণ্যবানের লক্ষণ। শাস্ত্রজটিলতা বর্জিত প্রাত্যহিক জীবনে মানুষের কল্যাণ সাধনে নিবদ্ধমনা ডিরোজিয়ো-পন্থীদের অবলম্বিত এই বিশেষ দৃষ্টির মর্যাদা আজও কম নয়।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

সুরাপান বিরোধী আন্দোলনের জন্য খ্যাত প্যারীচাঁদ এ ব্যাপারে 'ইয়ং বেঙ্গাল' গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যতিক্রম। বাংলা চলিত ভাষাকে তিনি মর্যাদা দান করেন 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে। ফলে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রবর্তিত সংস্কৃত-প্রভাবিত বাংলা ভাষার মোড় ফিরে যায়।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮)

ঈষৎ চরিত্র-দৌর্বল্যের জন্য সতীর্থদের শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত দক্ষিণারঞ্জন পরে কর্মদক্ষতার জন্য 'রাজা' উপাধি পান।

শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-১৮৯০) ও মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮৬৮-১৯৩০)—দুজনেই হয়েছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। চরিত্রদৃঢ়তা ও সততার জন্য এঁরা খ্যাত ছিলেন।

রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮)

নীতিনিষ্ঠ স্নেহকোমল চরিত্রের অধিকারী রামতনু লাহিড়ীর বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে প্রভেদ ছিল না। ব্রাহ্মদের উপবীত ত্যাগের বহু পূর্বে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি উপবীত ত্যাগ করে নানা দুর্ভোগ সহ্য করেন। তাঁকে ডিরোজিয়ো ও রামমোহনের সাধনার সেতু বলা হয়।

ডিরোজিয়ো-অনুবর্তী তথা ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী রামমোহন-বিরোধী বলেই পরিচিত। কারণ রামমোহন-পন্থীগণ ধর্মবিশ্বাসী ও জাতীয়তাবোধে সমৃদ্ধ আর ইউরোপীয় ভাবাপন্ন ডিরোজিয়ো-অনুবর্তীরা ছিলেন সংশয়বাদী। এ মত প্রকাশ করেছিল ১৮৩২ খিস্টাব্দের 'ক্যালকাটা খ্রিস্টান অবজারভার' ('Calcutta Christian Observer')। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সমকালের শিক্ষিত হিন্দুদের পত্রিকা 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'এনকোয়ারার' ইংরেজি সাহিত্যকে অধিক মূল্য দিত। এদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল চিন্তনের অগ্রগামিতা ও উন্নতি)।

কিন্তু ডিরোজিয়ো ও তাঁর শিষ্যদের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তাঁদের রামমোহন-বিরোধী বলা যায় না। বরং ডিরোজিয়ো-অনুবর্তীগণ পরে যে উদার মানবিকতা ও দেশহিতৈষণার পরিচয় দেন তা রামমোহন-অনুগামীদের চেয়ে অধিক পরিমাণে রামমোহন-আদর্শের অনুসারী। রামমোহনের অভিপ্রায় ছিল এদেশে আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান সাধনার প্রচার। তা বাস্তবায়িত হয় ডিরোজিয়ো-পন্থীদেরই একনিষ্ঠ প্রয়াসে। অধ্যাপনার ব্যবস্থা সহ উচ্চশ্রেণির স্কুল-কলেজ স্থাপন, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জন্য সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা—এসবই করেছিলেন ডিরোজিয়োপন্থী ইয়ং বেঙ্গালগণ।

প্যারীচাঁদ মিত্র ভিন্ন বাংলা সাহিত্যে ডিরোজিয়োপন্থীরা তেমন কোনো কীর্তির পরিচয় দিতে পারেননি। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রতি তাঁদের গাঢ় অনুরাগ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আসে নতুন যুগ। এ কর্ম সম্ভব করে ডিরোজিয়ো-পন্থীদের অনুবর্তী মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) লেখনী।

এইভাবে সমাজ ও সাহিত্যে—উভয়ত বাংলায় আসে নতুন যুগ।

ডিরোজিয়োপন্থীদের পরে বা তাঁদের যুগের শেষ ভাগে বাংলার নবজাগরণের উদ্যোক্তা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের (১৮১৭-১৯০৫) সাধনাসৃষ্ট ব্রাহ্ম সমাজ।

রামমোহন ও কিশোর দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল গভীর স্নেহের সম্পর্ক। তৎকালের অসাধারণ ধনী ও বিলাসী দ্বারকানাথের পুত্র হয়েও তরুণ বয়স থেকেই দেবেন্দ্রনাথের মনে গভীর অধ্যাত্ম-চেতনার উন্মেষ লক্ষিত হয়। হয়তো রামমোহনের প্রভাব তার একটি কারণ। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী 'আত্মচরিত'-এ এই ভগবৎ-চেতনার উদ্ভব ও বিকাশের বিশদ বিবরণ আছে। দ্বারকানাথ অধার্মিক ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথ স্বধর্ম ত্যাগ করেননি; কিন্তু ক্রমে তিনি

বুঝলেন প্রচলিত দেবপূজামূলক হিন্দু ধর্ম নয়—রামমোহন প্রবর্তিত ব্রহ্ম উপাসনাভিত্তিক ব্রাহ্ম ধর্মই তাঁর ধর্ম। রামমোহন-শিষ্য ও সহকর্মী রামচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ব্রাহ্ম ধর্ম ও প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখলেও ক্রমে তা হয়েছিল দুর্বল। তাই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্মের আলোচনার জন্য ১৮৩৯-এ স্থাপন করেন তত্ত্ববোধিনী সভা। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ ডিসেম্ভবর (১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ) কুড়ি জন বন্ধুর সঙ্গে তিনি রামচন্দ্র বেদান্তবাগীশের নিকট ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। এরপর দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুগণ বিশেষত অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) ব্রাহ্ম ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন সত্যনিষ্ঠা ও শ্রমের সঙ্গে। ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠল ব্রাহ্ম ধর্ম। একালের জীবনজিজ্ঞাসু হিসেবেই তাঁরা ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠাস্থান নির্ণয়ের প্রয়াসী হয়েছিলেন।

যুবক দেবেন্দ্রনাথের মনে জীবনের যথার্থতার সন্ধানজনিত বেদনা ছিল। হঠাৎ উপনিষদের একটি পৃষ্ঠা থেকে তিনি পান তা থেকে মুক্তির পথ। ইউরোপীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত মানবজীবন প্রকৃতির অধীন—দেবেন্দ্রনাথকে তৃপ্তি দেয়নি। উপনিষদে তিনি লাভ করলেন এ আশ্বাস—জগৎ পরিচালিত হচ্ছে বিশ্বের প্রভু ঈশ্বরের শুভ নিয়মে। তিনি এবং সে সময়ের ব্রাহ্মগণ উপনিষদকে গ্রহণ করলেন ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তি রূপে। তাই এ ধর্মের অন্য নাম হল বেদান্ত-প্রতিপাদিত ধর্ম। কিন্তু বাধা এল ব্রাহ্ম সমাজ এবং বাইরে থেকে।

উপনিষদ বা বেদান্ত দয়ালু পিতা ঈশ্বরের কথা বলে না, বলে না ঈশ্বর ও জীবের প্রেমবন্ধনের কথা। জীবনের নৈতিক ভিত্তি গঠন বিষয়ে উপনিষদ নীরব। আলেকজান্ডার ডাফ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শক্তিমান খ্রিস্টধর্ম প্রচারক এ বিষয়ে ব্রাহ্ম সমাজের সমালোচনা করতে লাগলেন। ডিরোজিয়োপন্থীরা ব্রাহ্ম সমাজকে এ বলে আক্রমণ করলেন যে ব্রাহ্মরা বেদান্তকে অভ্রান্ত ধর্ম বলে বিশ্বাস করেন না। বেদান্তের দোহাই দিয়ে তাঁরা হতে চান জনপ্রিয়।

এদিকে উপনিষদ তথা বেদ ও বেদান্তের সঙ্গে পরিচয় ব্যাপ্ত ও গভীর হওয়ায় জানা গেল বেদে উপনিষদের একেশ্বরবাদ ভিন্ন আছে বহু ঈশ্বরবাদ, সর্ব ব্রহ্মবাদ (Pantheism)। আরও জানা গেল উপনিষদের সংখ্যা এগারোটি নয়, একশো সাতচল্লিশটি। এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মচরিত'-এ লিখেছেন শঙ্করাচার্য যাদের ভাষ্য করেছেন সেই প্রধান এগারোটি উপনিষদেই আছে ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মোপাসনা ও মুক্তির কথা। পরে উপনিষদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হওয়ায় শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায় স্ব স্ব ধর্মের মহিমাব্যঞ্জক উপনিষদ রচনা করেন। এভাবে লেখা হয় একশো সাতচল্লিশটি উপনিষদ। আবার ব্রাহ্ম ধর্মের প্রাণ—ঈশ্বরের সঙ্গে উপাসকের সম্পর্ক বিষয়ে উপনিষদ নীরব। উপনিষদ বলে তিনিই আমি 'সোহমস্মি' তিনিই তুমি 'তত্ত্বমসি'। তখন অক্ষয়কুমার দত্তের পরামর্শে উপনিষদ ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তি—এ মত ত্যক্ত হল। পরিবর্তে সিদ্ধান্ত করা হল 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই' ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি। দেবেন্দ্রনাথ 'আত্মচরিত'-এ লিখেছেন—"সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি।"

এই সত্যানুরাগ নবীন ভারতের নবীন প্রাচ্যের, সম্ভবত নবীন বিশ্বের প্রকৃত ধর্ম। কারণ কাপট্যহীন মানব-কল্যাণেচ্ছা ও গভীর অনুভবই সত্য উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় তথা প্রকৃত ধর্ম। গ্রন্থবিশেষ বা মহাপুরুষের অনুসরণ তার সহায়ক মাত্র। এই শ্রেষ্ঠ সত্য পূর্বেও জগৎ জানত। বাংলার ব্রাহ্ম সমাজই আধুনিক যুগে এই অশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ সত্যকে অবলম্বন করেন। এ কারণে বিশ্ব তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। সত্য যখন গভীর অনুভবের সঙ্গে অন্বিত হয় ও মহত্তর চেতনার পথে চালিত হয় তখনই তা যথার্থ মূল্য পায়—নতুবা সত্য মূল্যহীন তত্ত্বরূপ অঙ্গার মাত্র। বাংলার ব্রাহ্মদের মধ্যে আধুনিক জীবনের পরম বিত্ত এই সত্যের দীপ্ত রূপ আর অনুভবহীন কৃষ্ণরূপ—উভয়ই লক্ষিত হয়।

ব্রাহ্ম ধর্ম সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের প্রয়াস সম্বন্ধে মতভেদ বর্তমান। যাঁরা ধর্মাশ্রয়ী যুক্তিবাদকে ধর্ম বিষয়ে রামমোহনের শেষ সিদ্ধান্ত মনে করেন তাঁদের মতে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মে এনেছিলেন আমূল পরিবর্তন। তাই তিনিই ব্রাহ্ম ধর্মের প্রকৃত প্রবর্তক। ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তি ও লোককল্যাণকে যাঁরা রামমোহনের ধর্মমতের অচ্ছেদ্য

অংশ মনে করেন তাঁদের কাছে দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজের সুপরিণতির দিকে অগ্রগমন বলেই গৃহীত হয়।

দেবেন্দ্রনাথের মতে রামমোহনের অদ্বৈতবাদে আপত্তি ছিল না কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ছিলে দ্বৈতবাদী ভক্ত ও জনকল্যাণকামী আধুনিক মনীষী। তাই তাঁকে বলতে হবে দ্বৈতবাদী জনসেবক গৃহস্থ। তাঁর কাছে ধর্ম ছিল মানুষের ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। ক্লান্তিহীন সাধনাশেষে দেবেন্দ্রনাথ ধর্মজীবন অর্থে এই সত্যই অনুভব করলেন। তবে তাঁর কাম্য ছিল আত্মার অনন্ত উন্নতি। উনিশ শতকের বাংলার ধর্মসংস্কারের ভিত্তি ছিল শাস্ত্র নয়—বিচারবুদ্ধি। এখানেই ইউরোপীয় রিফরমেশন-এর সঙ্গে তার তফাত। পরে অবশ্য বাংলা ও ভারতে ধর্মচিন্তা প্রাচীন শাস্ত্র-ঐতিহ্যের অনুসরণে সচেষ্ট হয়।

তত্ত্ববোধিনী সভা কেবল ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তি নির্ণয়ে বড়ো কাজ করেনি, বাংলা গদ্য তথা বিচারমূলক গদ্য সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনেও তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রামমোহনের রচনা মূলত প্রাচীন শাস্ত্রকেন্দ্রিক। সে কারণে তাঁর লেখা জনপ্রিয় হয়নি। তত্ত্ববোধিনী সভার যুগে বিচারমূলক গদ্যসাহিত্য সাধারণ জীবনের সঙ্গে অন্বিত হয়। তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে মুদ্রিত হয় অক্ষয়কুমার দত্তের সরল ভাষায় গভীর বিজ্ঞান-তথ্যের আলোচনা। জ্ঞানমূলক প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের অনুবাদেও (যেমন বেদ-অনুবাদ) এ সভা সক্রিয় হয়েছিল। বাংলায় উৎকৃষ্ট গদ্য সাহিত্যের অভাবে ডিরোজিয়ো-পন্থীগণ ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী হন এবং তাকে নিজেদের সাহিত্য করে তুলতে চেষ্টা করেন। এঁরা তত্ত্ববোধিনী সভার উৎকৃষ্ট রুচি ও নতুন রচনারীতি দর্শনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশ্বান্বিত হয়ে ওঠেন। তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যতম সদস্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গম্ভীর ও ললিত বাংলা রচনা মধুসূদনের রচনারীতির উৎস—এমন অনুমান করেন অনেক পণ্ডিতজন।

এসময়ে রাজনৈতিক চেতনাও কতকাংশে জাগ্রত হয়। তার প্রমাণ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। এর আগে রামমোহন ও 'বেঙ্গল হরকরা' প্রজার অধিকারের কথা বলেছিলেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এইসব চিন্তার মূর্ত রূপ; যদিও এসভা তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ করে উঠতে পারেনি।

আগেই বলা হয়েছে তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০-১৮৯১) যোগ ছিল। এই সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয় তাঁর বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত প্রবন্ধ। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে পাস হয় বিধবাবিবাহ আইন এবং দেশে জাগে আলোড়ন। সতীদাহ নিবারণ আইনের পর এরূপ আন্দোলন আর কোনো ব্যাপারে লক্ষিত হয় না। বিদ্যাসাগর হয়ে ওঠেন জন-মনোযোগের কেন্দ্র।

বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট রূপদাতা বিদ্যাসাগর দানশীলতা ও তেজস্বিতার জন্যই পরিচিত। তাঁর মনোগঠন ছিল যুক্তিমূলক। তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে তাঁর যোগ আর সে সময়ে তাঁর রচনায় প্রকাশিত মনোভাব প্রমাণ করে যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগর এই যুগের সৃষ্টি। যখন তত্ত্ববোধিনী সভায় ভক্তিবাদী দেবেন্দ্রনাথ আর যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে মতভেদ হয় তখন বিদ্যাসাগর অবলম্বন করেছিলেন অক্ষয়কুমারের পক্ষ। এ থেকে প্রমাণিত হয় অক্ষয়কুমারের মতো বিদ্যাসাগরও ছিলেন বৈজ্ঞানিক মনোভাব সম্পন্ন যুক্তিবাদী ব্যক্তি। ১৮৫০-এ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় মুদ্রিত বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কিত একটি নামহীন লেখায় বিদ্যাসাগরের এ মনোভাবের প্রকাশ লক্ষিত হয়। সেখানে তিনি বলেছেন বাল্যবিবাহ প্রথার মূল স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত কল্পিত পুণ্যলাভ। তবে অবিশ্রাম আলোচনা-আন্দোলনই এসব কুপ্রথা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করবে এবং সেগুলি দূর করার চেষ্টা দেখা দেবে। কারণ বিরামহীন সন্ধানেই সত্য প্রকাশিত হয়।

'বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব'-এ তিনি লিখেছেন বিধবাবিবাহের ঔচিত্য যুক্তির মাধ্যমে বোঝালে তা এদেশের মানুষ গ্রহণ করবে না। কারণ তারা শাস্ত্রসম্মত কর্মকেই কর্তব্য বলে জানে। তাই প্রথমে চাই বিধবাবিবাহের সপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ। বিশেষ শ্রম স্বীকার করে তিনি বিধবাবিবাহের শাস্ত্র-সম্মতি প্রমাণ করেন। কিন্তু তিনি যেভাবে শাস্ত্রবিচার দ্বারা বিধবাবিবাহের ঔচিত্য প্রমাণ করেছেন তা যুক্তির উপরই নির্ভরশীল। তাঁর যুক্তি—প্রাচীন শাস্ত্রবর্ণিত হিন্দু-জীবনের সঙ্গে একালের হিন্দুর সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শের মিল নেই। একালের হিন্দু কেবল লোকাচার প্রভাবে বিধবার বিবাহ দানে অসম্মত। অতএব বিধবার বিবাহ দেওয়া কোনো অশাস্ত্রীয় কাজ নয়।

বিদ্যাসাগরের মধ্যে যুক্তিবাদের সঙ্গে সংযোগ ঘটেছিল পৌরুষের। তিনি ছিলেন ডিরোজিয়ো-যুগের মানুষ। ডিরোজিয়ো-পন্থী অনেকের চরিত্রে দেখা যায় এরূপ যুক্তিবাদ ও পৌরুষের শুভযোগ। তবে আচার-ব্যবহারে তাঁরা ইংরেজিয়ানার পক্ষপাতী ছিলেন। বিদ্যাসাগর এ ব্যাপারে ছিলেন পুরো বাঙালি।

আসলে সে যুগের যুক্তিবাদ প্রভাবিত করেছিল সকল উল্লেখ্য বাঙালিকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও যুক্তিবাদী ইউরোপীয় দর্শনের চর্চা করেছিলেন। তবে যুগোচিত যুক্তিবাদের সঙ্গে তাঁর চরিত্রে মিশেছিল যুগ-অতিক্রমী ভগবৎ-চেতনা।

এ সময়ের আর এক বিশেষ ঘটনা ১৮৪৯-এ স্যার জন ইলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বিটন (Sir John Elliot Drink water Bethune : ১৮০১-১৮৫১ বেথুন নামে পরিচিত) কর্তৃক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের সরকারি রিপোর্ট-এ বাংলার নানা শহরে স্থাপিত উনিশটি বালিকা বিদ্যালয় ও ৪৪০ জন ছাত্রীর উল্লেখ আছে। অর্থাৎ স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা পূর্বেও কিছুটা ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদা বেথুন বিদ্যালয়ের প্রাপ্য। কারণ নারীশিক্ষাকে বিদ্যালয়টি দিয়েছিল দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপ্তি। সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থাও এ যুগে বিস্তৃত হয়েছিল। ভারতের অনেক প্রদেশে এসময়েই স্থাপিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে এ সময়ের বিশেষ ঘটনা নতুন ধারার বাংলা নাটকের সূচনা।

সমাজের উচ্চ স্তরের এইসব সংগঠনমূলক কাজের সঙ্গে সংযোগ ছিল না কৃষক ও মুসলমান সমাজের, এ দুই সমাজেই তখন দেখা দিয়েছিল কিছুটা বিদ্রোহী মনোভাব।

ব্রিটিশ শাসনের সূচনা থেকেই দেশের কৃষক ও সাধারণ মানুষের জীবন উত্তরোত্তর খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরেও তাদের খাজনা মকুব করা হয়নি। পরের বছরও তাদের খাজনা দিতে হল। অযোধ্যা, বারাণসী, মাদ্রাজে (বর্তমান চেন্নাই) দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষকদের আরও অবনতির মধ্যে ঠেলে দেয়। ইংরেজ কর্তৃক নীল চাষের সূচনায় নীলচাষিদের অবস্থা ঈষৎ উন্নত হলেও শীঘ্রই আরও খারাপ হয়ে যায়। ইংল্যান্ড থেকে বিলেতি সুতোর আমদানির ফলে কাটুনিদের অবস্থারও অবনতি ঘটে।

এদেশে ইউরোপীয় অধিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যে আন্দোলন হয় তদুপলক্ষে লর্ড বেন্টিঙ্ক বলেন এ দেশের পল্লী অঞ্চলে ইউরোপীয়দের বাসের মন্দ ফলই প্রবল। রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তীদের এ বিষয়ে মত ছিল ব্যাপারটা চলবে পরীক্ষামূলকভাবে এবং ইউরোপীয়দের দেশে প্রচলিত আইনের অধীন হতে হবে। মেকলে (Macaulay Thomas Babington : ১৮০০-১৮৫৯)-ও একই কথা বলেন।

কিন্তু তেমন কোনো ব্যবস্থা না করেই এদেশে ১৮২৪ থেকে ইউরোপীয়দের নীল চাষের অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর থেকেই সমকালের নানা সংবাদপত্রে সাধারণ মানুষের অবস্থার দ্রুত অবনতির সংবাদ পাওয়া যেতে থাকে। ১৮৪৯-এ বেথুন সাহেব জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য আইন পাস করেন এই মর্মে যে মফস্‌সলেও ইউরোপীয়দের বিচার হবে দেশীয় বিচারকদের আদালতে। কেবল মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকার তাদের থাকবে না।

এদেশের ইউরোপীয়রা এই আইন এবং সঙ্গের তিনটি খসড়া আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করে। তারা আইনগুলির নাম দেয় ব্ল্যাক অ্যাক্টস। রামগোপাল ঘোষ এ আইন প্রবলভাবে সমর্থন করেন। কারণ এর ফলে পল্লী অঞ্চলে নীলকরদের অত্যাচার হয়তো কমবে। কারণ স্থানীয় আদালতে তাদের অপরাধের বিচার সম্ভব হবে। এজন্য হর্টিকালচারাল সোসাইটি-র সদস্য বন্ধুস্থানীয় ইংরেজগণ তাঁকে অপমান করে আর দেশের লোক এ অপমানকে নিজেদের অপমান হিসেবে গ্রহণ করে।

ইউরোপীয়দের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের তীব্রতার ফলে ব্ল্যাক অ্যাক্টস প্রবর্তিত হয় না। তবে এদেশের মানুষ বুঝে নেয় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের শক্তি। ১৮৫১-তে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন তারই ফল। এর সভাপতি ধর্মসভার নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব আর সম্পাদক ব্রাহ্ম সমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাদ্রিদের ধর্মান্তরিত করার ব্যাপকতা হিন্দু ও ব্রাহ্মদের এই সহযোগিতার একটি কারণ। দেবেন্দ্রনাথ কলকাতার সম্ভ্রান্ত মানুষদের একত্র করে স্থাপন করেন একটি মহাসভা। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ গুণী ব্যক্তি। মহাসভার উদ্যোগে স্থাপিত হয় অবৈতনিক হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়। উদ্দেশ্য হিন্দু বালকদের ইংরেজি শেখার জন্য পাদ্রি স্থাপিত বিদ্যালয়ে গমন রহিত করা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হন ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪)। অবশ্য আপদ্ধর্মের ফলে এই হিন্দু-ব্রাহ্ম মিলন থেকে তেমন কোনো শুভফল পাওয়া যায়নি।

তৃতীয় অধ্যায় : এই অধ্যায়ে কাজী আবদুল ওদুদ 'সিপাহি বিদ্রোহ' (১৮৫৭) 'নীল বিদ্রোহ' (১৮৫৮-৬০), কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্ম সমাজের বিবর্তন, জাতীয়তাবোধের ক্রমোন্মেষ ও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র—এঁদের সম্পর্কে বলেছেন; তবে মুখ্য স্থান কেশবচন্দ্র সেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহকে অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেন। কিন্তু বাংলা দেশ বিশেষত কলকাতায় এ বিদ্রোহের কোনো প্রভাব পড়েনি, উপরন্তু এ বিদ্রোহ সম্পর্কে কিছুটা বিরূপতা লক্ষিত হয়। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৬১) বলেছিলেন এ বিদ্রোহের সঙ্গে ইংরেজ অনুগত প্রজাদের যোগ নেই; এটি 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিপাহিদিগের কর্মমাত্র।'—এই ছিল সে যুগের অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালির মত। তাই বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথের মতো স্বাধীনচেতা ব্যক্তিও এ বিদ্রোহ সম্পর্কে অনাগ্রহী ছিলেন।

অনেকে বলেন এর কারণ ইংরেজ আস্থাভাজন শিক্ষিত বাঙালির স্বার্থচিন্তা। এ মত ভ্রান্ত, কারণ তখন বাঙালির সৃষ্টিশক্তি ব্যাপক ও সক্রিয় ছিল। ইউরোপ আর ইংরেজের সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয়-জনিত সংশয়-সমালোচনাহীন গভীর শ্রদ্ধা থেকে জাত এই সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে সংকীর্ণতার যোগ থাকা অসম্ভব।

১৮৫৮-৬০ সালের নীল বিদ্রোহ কিন্তু কলকাতার শিক্ষিত বাঙালি সমাজকে আলোড়িত করেছিল। অনেকে সমর্থন করেছিলেন এ বিদ্রোহ। নীলকর সাহেবদের নৃশংস অত্যাচার-পীড়িত যশোর, নদিয়া, ফরিদপুর অঞ্চলের চাষিরা এ বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহের প্রবলতাহেতু ব্রিটিশ সরকার নীল কমিশন নিযুক্ত করেন। কিন্তু কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজের নীলবিরোধী সাক্ষ্য সত্ত্বেও সরকার প্রতিকারে ততটা সক্রিয় হননি।

নীল বিদ্রোহের অমৃতফল দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) 'নীল-দর্পণ' নাটক। নীলকরদের ঔদ্ধত্য, স্থূল প্রকৃতি, পাশবিক অত্যাচার, নীলকর-কর্মচারীদের দাস মনোভাব, চাষি তোরাপের বলিষ্ঠ সাহসী প্রতিবাদ-সমন্বিত এই নাটক প্রকাশের প্রায় সমকালেই ইংরেজিতে অনূদিত হয়। নাটকটি সারা দেশকে আলোড়িত করেছিল।

অনেকের মতে এ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন মধুসূদন। যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে এ নাটক প্রকাশ করেন পাদ্রি লঙ সাহেব। নীলকরদের অভিযোগ লঙ-এর ছ-মাসের জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। জরিমানার টাকা

দেন তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)। রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ বহু শিক্ষিত ব্যক্তি এবং কলকাতার 'হিন্দু পেট্রিয়ট'সহ মফস্‌সলের অনেক সংবাদপত্র নীলকরদের বিপক্ষে নীলচাষিদের সমর্থন করেন। এ প্রতিবাদ প্রমাণ করে বাঙালির ইংরেজ ও ইউরোপ-প্রীতি ছিল সুন্দর ও মহতের প্রতি শ্রদ্ধা—হীন স্তাবকতা নয়।

ব্ল্যাক অ্যাক্টস, সিপাহি বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহ প্রমাণ করেছিল ইউরোপীয়গণ এদেশে নিজেদের অন্যায় অধিকার সংকুচিত করতে চায় না। তার ফলে বাঙালিদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তারই সঙ্গে নাটক ও কাব্যের নতুন রূপ দেখা দিয়েছিল বাংলা সাহিত্যে। 'নীল-দর্পণ' প্রকাশের কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা নাটকে লক্ষিত হয় দুটি ধারা। সমাজসংস্কারমূলক বাংলা নাটক রচনা এবং সংস্কৃত নাটকের অভিনয় ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ। প্রথম ধারার বিশিষ্ট নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (রচনা ১৮৫৪, প্রথম অভিনয় ১৮৫৯)। 'নীল-দর্পণ' এ ধারারই নাটক।

সংস্কৃত নাটকের পুনরভিনয়ের ধারায় আবিষ্কৃত হয় মধুসূদনের বাংলা রচনা-নৈপুণ্য। নাটকের সঙ্গে তিনি বাংলা কাব্যক্ষেত্রেও নতুন ধারার সূচনা করেন যা বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ-বিকাশের সূচক।

কৈশোরেই আপন কবিপ্রতিভা সম্পর্কে সচেতন মধুসূদন (মাইকেল মধুসূদন দত্ত : ১৮২৪-১৮৭৩) ইংরেজিতে কবিতা ও কাব্য রচনা শুরু করেছিলেন। ইউরোপীয় কাব্য-সাহিত্য তাঁর মনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু বিদেশি ভাষায় কাব্যরচনা তাঁকে তৃপ্ত করেনি। আশ্চর্যভাবে তিনি বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় পান আপন কৃতিত্বের সন্ধান। মাত্র কয়েক বছরের সাধনায় তিনি পুষ্ট করেন বাংলা সাহিত্যকে। বিশ্বসাহিত্যের ছন্দ ও ভাব তিনি বাংলা সাহিত্যে সঞ্চার করেন এবং পাশ্চাত্য ও ভারতীয় তথা বাংলার কাব্য-জগতের মধ্যে স্থাপন করেন প্রেমের যোগ। বিস্ময় ও আনন্দের বস্তুকে তিনি করে তোলেন ঘরের বস্তু।

বাঙালির মানসিক সংকীর্ণতা স্বীয় বিশ্বমৈত্রীর সাধনা নিয়ে দূর করেছিলেন রামমোহন। মধুসূদন বাঙালিকে দিলেন ভয়হীন আনন্দ আর আত্মবিশ্বাসের সন্ধান। বাঙালি হয়ে উঠল বিশ্বসাহিত্যের উপভোক্তা।

মধুসূদন ইউরোপীয় সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ দেশপ্রেমকে বাংলা সাহিত্যের বিষয় করে তুললেন। অবশ্য এর সূচনা হয়েছিল কর্নেল টড-এর 'অ্যানালস অব রাজস্থান' দ্বারা অনুপ্রাণিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) ভাবশিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৮৭) রচনায়। মধুসূদনের রচনায় দেশপ্রীতি তৎকালীন বাঙালি মনে আনল জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনা; কাব্য ও নাটকে দেখা দিল অস্পষ্ট হিন্দু জাতীয়তাবোধ, স্বদেশগৌরব অনুভবের চেতনা। হিন্দু জাতির পুনরুত্থান ভাবনার মধ্য দিয়ে মানবমহিমাবোধ যুক্ত হল জাতীয়তাবোধের সঙ্গে।

এ সময়েই আশ্চর্য প্রতিভাসম্পন্ন কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪) অভ্যুদয়। যৌবনেই তাঁর মধ্যে ধর্মচেতনার সূক্ষ্ম গভীর প্রকাশ দেখা যায়। তাঁর নানা বক্তৃতা, উপদেশসমূহ, বিশেষ করে তাঁর 'জীবন-বেদ'-এ আছে এর পরিচয়। এ গ্রন্থে তিনি প্রার্থনাদ্বারা লব্ধ হৃদয়ের বাণীকেই একমাত্র অবলম্বন বলেছেন। তাঁর মতে ধর্মগ্রন্থ, প্রতিষ্ঠান বা গুরু—সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। তারপরে তিনি বলেছেন অনুভূত পাপবোধের কথা।

তৃতীয়ত বিবেকের আলোয় তিনি অন্তরের জড়তা, দৌর্বল্য, আসক্তি—এই ত্রুটিসমূহ অনুভব করেছেন এবং জেনেছেন ইচ্ছাই পাপের মূল।

ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা, অপরাধ মানবজীবনের অনিবার্য অংশ আর এ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ চেতনাই জীবনোৎকর্ষের উৎস। জাতির জীবনে প্রখর নৈতিক চেতনার অভাবে পতন হয় সভ্যতার। কেশবচন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে ব্যক্তি ও জাতির জীবনে প্রখর নৈতিক চেতনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন তিনি। এজন্যই দেবেন্দ্রনাথ, রামমোহনের পাশে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে তাঁর স্থান।

মাত্র বাইশ-তেইশ বছর বয়সেই কেশবচন্দ্র ঈশ্বর, প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা, পাপবোধ, প্রত্যাদেশ, ধর্মজীবন ও প্রাত্যহিক জীবন, ধর্ম ও বিজ্ঞান, ভারত ও ইউরোপের সম্পর্ক, পৃথিবীর নানা ধর্মের মূল্য ও সম্ভাবনা—এই সব জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপরিণত ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। এর সঙ্গে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের সাধনালব্ধ ভাবসম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে আসেন কেশবচন্দ্র।

তাঁর সম্পর্কে যে সব ভুল ধারণা আছে তাদের একটি তাঁর মধ্যে খ্রিস্টীয় ধর্ম ও সাধনার প্রভাব আধিক্য। ধারণাটি আংশিক সত্য। প্রত্যাদেশ, প্রার্থনা, প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে ধারণা—সবই ছিল তাঁর নিজস্ব অনুভব। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে উপদেশকালে তিনি বেদ ও বাইবেলের চেয়ে জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানকে বড়ো স্থান দিয়েছেন এবং স্বচ্ছ পক্ষপাতহীনভাবে বিচার করে সত্যকে গ্রহণ করার কথা বলেছেন।

কেশবচন্দ্র একই সঙ্গে ছিলেন ধর্মতত্ত্ববিদ, অসাধারণ নৈতিক চেতনাসম্পন্ন সংস্কারক, জাতীয় জীবনের শক্তিমান সংগঠক এবং সুনিপুণ ভাষাশিল্পী। পরিণত চিন্তার অধিকারী কেশবচন্দ্রের কর্মও ছিল পরিণত। তাঁকে সহকারী হিসেবে পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্রহ্মানন্দ উপাধি দিয়ে কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যপদে স্থাপন করেন। এর আগে কোনো অব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য হননি।

এর মধ্যে যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমারের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়। অক্ষয়কুমার জগৎচালক মঙ্গলময় ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। সে বিশ্বাস তাঁকে জ্ঞানান্বেষণ ও সৎকর্মের প্রেরণা দিয়েছিল। ভক্তিধর্মমতানুসারে তিনি ঈশ্বরকে প্রেমময় জেনে তাঁর সান্নিধ্যের জন্য আকুল হননি। তাঁর মতে জগৎ নিয়মশাসিত, প্রার্থনা বা ভক্তিতে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। তাঁর যুক্তি সম্পর্কিত ধারণা স্মরণীয় একটি সমীকরণের রূপ নিয়েছিল—

পরিশ্রম + প্রার্থনা = শস্য

পরিশ্রম = শস্য

প্রার্থনা = ০

দেবেন্দ্রনাথের কাছে ভক্তিই ছিল বড়ো। অক্ষয়কুমারের কঠোর যুক্তিবাদ তিনি মেনে নিতে পারেননি। আবার ভ্রাতাগণ বাৎসরিক দুর্গাপূজা বজায় রাখায় পরিবারেও ছিল অশান্তি। এ অবস্থায় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি হিমালয়ে চলে যান। সে স্থানে একাগ্র ব্রহ্মচিন্তার দ্বারা তিনি পেলেন শান্তি ও শক্তি; আত্মজীবনী 'আত্মচরিত'-এ আছে তার পরিচয়। শেষে অন্তর-লব্ধ নির্দেশে ১৮৫৮-তে তিনি ফিরে এলেন লোকালয়ে। তার আগের বছর কেশবচন্দ্র যোগ দিয়েছেন ব্রাহ্ম সমাজে। হিমালয়ে প্রাপ্ত ঈশ্বর-চেতনার ফলে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনা ও বক্তৃতা হয়ে উঠল নতুন শক্তির উৎস। কেশবচন্দ্রের প্রয়াসে এল গতি। উভয়ের যৌথ প্রয়াসে ব্রাহ্ম সমাজ হয়ে উঠল শক্তিমান। এই ব্রাহ্ম সমাজের কাছে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি লাভ করলেন জীবন ও কর্মের নবরূপ ও তাৎপর্য। ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব বাংলার নব জাগরণে স্মরণীয়; কারণ তাঁরা শুধু পারত্রিক বিষয়েই মগ্ন ছিলেন না; জাগতিক সমস্যার সমাধানেও তাঁরা ছিলেন সম-মনোযোগী। তার প্রমাণ ১৮৬০-এ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে উত্তর-পশ্চিম ভারতের দুর্ভিক্ষ সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের সাহায্য।

ভগবৎপ্রীতি যখন মানুষকে পরার্থপর, মানুষের প্রতি দায়িত্বসম্পন্ন করে তোলে তখন সমাজ ও সভ্যতা হয়ে ওঠে কল্যাণ ও শান্তির উৎস। কারণ যারা কাজ করে আর যাদের জন্য কাজ করা হয়—উভয় পক্ষই আত্মিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। দেহের ক্ষুধা মানুষের একমাত্র ক্ষুধা নয়। কিন্তু তার আত্মিক ক্ষুধা প্রায়শ সংস্কার দ্বারা আবৃত থাকায় সক্রিয় হয় না। ধর্মের কল্যাণময় আত্মিক বা নৈতিক দিক এবং তার সংস্কারময় অন্ধ আচারের দিক—উভয়

দিক সম্বন্ধে নব জাগরণ যুগের মনীষীরা ছিলেন সচেতন। এখানেই এ যুগের ধর্মসাধনার বিশেষত্ব।

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র—দু-জনেরই মধ্যে ছিল সমাজকল্যাণমূলক ভগবৎ-প্রেম। কেশবচন্দ্রের মধ্যে সমাজ কল্যাণের মনোভাব ছিল অধিক। ব্রাহ্ম সমাজকে তিনি সর্ব দুর্বলতাশূন্য আদর্শ ধর্ম সমাজ রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ডিরোজিয়ো-পন্থীদের সমালোচনা এবং নিজস্ব অধ্যাত্ম অনুভব তাঁকে এ কর্মে প্রাণিত করেছিল।

প্রচারক জীবনের শুরু থেকেই কেশবচন্দ্র তাঁর ধর্মালোচনা ও বিচিত্র কর্মের সহায়ক একদল যুবক অনুরাগী লাভ করেন। এঁরা বিধবাবিবাহ, উপবীত-ত্যাগ প্রভৃতি সংস্কারমূলক কর্ম আরম্ভ করেন। দেবেন্দ্রনাথ উপবীত ত্যাগ করে তাঁদের প্রয়াসের যথার্থতা স্বীকার করেন। ব্রাহ্ম সমাজ কিন্তু সমাজসংস্কার সম্পর্কে তত আগ্রহী ছিল না। তারা ব্রাহ্ম সমাজকে হিন্দু সমাজের অংশ মনে করত এবং হিন্দু সমাজের সার্বিক উন্নয়ন তাদের কাম্য ছিল। এজন্য সংস্কারের গতি মন্থর করতেও তাদের আপত্তি ছিল না।

দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের প্রাচীন ও নবীন—উভয় দলের প্রতিই প্রীতি ছিল। কিন্তু অগ্রসর দল যখন উপবীতধারীদের বেদীতে বসা বন্ধ করতে চাইল এ অজুহাতে যে তাঁরা যথার্থ ব্রাহ্ম নন তখন দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন দলের সমর্থন করলেন। কারণ উপবীতধারীদের মধ্যেও আছেন অনেক প্রকৃত ত্যাগী ব্রাহ্ম—যাঁরা দীর্ঘকাল ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের সেবা করছেন। নতুন ব্যবস্থায় তাঁরা অপমান বোধ করবেন। তরুণ দল কিন্তু নীতি ও আচরণের ব্যবধান মেনে নেওয়া অন্যায় মনে করতেন। এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে বেশ কিছু পত্রবিনিময় হয়। উভয়ের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও দুজনেই স্ব স্ব নীতিতে অবিচল রইলেন। ফলে ব্রাহ্ম সমাজ বিভক্ত হল। ১৮৬৫-তে কেশবচন্দ্র তাঁর অনুগামীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ', দেবেন্দ্রনাথ অনুবর্তীদের নাম হল 'কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ', এ দল অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ল। এই বিভাগ সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে প্রীতি-সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকল।

ব্রাহ্ম সমাজের উদ্ভব হিন্দু সমাজের কুসংস্কার ও গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিকাশমূলক ধর্মের প্রয়োজন। এই বিকাশভিত্তিক ধর্ম দেবেন্দ্র-অনুগামী তথা মন্থরগতি ব্রাহ্মদের কাছে পূর্ণ স্বীকৃতি পায়নি তাঁরা হতে চেয়েছিলেন ভব্য হিন্দু। যুগের দাবি না মেটাতে পারায় তাঁরা পিছিয়ে পড়লেন।

কেশবচন্দ্র এবং তাঁর অনুগামীরা ব্রাহ্ম সমাজকে ত্রুটিমুক্ত আদর্শ ধর্মসমাজ করে তোলার চেষ্টা করলেন। ব্রাহ্ম সমাজের এই অগ্রসর-প্রবণতা অভিনন্দিত হল সারা ভারতে। এরূপ অগ্রগামিতা কেশবচন্দ্রের প্রভাবে ধীরে ধীরে দেশের সর্বত্র মূর্ত হয়ে উঠল। এই সংস্কারমুক্ত সবলচরিত্র ব্রাহ্মগণ লাভ করল ডিরোজিয়ো-পন্থী রামতনু লাহিড়ীর অভিনন্দন।

কেশবচন্দ্রের মধ্যে সমাজ-কল্যাণকামনার সঙ্গে ছিল প্রবল ঈশ্বরভক্তি। ঈশ্বরপ্রীতির একটি রূপ অনড় সংস্কার-অনুবর্তী স্বয়ংসম্পূর্ণতার বোধ। কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের একাংশের মধ্যে দেখা গেল এই আত্মকেন্দ্রিক ভগবৎ-প্রীতি। তাঁদের মধ্যে দেখা দিল বৈষ্ণবদের মতো কীর্তনাসক্তি, প্রাচীন খ্রিস্টানদের মতো প্রবল পাপবোধ এবং পরস্পরের বিশেষত কেশবচন্দ্রের পদ স্পর্শ করে পাপের মার্জনা ভিক্ষার প্রবণতা। এই খ্রিস্ট-অনুরক্তি ও নরপূজা-প্রবণতা দেশবাসীদের মনে বিরূপতার সৃষ্টি করল।

এ সময়েই 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ'-এ একটি নতুন দল গড়ে উঠল। এঁরা পূর্বের মতো কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। পুরোনো দলের ব্রাহ্মদের মধ্যেও কেশবচন্দ্র আর তাঁর অনুগামীদের ভক্তি-অতিরেক সমালোচিত হল। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের মাঘোৎসবের ভাষণে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের খ্রিস্টানুরাগ ও অবতার-অনুগামিতা—দুই প্রবণতা বিষয়ে সাবধান করে দিলেন।

কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের একাংশের মধ্যে ভাবানুরাগের আতিশয্য দেখা দিয়েছিল—একথা সত্য। কিন্তু কেশবচন্দ্রের খ্রিস্ট-অনুরাগকে দেবেন্দ্রনাথ ঠিকমতো না বুঝেই আক্রমণ করেন। অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্ম ধর্মকে যে কোনো সাম্প্রদায়িক পৌত্তলিক ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। কিন্তু বাস্তবে এই খ্রিস্ট-বিমুখতা সাম্প্রদায়িকতা বা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রশ্রয়দাতা হয়ে দাঁড়াল।

এর পূর্বে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র ইংল্যান্ড যান। সেখানে তিনি খ্রিস্ট-এর শিক্ষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ ভিন্ন ধর্মের উদার ব্যাখ্যা দ্বারা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মৈত্রীকে অভিনন্দিতও করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি ইংরেজ সরকারের ভারত-শাসননীতির মধ্যস্থিত অবিচার, দমননীতি ও অত্যাচারেরও অকপট সমালোচনা করেন। তৎকালের শিক্ষিত ইংরেজ ও বাঙালি উভয়েরই গৌরবের কারণ এই ঘটনা। ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর কেশবচন্দ্রের দেশপ্রেম আরও বৃদ্ধি পেল। তিনি দেশসেবার জন্য সুলভ সাহিত্য প্রচার, নারী উন্নতি, শিক্ষাবিস্তার, সুরাপান বর্জন ও জনসেবার আদর্শ গ্রহণ করেন। ইংরেজ পরিবারের মতো ব্রাহ্ম পরিবারেও তিনি আনতে চেয়েছিলেন শৃঙ্খলা আর শ্রী।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্রের প্রয়াসে পাস হয় ধর্মনিরপেক্ষ বিবাহবিধি। পূর্বে ডিরোজিয়ো-শিষ্যগণ এরূপ আইন প্রবর্তনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রয়াস কেশবচন্দ্রের অ-হিন্দু মানসিকতার প্রকাশ বলে তীব্রভাবে সমালোচিত হয় হিন্দু ও পুরোনো ব্রাহ্ম সমাজে। কারণ কেশবচন্দ্র এ বিষয়ে ঘোষণা করেন 'The term of Hundu does not include the Brahmo' (ব্রাহ্ম হিন্দুদের অন্তর্ভুক্ত নয়)। এক দিক দিয়ে উক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন ব্রাহ্ম ধর্ম হয়ে উঠবে বিশেষ এক বিশ্বশক্তি। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে 'ঋষিদের সমাগম' ভাষণে তিনি প্রার্থনা করেন বাংলা দেশ হবে পুতুলপূজামুক্ত ব্রহ্ম দেশ। কাজেই তিনি যদি ব্রাহ্মদের হিন্দু না মনে করেন তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। বিশ্বে প্রচলিত ধর্মের তুলনায় হিন্দু ধর্মের মহত্তর পরিণতি ছিল তাঁর কাম্য। তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এক সংঘবদ্ধ প্রাগ্রসর দল, কোনো নতুন ধর্মের প্রচলন তাঁর কাম্য ছিল না। কিন্তু তাঁর এ উক্তিকে ভিত্তি করে তাঁকে আক্রমণ করে পুরোনো ব্রাহ্ম গোষ্ঠী। এ দলের অন্যতম পরিচালক রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক প্রস্তাব' প্রবন্ধ। হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ তাঁর মতে এ ধর্মের মধ্যে উচ্চাধিকারীদের জন্য নিরাকার উপাসনা ও নিম্নাধিকারীদের জন্য সাকার উপাসনার ব্যবস্থা আছে। অতএব কেশবচন্দ্রের দলের এ ধর্মের সংস্কার-প্রয়াস তাঁদের অজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রবন্ধটি অতি জনপ্রিয় হয় এবং হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সহায়ক হয়। যদিও পরিবর্তনবিরোধী এবং স্বজাতির গৌরবকীর্তনমূলক লেখাটির একমাত্র মূল্য হিন্দুদের আত্মসম্মানবোধের পুষ্টিসাধন।

কেশবচন্দ্রের মধ্যে ছিল অসাম্প্রদায়িক কর্মোদ্যম এবং ভক্তি ও বৈরাগ্য-তন্ময়তা। জীবনের শেষ দিকে তাঁর মধ্যে এই মরমিভাবটিই প্রবল হয়। ১৮৭৫-এ তাঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের (১৮৩৬-১৮৮৬) পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। অনেকের মতে এর ফলে কেশবচন্দ্রের মরমি প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। রামকৃষ্ণদেবের কিছুটা প্রভাব থাকলেও এ প্রবণতা ছিল কেশবচন্দ্রের প্রকৃতিগত। তবে তিনি কোনো সময় আপন প্রখর নীতিচেতনা থেকে সরে যাননি। তাঁর 'ব্রহ্মগীতোপনিষৎ' পড়লে বোঝা যায় তিনি ভক্তি ও বৈরাগ্যের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন কর্মোদ্যম।

জীবনের শেষভাগে টাউন হল-এ কেশবচন্দ্রের প্রদত্ত বক্তৃতা সমূহের কয়েকটিতে খ্রিস্টপ্রীতির আধিক্য ছিল। তা থেকে তাঁর সাধনাকে খ্রিস্টীয় সাধনা মনে করা সম্ভব। কিন্তু কেশবচন্দ্রের ধর্মমত খ্রিস্টপ্রীতি সত্ত্বেও ছিল স্বতন্ত্র। খ্রিস্ট-এর নৈতিক চেতনা ও নৈতিক দায়িত্বের উপর গুরুত্ব দান রামমোহনের মতো কেশবচন্দ্রকেও মুগ্ধ করেছিল। শেষ জীবনে কেশবচন্দ্রের এই আত্মিকচেতনায় তাত্ত্বিকতা প্রবল হয়। তিনি এসময় কর্মোদ্যম ও মরমি সাধনার সামঞ্জস্য সাধনে সমর্থ হননি। তাঁর শিষ্যদের কেউ কেউ এসময় ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম ও সাধনা সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা করেন। তবে শেষ জীবনে কেশবচন্দ্রের সাধনার রূপ বাংলার নব জাগরণের ক্ষতি-ই করে। তাঁর মূল্যবান দান

'ব্রহ্মগীতোপনিষৎ', 'সাধু-সমাগম', 'জীবনবেদ' এই তিন গ্রন্থ এবং ইংরেজি বক্তৃতাবলির প্রভাব সমকালে দেশের উপর পড়েনি। বরং এসবের প্রতিক্রিয়ায় জাতীয়তার অন্ধ আবেগই বৃদ্ধি পায়। কারণ তখন বাঙালির নবজাগ্রত শক্তি সফলতার পথের অভাবে হয়ে উঠেছিল বিক্ষুব্ধ। এই পরিস্থিতিতে কেশবচন্দ্রের অন্তর্জীবন গঠনের উপদেশাবলি, তত্ত্বচিন্তা আর বিচিত্র ভাবকল্পনা অপ্রয়োজনীয়বোধে ত্যক্ত হয়েছিল। দেশের জাগ্রত চেতনার সঙ্গে তখন ইংরেজশাসকের অহমিকার বলপরীক্ষা শুরু হয়েছে। সে সময় কেশবচন্দ্র ইংরেজশাসকদের বশ্যতা স্বীকারের কথা বলেন; কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল কুসংস্কারজীর্ণ আশাহীন এ দেশের উন্নতির জন্য ঈশ্বর তাদের পাঠিয়েছেন। ইংরেজ-আনুগত্য দ্বারাই এদেশের নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন সম্ভব হবে। এ কথাগুলি বুঝিয়ে দেয় দেশের চিত্তের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের যোগ ছিন্ন হয়েছে। ইংরেজশাসন এদেশের পক্ষে নানাভাবে শুভকর হয়েছে—কেশবচন্দ্রের এই মত নিছক ভাববিলাস নয়। কিন্তু দেশ তখন চেয়েছিল তার জাগ্রত চেতনার বিরুদ্ধে ইংরেজ-শাসকের বাধার প্রতিকার। এক্ষেত্রে নেতা কেশবচন্দ্রের উপযুক্ত সহায়তা না পাওয়ায় দেশবাসী তাঁর নেতৃত্ব, উপদেশ ও শিক্ষা সম্বন্ধে আস্থা হারায়।

কেশবচন্দ্রের মরমি প্রবণতার আধিক্যে তাঁর অনুবর্তীদের একটি দল ক্ষুব্ধ হন। এঁরা দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সফলতাকে ধর্মীয় সফলতার মতোই মূল্যবান মনে করতেন। কেশবচন্দ্র তখন বলছিলেন তিনি অন্তরলব্ধ ঈশ্বরাদেশের দ্বারা চালিত হন, বাইরের মতামতের দ্বারা নন। তাঁর আর এক মত ছিল ব্রাহ্ম প্রচারকরা ঈশ্বরের অধীন ব্রাহ্ম মণ্ডলীর নন। এসব কারণে নবীন দল অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। তাঁদের মনে হল কেশবচন্দ্র ক্রমে প্রভুত্বপ্রিয় হয়ে উঠছেন। এ মতভেদ চরমে উঠল ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে—উপলক্ষ্য কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের চোদ্দো বছরের কন্যার বিবাহ। কারণ কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্তীদের আগ্রহে প্রবর্তিত নতুন আইনে কন্যার বিবাহ-বৎসর নির্দিষ্ট হয়েছিল ষোলো। পরিণামে ব্রাহ্ম সমাজ আবার বিভক্ত হল। সংখ্যাগরিষ্ঠ কেশব-বিরোধী দলের নাম হল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, কেশবচন্দ্র তাঁর অনুগামীদের নিয়ে গঠন করলেন 'নব বিধান ব্রাহ্ম সমাজ'। মন্থরগতি ব্রাহ্ম সমাজের এতদিনের নাম 'কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ' পালটে হল 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ'।

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের বিরোধকালে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি নষ্ট হয়নি। কিন্তু এবার দু পক্ষের মধ্যে অধিক তিক্ততা সৃষ্টি হল। এ ব্যাপারে কোন পক্ষ দায়ী তা নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে। তবে এ বিষয়ে কেশবচন্দ্রের দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। কারণ তিনি ছিলেন নেতা; নেতার দায়িত্ব অনেক বেশি। একটি দল গঠনের পরও তিনি নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর বড়ো বেশি নির্ভর করেছিলেন। সে অধিকার তাঁর ছিল না। ফলে তাঁর স্বার্থপরতাই যেন প্রকট হয়েছিল।

দলভঙ্গের পর কেশবচন্দ্র নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের শক্তি বৃদ্ধির দিকে নজর দিলেন। কেউ কেউ বলেন 'নব বিধান ব্রাহ্মসমাজ' উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের সার্থকতম রূপ। কেশবচন্দ্র নিজেও তাই মনে করতেন। এক দিক থেকে একথা সত্য। এ প্রতিষ্ঠানে সকল ধর্ম সভ্যতা-সংস্কৃতি আর বিজ্ঞানের প্রতি যে শ্রদ্ধা-প্রীতির মনোভাব ছিল তা উনিশ শতকের বাংলার রেনেশাঁস-এর মূর্ত রূপ। আধুনিক জগতে বিভিন্ন দেশের নানা মতের লোক নিকটস্থ হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির মনোভাব বিশেষ মূল্যবান। এই শ্রদ্ধা-প্রীতির সম্পর্ক মানুষে মানুষে যোগসাধনের অন্যতম পথ। অবশ্য সঙ্গে চাই বহু সৃষ্টিমূলক চিন্তা ও কর্মায়োজন। বিশেষ করে ভারতের মতো ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও জাতির দেশে পারস্পরিক অকপট শ্রদ্ধা-প্রীতির মনোভাবের গুরুত্ব সঠিক।

এই মূল্যবান চিন্তার সঙ্গে 'নব বিধান ব্রাহ্ম সমাজ'-এর ছিল একটি শিথিল চিন্তা—সব ধর্মের সত্যতা স্বীকার। কারণ বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বর্তমান নানা অসত্য ও অসার্থক চিন্তা। আবার সত্যের বিচিত্ররূপ প্রকাশ পেয়েছে অনেক ধর্মে। সেই সব প্রকাশবৈচিত্র্যের উপলব্ধি ভিন্ন সত্যের সম্যক বোধ সম্ভব নয়—কেশবচন্দ্রের এ মতও সত্য। কিন্তু

সত্যের অতীত প্রকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলে সত্যের নব নব প্রকাশ সম্পর্কে সচেতনতা কমবে; ফলে মানুষের অসার্থকতার সম্ভাবনা বাড়বে। কারণ বর্তমানে ন্যায় ও যুক্তির নিয়মে করণীয় কী—এটাই মানুষের বড়ো প্রশ্ন। অস্পষ্ট অতীতকে গুরুত্ব দিলে এ প্রশ্নের উত্তর দানের যোগ্যতা হ্রাসের সম্ভাবনা অধিক। কোনো ধর্ম স্থির নয়, সময়ের সঙ্গে তাদের বিচিত্র রূপ ও প্রবণতা লক্ষিত হয়। এই সব কারণে সব ধর্ম সত্য—এই শিথিল চিন্তার চেয়ে বিভিন্ন ধর্ম বা জীবনাদর্শ কীভাবে ত্রুটিমুক্ত হয়ে বর্তমানে মানুষের কাছে লাগবে, তাকে নতুন করে উদ্বোধিত করবে সে ভাবনাই যথার্থ।

কেশবচন্দ্র যখন সমকালের স্বদেশের মানুষের অনুন্নত জীবনের বেদনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে সকলকে কুসংস্কারমুক্ত প্রখর নৈতিক দায়িত্বযুক্ত উন্নত জীবনের দিকে আকর্ষণ করেছিলেন তখন তিনি বহু জীবনকে আনন্দময় করার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি তাত্ত্বিকতা বা মরমী চিন্তাকে প্রাধান্য দিলেন তখন তাঁর অন্তরঙ্গ অল্প কয়েকজনই আনন্দ লাভ করেছিল। তাঁর নিজের আনন্দও কমই ছিল। চার পাশের বহু মানুষকে যা সার্থকতার সন্ধান বা প্রেরণা দিতে পারে না বা চায় না সে সত্যের মূল্য তর্কাতীত নয়। বর্তমানে অনেক মানুষকে প্রাণিত করতে পারে বহুর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত সত্য—এবং তার মূল্য অবশ্যস্বীকার্য। অতীতের ধর্মমত বা সাধনরীতি তৎকালে সত্য বর্তমানে তার প্রেরণাদানের শক্তি নেই।

এইসব ত্রুটি সত্ত্বেও কেশবচন্দ্রের 'নব বিধান ব্রাহ্ম সমাজ' স্মরণীয় হয়ে আছে। কারণ জগতের বহু প্রাচীন বিধানের মত ও পক্ষের সম্মিলন এ সমাজের প্রয়াসে হয়েছিল এবং তারই ফলে গড়ে উঠেছিল একটি নতুন বিধান। কেশবচন্দ্রের প্রদত্ত ব্যাখ্যা অপেক্ষা বাস্তবে 'নব বিধান ব্রাহ্মসমাজ' যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিল—এ স্বীকৃতি দেবেন্দ্রনাথ এমনকি পরে রবীন্দ্রনাথও দিয়েছেন।

আবার চেতনার প্রাখর্য ও ভাষাব্যবহার-দক্ষতার বিচারে বাংলার রেনেসাঁস-ইতিহাসে কেশবচন্দ্র স্মরণীয় একটি নাম।

রেনেসাঁস যুগে বাংলার নাটক ও কাব্যসাহিত্যে দেখা দিয়েছিল নতুন রূপ—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ক্রমে এই নবীনতা সঞ্চারিত হল কথাসাহিত্যে। প্রথম বাংলা উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখিত হয় এই নাটক-কাব্যের যুগেই। সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্ব থাকলেও সাধারণ মানুষকে সমকালে উপন্যাসটি আকর্ষণ করতে পারেনি। শিক্ষিত সাধারণ বাঙালির চিত্ত-আকর্ষক প্রথম বাংলা উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)। সংস্কৃতজ্ঞ আর ইংরেজিনবিশ—উভয় সমাজেই উপন্যাসটি আদৃত হয়। পরের উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬)। প্রকাশের পর শিক্ষিত সমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যখ্যাতি দৃঢ় হল। ১৮৭২-এ 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্রের জনপ্রিয়তা বাড়ল এবং তিনি লাভ করলেন চিন্তানায়কের সম্মান।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবন মূলত দু'ভাগে বিভক্ত; প্রথমভাগে তিনি প্রধানত শিল্পী, গৌণত দেশপ্রেমিক। দ্বিতীয় ভাগে তিনি মুখ্যত দেশভক্ত, পরে শিল্পী। দ্বিতীয় ভাগে নিজেকে জাতির শিক্ষকরূপে পরিচিত করায় শিল্প হিসেবে তাঁর রচনা হয়েছে কিছু হীন। এ স্তরের উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪)। চরিত্রচিত্রণ শক্তি ও ভাষার ব্যঞ্জনাসৃষ্টি-দক্ষতা এ উপন্যাসে আছে। তবে এখানে তিনি নিজেকে প্রচারক করে তুলেছেন এবং প্রচারের বিষয়ও তেমন উন্নত নয়—ফলে শিল্পসৃষ্টি ততটা সার্থক হয়নি। কিন্তু দেশের শিক্ষিত সমাজে তাঁর এই রূপই প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বাংলা ভাষায় বিশেষ অধিকার থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যচর্চা শুরু করেন ইংরেজিনবিশ হিসেবে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, নায়ক-নায়িকা চরিত্র-পরিকল্পনায় ইউরোপীয় সাহিত্য বিশেষত শেকসপিয়র-এর প্রভাব প্রবল। অবশ্য শেকসপিয়র-এর

মতো কল্পনা-ব্যাপ্তি বঙ্কিমচন্দ্রের নেই। তথাপি চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব চিত্রণে তিনি প্রায়শ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ দ্বন্দ্ব অবশ্য প্রধানত প্রেমকেন্দ্রিক।

ততটা সবল, উদ্দাম কল্পনা না থাকলেও দ্বেষ-ক্রোধচালিত প্রাত্যহিক মানব-জীবনের রূপদানে তিনি মধুসূদনেরই অনুবর্তী ('বীরাঙ্গনা কাব্য' ও 'সনেট') এবং অধিক অগ্রসর। কারণ তাঁর চরিত্রসমূহ সাধারণ মানুষ; পুরাণখ্যাত দেবচরিত্র নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বাংলা দেশে সমাজ ও ধর্মের পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবন প্রয়াস চলেছিল। সম্ভবত কালের প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র এদিকে আকৃষ্ট হন। এক্ষেত্রে সমকালের ব্রাহ্ম নেতাদের প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের উপর পড়েছিল অথবা বলা যায় এক্ষেত্রে ব্রাহ্ম নেতাদের সঙ্গে তাঁর চিন্তার ঐক্য ছিল। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের এক বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র জীবনের ও মানুষের সার্বিক উন্নতির কথা বলেছিলেন। মনের ও দেহের যাবতীয় বৃত্তির সম্যক অনুশীলন দ্বারা সেরূপ উন্নতি সম্ভব—এটাই ছিল তাঁর মত। তিনি আরও বলেছিলেন ঐশ্বরিক প্রীতিই উন্নতির যথার্থ পথ। কেশবচন্দ্র এ চিন্তার প্রেরণা পেয়েছিলেন আমেরিকা ও ইংল্যান্ড-এর চ্যানিং, পার্কার, নিউম্যান প্রমুখ একত্ববাদী খ্রিস্টান মনীষীদের কাছে। তাঁর মধ্যেই তা প্রথম সুস্পষ্ট রূপ পায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সুপরিচিত মত—মানুষের সমুদয় বৃত্তির সর্বাঙ্গীণ অনুশীলনই ধর্ম—কেশবচন্দ্রের উক্ত চিন্তার প্রভাবেই জাত। দেশকে দশভু জা দুর্গারূপে কল্পনাও বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক চিন্তা নয়। এ বিষয়ে তিনি সমসাময়িক নাট্যকার এবং হিন্দু মেলার অন্যতম নেতা মনোমোহন বসুর (১৮৩১-১৯১২) নিকট ঋণী। চিন্তাক্ষেত্রে মৌলিকতা খুবই দুর্লভ। সুতরাং চিন্তার অ-মৌলিকতার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে দোষী করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের মারাত্মক দুর্বলতা সৃষ্টিধর্মী উৎকৃষ্ট চিন্তার তুলনায় হিন্দু-ঐতিহ্য-গর্বকে গুরুত্ব দেওয়া। সৃষ্টিধর্মী চিন্তা মানুষকে তার মহত্তর সম্ভাবনা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সচেতন করে। আর ঐতিহ্যগর্ব কিছুটা সচেতনতা দিলেও শেষ পর্যন্ত দৃষ্টির স্বচ্ছতাকে ক্ষুণ্ণ করে বাড়িয়ে দেয় অন্ধ আবেগ। দেশ ও জাতির সংগঠকরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতার বহু প্রমাণ আছে তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব', 'বঙ্গদেশের কৃষক'—এই সব বিখ্যাত রচনায়। উদাহরণরূপে 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এর কথা বলা যায়। প্রবন্ধটিতে কৃষকদের দুঃখদুর্দশার মর্মস্পর্শী চিত্রাঙ্কনের জন্য তিনি শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু এ দুঃখ দূর করার উপায় নির্ধারণে তিনি ব্যর্থ। দশশালা বন্দোবস্ত প্রভৃতি বহু ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলেও জমিদারি প্রথার বিরোধিতা করেননি বঙ্কিমচন্দ্র। বরং এ প্রথার বিরোধিতাকে তিনি অন্যায় বলে মনে করেছেন এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর কাছে অত্যাচারী জমিদারদের সংযত করার আবেদন জানিয়েছেন।

দেশপ্রেমের মন্ত্রস্রষ্টা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসীদের কাছে পেয়েছেন ঋষির সম্মান। তাঁর অকৃত্রিম দেশপ্রেম প্রাণিত করেছিল বহু মানুষকে। কিন্তু তাঁর দেশপ্রেমের বড়ো ত্রুটি উগ্র জাতীয়তাবাদ, 'ধর্মতত্ত্ব'-এ বঙ্কিমচন্দ্র উগ্র জাতীয়তাবাদের নিন্দা করলেও তাঁর কোনো কোনো রচনায় আছে তার প্রকাশ। সে কারণেই সম্ভবত দেশবাসীরা তাঁকে উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্যই অভিনন্দিত করেছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদ ইউরোপ-এ এনেছে প্রলয়। আমাদের দেশেও এনেছে খণ্ড প্রলয়। আজও তার শক্তি নিস্তেজ হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সার্থক ও অসার্থক চিন্তার জটিল বন্ধন রয়েছে। সেই বন্ধন মোচন ভিন্ন একালে তাঁর চিন্তা থেকে সুফল পাওয়া যাবে না। তাঁর শ্রেষ্ঠ অবলম্বন জাতীয় ঐতিহ্যগর্ব—বর্তমানে এই মূল্যহীন চিন্তার বিপদ সম্ভাবনা প্রমাণিত।

আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ গৌরব শিল্পী হিসেবে। সেখানে মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগ সহজ ও গভীর। চিন্তানায়ক হিসেবে তাঁর ত্রুটি গুরুতর। এ ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন থাকলে তাঁর দেশপ্রেম থেকে পাওয়া যাবে সুফল।

বঙ্কিম-যুগের আর একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪)। অনুগ্র যুক্তিনিষ্ঠা প্রীতিপ্রবণ

হিন্দুত্বের প্রকাশ তাঁর রচনার বিশেষত্ব। যুক্তিনিষ্ঠার দুর্বলতা তাঁর রচনার ত্রুটি আর অন্যান্য ধর্ম ও সমাজের প্রতি দ্বেষহীনতা তাঁর রচনার গুণ।

কেশবচন্দ্রের সমকালে বাংলার নবজাগরণের এর আর এক বিশেষত্ব ইংরেজের অপ্রসন্নতা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদের ক্রমোন্মেষ। রাজনারায়ণ বসুর মতে ১৮৬৬-তে তিনি 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা' স্থাপনের যে প্রস্তাব করেন তারই প্রভাবে নবগোপাল মিত্র এবং তাঁর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সহকর্মীরা ১৮৬৭-তে স্থাপন করেন 'হিন্দুমেলা'। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু জাতিকে সংঘবন্ধ ও আত্মসম্পূর্ণ করে তোলা। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল হিন্দুমেলা। এরই এক অধিবেশনে 'আনন্দমঠ' প্রকাশের অনেক আগে নাট্যকার মনোমোহন বসু বলেন শারদীয় দেবীর মতো হিন্দুর জাতীয় উন্নতিও দশভুজা।

১৮৭২-এ বাংলায় নাট্যশালা হয়ে ওঠে বিশিষ্ট এক শক্তি; তার বিশেষ কাজ হিন্দুর নব জাগ্রত জাতীয়তার বার্তা সাধারণ্যে প্রচার।

এ সময়ের আর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিহারীলাল গুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, (১৮৪৮-১৯০৯), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯২৫) আই. সি. এস. পদ প্রাপ্তি। সামান্য ত্রুটির কারণে সুরেন্দ্রনাথ অল্পদিনের মধ্যে অপসৃত হন। একই ত্রুটির জন্য জনৈক ইংরেজ আই. সি. এস.-কে সাসপেনশন দেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথের পুনর্বিচারের সব আবেদন (ইংল্যান্ড ও ভারতে) অগ্রাহ্য হয়। ব্যারিস্টার হওয়ার সুযোগও তিনি পান না। দেশের শিক্ষিত সমাজ ব্যাপারটিকে ইংরেজ কর্তৃক শিক্ষিত বাঙালির অবদমন মনে করে। এই সময় আই. সি. এস. পরীক্ষার বয়স কমিয়ে উনিশ করা হয়। শিক্ষিত বাঙালিরা এ বয়স বাড়িয়ে বাইশ করার জন্য ভারতব্যাপী আন্দোলন করে। সৃষ্টি হয় 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এর নেতা। তাঁর বক্তৃতার ফলে ভারতের নানা প্রদেশের কয়েকটি শহরে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর শাখা স্থাপিত হয়। তবে উত্তর ভারতের মুসলিম নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁকে বাধা দেন এই বলে যে মুসলমানদের পক্ষে সরকার বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিত নয়।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপনের মূল কারণ কিন্তু ইংরেজ শাসকের অপ্রসন্নতা ও বিরোধিতার বিরুদ্ধে শিক্ষিত বাঙালির আত্মপ্রকাশমূলক সংগ্রামের রাজনৈতিক রূপ। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতির পটভূমিতে ছিল ইংরেজশাসক কর্তৃক মফস্সলে কলেজ তুলে দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের প্রয়াস, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ও অস্ত্রব্যবহারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ। ইংরেজকে বাঙালি এতকাল জেনেছিল অকৃত্রিম হিতৈষী রূপে। সে ভাবনায় এইসব আঘাতের ফলে চিড় ধরল এবং দেখা দিল বড়ো ফাটল—ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন তার প্রতীক। সাহিত্য, জাতীয় সংগীত, হিন্দুমেলা, নাট্যশালা, 'বঙ্গদর্শন'—এ সবের মধ্য দিয়ে বাঙালির জাতীয় চেতনার যে প্রকাশ লক্ষিত হয় তারই পূর্ণ রূপ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। শিক্ষিত বাঙালির নতুন চেতনা পরিচিত ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ হিসেবে। এ জাতীয়তাবাদ কিন্তু ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরোধী ছিল না। অপেক্ষাকৃত অ-সংঘবন্ধ হিন্দুদের ঐক্যবন্ধ করাই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। হিন্দুদের মধ্যে আরম্ভ হলেও এর দৃষ্টি ছিল সারা দেশের প্রতি আর আত্মিক যোগ ছিল সমস্ত জগতের উন্নতিপ্রবণতার দিকে। সুরেন্দ্রনাথ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সারা দেশের জাগরণকে দিলেন যোগ্য রাজনৈতিক মর্যাদা। ভারত-ইতিহাসে এটি স্মরণীয় এক ঘটনা।

হিন্দু মেলা থেকে কংগ্রেসের জন্ম—এমন বলা হয়। কিন্তু একথা বলাই সংগত হিন্দুমেলা আর ধর্ম-সমাজের ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের অসাম্প্রদায়িক শক্তিশালী নতুন সাধনা সুরেন্দ্রনাথকে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠনের প্রেরণা দেয়। তারই পরের ধাপ ভারতীয় কংগ্রেস।

চতুর্থ অধ্যায়ে তথা চতুর্থ বক্তৃতায় আবদুল ওদুদ বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনা থেকে উনিশ শতকের শেষে কংগ্রেস স্থাপন—এই সময়পর্বে বাংলার মুসলমানদের চিন্তাজগৎ ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন এবং তাদের মধ্যে হিন্দু নব জাগরণের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার পরিচয় দিয়েছেন।

হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই বাংলার নব জাগরণকে হিন্দু ব্যাপার বলে মনে করা হয়। কারণ রামমোহন শুরু করেছিলেন প্রচলিত হিন্দু ধর্মের ব্যাপ্ত সংস্কার এবং ইংরেজি শিক্ষা আর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্বীকরণে হিন্দুদের ছিল প্রবল আগ্রহ।

শাসনকালের সূচনায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোনো প্রভেদ ইংরেজরা করেনি। কারণ পলাশীর যুদ্ধ জয়ের ফলে তারা কেবলমাত্র বাংলার দেওয়ানি অর্থাৎ দিল্লি-সম্রাটের পক্ষে খাজনা আদায়ের অধিকার পেয়েছিল। শাসন কার্যের প্রচলিত ধারার পরিবর্তন হয়নি। মুসলমানগণ বিচার ও হিন্দুগণ রাজস্ব বিভাগে আগের মতোই কাজ করছিল। নিজেদের শাসনক্ষমতা বিলুপ্তি বিষয়ে মুসলমানগণ তেমন সচেতন ছিল না। তার প্রমাণ ১৭৮০-তে মুসলমানদের অনুরোধে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন—যার উদ্দেশ্য ছিল কাজি মুফতি পদের যোগ্য কর্মী পাওয়া।

মুসলমানদের আর্থিক অবস্থায় বড়ো পরিবর্তন এল ১৭৬৯-এর মন্বন্তরের পর। মন্বন্তর হেতু খাজনা আদায়ের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গৃহীত নতুন কিছু ব্যবস্থা তার কারণ। এ সম্বন্ধে ডবলু. ডবলু. হান্টার (Sir William Wilson Hunter : ১৮৪০-১৯০০) বলেন লর্ড কর্নওয়ালিশ ও স্যর জন শোর প্রবর্তিত সংস্কার-পরম্পরার পরিণতি ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এর ফলে শাসক ও প্রজার কাছ থেকে কর আদায়কারী মধ্যস্থ শ্রেণির উচ্চ কর্মচারীরা হলেন ইংরেজ। ঢাল-ঘোড়সওয়ারধারী মুসলমান তহশিলদারের পরিবর্তে এলেন ইংরেজ কালেক্টর ও তাঁর আদালতের সঙ্গে যুক্ত বন্দী ও নিলাম করার ক্ষমতাযুক্ত নিরস্ত্র আমলা ও বরকন্দাজ। উচ্চ শ্রেণির মুসলমানরা হলেন কেবল জমিদার—ভূমিজ লভ্যের প্রাপ্য অংশ থেকে তাঁর বঞ্চিত হলেন। এই পরিবর্তনের ফল দেখা গেল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে। এর ফলে প্রজার নিকট থেকে সরাসরি খাজনা আদায়ের ভার পেলেন জমিদারগণ। মধ্যস্বত্বভোগীদের কথা থাকলেও ১৭৯৩-এর ব্যবস্থায় ভূমিকর-আদায়কারী কর্মচারীদের দৃষ্টি ছিল কেবল সরকার, প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায়কারী স্থানীয় আমলা বা জমিদার এবং জমিচাষকারী কৃষকগণের উপর। এ ছাড়া মুসলিম আমলের অন্যান্য ব্যবস্থা লুপ্ত হয়েছিল। এর ফল সমৃদ্ধ মুসলমানদের পক্ষে হয় মারাত্মক। কারণ তালুকদারগণ তালুকের অংশ পত্তনি দিলেও পত্তনিদারদের উপর তাঁর অধিকার বজায় থাকত। দরকার মতো তিনি এঁদের কাছ থেকে কোনো না কোনোভাবে সেস বা চাঁদা আদায় করতে পারতেন। মি. জেমস ও'কিনিলি সি. এস. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করেছেন, এর ফলে সামান্য পদাধিকারী হিন্দুরা হলেন জমিদার; মুসলিম আমলে যে অর্থ পেতেন মুসলমানগণ, তা পেতে থাকলেন হিন্দুরা।

এরপর হল রিজাম্পসন প্রসিডিংস (Resumption Proceedings)-এর প্রচলন। তার ফল মুসলমানদের পক্ষে হল আরও মারাত্মক। এ বিষয়ে হান্টার লিখছেন ইংরেজ বাংলার শাসক হয়ে দেখল দেশের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ জমি নিষ্করভোগীদের দখলে। ১৭৭২-এ ওয়ারেন হেস্টিংস (Warren Hastings : ১৭৩২-১৮১৮) তা বুঝলেও জনমতের প্রবল বিরোধিতায় এসব জমি তিনি বাজেয়াপ্ত করতে পারেননি। ১৯৯৭-এ লর্ড কর্নওয়ালিশ ঘোষণা করেন ইংরেজ সরকারের অনুমোদিত নিষ্করসমূহে তাঁদেরই অধিকার। কিন্তু এ নীতি কার্যকর করার সাহস তাঁদের হল না। ১৮১৯-এ আবার নীতিটি ঘোষিত হলেও কাজ কিছু হয় না। ১৮২৮-এ ব্যবস্থাপক বিভাগ ও শাসক বিভাগ নিষ্করভোগীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য স্থাপন করলেন বিশেষ আদালত, প্রণীত হল 'তিন' আইন। এ

আইন বলে রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারীরা আদালতের রায় ব্যতীত নিজ বিবেচনায় নিষ্করভোগীদের অধিকার নাকচ করতে পারবেন। এর আগে নিয়ম ছিল রাজস্বের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর অভিযোগে আদালতের বিচারে অবৈধ ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত নিষ্করভোগীগণ ভূমি ভোগ করতে পারবে। তা এই তিন আইনে বাতিল হল। এভাবে নিষ্কর বাজেয়াপ্ত করে (আট লক্ষ পাউন্ড ব্যয়ে) বার্ষিক তিন লক্ষ পাউন্ড আয়ের স্থায়ী সম্পত্তি সরকার পেলেন। বাজেয়াপ্ত জমির অধিকাংশ ছিল মুসলিম পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের। ফলে শত শত প্রাচীন পরিবার ও মুসলিম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হল। মুসলিম সমাজে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে দেখা দিল ভীতি ও বিতৃষ্ণা যা সহজে নষ্ট হয়নি। রামমোহন রায় ভারতে ও ইংল্যান্ড-এ বিষয়ে সুবিচার প্রার্থনা করে ব্যর্থ হন।

১৮৩৬-এ রাজকর্মের ভাষা পারসির বদলে হল ইংরেজি। ফলে অধিকাংশ সরকারি পদ অধিকার করে হিন্দু কলেজের শিক্ষিত তরুণ দল। দীর্ঘ কাল কোনো মুসলমান রাজপদ পাননি। মাইকেল মধুসূদনের দুই মুসলমান বন্ধুর একজন আবদুল লতিফ (পরে নবাব) ১৮৪৯-এ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৮৫ খিস্টাব্দে লেখা 'আত্মচরিত'-এ তিনি লিখেছেন গত ছত্রিশ বছরে সব ব্যাপারে মুসলমানদের মুখপাত্র ছিলেন তিনি একা। এ থেকে ইংরেজ শাসনের সূচনা ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা—এই দীর্ঘ সময়ে ইংরেজি তথা আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে মুসলমানদের বিরূপতার পরিমাণ বোঝা যায়। এই সময়ের মধ্যে মাত্র দুটি মুসলিম পরিচালিত সংবাদপত্রের সন্ধান মেলে—(১) 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' (১৮৪৬ : ইংরেজি, পারসি) উর্দু ও বাংলা—এই চার ভাষায় মুদ্রিত হত এবং 'ফরিদপুর দর্পণ' (১৮৬১)।

ইংরেজি শিক্ষার প্রতি হিন্দুদের আগ্রহ ও মুসলমানদের অনাগ্রহের ছিল নানা কারণ—(১) উচ্চ শ্রেণির মুসলমানগণ ছিলেন জমিদার ও রাজকর্মচারী আর সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের কয়েকজন জমিদার হলেও বেশির ভাগ ছিলেন ব্যবসায়ী। ব্যবসায় সম্পর্কিত ব্যাপারে ইংরেজ-সংস্পর্শের কারণে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তাদের মনে আগ্রহ জাগে। মুসলমানদের এরূপ কোনো তাগিদ ছিল না।

(২) ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভ সময়ে মুসলমানদের প্রতিপত্তি অধিক হলেও সাধারণ মানুষ ছিল হিন্দু। ইংরেজগণ এদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়।

(৩) আচারে অনুদার হিন্দুরা ছিল পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ।

আচার উদার হলেও ধর্মবিষয়ে মুসলমানগণ ছিল গোঁড়া। বিধর্মীর ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাই তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না।

(৪) হিন্দুরা এতদিন রাজভাষা পারসি শিখে এসেছে, তাই অন্য একটি সরকারি ভাষা শিখতে তাদের অসুবিধে হয়নি।

স্ব-প্রাধান্য-সচেতন মুসলিম গোষ্ঠী বিজাতীয় ভাষা সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ অনুভব করেনি।

দীর্ঘকাল চলেছিল এ অবস্থা। অবক্ষয়ের চরমে পৌঁছে রাজ্য হারালেও আপন হীনাবস্থা সম্বন্ধে মুসলিমগণ ছিল অসচেতন। এই অবস্থার নিখুঁত চিত্র আছে সৈয়দ গোলাম হোসেনের 'সিয়ারুল মোতা আখেরুন' গ্রন্থে। কয়েকজন গুণী ব্যক্তি তখনও মুসলমান সমাজে ছিলেন। ইংল্যান্ড-এ সাক্ষ্যদান কালে রামমোহন রায় উচ্চপদস্থ মুসলিম কর্মচারীদের বিদ্যা ও চরিত্রের প্রশংসা করেন। কিন্তু সাধারণভাবে মুসলমান সমাজে ছিল নিজেদের হীনতা সম্বন্ধে উদাসীনতা ও ব্যাপক কদাচার। তাই বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানদের সরিয়ে তাদের স্থান দখল করছিল নানা ইউরোপীয় জাতি।

এ অবস্থার ঈষৎ পরিবর্তন দেখা দেয় অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে আরবে ওহাবি আন্দোলনের ফলে। নামটির

উৎস অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের আরব বীর আবদুল ওহাবের নাম। এ মতের মূল কথা হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত মূল ইসলাম ধর্মের পরিবর্তনই মুসলমানদের দুরবস্থার কারণ। আদি ইসলামে ফিরে গেলে তাদের ধর্মাচার হবে শুদ্ধ এবং জাগবে দুর্গতি অবসানের আশা। ভারতে এ মতবাদের প্রথম প্রবর্তক শাহ্ সৈয়দ আহম্মদ।

পাঞ্জাবে ১৮২৬-এর শেষে শিখদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধটিকে 'জেহাদ' ঘোষণা করে নেতৃত্ব দেন শাহ্ সৈয়দ আহম্মদ। এ যুদ্ধ পরে মুসলমান ও ইংরেজের যুদ্ধে পরিণত হয়। সারা উত্তর ভারত ও বাংলা দেশ থেকে মুসলমানেরা সে যুদ্ধে যোগ দেন। ১৮৫১-তে যুদ্ধের প্রবলতা বাড়ে এবং সিপাহি বিদ্রোহের সময় তা সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলায় দেখা দেন বিখ্যাত ওহাবি নেতা তিতু মিয়াঁ বা তিতু মির। এঁর সম্বন্ধে যেটুকু খবর পাওয়া যায় তাতে মনে হয় প্রজাদের অধিকার সংকোচনের বিরুদ্ধে, জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর সানুচর প্রতিবাদ। বাংলার মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করার এবং তাদের ধর্মাচার বিশুদ্ধ করার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। তাঁর যোদ্ধা দলের সংখ্যা ছিল আনুমানিক তিন হাজার। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইংরেজদের নিকট পরাস্ত হন। তাঁকে হত্যা করে কলকাতার রাস্তায় লাঞ্ছিত করা হয় তাঁর মৃতদেহ। নিষ্কর বাজেয়াপ্ত করা (১৮২৮) আর ইংরেজির রাজভাষার (১৮৩৬) সম্মান লাভ—এই সময়পর্বের অন্যতম ঘটনা। খ্রিস্টান হওয়ার প্রবণতা এই সময়ে বেড়ে যায়।

এভাবেই ইংরেজ ও মুসলমানদের মধ্যে বেড়ে ওঠে বিদ্বেষ। পরিণামে সচেতন মুসলমানগণ ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে।

সিপাহি বিদ্রোহের আগে খান বাহাদুর (পরে নবাব) আবদুল লতিফ ইংরেজিতে সুশিক্ষিত হয়ে সুযোগ্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর উন্নতি তাঁর নজর এড়ায় না এবং ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঘোষণা করেন দেশের বর্তমান অবস্থায় ইংরেজি-ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষায় বাংলার মুসলমান ছাত্রদের উপকার এবং তা শেখার উপায় সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধকে একশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এর উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজিতে বিজ্ঞানাদি শেখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিক্ষিত মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ। তার আগে ১৮২৫-এ মাদ্রাসায় ইংরেজি শেখানোর চেষ্টা বিফল হয়। ইংরেজি-শিক্ষিত সমকালের হিন্দুদের উন্নতি মুসলমানদের প্রভাবিত করেনি। তার একটি প্রমাণ ১৮৩১-এ মুদ্রিত ইংরেজি ও পারসি ভাষার পত্রিকা 'সমাচার সভারাজেন্দ্র'-র হিন্দু-মনস্কতার জন্য মুসলিম সম্পাদককে সংস্কার বিরোধী সমকালীন পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা'র অভিনন্দন।

জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার দ্বারা মুসলিম সমাজের মানসিক সচেতনতা আনয়নের জন্য ১৮৬৩-তে নবাব আবদুল লতিফ স্থাপন করেন মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি। ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা, নৌ পরিচালনা ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি, আমেরিকা আবিষ্কার, সভ্যতার মোড় ফেরার কাহিনি, মুসলিম আইনের মূল নীতি—এইসব বিষয় সোসাইটির সভায় আলোচিত হত পারসি ও উর্দু ভাষায়। সভায় যথেষ্ট জনসমাগম হত। তাঁদের আপ্যায়নের ভালো ব্যবস্থা ছিল। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন (Bengal Social Science Association)-এ মুসলিম সমাজে শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে পঠিত প্রবন্ধে নবাব আবদুল লতিফ মুসলিমদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণার কথা বলেন। স্থাপনের পর জনপ্রিয় হয় কলকাতা মাদ্রাসা। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা মুসলমানদের আকর্ষণ করেনি। তিনি এজন্য একটি কলেজ স্থাপনের কথা বলেন। সভায় উপস্থিত প্যারীচাঁদ মিত্র মুসলিম সমাজে হিন্দুদের মতো স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কথা জানতে চান। মৌলভি আবদুল হাকিম উর্দুতে জানান মহামহিম পয়গম্বর পুরুষের মতো মেয়েদেরও শিক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে স্ত্রী শিক্ষার প্রমাণ আছে। মুসলমানগণ স্ত্রী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু তারা তাদের মেয়েদের অন্যান্য জাতির মতো স্কুল-কলেজে পাঠাতে চায় না। মুসলিম পুরুষদের শিক্ষার

উন্নতির সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষাও এগিয়ে যাবে। ইসলামের নির্দেশ মেয়েদের পর্দায় রাখা—এর ব্যতিক্রম তাঁরা চান না। জনৈক ডক্টর চক্রবর্তী জানতে চান যে সব হিন্দু মেয়েদের পর্দায় রাখতে চান তাঁরা মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন জানানা শিক্ষার সাহায্যে। মুসলমানগণ কি এ ব্যবস্থার সুযোগ নিচ্ছেন। এর উত্তরে কী বলা হয় তা জানা যায় না।

নবাব আবদুল লতিফের কলকাতা মাদ্রাসার সঙ্গে চারটি কলেজ ক্লাস যুক্ত করার প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। তবে অংশত তাঁর চেষ্টায় হিন্দু কলেজ ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং মুসলমানদের উচ্চ ইংরেজি শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা হয়। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক এবং সে সময়ের বেঙ্গল কাউন্সিল-এর সভ্য সৈয়দ আমির হোসেন মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ে একটি ইংরেজি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটিতে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনের উপর জোর দেওয়া হয় কারণ তা না হলে ভারতের অন্যান্য জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাদের পরাজয় অনিবার্য। এখন মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বীতরাগ নয়, বরং ইংরেজি না শেখার জন্য তারা অনুতপ্ত। সৈয়দ আমির হোসেন আরও বলেন মহসিন ফান্ড-এর টাকার হুগলি, রাজশাহি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাসা শিক্ষার যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে মুসলমানদের প্রকৃত উন্নতি হচ্ছে না। অতএবং হুগলি মাদ্রাসা বন্ধ করে রাজশাহি ও চট্টগ্রাম মাদ্রাসার টাকার পরিমাণ কমানো হোক। এর ফলে প্রাপ্ত বার্ষিক তিরানব্বই হাজার টাকা দিয়ে কলকাতা মাদ্রাসা ভবনে একটি বি. এ. কলেজ খোলা হোক। কারণ প্রেসিডেন্সি কলেজ মুসলিম মহল্লা থেকে দূরে হওয়ায় যাতায়াতে ছেলেদের মাথা পিছু মাসিক কুড়ি টাকা খরচ হয়। সে ক্ষেত্রে মাদ্রাসা-দালানে কলেজ খুললে তাদের বহু সুবিধা হবে। বার্ষিক বাইশ হাজার টাকা ব্যয়ে ইংরেজ অধ্যক্ষ নিয়ে আলিগড়ে এফ. এ. ক্লাস পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। কাজেই বার্ষিক তিরানব্বই হাজার টাকা ব্যয়ে কলকাতা মাদ্রাসার দালানে বি. এ. কলেজ চালানো সহজ। এতে সরকারি অর্থসাহায্য ব্যতীত মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার সুব্যবস্থা হবে। মাদ্রাসায় ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য আবশ্যিক করার প্রস্তাবও করা হয়।

তখনকার হিন্দু পরিচালিত পত্রিকা 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'ইন্ডিয়ান মিরর' 'বেঙ্গালী' সৈয়দ আমির আলির মাদ্রাসায় কলেজ খোলার প্রস্তাব সাগ্রহে সমর্থন করেন। কেশবচন্দ্র-দলের পত্রিকা 'ইন্ডিয়ান মিরর' মন্তব্য করে এ ব্যাপারে সরকারি অর্থ ব্যয়ও সংগত। ডবলু. ডবলু. হান্টার প্রস্তাবটি সমর্থন করলেও তখনকার বাংলার ছোটো লাট স্যার অ্যাসলি ইডেন (Sir Asley Eden) বলেন এ প্রস্তাব গ্রহণের দুটি বাধা বর্তমান—(১) মুসলমানদের জন্য স্থাপিত কলেজ প্রেসিডেন্সি প্রভৃতির মতো উচ্চাঙ্গের হবে না। (২) মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের অনুরাগ কমেনি। কলকাতা মাদ্রাসার আরবি বিভাগের ছাত্র সংখ্যা ইংরেজি বিভাগের প্রায় দশ গুণ বেশি। সারা বাংলায় বছরে বত্রিশজন মুসলিম ছাত্র এন্ট্রাস পাশ করে। তাদের মধ্যে হয়তো কুড়ি জন কলেজে যায়। এত কম ছাত্র নিয়ে একটি কলেজ চলে না। তিনি কলকাতার কলেজগুলিতে বরাদ্দ মাইনের এক তৃতীয়াংশ দিয়ে মুসলিম ছাত্রদের অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন।

মুসলমানদের শিক্ষার জন্য নবাব আবদুল লতিফের আর একটি উল্লেখ্য কাজ মহসিন ফান্ড-এর পুনর্গঠন। তিনি মুসলমানদের আরবি-ফারসি ভিন্ন ইংরেজি শিক্ষার জন্য সে অর্থের ব্যবহারের কথা বলেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। ওহাবি বিদ্রোহীরা ভারতকে বলেছিল 'দারুল হরব'—অর্থাৎ যুদ্ধবিগ্রহপূর্ণ অমুসলিম রাষ্ট্র—যেখানে আত্মরক্ষার জন্য মুসলমানদের কর্তব্য যুদ্ধ করা। ফলে ইংরেজ সরকার মুসলমানদের প্রতি বিরূপ হন স্বাভাবিকভাবেই। এ সময়ের পারসি সংবাদপত্র 'দূরবীণ' এবং বিপিনচন্দ্র পালের 'আত্মচরিত' থেকে এ বিরূপতার প্রমাণ মেলে। এ পরিস্থিতিতে নবাব আবদুল লতিফ বিখ্যাত ধর্মাচার্য মৌলানা

কেরামত আলিকে দিয়ে ফতোয়া লেখান ভারতবর্ষ 'দারুল হরব' নয়, 'দারুল ইসলাম' অর্থাৎ ইসলামের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। কারণ ইংরেজ সরকার মুসলমানদের ধর্মকর্মে বাধা দেন না।

নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির হোসেন মুসলমানদের জন্য যে আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চান তার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি ভাষাসাহিত্য ও ইউরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের মাধ্যমে তাদের সরকারি চাকরির যোগ্য করা। এই নতুন শিক্ষাকে যথার্থ কার্যকর করার জন্য জগৎ ও জীবন সম্পর্কে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁরা আদৌ সচেতন ছিলেন না। হিন্দুদের মধ্যে রামমোহনের কাল থেকে দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে শুরু করে। এসময় কেশবচন্দ্রের প্রয়াসে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠেছিল নতুন শক্তি। হিন্দুরা প্রতিমাপূজা, জাতিভেদ, বিধবাবিবাহ নিয়ে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন নতুন এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। এইরূপ সংস্কারের প্রয়োজন না থাকায় সম্ভবত মুসলমানগণ হিন্দু সমাজের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নতুন বোধ এবং তার সার্থক রূপায়ণের অশ্রান্ত চেষ্টার দিকটি বোঝেননি।

তবে আলিগড়ের স্যার সৈয়দ আহমদের মধ্যে এ চেতনার আংশিক প্রকাশ দেখা যায়। তিনি বলেছিলেন 'যা সত্য নয় তা ইসলাম নয়'। এ দৃষ্টিতে কোরআনের নতুন ভাষ্য রচনা আরম্ভ করেন তিনি। কিন্তু আপন সম্প্রদায়ের প্রবল বিরোধিতার জন্য তিনি সে চিন্তা বাস্তবায়িত করতে পারেননি। মুসলমানদের জন্য ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞান চর্চার কিছু ব্যবস্থা করেই তাঁকে তুষ্ট থাকতে হয়। আলিগড়ে এর বেশি কিছু হয়নি। বরং মুসলিম ধর্ম ও সমাজের পুনর্গঠন সম্বন্ধে তাঁর মত প্রকৃতি-অনুবর্তিতা বলে নিন্দিত হয়।

একালে মুসলিম জগতে প্রকৃত জাগরণ দেখা দিয়েছিল তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক-এর নেতৃত্বে। ১৯২৬-এ ঢাকার 'শিখা' সম্প্রদায় বাংলায় এরূপ জাগরণের চেষ্টা করেছিল।

নবাব আবদুল লতিফ ফরিদপুর জেলার বাঙালি আর সৈয়দ আমির হোসেন পাটনার লোক। আবদুল লতিফ আরবি-পারসির চর্চা বেশি করতেন। তবে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের পর তাঁর মুসলিম লিটারারি সোসাইটিতে বাংলার চর্চাও হত।

১৮৮১ বা ১৮৮২ উনিশ শতকের বিখ্যাত মুসলিম নেতা প্যান ইসলামবাদের প্রচারক জামালউদ্দিন আফগানি কলকাতায় আসেন। প্যান ইসলামবাদের অর্থ বিশ্বের সব মুসলমান একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ—অতএব তাদের ইউরোপীয় শক্তিবর্গের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম একইভাবে করা উচিত এই বিশ্বাস।

তিনি বিজ্ঞান ও ইসলামের মধ্যে বিরোধ নেই—এ শিক্ষা দান করেন। তাঁর মত ছিল বিজ্ঞান আয়ত্ত করে মুসলমানগণ নতুন করে শক্তিশালী হোক। বিপিনচন্দ্র পালের 'আত্মচরিত' থেকে জানা যায় জামালউদ্দিন আফগানির কলকাতা ভ্রমণের পর এদেশের মুসলমানগণ প্যান ইসলামবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন।

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে এই সময়ে মুসলমানদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল দুটি চেতনা। একটি এসেছিল ওহাবি মতবাদ এবং ইংরেজ-ওহাবি সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। অন্যটি এল ইংরেজি না শিখে হিন্দুদের থেকে পিছিয়ে-পড়া জনিত ক্ষোভ ও বাস্তব চেতনা থেকে। এই দুই চেতনার প্রভাবে মুসলমানগণ সক্রিয় হয়ে উঠল। তাদের উদ্যম প্রকাশ লাভ করল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন-এর কর্মধারায় এবং ধর্মসংস্কারের প্রয়াসে।

ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্ভব সময় জানা যায় না। তবে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবটি ছিল সঠিক। প্রতিষ্ঠানটি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার একটি প্রমাণ ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু তাঁর এক লেখায় বলেন মুসলমানদের ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন-এর মতো হিন্দুদেরও স্ব-সমাজের উন্নতির জন্য 'মহাহিন্দু সমিতি গঠন' করা দরকার। উক্তিটি তাঁর হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রমাণ—যার কথা আগেই বলা হয়েছে।

ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন-এর অন্যতম প্রধান পরিচালক ছিলেন জাস্টিস সৈয়দ আমির আলি। স্যার সৈয়দ আহমদ আলিগড়ে যে ধরনের মুসলিম জাগরণের চেষ্টা করেন সৈয়দ আমির হোসেনের প্রয়াস ছিল কতকটা সেরূপ। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দ্য স্পিরিট অব ইসলাম'-এ তিনি ইসলামের উদার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং বোঝাবার চেষ্টা করেন ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি যে রূপ নিয়েছে, মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির গতি সেই দিকেই। সৈয়দ আমির আলির গুরুস্থানীয় স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমান ও ইংরেজদের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের চেষ্টায় বাইবেল-এর উর্দু অনুবাদ করেছিলেন। ওহাবি মতবাদ ও বিদ্রোহের ফলে মুসলমানদের সম্পর্কে ইংরেজদের মনে জেগেছিল অবিশ্বাস। তা দূর করার জন্য চেষ্টা করেন তিন মুসলিম নেতা—নবাব আবদুল লতিফ, স্যায় সৈয়দ আহমদ ও সৈয়দ আমির আলি। সৈয়দ আমির আলি ইসলামের যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা দিয়ে ওহাবি মত খণ্ডনের চেষ্টা করেন। বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে আমির আলির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন-এর মাধ্যমে তাঁর প্রভাব বিশেষ কাজ করেছিল। তার ফলে বাংলার মুসলমানগণ গঠন করে নানা আঞ্জুমান বা সম্মেলন। এদের লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করা এবং ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রবিষয়ে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সংহত ও সুস্পষ্ট করা। প্যান ইসলামবাদের কিছু ছায়া এসব আঞ্জুমানের উপর পড়েছিল। তার ফলে বাংলার মুসলমানেরা বহির্ভারতের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির কথা ভাবতে শুরু করে এইমাত্র।

এ যুগে কয়েকজন মুসলমান সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের জন্ম হয়। তাঁরা কতকটা হিন্দু জাতীয়তাবাদের অনুসরণে মুসলমানদের অতীত-গৌরব কথা একটু উচ্চস্বরে প্রচার করেন। এসবই ঘটেছিল কংগ্রেসের সূচনাকালে ও তার কিছু পরে।

মৌলানা কেরামত আলি ওহাবিদের মতের বিরোধী ফতোয়া দিয়ে বলেন ভারতবর্ষ 'দারুল ইসলাম' অর্থাৎ মুসলমানের মিত্র দেশ। কিন্তু ওহাবিপন্থীদের মতোই আদি ইসলামে প্রত্যাবর্তন-মূলকতাই ছিল তাঁর ধর্মসংস্কারের ভিত্তি।

এদেশের শিক্ষিত মুসলমানগণ ধর্মের নিয়ম-কানুনের কিছু খবর রাখতেন আর পোশাক ও আদব-কায়দায় মুসলমানি রীতিনীতি মেনে চলার চেষ্টা করতেন। সাধারণ মুসলমানদের ধর্মমতে কিন্তু ইসলামের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল হিন্দু-বৌদ্ধ মতবাদ। তাঁদের দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারে দেখা যেতে এর প্রকাশ। তাঁরা পিরের স্থানে মানত করতেন, করতেন ওলাবিবি, শীতলা, লক্ষ্মী, হাজরা ঠাকুর প্রভৃতি লোকদেবতার পূজা। কোনো কোনো মুসলমান দুর্গা ও কালীপূজা করতেন। তাঁর চিন্তাজগতেও লক্ষিত হত নানা মতের মিশ্রণ। দৃষ্টান্ত হিসেবে আলিরাজা ওরফে কানু ঠাকুরের 'জ্ঞানসাগর' কাব্যের নাম করা যায়। চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত কাব্যটির রচনাকাল আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের মতে উনিশ শতকের প্রথম ভাগ। কাব্যটিতে মোহাম্মদ আর কৃষ্ণের অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটেছে। বাউলদের চিন্তায়ও দেখা যায় অনুরূপ মিশ্রণ। ইসলামি শরিয়ত অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনে পালনীয় নিয়মাদির কোনো প্রভাব বাউলদের মধ্যে নেই। গুরু বা মুর্শেদ তাদের সত্য পথের দিশারি, লক্ষ্য 'নিরঞ্জনলাভ' বা মহাসুখের অনুভব।

মৌলানা কেরামত আলি এসব আচার ও মত দূর করে তাদের চিরাগত মুসলিম ধর্মাচার ও বিশ্বাসে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। আঞ্জুমানগুলিকে কেন্দ্র করেও চলতে থাকে একই কাজ। এই মুসলমানীকরণ উনিশ শতকের বাংলার একটি উল্লেখ্য ঘটনা। মৌলভি-মৌলানারা কিছু জবরদস্তি করলেও মোটের উপর বিনা বাধায় একাজ হয়। কারণ মুসলিম সমাজে প্রবিষ্ট আচার-ব্যবহারের তুলনায় প্রাচীন ইসলামি আচার অনেক ক্ষেত্রেই ভালো ছিল। গুরু অপেক্ষা পয়গম্বরের আনুগত্যের গৌরব অধিক—এ যুক্তি খণ্ডন করতে পারেনি বাউলগণ। তবে তাদের গানে মাঝে

মাঝেই শোনা যেত ধর্মের অন্তঃসারশূন্যতার কথা। মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে মীর মোশাররফ হোসেন ক্ষীণকণ্ঠে হিন্দুদের সঙ্গে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য গোহত্যা বন্ধের কথা বলে প্রবল প্রতিবাদের সম্মুখীন হন।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বকাল পর্যন্ত এভাবেই বাংলার মুসলমানগণ নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও পশ্চাৎপদ অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়। অথচ এ সময়েই কেশবচন্দ্র ধর্মগ্রন্থ অপেক্ষা মানবজীবনের অধিক গৌরবের কথা প্রচার করেন। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, বাংলা—এমনকি কোনো কোনো মুসলিম মনীষী মানবমহত্ত্বের কথা বলেন। স্যার সৈয়দ আহমদের শিষ্যস্থানীয় মুসলমান কবি হালী যা বলেন তার মর্ম—মানুষের কাছে আসবে মানুষ—এটাই শ্রেষ্ঠ ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বর-আরাধনা। এই অতি প্রয়োজনীয় নতুন জীবনচেতনা তেমন করে পৌঁছোয়নি মুসলমানদের কাছে। তাদের অন্তরাত্মা গ্রহণ করতে পারেনি এই সূক্ষ্ম নবজীবন-সঞ্চারী অনুভব। সে কারণেই বাংলার নব জাগরণ মুসলিম সমাজের কাছে পৌঁছোয়নি বলা যায়।

পঞ্চম বক্তৃতা তথা পঞ্চম অধ্যায়ে কাজী আবদুল ওদুদ মূলত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের কর্মপ্রণালী এবং রেনেসাঁস-এর সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন। তারই সঙ্গে প্রথম অংশে বাঙালির রাজনৈতিক চেতনা তথা আন্তর্জাতিক চেতনার বিকাশের স্তর পরম্পরা আর থিয়সফি ও হিন্দু পুনর্জাগরণের দিকটিও বিশ্লেষণ করেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালি হিন্দুর জাগরণকে সর্বভারতীয় করে তোলেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করে। ধর্মের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতার বিলোপ করার সাধনা ছিল কেশবচন্দ্রের। তাই বাইবেল আর সমকালীন ইউরোপীয় ধর্মবাদীদের চিন্তাধারার আধ্যাত্মিক দিকটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এ মনোভাব ফরাসি বিপ্লব এবং তার পরের ইউরোপের নব মানবতা আর নতুন মানসিকতা গ্রহণের পরিচায়ক। প্রবল স্বাদেশিকতা আর আন্তর্জাতিকতা এসময় বাংলায় বড়ো হয়ে উঠেছিল।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠনের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার বয়স উনিশ থেকে বাড়িয়ে বাইশ করা। সুরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় এ ব্যাপারে সর্ব ভারতীয় সমর্থন পাওয়া যায়। একমাত্র উত্তর ভারতের মুসলিম নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ সমর্থন করেননি এই প্রয়াস; কারণ সিপাহি বিদ্রোহ ও ওহাবি বিদ্রোহ দমনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কঠোর নীতি। ইংরেজ-সমর্থক স্যার সৈয়দ আহমদের মধ্যে দেশপ্রেমের সঙ্গে মিশেছিল স্বধর্ম ও স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর প্রীতি। তিনি ব্রিটিশ সরকার ও মুসলমানদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গঠন করে তাদের বিপদমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সে কারণে সুরেন্দ্রনাথের সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করার মনোভাব তাঁকে শঙ্কিত করে। তিনি কিন্তু উন্নতিশীল বাঙালিদের শ্রদ্ধা করতেন এবং মুসলমান ধর্ম ও সমাজের পুনর্গঠনের কথা ভেবেছিলেন। তাঁর এই বাধাদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সুরেন্দ্রনাথ অবশ্য এই বাধায় ক্ষান্ত না হয়ে ভারতের সকল প্রদেশ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের কাজ চালিয়ে যান। তাঁর এ প্রয়াসের ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। সুরেন্দ্রনাথের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন আর কেশবচন্দ্রের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার কর্ম এ সময়ের বাংলার শ্রেষ্ঠ উদার মানবিক এবং সৃষ্টিধর্মী কাজ।

এ সময়ে বাংলায় প্রতিক্রিয়াধর্মী সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদও পুষ্ট হতে থাকে ব্রিটিশ শাসকের বিরূপ মনোভাবের ফলে। ব্ল্যাক অ্যাক্টস (Black Acts)-এর সময়ে ইংরেজের বিরূপ মূর্তি বাঙালি প্রথম দেখেছিল। বাঙালির শক্তির নব নব স্ফুরণের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের বিরূপতা বাড়তে থাকে।

শিক্ষিত বাঙালি সমাজ যখন আপন অধিকার বুঝে নেবার জন্য আগ্রহী হল তখন ব্রিটিশ সরকার যেন নিঃসন্দেহ হল ভুল করে বাঙালিকে সে এতটা বৃদ্ধির সুযোগ দিয়েছে। সে ভুল সংশোধনের চেষ্টায় সরকার বাঙালির উচ্চ শিক্ষার সুযোগ হ্রাস করল, সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের কড়া ব্যবস্থা নিল আর অস্ত্রশস্ত্র রাখার পথে বাধা সৃষ্টি করল। বাঙালির

বিকাশশীল মন বাধাগুলিকে অবাঞ্ছিত মনে করল; ইংরেজের সঙ্গে তার নিবিড় প্রীতির সম্পর্কে দেখা দিল ফাটল। এসময়ে ঘটে গুরুত্বপূর্ণ দুটি ঘটনা—ভারতে থিয়সফির আবির্ভাব এবং ইলবার্ট বিল প্রণয়ন।

ভারতে থিয়সফির ব্যাখ্যাতা রূপে এলেন মাদাম ব্লাভাট্স্কি (H. P. Blavatsky : ১৮৩১-১৮৯১) এবং কর্নেল ওলকট (Col. Henry Stel Olcott : ১৮৩২-১৯০৭)। তাঁদের মূল বক্তব্য হিমালয়ের অগম্য অঞ্চলে আছেন বহু মহাযোগী। তাঁরা সেখান থেকে যোগবলে বা আত্মিক বলে জগতের ঘটনাসমূহ নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং মানুষের নব নব উন্নতি সম্ভব করছেন। হিন্দু দেবদেবীগণ মিথ্যা নন, মিথ্যা নয় তাঁদের দিব্য শক্তির প্রভাব।

বাংলার সংস্কার আন্দোলন শিক্ষিতদের মধ্যে সীমিত ছিল; সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হয়নি। শাসকগণ এরপর দেশের উন্নতিতে আনল বাধা। এই পরিস্থিতিতে থিয়সফি ব্যাখ্যাতাদের মুখে দেশীয় দেবদেবী ও হিমালয়স্থ মহাযোগীদের অপূর্ব শক্তির কথা সোজাসুজি অবিশ্বাস করতে পারলেন না শিক্ষিত সমাজ।

ইলবার্ট বিল-এ প্রস্তাব করা হয় কয়েক শ্রেণির ভারতীয় জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট বিচার কার্যে ইউরোপীয় জজ আর ম্যাজিস্ট্রেটদের সম মর্যাদা পাবেন। এ প্রস্তাব দেশস্থ ইউরোপীয়দের বিদ্রোহী করে তোলে। দেশীয় বিচারকদের সমালোচনা প্রসঙ্গে তারা ভারতীয়দের আক্রমণ করল। তাদের মতে প্রতিমাপূজক, জাতিভেদে বিশ্বাসী ভারতীয়গণ নৈতিক দিক দিয়ে ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা হীন। অতএব তাদের বিচারের যোগ্যতা এদের নেই।

মর্যাদার উপরে এ আঘাতের ফল হল বিচিত্র। এতদিন ভারতীয়গণ বিশেষত বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা স্বদেশের নানা রীতিনীতি, মত ও বিশ্বাসের কঠিন সমালোচনা করে আসছিলেন। ইউরোপীয়দের এই গর্বিত অপমানকর ব্যবহারে তাদের মানসিকতা পালটে গেল। এক দিকে ইউরোপীয় সমাজের দোষত্রুটির সমালোচনা শুরু হল, অন্য দিকে বাল্যবিবাহ, প্রতিমাপূজা, জাতিভেদ প্রভৃতি কুপ্রথাকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা শুরু হল। (থিয়সফির প্রচলন কালে উত্তরভারতে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী স্থাপন করেছিলেন প্রতিমাপূজা-বিরোধী, বেদ অনুবর্তী আর্য সমাজ। এ সমাজে অন্য ধর্মের ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হয়ে প্রবেশ করতে পারত। উত্তর ভারতে আর্য সমাজের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।))।

এই পরিবর্তিত মনোভাবের চিত্র দেখা গেল সাহিত্যে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৯০৩) কিছু কবিতায় আছে বাঙালি মনে ইংরেজস্তুতির অশোভন রূপান্তরের চিহ্ন।

যে আত্মবিশ্বাস-বলে এদেশীয়গণ ইউরোপীয়দের আঘাত করতে পেরেছিল তারই বিশেষ প্রকাশ ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ছিল এর উৎস। প্রথমে কংগ্রেস শান্তভাবে সরকারকে দেশের মানুষের বিশেষত শিক্ষিত সমাজের উপকারের পথ প্রদর্শনের প্রয়াসী হয়। কিন্তু জাতির আত্মপ্রকাশের যে তাগিদ কংগ্রেসের উৎস তা তাকে শান্ত থাকতে দিল না। সরকার প্রথমে কংগ্রেসকে উপেক্ষা করলেও পরে গুরুত্ব দেয়। তার প্রমাণ সরকারি কর্মচারীদের কংগ্রেসি-প্রভাব মুক্ত রাখার দিকে নজর দেওয়া হয়।

কংগ্রেসে যোগদান বিষয়ে স্যার সৈয়দ আহমদের নিষেধ সব মুসলমান মানে না। কংগ্রেস ক্রমে নবীন ভারতের ধর্ম-বর্ণ-প্রদেশ অতিক্রমী অধিকার-সচেতন জীবনবোধ থেকে রস আহরণ করে শক্তি লাভ করে।

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ দেখা দিল অদ্ভুতভাবে। এই অদ্ভুতত্ব হয়ে উঠল শক্তি। এই নতুন শক্তি ও তার সাধনা মূল্যবান হলেও দেশের শিক্ষিত শ্রেণির কম মানুষই তার তাৎপর্য বুঝে ঠিকমতো গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিল।

১৮৪৫-এ খ্রিস্টান পাদ্রিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সনাতনী হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মিত্রতা হয়েছিল। এ সময়ে তার সাময়িকত্ব প্রমাণিত হয়। কারণ সনাতনীরা শক্তি সঞ্চয় করে সংস্কারপন্থীদের শক্তিহীন করে দেয়।

রামমোহন ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বিতর্ক থেকে বোঝা যায় ধর্মের মূল কথা যে নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তা মৃত্যুঞ্জয় বুঝতে পারেননি। ধর্ম তাঁর কাছে ছিল বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মন্ত্রপ্রয়োগের মতো প্রক্রিয়া মাত্র। ১৮৮০-র কিছু পরে আবার এই চেতনা প্রবল হয়ে ওঠে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির প্রচেষ্টায়। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সাকার ও নিরাকার উপাসনা বিষয়ে তর্ক হয়। শশধর তর্কচূড়ামণির মতে ঈশ্বর দুর্জ্ঞেয়; সেই দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরের নিকট ব্রাহ্মদের মতো প্রার্থনা অর্থহীন। এই ঈশ্বর-উপাসনার প্রকৃত পথ হিন্দু সমাজের প্রচলিত প্রতীক উপাসনা। কারণ তা সহজে মানুষ গ্রহণ করতে পারে। ধর্ম শশধর তর্কচূড়ামণির কাছে লৌকিক ব্যাপার। লৌকিক রূপবাদ দিয়ে যা ভাবা যায় তা সহজবোধ্য নয় বলেই তাতে সুফলের আশা নেই। ধর্মের আসল কাজ যে মানুষের নৈতিক চেতনার উদ্দীপন সে সম্পর্কে শশধর চিন্তা করেননি। শশধর তর্কচূড়ামণির মত বেশ জনপ্রিয় হয় বিশেষত তাঁর বৈজ্ঞানিক পরিভাষার প্রয়োগের কারণে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কিছু বক্তৃতায় উপস্থিত থাকলেও শেষ পর্যন্ত বলেন এই হিন্দুধর্ম আধুনিক কালের অনুপযোগী। তাঁর যুক্তি রামকৃষ্ণ পরমহংসকেও খুশি করেনি। তথাপি শশধর তর্কচূড়ামণির তৎকালীন জনপ্রিয়তার কারণ ঈশ্বর সম্পর্কে ব্রাহ্ম সমাজের বেশির ভাগ সদস্যের ভাববিলাসের আধিক্য। ঈশ্বরের দুর্জ্ঞেয়তার উপর জোর দেওয়ায় সেই ভাববিলাসের ঘোর সহজেই কেটে যায়। কোনো ব্যাপারে বাড়াবাড়ি হলেই তার প্রতিক্রিয়া হয় প্রবল। তাই ঈশ্বর-নাম কীর্তনের অতিরেক সহজেই ঈশ্বর সম্বন্ধে অবিশ্বাস বা অমনোযোগের রূপ নেয়।

এরপরে আসে সনাতন হিন্দু ধর্মের সর্বাত্মক জাগরণ—ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক বাঙালিও যার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারেনি। তার কারণ শুধু তর্কচূড়ামণির নতুন ব্যাখ্যা নয়; হিন্দু জাতীয়তাবাদ মন্থরগতি ব্রাহ্মদের (আদি ব্রাহ্ম সমাজ) মধ্যে, বঙ্কিমচন্দ্র-ভূদেবের রচনায় ক্রমপুষ্ট হয়ে উঠছিল। তার সঙ্গে থিয়সফিক্যাল আন্দোলন, রাজনীতি ক্ষেত্রের ব্যর্থতা যুক্ত হয়ে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদকে করল শক্তিশালী। শেষের দিকে রামকৃষ্ণ পরমহংসের অসাধারণ সাধনা আর তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্মের নতুন ব্যাখ্যাদান ও বলিষ্ঠ প্রচারে এই ভাবধারা আরও শক্তি লাভ করল। অনেকে বলেন এঁদের সাধনায় উনিশ শতকের রেনেসাঁস হয়েছে সবচেয়ে সফল।

রামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনায় অলৌকিকতা পেয়েছে অধিক গুরুত্ব। তথাপি তাঁর সাধনায় পাওয়া যায় গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য।

আনুমানিক ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে দরিদ্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দম্পতির পুত্র রামকৃষ্ণের জন্ম। শৈশবে পড়াশোনা তেমন হয়নি। তবে গান, অভিনয়, ছবি আঁকা মূর্তি গড়ার সঙ্গে শাস্ত্রপাঠ শ্রবণও তাঁর প্রিয় ছিল। এসময় ভাবাতিশয্যে মাঝে মাঝে তাঁর মূর্ছা হত। এসব থেকে তাঁর মনের গঠন, আচরণ প্রচারের ধারা বোঝা সহজ হয়।

তরুণ বয়সে তিনি দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের পূজারী নিযুক্ত হন। রামপ্রসাদের গান তাঁর প্রিয় ছিল। ক্রমে রামপ্রসাদের মতো কালীকৃপা লাভের কামনা তাঁর মনে প্রবল হয়। আকুল আর্তিতে কালীমূর্তির সামনে আত্মহত্যায় উদ্যত তাঁর দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়। তিনি প্রত্যক্ষ করেন সর্বব্যাপ্ত এক চিন্ময় সত্তার রূপ। পরে তিনি তান্ত্রিক সাধনা, বৈষ্ণব সাধনা, অদ্বৈত সাধনা—হিন্দু ধর্মের এসব সাধনার সঙ্গে সুফিমত ও খ্রিস্টীয় সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করেন। এভাবে তিনি উপলব্ধি করেন এক পরম সত্যই সব ধরনের সাধনা ও ধর্মের অন্বিষ্ট। ক্রমে সিদ্ধপুরুষ হিসেবে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হয়। ১৮৭৬-এ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। তাঁর পরিচালিত পত্রিকায় রামকৃষ্ণ সম্পর্কে শ্রদ্ধাপূর্ণ আলোচনা মুদ্রিত হয়। এভাবে তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালি (হিন্দু) সমাজে রামকৃষ্ণের খ্যাতি ছড়ায়।

পোশাক সন্ন্যাসীর না হলেও বিবাহিত রামকৃষ্ণ ছিলেন পুরো সন্ন্যাসী। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় নারী সম্পর্ক বর্জনের মত পোষণ করতেন। আসলে তাঁর সাধনা ছিল ইহজীবনবিমুখ মধ্যযুগীয় সাধনা। তথাপি কয়েকটি কারণে তাঁর প্রভাব এশ্রেণির অন্যান্য সাধকের চেয়ে বেশি—

(১) হিন্দু ও অহিন্দু—উভয় মতের সাধনা করেছিলেন রামকৃষ্ণ। এভাবে বাংলা দেশের বিশ্বমুখী সাধনার সঙ্গে তাঁর যোগ স্থাপিত হয়। দেশের প্রাচীন পন্থার সাধনায় এ ছিল এক নতুন ব্যাপার।

(২) উনিশ শতকের বাংলার শিক্ষিত হিন্দু সমাজে ছিল প্রতিমাপূজা-বিরোধী মনোভাব। রামকৃয়ের সাধনা থেকে আকার ও নিরাকার সাধনার সমমূল্যতা বুঝেছিলেন এই সমাজ। বর্ধনশীল হিন্দু জাতীয়তাবাদ তাঁর এ সাধনা থেকে লাভ করেছিল বিশেষ আনুকূল্য।

(৩) রামকৃষ্ণের মতো প্রায় নিরক্ষর ব্যক্তির গভীর জ্ঞানপূর্ণ বাক্যালাপ; বিশেষত ভাব-সমাধির আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার।

(৪) শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বব্যাপ্ত খ্যাতি রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক খ্যাতিকে বর্ধিত করে।

ফরাসি মনীষী রমাঁ রলাঁ (Romain Rolland : ১৮৬৬-১৯৪৪) রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মতে অন্তর্মুখীনতা কখনও কর্মপ্রবণতাকে ক্ষুণ্ণ করেনি। ভারতের অন্তর্মুখী সাধনাই তার জাতীয় পুনরুত্থানের ভিত্তি। কারণ কর্মশক্তির উৎস আত্মা। পাশ্চাত্যের বহির্মুখ জাতিদের উচিত আপন আত্মায় সৃষ্টিধর্মী শক্তির উৎস সন্ধান। নতুবা ব্যাপ্ত যান্ত্রিক জ্ঞানই হবে তাদের ধ্বংসের কারণ। আধুনিক ইউরোপের বহির্মুখীতার জন্য তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত ছিলেন রোলাঁ। তাই রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং তাঁর শক্তিমান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের চরিতকথার দিকে তিনি পাশ্চাত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কারণ এঁদের মধ্যে লক্ষিত হয় একালের আধ্যাত্মিক সাধনার চরমোৎকর্ষ। প্রসঙ্গত তিনি প্রাচীন ইউরোপের উন্নত আত্মিক সাধনার কথাও বলেছেন। কিন্তু আত্মিক বা মরমিসাধনার অবাঞ্ছিত রূপ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না।

আত্মিক সাধনার বিকৃত পরিণাম কেশবচন্দ্রের শিষ্যদের মধ্যে লক্ষিত হয়। রামকৃষ্ণের ভগবৎ-উপলব্ধি কেশবচন্দ্রের তুলনায় অনেক গভীর ছিল। ঈশ্বরচেতনা এবং তার অনুষঙ্গ ভগবৎ-নির্ভরতা যে মানুষকে সহজে দুর্ভাগ্যের ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারে উৎকৃষ্ট উদাহরণ রামকৃষ্ণের জীবন।

কিন্তু তাঁর এই ঈশ্বরচেতনা ও নির্ভরতা অনেক সময় এত স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে যে লোককল্যাণের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয় ছিন্ন নতুবা শিথিল হয়েছে। কোমলমনা হলেও লোকশ্রেয় সম্পর্কে তাঁর চিন্তা যে সুবিকশিত হয়নি তার প্রমাণ তাঁর বাণীতেই আছে।

রামকৃষ্ণের মতে ঈশ্বরলাভ যাঁরা করেন তাঁদের আচরণ হয় জড়, বালক, উন্মাদ বা পিশাচের মতো। কিন্তু পৃথিবীর বহু সুপরিচিত ঈশ্বরভক্তের আচরণ এরূপ ছিল না। রামকৃষ্ণের আচরণও ছিল কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন সাধারণ মানুষের মতো, বালক, উন্মাদ বা পিশাচের মতো নয়। সৌম্য, সচেতন, শান্ত, মৈত্রী ও করুণা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বই সর্বকালের মানুষের শ্রেষ্ঠ কাম্য। লোককল্যাণও এসেছে এই পথে। জনমঙ্গালের সঙ্গে যোগহীন ভগবৎ-চেতনা বা নির্ভরতা বা লোককল্যাণের প্রেরণাহীন ঈশ্বরনির্ভরতা উচ্চশ্রেণির ভাববিলাস মাত্র। প্রগল্‌ভ ভক্তির অবাঞ্ছিত পরিণাম বার বার মানব-ইতিহাসে দেখা গেছে।

রামকৃষ্ণের চিন্তার আর এক দুর্বলতা হিন্দু সংস্কারকে চিরন্তন বলে গ্রহণ করা। কাশীর শ্মশানে তিনি শিব ও

শিবানীকে মৃতাত্মার মুক্তিদাতা হিসেবে দেখেছিলেন। স্থানবিশেষে মৃত্যুর ফলে আত্মার সদ্‌গতি সম্ভব—এ ধারণা ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের সংস্কার মাত্র। এ চিন্তায় ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ কেউ না জানলেও তাঁকে সুন্দর, মহতের বিধাতা বলে বিশ্বাস করা হয়। সেই সুন্দর ও মহতের ক্লান্তিহীন অন্বেষণই মানুষের কর্তব্য—মানব-অন্তরে এটাই বিধাতার চিরন্তন নির্দেশ। সুন্দর, মহৎ আর ন্যায় লাভের পথে অশ্রান্ত চেষ্টার সহায়তাই মানুষের মরমি সাধনের প্রকৃত তাৎপর্য। কিন্তু স্ব-সম্পূর্ণ মরমি সাধনা এ তাৎপর্য বজায় রাখতে পারে না বলেই ব্যর্থ হয়। রামকৃষ্ণদেবের সাধনায় এ সম্ভাবনা ছিল। তাঁর অলৌকিক দর্শনও সব মরমি সাধনার সাধারণ দুর্বলতা।

পরমহংসদেবের বিখ্যাত চিন্তা ‘যত মত তত পথ’—এর মূল্য সম্বন্ধেও আছে সংশয়। কারণ কোনো কোনো মতকে (যেমন বামাচার) তিনি যোগ্য মনে করেননি আর সন্ন্যাসের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল পক্ষপাত।

তিনি এই কথা বলে কেশবচন্দ্রের মতো মানুষকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এ শুভেচ্ছার মূল্য কম নয়। তবে তাঁর শিষ্যরাও ‘যত মত তত পথ’কে সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের সূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন—যদিও তা বিচারসহ নয়। কারণ সব ধর্ম সত্য—এ চিন্তা সঠিক নয়। সকল ধর্মের মধ্যেই আছে বহু মিথ্যা বা অসফল ভাবনা—তাদের অতিক্রম করার চিন্তাই সত্য চিন্তা। ধর্মের যথার্থ অর্থ মনুষ্যত্বের সাধনা। আনুষ্ঠানিক ধর্ম যদি এই মনুষ্যত্ব-সাধনার সহায়ক হয় তবেই তা প্রকৃত ধর্ম, নতুবা তা আচার মাত্র। মানবতার সাধনা সর্বদা আনে নতুন নতুন দাবি। তাই ধর্ম কী—তার সন্ধান অতীতের চেয়ে বর্তমানে করাই কর্তব্য। তার সঙ্গে চাই বর্তমান কেমন করে ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠে সে সম্বন্ধে সচেতনতা। ‘যত মত তত পথ’ চিন্তায় অতীত-প্রভুত্ব অধিক বলেই তা তত্ত্বকে ছাড়িয়ে যথার্থ সত্য হয়ে উঠতে পারেনি।

মানুষের সর্বাপেক্ষা বড়ো সম্পদ সৃষ্টিশক্তি। ‘যত মত তত পথ’ সৃষ্টিমূলক চিন্তা নয়, স্থূল একটি চিন্তা মাত্র। রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা কালে রমাঁ রলাঁ বিশ্বমৈত্রীর উদ্দীপনায় তা লক্ষ করেননি।

পরমহংসদেবের আর এক পরিচিত মত সব ধর্মই ত্রুটি সত্ত্বেও সত্য। কারণ সকল ধর্মের আসল কথা ঈশ্বরাকূতির গভীরতা। রমাঁ রলাঁ এইমত সমর্থন করেছেন। আপাতভাবে সমর্থনযোগ্য মনে হলেও মতটি যুক্তিসংগত নয়। এটি একটি শিথিল চিন্তামাত্র। ত্রুটিহীন হওয়ার অশ্রান্ত প্রয়াসই দেশ ও জাতির উন্নতির সঠিক পথ। এ দিক দিয়েও রামকৃষ্ণের এ বাণী যথার্থ নয়।

ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণের তীব্রতা মানুষকে নিয়ে যায় শুদ্ধতা ও পবিত্রতার দিকে। রামকৃষ্ণের বাণীতে এ সত্য উপেক্ষিত। তুলনায় সত্য গ্যেটে ও বুদ্ধদেবের বাণী। গ্যেটে বলেছেন জীবন ও স্বাধীনতা তারই লভ্য ও ভোগ্য যে প্রতিদিন নতুন করে এ দুটি জয় করে নেয়। বুদ্ধদেব বলেছেন প্রতিদিন স্বীয় শীল অখণ্ড রাখা ও সর্ব প্রাণীর সুখের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন।

বিবেকানন্দ সমেত একদল ভক্ত পরমহংসদেবকে অবতার মনে করতেন। সন্ন্যাসের প্রতি আকর্ষণ, ভাব সমাধি, হিন্দুর প্রিয় গুরুবাদ ও অবতারবাদের প্রশংসা, মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যে বিবেকানন্দের বিশ্বজয়—এসবের সমন্বয়ে রামকৃষ্ণ হয়ে উঠলেন অবতার। পরিণামে চিন্তা ও সাধনার ক্ষেত্রে সৃষ্টিধর্মিতার পরিবর্তে পুরোনো, শক্তিমান লৌকিক সংস্কারই জয়ী হল।

অবতারবাদের প্রতি ঝোঁক একালের পক্ষে সংগত নয়। এরূপ প্রয়াসে জাতির শক্তি ও সময়ের বড়ো ধরনের

অপচয়ই হয়। তবে রামকৃষ্ণ দেবের চিন্তা ও সাধনা কিছুটা ভিন্ন রূপ পায় বিবেকানন্দের কর্মধারার মাধ্যমে।

স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) পিতৃদত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ; জন্ম কলকাতার সিমলায়। তিনি ছিলেন পড়াশোনা, গান, খেলাধূলা, কুস্তি—সর্ব বিষয়ে আগ্রহী প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল এক যুবক। তরুণ বয়সে তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উৎসাহী সদস্য ছিলেন এবং তখনই তিনি যথেষ্ট পড়াশোনা করেছিলেন। এসময়ই তিনি কান্ট (Kant)-এর দর্শন পাঠ করেন এবং সংশয়বাদী দর্শনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মায়। তিনি এমন কারও সন্ধানে ছিলেন যিনি নাস্তিক্য থেকে মুক্তি দিয়ে ঊর্ধ্বায়িত করবেন তাঁর চিত্ত। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করার বাসনা নিয়ে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেন। কিন্তু মহর্ষির উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হননি। রামকৃষ্ণ পরমহংস এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন এবং নরেন্দ্রনাথকে দেখাতে পারেন।

প্রথমাবধি পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথকে বিশেষ স্নেহদৃষ্টিতে দেখেন। কারণ তাঁর ধারণা হয় নরেন্দ্রনাথ অসাধারণ শক্তির অধিকারী।

প্রথম দিকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে বিশ্বাস করেননি নরেন্দ্রনাথ। তিনি রামকৃষ্ণের অলৌকিক দর্শনকে মনোবিভ্রম (Hallucination) বলে উড়িয়ে দিতেন। অসীম সাহস আর অকপটতা ছিল নরেন্দ্রনাথের সম্পদ। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে ঈশ্বর দর্শন করানোর জন্য পীড়াপীড়ি করায় ভাবাবস্থায় তিনি একদিন নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করেন। সে স্পর্শে কিছুক্ষণের জন্য নরেন্দ্রনাথের চোখের সামনে থেকে বাস্তব জগৎ লুপ্ত হয়। তিনি ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। তবে এরপরেও তিনি রামকৃষ্ণের দ্বারা ততটা প্রভাবিত হননি। সংশয়বাদের দিকে তাঁর প্রবণতা থেকে যায়।

রামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথের গান শুনতে ভালোবাসতেন, তিনিও শোনাতেন। ক্রমে পরমহংসদেবের অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তিতে নরেন্দ্রনাথের আস্থা জাগে এবং তাঁর কাছে তিনি দীক্ষা নেন। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতি অনুরাগ গাঢ় হলেও সংশয় থেকে মুক্তি পান না তিনি। এ সময়ে বৌদ্ধগয়ায় খনন কার্য চলছিল। ১৮৮৪-তে তা শেষ হয়। নরেন্দ্রনাথ বৌদ্ধগয়া যান এবং বুদ্ধের প্রতি তীব্র আকর্ষণ নিয়ে ফিরে আসেন। ১৮৮৭-তে স্যার এডুইন আর্নল্ড (Sir Edwin Arnold)-এর 'লাইট অফ এশিয়া' ('Light of Asia)-এই বিখ্যাত বুদ্ধজীবনী প্রকাশিত হয়। নরেন্দ্রনাথ সেটি পড়েন।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর যুবক নরেন্দ্রনাথই গ্রহণ করেন তরুণ গুরুভাইদের দায়িত্ব। দারুণ অর্থসংকট সত্ত্বেও তপস্যায় দিন কাটতে থাকে তাঁর। তপস্যায় বা ধ্যানে অনুরাগ সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথের মনের অশান্তি দূর হয় না। কিছুকাল পরে তিনি সন্ন্যাসীবেশে একা সারা ভারত ভ্রমণ করেন। এ সময় কঠিন অসুখ ও নানা বিপদের সম্মুখীন হন তিনি, অনশনে কাটে অনেক দিন। আশ্চর্য আত্মবিশ্বাসে তিনি সব বিপদ কাটিয়ে ওঠেন। এ সময়ই তিনি ভারতের নিম্নবর্গীয় মানুষদের দুর্গতি সম্বন্ধে যেমন অবহিত হন তেমনই পরিচিত হন পণ্ডিতসমাজ, রাজা-মহারাজা শ্রেণির মানুষদের সঙ্গে। তখনই তিনি বিবেকানন্দ উপাধি গ্রহণ করেন। এরপর তিনি সিদ্ধান্ত করেন—(১) দেশের শিক্ষিত ভদ্রসমাজ সমাজসংস্কার নিয়ে মত্ত। সাধারণ জনতাকে শোষণ করে তারা বেঁচে আছে কিন্তু তাদের উপকারের জন্য কিছুই করছে না।

(২) জনতা অজ্ঞ এবং উচ্চ শ্রেণির অত্যাচারের ফলে ব্যক্তিত্বহীন। তারা ধর্মহীন নয়। কিন্তু তাদের ধর্মশিক্ষা দানের যোগ্যতা শিক্ষিত সমাজের নেই।

এ অবস্থায় কর্তব্য—(১) সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, (২) তাদের মনে আত্মবিশ্বাস এনে দেওয়া, (৩) আত্মবিশ্বাস জাগানোর প্রধান উপায় হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠ মত অদ্বৈতবাদের প্রসার।

এসব কাজের জন্য চাই অর্থ। বিবেকানন্দ ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়ে আপন বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা অর্থ সংগ্রহের কথা ভাবেন। তৎকালীন মাদ্রাজের (বর্তমান চেন্নাই) ভক্তদের সহায়তায় তিনি ১৮৯৩-এ আমেরিকার শিকাগোয় অনুষ্ঠিত ধর্ম সম্মেলন-এ যোগ দেন। সেখানে তাঁর হিন্দু ধর্মের, বিশেষত অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হন শ্রোতাগণ। বিবেকানন্দ লাভ করেন বিশ্বখ্যাতি। এরপর আমেরিকা ও ইংল্যান্ড-এ হিন্দু ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা করে সংগৃহীত অর্থে তিনি গড়ে তোলেন রামকৃষ্ণ মিশন। শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের এক পরিচালক বলেন বিবেকানন্দের বক্তৃতার দার্শনিক গভীরতা, আধ্যাত্মিক আবেগ, চিন্তার নিজস্বতা মানুষের প্রতি অকৃত্রিম সমবেদনার প্রকাশ আমেরিকার শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

বিপিনচন্দ্র পালের (১৮৫৮-১৯৩২) মতে বিবেকানন্দের বক্তৃতা ছিল অন্তরোৎসারিত, যুক্তিপ্রধান নয়। বস্তুত বিবেকানন্দের শক্তির উৎস ছিল তাঁর বিশাল হৃদয় এবং দিব্য যৌবন। আমেরিকা যাওয়ার আগে গুরুভাই তুরীয়ানন্দকে তিনি বলেছিলেন তথাকথিত ধর্মের চেয়ে অনুভবই তাঁর কাছে বড়ো। বুদ্ধকে তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি হিসেবে শ্রদ্ধা করতেন। 'প্র্যাকটিকাল বেদান্ত' ('Practical Vedanta') নামের বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি বলেছেন স্বর্গ-নরক, আত্মার অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব বিষয়ে তর্কের চেয়ে দৃশ্যমান জগতের দুঃখই বড়ো। তাই বুদ্ধের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। আস্তিকতা, নাস্তিকতা, অজ্ঞেয়বাদ, বৈদান্তিক, খ্রিস্টান, মুসলমান—এসব ক্ষুদ্র আমির চেয়ে বড়ো প্রকৃত আত্মার প্রকাশ। এ-ই তাঁর জীবনদর্শনের যথার্থ প্রকৃতি।

বিবেকানন্দ নিজেকে বলতেন বেদান্তবাদী এবং বেদান্তের সোহম্, তত্ত্বমসি প্রভৃতি চিন্তা ছিল তাঁর প্রেরণার উৎস। গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো অবিচলিত ঈশ্বরনিষ্ঠা এবং পার্থিব বস্তুর অনিত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস তাঁর ছিল না। রামমোহনের মতো ব্রহ্মবোধ আর জগতের ব্যবহারিক সত্তাবোধের স্থিরতাও তাঁর মধ্যে ছিল অনুপস্থিত। মানবপ্রেম বিশেষত দেশপ্রেমের জন্য সারা জীবন বেদান্ত এবং সংশয়বোধের মধ্যে দোলাচলতা ছিল তাঁর চিত্তে। দার্শনিকতা বা তত্ত্বচিন্তা বিবেকানন্দের প্রতিভার গৌণ দিক। প্রেমধর্মের গভীরতার জন্য বুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হলেও বুদ্ধের মতো স্থৈর্য থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। কারণ তাঁর অনুভূতি-প্রধান মানসিকতায় মানবদুঃখ-মোচনের তাগিদই বড়ো ছিল।

বিবেকানন্দ উনিশ শতকের মানুষ; সমকালের শিক্ষা ও সংস্কারে বর্ধিত। তাই তাঁর গুরুর জগতের সঙ্গে তাঁর জগতের মিল ছিল না। রামকৃষ্ণ দেবের দয়ার্দ্র চিত্ত ক্বচিৎ দুঃখীর দুঃখ নিবারণে উদ্বুদ্ধ হলেও রামকৃষ্ণ মিশন বা সেবা সংঘের মতো কোনো সংগঠনের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি। তাই বিবেকানন্দ গুরুভাইদের এ পথে সহজে আনতে পারেননি।

রামকৃষ্ণের 'যত্র জীবন তত্র শিব'—এ বাণী থেকে সেবার প্রেরণা লাভের কথা বলেছেন বিবেকানন্দ। গুরুর সে শিক্ষা তাঁর কাছে হয়েছে 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।' দুটি বাণী কিন্তু এক নয়। প্রথমটিতে জোর পড়েছে শিবত্বের উপর; দ্বিতীয়টিতে জোর জীবের উপর।

বিবেকানন্দের মধ্যে প্রায় সারা জীবন সোহম্‌বাদ ও সংশয়বাদের দ্বন্দ্ব চলছিল। শেষজীবনে তা লুপ্ত হয় এবং তিনি একান্ত নির্ভরশীল ভক্ত হয়ে ওঠেন। তথাপি মানবপ্রেম এবং দেশপ্রীতিতেই তাঁর প্রকৃত পরিচয়। সেই সময়ের বাংলার সাধনার বিশ্বমুখীনতা তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়েছিল। তাঁর বিদ্যাচর্চার ব্যাপ্তি, সব ধর্ম ও সমাজের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি, সংকীর্ণ হিন্দুত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা—সেই সময়ের ফসল। বিবেকানন্দের মধ্যে প্রগাঢ় দেশপ্রেমের যে প্রকাশ লক্ষিত

হয় তার উৎসও সম-সময়। কারণ তাঁর পূর্ববর্তী বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য অনেক কবি, নাট্যকার, সাহিত্যিকের রচনায় দেখা যায় হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রকাশ। অবশ্য শশধর তর্কচূড়ামণি ও থিয়সফিস্টদের অদ্ভুত মত কেউ-ই গ্রহণ করেননি। এই হিন্দু জাতীয়তাবাদের উৎস ছিল শাসকশ্রেণির অবজ্ঞা এবং এক শ্রেণির শিক্ষিত বাঙালির স্বদেশচেতনার অভাব। স্বামী বিবেকানন্দ শেষ কারণটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু এই সামান্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বড়ো সংগ্রামের আয়োজনে তাঁর শক্তি এবং জাতির সময় নষ্ট হল। হিন্দু বা দেশের নব চেতনাকে অবজ্ঞাকারী পূর্বোক্ত দলের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের যোগ স্থাপিত হয়। তাই কম সংখ্যক হলেও এ সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ফলে সংস্কারপন্থী দেশপ্রেমিকদেরও লোকে স্বদেশকে অবজ্ঞাকারী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করল। আর পরিবর্তনভীত অদ্ভুত মতবাদীগণ স্থান পেল জাতীয়তাবাদীদের দলে।

জাতীয়তাবাদীদের চিন্তাশিথিলতা ক্রমে আদি ব্রাহ্ম সমাজের (ওদুদ এঁদের বলেছেন মন্থরগতি ব্রাহ্ম) মধ্যেও সংক্রমিত হল। বিবেকানন্দের মধ্যেও দেখা গেল নানা দুর্বলতা, সংস্কারপন্থাকে তিনি দেখলেন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে। অথচ সৃষ্টিধর্মিতার সঙ্গে সংস্কারের যোগ অবিচ্ছেদ্য।

অস্পৃশ্যতা ও জাত্যভিমানের ক্ষেত্রে সংস্কার দরকার বুঝলেও বিবেকানন্দ দুটি ক্ষেত্রেই অবজ্ঞা প্রদর্শন ভিন্ন কিছু করতে পারেননি। কারণ প্রথমাবধি তিনি ছিলেন সংস্কারবিরোধীদের দলভুক্ত।

তাঁর হিন্দু ধর্মে নতুন শক্তি সঞ্চার করার কাজেও বিভ্রাট দেখা দিল। হিন্দুর ধর্মজীবনে নতুন শক্তি সঞ্চারের পরিবর্তে তিনি হিন্দুধর্মে শক্তি সঞ্চার করতে চাইলেন। ফলে অনেক অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান আর সংস্কার শক্তিমান হয়ে উঠল। যেমন ভারতীয় সভ্যতার আধ্যাত্মিকতা, রামকৃষ্ণদেবের অবতারত্ব ইত্যাদি। বিবেকানন্দের অনেক বাণীতেই এরূপ প্রয়োজনীয় বিষয়ের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের, উৎকৃষ্ট চিন্তার সঙ্গে অসার্থক চিন্তার মিশ্রণ লক্ষিত হয়। যথা—

১. ধর্মের কাজ আত্মার সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে নয়। অথচ তিনি অস্পৃশ্যতা এবং মাদ্রাজের ব্রাহ্মণদের জাতি অভিমানকে আঘাত করে কথা বলেছেন। সম্ভবত এ কারণে নারীদের সমস্যা নিয়ে তিনি কিছু বলেননি।

২. তিনি বলেছেন আমেরিকার আধ্যাত্মিক জীবন অনুন্নত কিন্তু সমাজ উন্নত। আধ্যাত্মিকতায় ঘাটতি থাকলে সমাজ উন্নত হয় কেমন করে—তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি। আচার-অনুষ্ঠান পালন যে আধ্যাত্মিকতা নয় তা তিনি জানতেন। অথচ ভারতের আধ্যাত্মিকতা বলতে মূলত আচার-অনুষ্ঠানই বোঝায়।

৩. বেদকে তিনি অপরিবর্তনীয় বলেছেন—অথচ তাঁর বিশ্বাস ছিল না এই মতে। এ মত অনেকটা আর্যসমাজ-সদৃশ মত—যা বাংলাদেশ সমর্থন করেনি। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলেননি। রামকৃষ্ণদেবও শাস্ত্রের পরিবর্তে ঈশ্বরে সমর্পিত চিত্ত হবার কথা বলেছেন।

৪. শক্তিমানের মতো অন্যায় কর্ম করাকে তিনি সমর্থন করেছেন। অথচ দুই বিশ্বযুদ্ধের পরে এ মতের ভ্রান্তি প্রমাণিত। সম্ভবত জাতীয়তার প্রকাশই তাঁকে বিভ্রান্ত করেছিল।

৫. তাঁর সবচেয়ে দুর্বল চিন্তা এই যে আধ্যাত্মিক দেশ ভারত হবে জড়বাদী দেশ ইউরোপের আচার্য। দুই সভ্যতার এই তুলনা যথাযথ নয়। কারণ সভ্যতা মাত্রেই আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদের মিশ্রণ। হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান—সব ধর্মেই একই সঙ্গে মহৎ ও দুর্বৃত্তের জন্ম হয়েছে। আসলে সেই সময়ের ইউরোপের ব্যাপ্ত প্রাধান্যের সামনে বাঙালির নবজাগ্রত জাতীয় চেতনা এভাবেই নিজের অস্তিত্বকে শক্তিমান করে তুলতে চেয়েছিল।

চিন্তানায়ক নয়, মানবপ্রেমিক বিশেষত দেশপ্রেমিক রূপটিই বিবেকানন্দের প্রকৃত রূপ। আপন অন্তরের প্রবল শক্তি তিনি দেশ ও মানুষের সেবায় নিয়োগ করেন। তাঁর মানবপ্রেমের অকৃত্রিম বলিষ্ঠতার প্রমাণ কলকাতায় প্লেগের সময় তিনি রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপনের জন্য কেনা জমি বিক্রয় করে জনসেবার অর্থ সংগ্রহের জন্য সশিষ্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বার বার বলেছেন অন্যের জন্য বুদ্ধের মতো শত সহস্রবার জীবন ত্যাগ করা উচিত।

বিবেকানন্দের এই প্রেমের সাধনা হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও পরমহংসদেবের অসম্পূর্ণ ভগবৎ সাধনাকে করে তোলে শক্তিমান। অবশ্য রামকৃষ্ণদেবের সাধনায় সেবা-প্রবণতা না থাকলে তিনি স্বামীজিকে নিজের মুক্তি উপেক্ষা করে লোকহিত সাধনায় প্রাণিত করতে পারতেন না। তাই তাঁর ঈশ্বরসাধনা অনেক বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। আবার বিবেকানন্দের প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত না হলে রামকৃষ্ণদেবের মানবসেবা-কামনা সফল হত না। বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভাইদের অনেককে মানবসেবায় প্রাণিত করেন। পরমহংসদেবের সাধনা ছিল সেবাধর্মী, একান্ত আত্মসম্পূর্ণ নয়। এজন্য তাঁর প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়ের ত্যাগের সাধনা সার্থক হতে পেরেছে।

হিন্দু জাতীয়তার সাধনা স্বামীজির প্রেমের সাধনা থেকে প্রবল শক্তি লাভ করলেও তা ছিল সাময়িক। কারণ জাতীয়তাবাদ আর প্রেমের সাধনা—উভয়ের প্রকৃতি পরস্পরের বিপরীত। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, সত্যবিমুখ, অহং প্রধান এবং নিষ্ফল। প্রেমের সাধনা তা নয়।

তবে পরমহংসদেবের আত্মসম্পূর্ণ ভগবৎ-সাধনা এবং বিবেকানন্দের সন্ন্যাসের প্রতি আকর্ষণ—উভয়ের প্রভাব জাতীয় জীবনে অবাঞ্ছিত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। কারণ এই প্রবণতাসমূহ জীবনবিমুখ।

পরমহংসদেবের ঈশ্বরানুরক্তি ও নির্ভরতা এবং বিবেকানন্দের দুঃস্থ আর নির্যাতিতদের প্রতি সহানুভূতি জীবনবিমুখ নয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রাবল্য, মরমিবাদ, সন্ন্যাস-প্রীতি বর্তমান। এই সব জীবনবিমুখ প্রবণতা থেকে এ দুই সাধনাকে পৃথক করে দেখা সম্ভব কিনা—এর উপরই নির্ভর করছে জাতীয় জীবনকে তাঁদের সাধনা কোনো মহত্তর পরিণতির দিকে চালিত করবে না এ বিষয়ে ব্যর্থ ও বিপত্তিকর রূপে পরিগণিত হবে—এ প্রশ্নের উত্তর।

ষষ্ঠ তথা শেষ অধ্যায়ে উনিশ শতকের রেনেসাঁস বিশ শতকের প্রথম ভাগে কীরূপ গ্রহণ করল এবং ব্যর্থতার দিকে অগ্রসর হল তারই ইতিহাস বিশ্লেষিত হয়েছে। এ অংশে স্বদেশি আন্দোলন, রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ এবং মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বের রাজনৈতিক ও সমাজ-সংস্কারভিত্তিক রূপের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উনিশ শতকের রেনেসাঁস-এর ফসল বিশ শতকের প্রথমার্ধের স্বদেশি আন্দোলন—যা বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক চেতনাকে পুষ্ট করেছিল। উনিশ শতকের বাংলায় প্রবল হয় হিন্দু জাতীয়তাবাদ। একই সঙ্গে গড়ে ওঠে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে নব বিধান ব্রাহ্ম সমাজ এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারতীয় কংগ্রেসের উৎস 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। এই দুই সংগঠনের সঙ্গে হিন্দু জাতীয়তাবাদের যোগ না থাকলেও দুটিই ছিল বেশ শক্তিশালী। কেশবচন্দ্রের শেষ জীবনের বক্তৃতাসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হন বিবেকানন্দ এবং ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস শাসকদের নিকটে গুরুত্ব পায়। হিন্দু জাতীয়তাবাদের মতো জনপ্রিয় না হলেও দেশের উপর এদের প্রভাব কম ছিল না।

হিন্দু জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ছিল না এর সমর্থকদের মনে। আদি ব্রাহ্ম সমাজ (ওদুদের মতে মন্থরগতি ব্রাহ্মগণ), বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর অনুরাগী কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ, শশধর তর্কচূড়ামণি ও তাঁর অনুগামীগণ এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস-বিবেকানন্দ ও তাঁদের ভক্তগণ প্রমুখ হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মনে ক্রমে যুক্ত হয় বিস্তৃত বিশ্বের উদার

মানসিকতা, গণতন্ত্র আর বিজ্ঞানের আকর্ষণ। শেষ দিকে বিবেকানন্দের প্রভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদের একাংশ যোগ ও সন্ন্যাসের দিকে আকৃষ্ট হয়। তবে তার চেয়ে ব্যাপ্তভাবে দেখা দেয় হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আপাত শক্তিশালী আসলে দুর্বল গৌরববোধ। স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব শক্তি এই ধর্ম ও ঐতিহ্য সম্পর্কে গৌরববোধকে পুষ্ট করেনি। কারণ তাঁর শক্তির সঙ্গে যুক্ত ছিল সন্ন্যাসপ্রীতির মতো জীবনবিমুখতা এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে চিন্তার অপরিচ্ছন্নতা। ফলে অসাধারণ ব্যাপ্তি সত্ত্বেও হিন্দু জাতীয়তাবাদ ছিল লক্ষ্যহীন।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে আফ্রিকায় ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক ও ইংরেজদের শুরু হয় বোয়ার যুদ্ধ। এ যুদ্ধের পরোক্ষ ফল হিন্দু জাতীয়তাবাদ বা ভারতীয় আদর্শকে যথার্থ লক্ষ্যের সন্ধান দান।

বাংলার উপর ইউরোপের প্রবল প্রভাব বহুদিন ধরেই কমে আসছিল। এ প্রভাব বোয়ার যুদ্ধের ফলে নিঃশেষে মুছে গেল। কারণ এই যুদ্ধে ইউরোপীয় সভ্যতার স্বার্থপরতা আর দায়িত্বহীনতার নগ্ন রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। পরিণামে হিন্দু জাতীয়তাবাদ আরও শক্তিমান হল এবং এ দলের মধ্যে আবির্ভূত হলেন ক্ষুদ্র হলেও বিশিষ্ট একদল সাধক। পূর্ববর্তী হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এ ধরনের সাধক। কারণ তাঁদের কাছে হিন্দুত্ব ছিল এক ধরনের আত্মিক চেতনা আর সে চেতনা দ্বারা প্রভাবিত জীবনাদর্শ। কিন্তু এঁদের ত্রুটি এই যে ইউরোপের সাধনার স্বরূপ সন্ধানের চেষ্টা না করেই তাঁরা করেছিলেন সমালোচনা। অর্থাৎ সত্যানুরাগ অপেক্ষা স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি তাঁদের কাছে বড়ো ছিল। কিন্তু বিশ শতকের এই তাপস গোষ্ঠী (যাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রী অরবিন্দ, সিস্টার নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ) পূর্বজদের ত্রুটি থেকে অনেকটা মুক্ত ছিলেন। তাঁদের জাতীয়তাবাদ সত্যনিষ্ঠা ও বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে চেতনাকে ছাড়িয়ে যায়নি। হিন্দুত্বের মাহাত্ম্য দিয়ে দেশবাসীদের তাঁরা মাতাতে চাননি। তাঁদের কাম্য ছিল ইউরোপ অপেক্ষা মহৎ ও কার্যকর লক্ষ্য দ্বারা দেশের মানুষের কর্মশক্তিকে সক্রিয় করা। এ সময়ের অন্যান্য নেতা অপেক্ষা এঁদের আর্বিভাব ছিল অর্থপূর্ণ। কেন না হিন্দু জাতীয়তাবাদকে তাঁরা পরিচ্ছন্ন, জীবনধর্মী ও বলিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। আন্তর্জাতিকভাবে শ্রদ্ধেয় মনীষী শ্রী অরবিন্দের প্রধান মত ছিল আপনার অন্তরস্থ দিব্য জীবনের সম্যক প্রকাশেই মানবজীবন হয় সার্থক। এ চিন্তা এক হিসেবে জগতের সব মহাপুরুষের প্রধান চিন্তা। স্বামী বিবেকানন্দের সোহম্‌বাদও একই কথা বলে। তবে শ্রী অববিন্দের বিশিষ্টতা এই যে, কেবল ব্যক্তিজীবনে নয় সমষ্টিজীবনেও দিব্যজীবনের বিকাশ ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। তবে এ বিষয়ে আলোচনার উপযোগী নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে তাঁর বক্তব্য ছিল পাশ্চাত্যের অনুকরণ নয়; জগতের অতুল্য সম্পদ ভারতীয় অধ্যাত্ম উপলব্ধির অধিকারী হওয়ার জন্য ভারতের বিশিষ্ট জীবনাদর্শ সম্পর্কে সচেতন থেকে স্বাধীনতার জন্য অক্লান্ত সংগ্রামই এখন কর্তব্য। কারণ স্বাধীনতা ভিন্ন সে জীবনাদর্শ ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অধিকার লাভ অসম্ভব। শ্রী অরবিন্দের অন্যতম কীর্তি 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের উদ্‌গাতা বঙ্কিমচন্দ্রকে ঋষির মর্যাদা দান। সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রকৃতি অজানা। তবে তাঁর বাণী তৎকালীন বাঙালির রাজনৈতিক চেতনাকে উদ্দীপিত করেছিল। ভারতের আত্মিক চেতনার প্রতিমূর্তি হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা।

বিবেকানন্দ-শিষ্য সিস্টার নিবেদিতার মধ্যে গুরুর ধর্মাদর্শের সঙ্গে মিশেছিল মজ্জাগত ব্যক্তিজীবনের মর্যাদাবোধ। ভারতীয়দের তিনি দুর্বলতামুক্ত ও আত্মবিশ্বাসী হওয়ার শিক্ষা দিতেন। অনেকের মতে সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। সে কথা সত্য কিনা বলা যায় না। তবে ভারতীয়দের ইউরোপ-ভীতি দূর করার চেষ্টা তিনি করতেন। শ্রী অরবিন্দ ও সিস্টার নিবেদিতা কিন্তু বেশিদিন জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। পক্ষান্তরে জাতীয় জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) প্রত্যক্ষ যোগ বহুদিন বজায় ছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকতা, ব্রাহ্ম সাধনার

উত্তরাধিকার—সব কিছুর মধ্যে দিয়ে বিকশিত তাঁর চিত্ত বিরাট, বিচিত্র ভারতবর্ষের সার্থকতার পথ সন্ধান রূপ মহাসমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। বাংলার উনিশ শতকের রেনেসাঁস তাঁর মধ্যে পেয়েছিল অসাধারণ সার্থকতা; গড়ে উঠেছিল বিশ শতকের বাংলার অমূল্য ভাবসম্পদ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ বাল্যে দেখেছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম বিভাগ আর হিন্দু মেলার অনুষ্ঠান। তাঁর কৈশোরে বাংলা সাহিত্যের যৌবনদাতা 'বঙ্গদর্শন'-এর আবির্ভাব।

দেবেন্দ্রনাথ মতবিরোধ সত্ত্বেও কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেননি। কিন্তু তাঁর পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্তীদের কটাক্ষ করে রচনা করেন 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নামের প্রহসন। রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য নেতাদের মধ্যেও ছিল এই আঘাতপ্রবণতা।

বাল্য থেকে কাব্যের একান্ত অনুরাগী রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও প্রথম যৌবনের নিত্যসঙ্গী ছিলেন জয়দেব, বৈষ্ণব পদাবলির কবিগণ, কালিদাস, বায়রন, শেলি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কিটস, ব্রাউনিং। গভীর অনুভবের সহজ ভাষারূপ দানে সক্ষম বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-১৮৯৪) কবিতাও তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। তথাপি পরিবেশ জনিত কারণে ব্রাহ্ম ধর্ম, সমাজ-সংস্কার তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল; চব্বিশ বছর বয়সে (১২৯১ বঙ্গাব্দে) লেখা 'রামমোহন রায়' নামের দীর্ঘ প্রবন্ধে (যা পুস্তিকা হিসেবে বের হলেও পরে আর মুদ্রিত হয়নি। এর একটি সংক্ষিপ্ত রূপ 'চারিত্রপূজা'-য় বের হয় এবং পরে সেটি বর্জিত হয়) আছে তার পরিচয়। এ প্রবন্ধে তরুণ রবীন্দ্রনাথ হিন্দু জাতীয়তাবাদের একান্ত সমর্থক। কেশবচন্দ্র এবং তাঁর অনুরাগীদের খ্রিস্ট ভক্তিতে অস্বস্তি বোধ করে 'ব্রাহ্ম সম্মিলন সভায়' প্রদত্ত এক বক্তৃতায় জাতীয়তাবাদ সমর্থন করেছিলেন তিনি—'আপন দেশীয় ভাবে প্রতি দেশের লোককে ব্রাহ্মধর্ম পালন করিতে হইবে।' রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটিতে এ মনোভাব আরও তীব্র—"ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর। কিন্তু তিনি বিশেষভাবে ভারতবর্ষের ব্রহ্ম।...ব্রহ্ম বলিতে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইবে ঈশ্বরের অন্য কোনো নামে আমাদের মনে সে ভাব কখনই উদয় হইবে না।"

প্রকৃতপক্ষে একালের বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথের মনে তখনও প্রকৃত ধর্মবোধ জাগেনি। দেবেন্দ্রনাথ জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার ঊর্ধ্বে ধর্মকে স্থান দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধর্ম জাতীয়তার অঙ্গ। অর্থাৎ এ সময় জাতীয়তাই তাঁর কাছে ধর্ম। এর নয় বছর পরে রবীন্দ্র মানসে প্রকৃত ধর্মবোধের উন্মেষ হয়। তারই প্রকাশ রূপ ১৩০০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে রচিত 'এবার ফিরাও মোরে'। কবিতাটিতে দেখি গভীর ঈশ্বরবোধ ও মানব-দুঃখসুখের সঙ্গে নিবিড় যোগই তাঁর কাছে ধর্ম হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। মোটামুটি ১৩০৫ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩০৯ বঙ্গাব্দ—এই সময়পর্বে রচিত 'কথা', 'কাহিনী' ও 'কল্পনা'য় এই ধর্মবোধের প্রকাশ লক্ষিত হয়।

আদি ব্রাহ্ম সমাজে স্বজাতি ও স্বদেশপ্রীতি ছিল; কিন্তু সে সম্বন্ধে তীব্র বেদনাবোধ ছিল না। আদি ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হলেও এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সে সমাজের প্রভেদ। এ সময়ের শেষ দিকে রচিত রবীন্দ্র-প্রবন্ধগুলিতে দেখা যায় কবির স্বদেশপ্রীতির প্রবলতার প্রকাশ। দেশীয়দের প্রতি শাসকবর্গের অবজ্ঞা, অবিচার, হিন্দু সভ্যতা ও সাধনার বিশেষত্ব, এ বিষয়ে ইউরোপ ও ভারতের প্রভেদ, ইউরোপীয় 'নেশন' ও ভারতীয় 'সমাজ'— উভয়ের পার্থক্য, ভারতীয়দের আত্মচেতনা উদ্রেকের উপায়—এসবই এ সময়ের প্রবন্ধসমূহে আলোচিত হয়েছে।

এ সময়ের মধ্যভাগে বোয়ার যুদ্ধ কালে শক্তিমান ও সম্মানিত ইউরোপের দুর্বলতার অনাবৃত প্রকাশ দেখে বেদনার্ত হন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মন আশ্রয় খুঁজে পায় ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্নিহিত অপ্রমত্ত, লোভহীন শান্তির

আদর্শে—'নৈবেদ্য'-র কিছু কবিতায় আছে তার প্রকাশ। ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে আশা-ভরসা এ সময় তাঁর মন থেকে একেবারে লুপ্ত হয়। আর তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা। তাই ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে ছাত্রদের নির্জনে পবিত্রভাবে বড়ো করার কথা তিনি জানিয়েছেন ত্রিপুরার মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেবমাণিক্যকে লেখা এক চিঠিতে।

নিরাকার পরম ব্রহ্মের সাধনা গ্রহণ করলেও ব্রাহ্মদের সমাজ-সংস্কার প্রয়াসের বদলে চিন্তায়, আচরণে আর সমাজে ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে প্রাচীন ভারতের আদর্শ স্থাপন করতে চাইলেন তিনি। তাঁর মতে ব্রাহ্মগণ হিন্দু এবং হিন্দু সমাজ দ্বিজ সমাজ। সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি উপজাতি ভিন্ন কায়স্থ সুবর্ণবণিক সবাই দ্বিজ। ব্রাহ্মণগণ ত্যাগ, চারিত্রিক শুচিতা এবং জ্ঞান সাধনার জন্য হবেন এ সমাজের প্রধান; ভারতবর্ষকে তাঁরাই করবেন ঐক্যবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত এই নব বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমে সৃষ্টি করল নানা সমস্যা। তিনি যখন ধর্মবোধ আর জাতীয়তাবোধের মধ্যে সংযোগের পথ খুঁজছেন তখন ব্রিটিশ শাসক বাংলাকে পূর্ব ও পশ্চিম—এ দুটি ভাগে বিভক্ত করার ব্যবস্থা করল। বিহার ওড়িশা ও আসাম তখন বাংলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। স্থির হল আসাম, ঢাকা, রাজশাহি নিয়ে গঠিত হবে বাংলার পূর্বভাগ; পশ্চিম ভাগে থাকবে বাংলার প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগ এবং ওড়িশা ও বিহার। বলা হল যে শাসনের সুবিধা ও পূর্ব বঙ্গের উন্নতি এ বিভাগের উদ্দেশ্য। শিক্ষিত বাঙালি সমাজ কিন্তু বুঝল তাদের দুর্বল করাই শাসকপক্ষের লক্ষ্য। প্রতিবাদে ফেটে পড়ল সারা বাংলা। এমন প্রাণপূর্ণ বিশাল প্রতিবাদ ইংরেজ শাসনাধীন বাংলায় আর দেখা যায়নি। বাঙালি জাতির প্রাণশক্তির এ প্রকাশে নেতাগণ হলেন আশান্বিত ও উদ্দীপ্ত ; শাসকপক্ষ হলেন ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত।

এই প্রতিবাদে প্রথমে কোনো সাম্প্রদায়িক অনৈক্য না থাকায় শাসকগণ অস্বস্তি বোধ করছিলেন। শীঘ্রই সম্প্রদায়গত ভেদ দেখা দিয়েছিল। তথাপি এই স্বতঃস্ফূর্ত নিরস্ত্র প্রতিবাদ, জনতা ও ছাত্রদের পুলিশি নিপীড়ন সহ্য করার ধৈর্য দেশকে চমকিত করে নতুন সংকল্পের শক্তি জোগাল। এশিয়ার জাগরণের এই বার্তা ছড়িয়ে গেল দূর দূরান্তে।

আবেদন-নিবেদন নিয়ে শুরু হয় কংগ্রেসের যাত্রা। অথচ কংগ্রেস ছিল দেশের অভিযোগ জানাবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। তাই শীঘ্রই তার আবেদন-নিবেদন হয়ে উঠল সুস্পষ্ট সমালোচনা আর দাবি। ক্রমে এর সুর চড়ল; দাবি বাড়তে লাগল। ফলে শাসক দলের প্রাথমিক প্রশ্রয়, বিরক্তি ও অবজ্ঞা থেকে ক্রমে পরিণত হল ক্রোধে। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রে প্লেগ প্রতিরোধে নিযুক্ত ইংরেজ সৈন্যদলের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ জনতা হত্যা করে দুই সৈনিককে। ফলে জনতার উপর চলে নির্মম অত্যাচার। মহারাষ্ট্রের প্রখ্যাত নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁর সম্পাদিত দুটি পত্রিকায় করেন প্রবল প্রতিবাদ। তিনি নাকি প্রথম শিবাজির হিন্দু রাজ্য স্থাপন প্রয়াসের প্রশংসা করেন। এর কিছু আগে মহারাষ্ট্রে দেখা দিয়েছিল হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। ক্রমে মহারাষ্ট্রে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও জাতীয় সংহতির আন্দোলন প্রবল হয়। তারই পরিণামে শুরু হয় শিবাজি উৎসব (১৮৯৭)। প্রসিদ্ধ 'দেশের কথা'-র লেখক সখারাম গণেশ দেউস্করের প্রয়াসে বাংলায়ও আরম্ভ হয় এ উৎসব। তাঁরই আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটি যা পরে তিনি প্রায় বর্জন করেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদকে শিবাজি উৎসব করে তোলে আরও শক্তিমান। কংগ্রেসে দেখা দেয় 'গরম' দল। এ আন্দোলন বাংলার স্বদেশি আন্দালনকে করে তোলে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। সমকালের বাংলা নাটকগুলিতে দেখা যায় হিন্দু জাতীয়তাবাদের আবেগ।

স্বদেশি আন্দোলনে বাংলার উদ্দীপনাকে প্রকৃত জাতি গঠনের কাজে ব্যবহারের কথা ভেবেছিলেন কোনো কোনো নেতা। তাঁদের দৃষ্টি পড়ে শিক্ষা ব্যবস্থা, পণ্য উৎপাদন, গ্রামে ব্যয়বাহুল্য বর্জিত বিচার ব্যবস্থা—এসবের উপর দেশীয়দের কর্তৃত্ব করার সম্ভাবনার দিকে। কিছুকাল আগে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বরিশালে এরূপ কাজ আরম্ভ

করেছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। বিশ শতকের কলকাতার কলেজ-ছাত্রদের মধ্যে এ কাজ শুরু করেছিলেন 'ডন' সোসাইটি পরিচালক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। একই ভাবনা থেকে ১৩১১ বঙ্গাব্দে লেখা হয় রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজ'। এ সময়ের বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আবদুর রসুল ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু। এ সময়ে অধ্যাপক সিলি ও পার্লামেন্ট সভ্য মাইকেল ডেভিড উভয়ের একটি করে উক্তি প্রসিদ্ধি অর্জন করে। প্রথম উক্তি সিলি-র—"If at any time the Indian people became practically of one mind not to help our administration we shall have to quit that moment that country at once." দ্বিতীয় উক্তি মাইকেল ডেভিড-এর "Loyalty can only be honestly felt and expressed when it is honestly earned by the ruling power."

প্রথম উক্তি নেতাদের দেয় প্রবল প্রতিরোধ গঠনের প্রেরণা; দ্বিতীয়টি রাজভক্তির দায় থেকে শাসিতদের দেয় মুক্তি। এ সময়ের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সম্মানিত ব্যক্তি। তবে চিন্তা ও ভাষার তীক্ষ্নতা আর তীব্রতা লক্ষিত হল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পালের লেখায় ও বক্তৃতায়। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নববিধান সমাজের ব্রাহ্ম ছিলেন, পরে হন রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান। তাঁর লেখায় থাকত তীব্র ব্রিটিশ বিরোধিতা। বিপিন্দ্রচন্দ্র পালের রচনায় থাকত তত্ত্বচিন্তা। তাই তিনি সাধারণ মানুষ বিশেষত তরুণদের অধিক প্রভাবিত করেন। তিনি বলতেন সর্বশক্তি প্রয়োগে স্বাধীনতার চেতনা জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। ক্রমাগত বয়কট প্রভৃতি দ্বারা শাসনকার্যকে বিঘ্নিত করাই দেশবাসীর কাজ। কাপড়, নুন ও সরকারি অফিস পুরোপুরি বয়কট করলে শাসকদল সমস্যায় পড়বে। ইংরেজ-পণ্য বয়কট নীতি দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। ফলে গঠনপন্থীরা কেবল শিক্ষাক্ষেত্রেই কিছুটা কাজ করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ বয়কট সমর্থন করেননি। সারা দেশে এ নীতি অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে ছিল। তাই তিনি ভাবলেন ইংরেজ বিদ্বেষ নয়, গভীর দেশপ্রীতিই মানুষকে স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহারে প্রাণিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরিবারে স্বদেশ-চেতনা জাগ্রত হয়েছিল বহু আগেই। 'জীবনস্মৃতি'তে আছে তার উল্লেখ। দেশে সে প্রেরণা জাগেনি বলেই তাঁদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। এবার রবীন্দ্রনাথ ব্যবসায় বা পণ্য উৎপাদনে নয় দেশের পূর্ণ সেবার জন্য নিজেদের নিয়োজনের উপর জোর দিলেন। এ সম্বন্ধে বহু কথা তিনি নানা প্রবন্ধে বলেছেন। একটি উদাহরণ "... সর্ব প্রযত্নে আমাদিগকে এমন একটি স্বদেশী কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে স্বদেশী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ শিক্ষকতা, পূর্তকার্য্য, চিকিৎসা প্রভৃতি দেশের বিচিত্র মঙ্গলকর্মের ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকিবেন ... ইংরেজের উপর রাগারাগি করিয়া ক্ষণিক উত্তেজনামূলক উদ্যোগে প্রবৃত্ত হওয়া সহজ, কিন্তু সেই পথ সহজ শ্রেয়ের পথ নহে।"

রবীন্দ্রনাথ যখন দেশ ও দেশবাসীর মঙ্গলকর্মে নিঃশেষে আত্মনিবেদনের আবেদন করলেন, তখনই রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ঘোষণা করলেন বয়কট-এর তীব্রতায় শাসকরা অসুবিধায় পড়বে।

কম শ্রমে কাজ হবে জানলে অধিক শ্রমকে মূর্খতা মনে করাই স্বাভাবিক। উপরন্তু বয়কট-এর মধ্যে আছে তীব্র উন্মাদনা। আর রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় আছে কঠিন শ্রমের অন্তে বিলম্বিত ফল লাভ বা ফল লাভের আশামাত্র। কাজেই বয়কট আন্দোলন হল ব্যাপক। বিলেতি পণ্য বয়কট-এ যারা আপত্তি করল সেই নমঃশূদ্র ও মুসলমানগণের উপর কোথাও কোথাও জোর করা হল। কিছুটা এই জবরদস্তি ও ভীতি প্রদর্শনের প্রতিক্রিয়ায়; এবং অনেকটা শাসকপক্ষের প্রয়াসে শুরু হল হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। নেতাগণের কেউ ইংরেজদের উপর এবং অনেকে মুসলমানদের

উপর ক্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু সংকট সমাধানের চেষ্টা করলেন না কোনো নেতাই। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ অসীম ধৈর্যে সংকটের সম্মুখীন হলেন, বললেন—"আগুন যখন আমাদের নিজেদের ঘরে লাগিয়াছে তখন দুই পক্ষ দুই দিক হইতে এই অগ্নিকে উষ্ণ বাক্যের বায়ু বীজন করিয়া ইহাকে প্রতিকারের অতীত করিয়া তুলিলে তাহার চেয়ে মূঢ়তা আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারিবে না।" ('সফলতার সদুপায়') পাবনা প্রাদেশিক কনফারেন্স-এর অভিভাষণে তিনি প্রস্তাব করলেন "যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি।" তিনি পূর্বে বলেছিলেন "একটি বৃহৎ স্বদেশী কর্মক্ষেত্র আমাদের আয়ত্তগত না থাকিলে আমাদিগকে চিরদিনই দুর্বল থাকিতে হইবে।" সব কিছু মিলিয়ে তাঁর এ প্রস্তাবের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করেনি কেউ। বয়কট-এর ব্যাপকতা, পুলিশি নির্যাতন বৃদ্ধি, সাম্প্রদায়িক মন কষাকষি, হাঙ্গামা, কংগ্রেসে নরম ও গরম দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব, গরম দলের কংগ্রেস ত্যাগ—এসব ঘটনা ঘটেই চলেছিল।

১৯০৮-এর ২৫মে মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষেপের ফলে দুই ইংরেজ মহিলার মৃত্যু হয়। এর এক মাসের মধ্যে মানিকতলার পোড়ো বাড়িতে পুলিশ খুঁজে পায় বোমার কারখানা। এ সম্পর্কে অপ্রস্তুত নেতারা কর্তব্য নির্ধারণে অক্ষম হলেন। একমাত্র বাল গঙ্গাধর তিলক নির্ভয়ে নিজের সংবাদপত্রে ঘোষণা করলেন এটি দমননীতির অনিবার্য ফল। রবীন্দ্রনাথ এসময়ে এক সভায় পাঠ করেন 'পথ ও পাথেয়' নামের প্রবন্ধ। তরুণ বিপ্লবীদের জন্য সহানুভূতির সঙ্গে প্রবন্ধটিতে প্রকাশ পেল ভারতবর্ষের সমস্যার জটিলতার অ-সাধারণত্ব, তার সম্মুখীন হতে শিক্ষিত সমাজের অক্ষমতা বা অনিচ্ছা, যুগপ্রবণতা—এ সবের ধীর বিশ্লেষণ এবং সমস্যার সমাধানে তাঁর বিশ্বাসদৃঢ় নির্দেশ। 'সমস্যা' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ সংকট উত্তরণের উপায় নির্ধারণ করেছেন। বিচিত্র জাতি, ধর্ম ও আচার সম্পন্ন পুরোনো দেশ ভারতের মূল সমস্যা এবং তার প্রতিকারের প্রত্যয়-সমৃদ্ধ স্পষ্ট নির্দেশ যেমনভাবে এ দুটি প্রবন্ধে পাওয়া যায় তা রবীন্দ্র-রচনায়ও বিরল।

রবীন্দ্রনাথের মতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহায়তার অভাব এবং উদাসীনতাই এ দেশের মূল ত্রুটি। এই উদাসীন অবজ্ঞা মুছে না গেলে দেশবাসীর মনুষ্যত্ব বিকশিত হবে না। —"সেই নির্ভীক বিরাট বিপুল মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবার জন্যই আমাদিগকে পরস্পরের সহিত পরস্পরকে ধর্মের বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। ইহা ছাড়া মানুষ কোনো মতেই বড়ো হইতে পারে না। ভারতবর্ষে যে-কেহ আছে যে-কেহ আসিয়াছে সকলকে লইয়াই আমরা সম্পূর্ণ হইব—ভারতবর্ষে বিশ্ব মানবের একটি প্রকাণ্ড সমস্যার মীমাংসা হইবে। সে সমস্যা এই যে, পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায় ধর্মে আচরণে বিচিত্র—নরদেবতা এই বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট—এই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গ করিয়া দেখিব। পার্থক্যকে নির্বাসিত বা বিলুপ্ত করিয়া নহে, কিন্তু সর্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধি দ্বারা, মানবের প্রতি সর্বসহিষ্ণু পরম প্রেমের দ্বারা, উচ্চ নীচ আত্মীয় পর সকলের সেবাতেই ভগবানের সেবা স্বীকার করিয়া।"

দেশের এই মহাসংকট ক্ষণে রবীন্দ্রনাথের মন মুক্ত হল হিন্দুত্বের জন্য অবুঝ মমতা থেকে। দেশের দুর্গতি, অসম্পূর্ণতার মর্ম অনুধাবন করে আশ্চর্য বিশ্বাসে তিনি কল্যাণপথের নির্দেশ দিতে পারলেন, দিলেন আধুনিক পৃথিবীর প্রকৃত মঙ্গল-পন্থার নির্দেশ। বিশ শতকের সূচনায় চিন্তা আর অনুভব—উনিশ শতকের রেনেশাঁস-এর এ এক অবিস্মরণীয় সার্থকতা। কিন্তু দেশবাসী রবীন্দ্র-নির্দেশের মর্ম বুঝল না। কারণ রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ছিল ধর্মচেতনা অর্থাৎ জগতের সঙ্গে প্রেম ও শুভবোধ জনিত যোগের স্তরে; দেশের মানুষের অবস্থান ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদের স্তরে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনার প্রথম স্তরে জাতীয়তাবোধ ছিল। কিন্তু ক্রমে বৃদ্ধি পায় তাঁর সত্যাশ্রয় ও প্রেমপ্রীতি এবং শুদ্ধ হয় তাঁর জাতীয়তাবোধ।

উনিশ শতকের শেষে বাংলার জাতীয়তাবোধ শাসকগোষ্ঠীর প্রতিরোধ আর স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব পাশ্চাত্যে বিস্তৃত হওয়ায় বৃদ্ধি পায়। বিবেকানন্দের সাধনায় জাতীয় গৌরববোধ অপেক্ষা মূল্যবান যা কিছু ছিল তা ঐতিহ্য-গৌরব বোধের মধ্যে লুপ্ত হল। কারণ উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেখার সচেতন প্রয়াস তাঁর মধ্যে ছিল না।

স্বদেশি আন্দোলনের সূচনায় জাতীয়তাবোধ ছিল উদার, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিল এ আন্দোলনের। বিশ শতকের সূচনায়ও তা সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। বাঙালি মুসলমানদের ছোটো এক যুক্তিবাদী গোষ্ঠীর উপর পড়েছিল তার প্রভাব। কিন্তু 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র আর 'শিবাজি উৎসব' জনিত সংযোগের বৃদ্ধি কিছু ছিদ্রান্বেষী মুসলমানকে জাতীয়তাবোধের বিরোধী করে তোলার সুযোগ দিয়েছিল। কারণ 'বন্দেমাতরম্'-এর উৎস 'আনন্দমঠ'—যার বিষয় মুসলিম শাসন বিনাশ পূর্বক হিন্দু শাসন স্থাপন প্রয়াস আর শিবাজি স্মরণীয় মোগল শাসন বিপর্যস্ত করে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য। বিপিনচন্দ্র পাল অবশ্য বলেন আন্দোলন গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় হিন্দু জাতীয়তাবোধের প্রতীক হিসেবে শিবাজি গৃহীত হয়েছেন। এর দ্বারা মুসলমানদের আঘাত করা হয়নি। মুসলিমগণ আকবর উৎসব করলে হিন্দুরা খুশি হবেন। কিন্তু শিবাজির সঙ্গে যোগ নিষ্ঠাবান মুসলমান সম্রাট আওরঙ্গজেবের। ফলত বলা যায় উনিশ শতকের শেষে এ দুই কারণে মুসলমানদের মধ্যে দেখা দিল সাম্প্রদায়িকতা; শাসকশক্তি তা প্রয়োগ করল হিন্দু জাগরণের বিরুদ্ধে। এ প্রয়াসের বিষাক্ত ভাবী সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন ছিল না পশ্চাৎপদ এবং সে কারণে স্বস্তিহীন মুসলমান সমাজ। হিন্দু জাতীয়তাবাদের মোহকর প্রভাব হিন্দুদেরও এ সম্পর্কে সতর্ক হতে দেয়নি। সমকালের বিশ্বে জাতীয়তাবোধ জনিত মুগ্ধতা আর হিন্দুদের উন্নত অবস্থা—উভয়ের ফলে শক্তিমান হল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। ভারতের মতো বহু ধর্ম আর ভাষার দেশে কোনো সম্প্রদায়কেন্দ্রিক জাতীয়তাবোধ যথার্থ জাতীয় আদর্শ নয়। এ বিষয়ে রাজনৈতিক চেতনার প্রথম যুগে সচেতনতা সম্ভব নয়। স্বদেশি আন্দোলনকালে সাম্প্রদায়িক সংঘাত যখন বড়ো হয়ে ওঠে তখনও রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন অন্য সবাই ছিলেন এ বিষয়ে অচেতন। অথচ এ কারণেই রবীন্দ্রনাথকে তৎকালীন নেতারা মনে করেছিলেন স্বপ্নদর্শী।

শাসকগোষ্ঠীর উৎকট অহংকার, প্রবল অত্যাচার, হিন্দু তরুণদের প্রাণপণ প্রতিশোধ প্রয়াস, নেতৃবর্গের দুর্বলতা, সাম্প্রদায়িকদের ভীতিজনিত কাণ্ডজ্ঞানহীনতা—সব কিছু মিলে ধ্বংস করে দিল বাংলার রেনেসাঁসজাত মানবমহিমা বোধ আর উদার জ্ঞান-বিজ্ঞানমনস্কতা। স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়ে রবীন্দ্রনাথ মন দিলেন গঠনমূলক কাজে—শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তার সঙ্গে চলল সাহিত্যচর্চা। বহু প্রিয়জনের মৃত্যুর আঘাত, ব্যাধি, মানসিক অস্বস্তি—এসবের ফলে তাঁর মনে ধ্বনিত হল আপন অন্তরদেবতার কাছে একান্ত আত্মনিবেদনের সুর। এই নিবেদন তাঁকে ফিরিয়ে দিল মনের শান্তি আর দেহের স্বাস্থ্য। ক্রমে তিনি লাভ করলেন বৃহত্তর জগতের সমাদর। দেশবাসীর কাছে তাঁর যে আহ্বান ব্যর্থ হয়েছিল বিশ্বের কাছে তিনি সেই অহম্ বর্জিত প্রেম, সেবা ও মৈত্রীর আদর্শ উপস্থাপিত করলেন তিনি। দেশের বহু বিচক্ষণ নেতৃবর্গ বিশ্বাস করেননি তাঁর উপদেশসমূহ। কিন্তু পরবর্তী ঘটনা-সূত্রে রবীন্দ্র-বাণীর সত্যতাই প্রমাণিত হয়। এ প্রবন্ধ রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধিজির শান্তি ও মৈত্রীর বাণী বিশ্বের বহু অধিবাসীকে আকৃষ্ট করে। বাংলার রেনেসাঁস সম্পর্কে উৎসাহীদের পক্ষে এ এক আনন্দ-সংবাদ। কারণ সেই জাগরণ মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতাগণ উদার জ্ঞানসাধনা, শান্তি ও বিশ্বমৈত্রীর কথা প্রচার করেছিলেন শতাধিক বৎসর পূর্বে। শান্তি ও অহিংসার প্রচারক হিসেবে গান্ধিজির মর্যাদা অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু বাংলার রেনেসাঁস-এর শ্রেষ্ঠ নেতা রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বোধ গান্ধিজি অপেক্ষা উচ্চ স্তরের।

গান্ধিজির মনে দীর্ঘকাল ছিল সনাতনী হিন্দু ও সনাতনী মুসলমানের মিলনের আশা। নিজেকে তিনি বলতেন

সনাতনী হিন্দু। ১৯৪৪-এ অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনকালে তাই তাঁকে প্রশ্ন করা হয় কেন তিনি 'মনুসংহিতা' সমর্থিত অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। প্রাচীন হিন্দুদের গোমাংস ভক্ষণ ও নারীর একাধিক পতিগ্রহণ বর্তমানে পরিত্যক্ত—উত্তরে এ উদাহরণ দিয়ে গান্ধিজি বলেন ধর্মশাস্ত্র ধর্ম নয়—চিরন্তন মানববিবেকই ধর্ম—'Religion is eternal human conscience'। এ সিদ্ধান্ত তাঁকে উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁস-নেতাদের পর্যায়ভুক্ত করে। এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় বাংলার জাগরণের শ্রেষ্ঠ নেতাদের সিদ্ধান্ত আধুনিক কালেরও এক মূল্যবান সিদ্ধান্ত।

বোমাকেন্দ্রিক স্বদেশি আন্দোলন বাংলার রাজনৈতিক ও দৈনন্দিন জীবনে সৃষ্টি করল সংকট। বাংলার শ্রেষ্ঠ তরুণগণ বেছে নিল সন্ত্রাসবাদের পথ। রবীন্দ্রনাথ তাদের প্রভাবিত করতে পারলেন না। শাসকদলের দমননীতি হল কঠোর। এই ধ্বংসাত্মক মানসিকতা ও কর্মপ্রণালী পরিবর্তিত হল গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের ফলে।

স্বদেশি আন্দোলনের নেতাদের বহু দুর্বলতা থেকে মুক্ত গান্ধিজি জোর দিয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক মৈত্রী ও অহিংসার উপর। জীবনপণ করে অহিংসা অবলম্বনের নীতি—বাঙালি সহজেই গ্রহণ করল কারণ প্রাণ পণ করে দুঃসাধ্য সংগ্রামের আনন্দস্বাদ তার জানা ছিল। অসহযোগ আন্দোলন বাংলায় স্বদেশি আন্দোলনের মতো ব্যাপ্ত না হলেও হয়েছিল আন্তরিক। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে বহু বাঙালি এ আন্দোলনে যোগ দিয়ে অসাধারণ প্রাণশক্তির পরিচয় দেন। অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হলে বাংলা ও বাংলার বাইরের দুঃসাহসী তরুণরা আবার সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ গ্রহণ করে। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের ব্যাপক প্রতিরোধ ছিল সশস্ত্র। সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ এ পন্থার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। ক্ষতিকর সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ আর অস্পৃশ্যতা মুছে গিয়ে সেখানে ভারতীয়গণ গড়ে তুলেছিল আশ্চর্য সংহতি। তবে যুদ্ধের উত্তেজনায় আত্মস্বার্থ সহজে লুপ্ত হয়; প্রাত্যহিক জীবনে তা ঘটানো কঠিন। মহাত্মা গান্ধির আন্দোলনও সূচনায় প্রায় মুছে দিয়েছিল সম্প্রদায়গত ভেদ। মুসলমানেরা স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে দিল্লির জুমা মসজিদে ইমামের পদে বসিয়ে বক্তৃতা দানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ সংহতি টেকেনি।

রেনেসাঁস-এর পর বাঙালির আশ্চর্য আত্মপ্রকাশ প্রয়াস নানা পথের শেষে গ্রহণ করল সন্ত্রাসবাদের পথ। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি ও নির্দেশ, গান্ধিজির অহিংস সংগ্রাম—তাকে প্রভাবিত করতে পারল না। বাঙালির জাগরণ, তার জাতীয়তাবোধ আর রাজনৈতিক সংগ্রামের এ ভ্রান্ত পরিণাম অত্যন্ত দুঃখজনক। তথাপি বিশ শতকের বাঙালির ব্যর্থতার মূল সন্ধানের ইচ্ছা যদি আমাদের মনে জাগে তবে সে দুর্দিন কাটিয়ে ওঠার দিকেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি বলা যায়; কারণ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ শক্তি আর দুঃখের কারণ জানা গেলে তা আর ভয়ংকর থাকে না।

বাংলার রেনেসাঁস-এর মুখ্য ধারা জাতীয় জীবনে ব্যাপ্ত উন্নতি লাভের ধারা আরও সংকীর্ণ অর্থে জীবনবোধ আর রাজনীতির ধারায় এ ভাবেই এল বিপর্যয়। অন্য ধারাগুলি এর ফলে প্রভাবিত হলেও ধ্বংস হয়নি। এইসব অপ্রধান ধারার মধ্যে সাহিত্য ও চারুশিল্প অন্যতম।

বাংলার এ সময়ের সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জীবনের স্পর্শসঞ্জাত জীবনাগ্রহ, আনন্দ এবং উদ্দীপনা। জীবন সম্বন্ধে এই আনন্দ-কৌতূহল আর উদ্দীপনা নানাভাবে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে প্রকাশ লাভ করেছে বলেই এঁরা একালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। তাঁদের পরে বাংলা সাহিত্য যতটা সুন্দর হয়েছে ততটা মহৎ হয়নি। মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের মতো আবেগ ও পৌরুষের ভাষারূপ, রবীন্দ্রনাথের তুল্য ধর্মবোধ তথা পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধ এবং আনুষঙ্গিক আনন্দবোধ—এ সবের প্রকাশ বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। এ সাহিত্যে আছে জীবনের ছোটো ছোটো দুঃখ-বেদনার ছবি। সাহিত্য জীবনের প্রতিরূপ। বাঙালির বর্তমান দুলর্ভ মানস-সম্পদহীন

জীবনে এইসব দুঃখ কথাও মূল্যহীন নয়। কিন্তু সাহিত্য শুধু জীবনের প্রতিফলন নয়—জীবনের মহৎ স্বপ্নেরও প্রতিফলন। তার অভাবে সাহিত্য জাতিকে দিতে পারে না যথার্থ আনন্দ—যা আসলে শক্তির নামান্তর। সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে জীবনের এই রমণীয়তার রূপায়ণ বাঙালিকে তার ভাগ্য-বিপর্যয়ের দুঃখ অনেকটাই ভুলিয়ে দিয়েছে।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাঙালির হীন অবস্থার কথা বলেছেন বহু দূরদর্শী ব্যক্তি। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে বাঙালি ব্যবসায়ে কৃতী হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তা সফল হয়নি।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রারম্ভে বাঙালি অর্জন করেছিল সফলতা। বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ সাধনা সম্পর্কে গবেষণা একালের বাঙালির স্মরণীয় কাজ। কাজী আবদুল ওদুদের মতে এই প্রবন্ধ রচনাকালে উচ্চ শিক্ষিত বাঙালির সংখ্যা কম না হলেও প্রতিভাবান ও প্রতিষ্ঠিত বাঙালি বেশি নেই।

তবে তার অপরাজেয় মানস শক্তির পরিচয় আছে বিশ শতকের বাঙালির সাহিত্য আর জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে কিছু কিছু কর্মে।

বাংলার মুসলমান, বিশেষত সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। উনিশ শতকে ওহাবি চেতনার যে প্রকাশ মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায় তার উত্তরাধিকার লক্ষিত হয় বিশ শতকের মুসলিম রাজনীতিতে। তথাপি বিশ শতকের সূচনায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যে উদার মানবিক দৃষ্টিসম্পন্ন ক্ষুদ্র এক সাহিত্যিক গোষ্ঠীর দেখা মেলে। সম্ভবত বাংলার উদার মানবিক আবহ (যার উৎস ইংরেজি সাহিত্য, বিশেষত রবীন্দ্র-সাহিত্য) আর স্বদেশি আন্দোলনের প্রথম দিকের শক্তিমান জাতীয়তাবোধ তাঁদের প্রাণিত করেছিল। এঁদের মধ্যে প্রধান তিন জন—বেগম রোকেয়া (মিসেস আর. এস. হোসেন নামে পরিচিত), কাজী ইমদাদুল হক এবং লুৎফর রহমান। বেগম রোকেয়ার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মতিচুর' (১৯০৪-১৯০৮)-এ ছোটো ছোটো নিবন্ধে পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের ছবি নিপুণভাবে আঁকা হয়েছে। 'সুলতানা'জ ড্রিম' ('Sulatana's Dream' : ১৯০৪-১৯০৮) নামের ছোটো গ্রন্থটিতে নারীর মুক্তি, কর্মজগতে তার যথার্থ স্থানলাভ ইত্যাদি বিষয়ে আপন আশা তিনি তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায় কৌতুকার্দ্র চিত্রময় ভাষায় রূপ দিয়েছেন। বাংলার মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া। মুসলিম নারীদের শিক্ষার জন্য ১৯১১-তে তিনি শাখাওয়াৎ মেমোরিয়েল গার্লস স্কুল স্থাপন করেছিলেন।

ইমদাদুল হক তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আবদুল্লাহ' (১৯১৮)-তে মুসলিম সমাজের গোঁড়ামির দিকটি চিত্রিত করেছেন। গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে প্রীত করেছিল।

লুৎফর রহমানের কবিতা-সংগ্রহ 'প্রকাশ'-এ 'চৈতালি'-র প্রভাব সুস্পষ্ট। স্মাইলস (Smiles)-এর নীতি-উপদেশ পূর্ণ লেখার সঙ্গে কিছু মিল আছে তাঁর 'উন্নত জীবন ও মহৎ জীবন' গ্রন্থের। তবে উচ্চ নৈতিক জীবন গঠনের উপর জোর দিলেও লুৎফর রহমানের লেখায় জীবনবোধ অধিক।

এর পরে আসে কাজী নজরুল ইসলামের নাম। স্বদেশি আন্দোলন বিশেষত সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল। তাঁর রচনার প্রধান লক্ষণ বলিষ্ঠতা আর শঙ্কাহীন যৌবনের প্রকাশ। স্থির গভীর চিন্তার অভাবই তাঁর রচনার ত্রুটি।

বুদ্ধির মুক্তির উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯২৬-এ ঢাকায় গঠিত হয় মুসলিম সাহিত্য সমাজ। এঁদের মুখপত্রের নাম 'শিখা'। 'বুদ্ধির মুক্তি' ('Emancipation of the intellect')-র মন্ত্র তাঁরা পেয়েছিলেন কামাল আতাতুর্ক, রবীন্দ্রনাথ, 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর লেখক রোমাঁ রোলাঁ, পারসিক কবি সাদী আর হজরত মোহম্মদের কাছ থেকে। এঁদের অন্যতম পরিচালক

আবুল হুসেন বলেছিলেন হজরত মোহম্মদ-এর বিখ্যাত বাণী 'আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে বিভূষিত হও'-এর অর্থ অনন্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত হওয়া। কাজেই মানুষের উন্নতির অন্ত নেই। সে হতে পারে হজরত মোহম্মদের অপেক্ষাও বড়ো। এ মতের জন্য তাঁকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ পূর্ণ উদ্যমে তিন বৎসর কাজ করে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন নজরুল এবং উল্লসিত হয়েছিলেন এর আদর্শে। তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলে সাহিত্য সমাজের সব অধিবেশন নিষিদ্ধ হয় কারণ এ সংস্থার মুসলিম ধর্ম বিরোধী কাজ। কিন্তু ইসলাম-বিরোধিতা বলতে যা বোঝায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ তা করেনি। এটি ছিল একটি সাহিত্য ও বিশুদ্ধ চিন্তা-চর্চার কেন্দ্র। এঁদের এক সভ্য বলেন মহাপুরুষের অনুবর্তিতা মানে বুদ্ধি-বিচার বিসর্জন দিয়ে নত হওয়া নয়; মন, প্রাণ ও মস্তিষ্ক দিয়ে তাঁর সাধনা গ্রহণ করা ও প্রয়োজন হলে তাঁকে অতিক্রম করাই মহাপুরুষের প্রকৃত অনুগামিতা।

সমিতিটি চলে আরও সাত বছর; আর বার্ষিক মুখপত্র বের হয় ক্রমান্বয়ে পাঁচ বছর। দশম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র। শেষ দিকে দেশে সাম্প্রদায়িকতা বেড়ে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি অর্থহীন হয়ে যায়। অবশ্য বুদ্ধির মুক্তিতে বিশ্বাস মুছে যায়নি। পরবর্তীকালে পূর্ব বঙ্গের তরুণ লেখকগণ মুসলিম সাহিত্য সমাজ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না; কিন্তু তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন বুদ্ধির মুক্তির পথ। উপরন্তু এঁরা ছিলেন ধর্ম ব্যাপারে উদাসীন, বামপন্থী চিন্তার বাহক এবং স্বদেশপ্রেমিক। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজের একটি দলের মধ্যে পরিবর্তন আসে দেশভাগের পরে।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ বাংলার জাগরণের স্বল্প পরিসর অথচ বেগবান একটি ধারা বাংলার মুসলমানদের মধ্যে স্বল্পকালের জন্য প্রবাহিত করে দিয়েছিল। এ সমিতি বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল এ সত্যও অবশ্য স্বীকার্য।

কাজী আবদুল ওদুদের মতে বাংলার রেনেসাঁস বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বিপর্যস্ত হয়। তিনি বলেছেন অনেকে বলেন এর বিপরীত কথা। তাঁদের মতে স্বদেশি আন্দোলনের সশস্ত্র রূপটি বাংলার জাগরণের আপাত বিপর্যয়ের প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে এর ফলে বাংলার রেনেসাঁস প্রাদেশিকতা ত্যাগ করে হয়ে উঠেছিল সর্বভারতীয়। মতটি গুরুত্বহীন নয়। কারণ শীঘ্রই সর্বভারতীয় রাজনীতির নিয়ামক হলেন মহাত্মা গান্ধি। ব্যাপ্ত নতুন ধর্মচেতনাই বাংলা রেনেসাঁস-এর শ্রেষ্ঠ নায়কদের যথার্থ পরিচয়। গান্ধিজির মধ্যে এ ধর্মচেতনার প্রকাশ লক্ষিত হয় এবং তাঁর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু ধর্মচেতনা নয়—গান্ধিজির রাজনৈতিক মত ও কর্মপ্রণালীই দেশের চিন্তা ও কর্মধারাকে প্রভাবিত করেছে। স্বাধীনতা লাভের উপায় হিসেবে কংগ্রেস গ্রহণ করেছে তাঁর অহিংস আন্দোলনের পথ—কিন্তু তাঁর অপূর্ব ধর্মচেতনা দেশকে প্রভাবিত করেনি। কারণ গান্ধিজির চিন্তাধারায় ছিল জটিলতা। দীর্ঘ সময় তাঁর সত্যপ্রীতি, মানব প্রেম, জীবপ্রেম—যুক্ত ছিল পুনরুজ্জীবনবাদী (Revivalism) চিন্তার সঙ্গে, পরে এ জটিলতা থেকে মুক্ত হয় তাঁর চিন্তাধারা। কিন্তু তাঁর এই অর্থপূর্ণ জীবনসাধন দেশবাসীকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

বাংলার রেনেসাঁস-এর প্রধান নেতারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা কামনা করলেও ধর্মজীবনকে দিয়েছিলেন গুরুত্ব। ধর্মজীবন বলতে তাঁরা বুঝেছিলেন মনুষ্যত্বের পূর্ণ উদ্‌বোধন। তাঁরা অধ্যাত্মবাদ অপেক্ষা বিচারবাদ ও লোককল্যাণকেই কাম্য মনে করেছিলেন। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনকে উন্নত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। তার সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁদের মরমি বা আধ্যাত্মিক চেতনা। তাই তাঁদের ধর্মবোধ হয়ে উঠেছিল অর্থপূর্ণ এবং জীবন-জিজ্ঞাসার ভিত্তি।

রেনেসাঁস সময়ের এবং বিশ শতকের জাতীয়তাবাদীরা রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সত্ত্বেও অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত আমরা পরে বুঝেছি স্বাধীনতা অপেক্ষা মূল্যবান বা তুল্যমূল্য এমন সম্পদ আছে যার অভাবে স্বাধীনতা অর্থহীন।

বিশ শতকে বাংলার বুদ্ধিজীবীগণ আকৃষ্ট হয়েছেন ফ্রয়েড আর মার্কস-এর দর্শনের প্রতি আর সর্ব সাধারণের আকর্ষণের বিষয় রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং তাঁর সমগোত্রীয় সাধকদের মরমি সাধনা। বাংলার রেনেসাঁস-এর শ্রেষ্ঠ নেতাদের উদার জ্ঞান ও প্রেমের সাধনার তুলনায় এসব মত অসম্পূর্ণ; এদের থেকে কোনো লক্ষণীয় সুফল পাওয়া যায়নি।

তবে মানবজীবন এভাবেই বিচিত্র প্রবণতা ও চিন্তার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। একথাও সত্য যে মানুষ তখনই যথার্থ সৃষ্টিধর্মী হয় যখন তার ধর্মজীবন—যার অন্য নাম অকপট সত্যাশ্রয়িতা আর জগতের সঙ্গে নিবিড় প্রেমের যোগ তাকে প্রেরণা দেয়। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, প্রবল জাতীয় চেতনা, বৃহৎ ঐতিহাসিক ঘটনা বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সে প্রেরণা দানের শক্তি নেই।

কাজী আবদুল ওদুদের মতে আমাদের দেশের তথা আধুনিক কালের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা পরস্পর সম্বন্ধে উদাসীনতা ও অজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায় ধর্মে আচরণে বিচিত্র—নরদেবতা সেই বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট—সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গ করিয়া দেখিব পার্থক্যকে নির্বাসিত বা বিলুপ্ত করিয়া নহে কিন্তু সর্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধির দ্বারা, মানবের প্রতি সর্বসহিষ্ণু পরম প্রেমের দ্বারা। উচ্চ নীচ সকলের সেবাতেই ভগবানের সেবা স্বীকার করিয়া।"

এই সংযোগের অভাবেই মূলত বাংলার নব জাগরণ বিপর্যস্ত হয়েছে। নতুন করে তার সঞ্জীবন যদি সম্ভব হয় তাহলে ভারতের স্বাধীনতা হবে সার্থক; বাঙালি ফিরে পাবে তার যথার্থ জ্ঞান। যা জীবনের গভীরতর সত্য, তাকে ধ্বংস করতে পারে না কাল। সত্যাশ্রয়ীর আবির্ভাব হলেই সেই সত্য আবির্ভূত হয়। প্রাচ্যের নব জীবনের জন্যই প্রয়োজন বাংলার রেনেসাঁস-সঞ্জাত নতুন ব্যাপ্ত ধর্মবোধের সঞ্জীবন। কারণ সেটাই আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জীবন দর্শন।

২.৪ বাংলার নব জাগরণ বিষয়ে কাজী আবদুল ওদুদের মতামতের বিশ্লেষণ

কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন মুক্তবুদ্ধি, নিরপেক্ষ যুক্তিমনস্ক প্রাবন্ধিক। 'বাংলার রেনেশাঁস' শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁর এই পক্ষপাতহীন, যুক্তিমনস্ক মুক্ত মননের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলার রেনেসাঁস সম্পর্কে সাধারণত দুটি মতবাদ লক্ষিত হয়—নেতিবাচক এবং ইতিবাচক। প্রথম মতের চিন্তাবিদগণ বাংলার জাগরণের মূল্য স্বীকার করেন না। দ্বিতীয় মতাবলম্বীদের বক্তব্য উনিশ শতকে বাংলায় যথার্থই এসেছিল সার্বিক এক জাগরণ। দীর্ঘকালের অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়েছিল দেশ এবং তার কারণ ইংরেজ-শাসন এবং সেই সূত্রে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়। কাজী আবদুল ওদুদ রেনেসাঁস সম্পর্কে এই দ্বিতীয় ইতিবাচক মতের সমর্থক। এবং 'বাংলার রেনেশাঁস' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি তথ্য ও যুক্তি সহায়ে এই ইতিবাচক মতই প্রকাশ করেছেন। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার থেকেই তাঁর এই মতের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে যায়। এবং সেই পরিচয় থেকে আমরা আরও প্রাপ্ত হই ওদুদের রেনেসাঁস সম্পর্কিত ইতিবাচক মনোবৃত্তির বেশ কয়েকটি বিশেষত্ব।

প্রথমত তিনি মানসিক উৎকর্ষ তথা চিৎ প্রকর্ষকেই বলেছেন রেনেসাঁস-এর প্রকৃত ভিত্তি। রেনেসাঁস বলতে যে নব জাগরণ বোঝায় তা জাতির ও দেশের চিৎ-সম্পদের জাগরণ। বস্তুগত জাগরণ তার আনুষঙ্গিক ফল—এই মাত্র।

দ্বিতীয়ত এ কারণে তিনি রামমোহন রায়ের কলকাতা-বাস তথা বেদান্ত গ্রন্থের প্রকাশকেই বাংলার জাগরণের সূচনা বলেছেন। কারণ এই সূত্রেই বাঙালির আবদ্ধ সংকীর্ণ ধর্ম ও বাস্তব জীবন নতুন সম্ভাবনার আলোয় দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রামমোহনের জীবন ও কর্ম বিশ্লেষণ করে ওদুদ মত প্রকাশ করেছেন রামমোহনের ভাবনার সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ বাংলার তৎকালীন সমাজকাঠামো রামমোহনের নব যুগ আনয়নকারী ভাবনার স্বরূপ চিত্তলোকে গ্রহণ করতে পারেনি—কর্মে রূপ দেওয়া দূরের কথা। তিনি আপন নব চিন্তনের যেটুকু রূপ দিতে পেরেছেন তাই যথেষ্ট।

তাঁর মধ্যে পুরোনো আধ্যাত্মিক সাধনা, মধ্যকালীন মানবপ্রীতি আর আধুনিক ইউরোপের বস্তুনিষ্ঠ সাধনার সুসমঞ্জস এবং সুষ্ঠু বিকাশ লক্ষিত হয়। আর এই বিশিষ্ট সাধনার দ্বারাই তিনি বাংলা রেনেসাঁস-এর বনিয়াদ দৃঢ় করে দিয়েছিলেন।

ডিরোজিয়ো আর ইয়ং বেঙ্গলদের সম্পর্কে ওদুদের মত যে এঁরা ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান সাধনা এদেশে প্রতিষ্ঠিত করে রামমোহনের ঈপ্সিত দেশের চিত্তোন্নতির সহায়তা করেছিলেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রতি তাঁদের ঐকান্তিক অনুরাগ বাংলা সাহিত্যে এনেছিল নতুন প্রাণের ঐশ্বর্য। শিক্ষা বিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার ব্যাপ্তি, যুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার—এই সব কর্মপ্রণালীর মাধ্যমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্ম সমাজ বাংলার রেনেসাঁস আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল—এ সত্য স্বীকার করেছেন আবদুল ওদুদ। তবে তাঁর মতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজের সর্বোত্তম কীর্তি 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'-কে ধর্মের মূল বলে ঘোষণা। ওদুদের মতে মানুষের অকৃত্রিম কল্যাণ সন্ধান আর গভীর অনুভবই সত্য উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় এবং যথার্থ ধর্ম। তা ছাড়া মানুষের প্রতি প্রীতি, পরার্থপরতা যা সর্বমানবের প্রতি দায়িত্ব সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে—বাংলার ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিশেষত্ব। এভাবেই ধর্মের কল্যাণময়তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল উনিশ শতকের শিক্ষিত সমাজ।

কাজী আবদুল ওদুদ এটাও লক্ষ করেছেন যে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) এবং তাঁর অনুবর্তীদের মধ্যে ক্রমে দেখা দিয়েছিল আত্মসম্পূর্ণ ঈশ্বরপ্রীতি। ফলে বেশ কিছু উল্লেখ্য কাজ (বিশেষ বিবাহবিধি প্রবর্তন, সুলভ সাহিত্য প্রচার, সুরাপান বর্জন, লোকসেবা, নারীসমাজের উন্নতির প্রয়াস) সত্ত্বেও তাঁর নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্মসমাজ ভ্রষ্ট হয়েছিল সমাজ-কল্যাণ তথা মানব-কল্যাণের উচ্চ আদর্শ থেকে। তদুপরি এঁদের খ্রিস্টভক্তির আতিশয্য হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের ভূমি প্রস্তুত করে দেয়।

এই হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ পুষ্ট করেছিল হিন্দু-ঐতিহ্য সম্বন্ধে গৌরববোধকে—এটাই আবদুল ওদুদের মত। তবে এক্ষেত্রে শাসক সম্প্রদায়ের জাগ্রত বাঙালির শক্তিকে দমিত করার প্রয়াস, এক শ্রেণির শিক্ষিত বাঙালির বিমুখতা—এসবের দায়ও স্বীকার করেছেন ওদুদ।

১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহ সম্বন্ধে বাঙালি বিরূপ ছিল। বহু পণ্ডিত বলেন এর কারণ স্বার্থপরতা। ইংরেজ প্রসাদপুষ্ট তৎকালীন বাঙালি শাসকশ্রেণির বিমুখতার আশঙ্কায় সমর্থন করেনি ভারতের এই প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন সিপাহি বিদ্রোহ কালে বাঙালির সৃষ্টিক্ষমতা ছিল ব্যাপকভাবে সক্রিয়। এবং এরূপ ব্যাপ্ত সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে স্বার্থের যোগ থাকা সম্ভব নয়। তাঁর মতে ইংরেজ-শাসনের মাধ্যমে বাঙালি পরিচিত হয় ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে। ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সাহিত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে তার মনে উদ্রেক হয় শ্রদ্ধা এবং

মুগ্ধতা। ফলে পরাধীনতার গ্লানি বিস্মৃত হয়েছিল বাঙালি। একারণেই সে সিপাহি বিদ্রোহ সমর্থন করতে পারেনি।

সাধারণত বলা হয় বাংলার রেনেসাঁস ছিল কলকাতা-কেন্দ্রিক তথা নগরকেন্দ্রিক এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজেই তা সীমিত ছিল। আর এই আলোকপ্রাপ্ত বাঙালিগণ সাধারণ শ্রমজীবী গ্রামীণ মানুষ সম্পর্কে ছিলেন উদাসীন। কাজী আবদুল ওদুদ এই মত পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। অবশ্য তিনি বলেননি যে সামগ্রিক মানস উৎকর্ষ রেনেসাঁস-এর প্রাণ তা সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার অভাব সম্পর্কেও তিনি নীরব। কিন্তু ইংরেজ-শাসনের ফলে সাধারণ মানুষের দুর্গতির দিকটি তাঁর নজর এড়ায়নি এবং তিনি এ সত্যও উপেক্ষা করেননি যে রেনেসাঁস-নায়কদের অনেকেই এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন; কেউ কেউ তার প্রতিকারের চেষ্টাও করেছেন। রামমোহন ইংল্যান্ড-এ বাস কালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজনিত প্রজাদুর্গতি সম্পর্কে ব্রিটিশ-শাসককে সচেতন করার চেষ্টা করেছিলেন এবং ভারতবাসী ইউরোপীয়দের প্রচলিত আইনের অধীন করার কথাও বলেছিলেন। কারণ প্রচলিত বিচারপদ্ধতির অধীন ছিল না বলেই নীলকর ইংরেজগণ নীলচাষিদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়াতে পেরেছিল।

১৮৫৮-৬০-এ যশোর, নদিয়া, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলের নীলচাষিদের মধ্যে এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। কলকাতার শিক্ষিত বাঙালিগণ এ বিদ্রোহে নীলচাষিদের পক্ষ সমর্থন করেন সক্রিয়ভাবে। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্যতম ব্যক্তিত্ব রামগোপাল ঘোষ নীলচাষিদের পক্ষ সমর্থন করেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ (‘The Hindu Patriot’) সহ বহু সংবাদপত্রে নীলকর অত্যাচারের বিশদ বিবরণ মুদ্রিত হয়। দীনবন্ধু মিত্র রচনা করেন ‘নীল দর্পণ’ নাটক। এ নাটকে নীলকর অত্যাচারের সঙ্গে চাষিদের প্রতিরোধের দিকটিও চিত্রিত। নাটকটির ইংরেজি অনুবাদের প্রকাশক রেভারেন্ড লঙের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনে নীলকরগণ। বাঙালি তাঁর পক্ষ সমর্থন করে।

কাজী আবদুল ওদুদ রেনেসাঁস সম্পর্কে বাংলার তথা ভারতের মুসলমান সমাজের উদাসীনতার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে শাসনক্ষমতার হস্তান্তর আর নিষ্কর বাজেয়াপ্ত হওয়ার ফলে মুসলমানগণের বৈষয়িক অবস্থার অবনতি হয়। পরিণামে তাদের মধ্যে ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি গ্রহণ করার বিরোধী মানসিকতা প্রবল হয়। পরে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর উন্নত অবস্থা আর সরকারি উচ্চ পদাধিকার—দৃষ্টে মুসলমান সম্প্রদায়ের কোনো কোনো মনীষী স্বসম্প্রদায়কে ইংরেজি-শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই প্রয়াস ছিল কেবলমাত্র চাকরিকেন্দ্রিক। ইংরেজি-শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা এবং মানসিকতার পরিবর্তন মুসলমানগণের মধ্যে দেখা দেয়নি। ওদুদের মতে এর কারণ দুটি—(১) মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবাবিবাহ, প্রাপ্তবয়স্ক কন্যার বিবাহ প্রচলিত ছিল। জাতিভেদ প্রভৃতি কুপ্রথা থেকেও মুক্ত ছিল মুসলিম সমাজ। উপরন্তু তাদের মধ্যে ছিল ধর্ম সম্পর্কে গোঁড়ামি। আরব থেকে আগত ওহাবি আন্দোলন তাকে পুষ্ট করেছিল। কারণ এ আন্দোলনের মূল কথা ছিল আদি ইসলামে প্রত্যাবর্তনই মুসলমানদের দুর্গতি মুক্তির উপায়।

কাজী আবদুল ওদুদের মতে উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁস যে সামগ্রিক চিৎ-প্রকর্ষ এবং তজ্জনিত পারস্পরিক কল্যাণবোধের বার্তা বহন করে এনেছিল তা বিপর্যস্ত হয়। তার বহু কারণ তিনি সযত্ন বিশ্লেষণে নিরূপণ করেছেন। তবে তাঁর প্রধান মত এই যে ইংরেজ সরকারের দমনমূলক আইনের প্রতিবাদকল্পে হিন্দু ঐতিহ্য সম্পর্কিত গৌরববোধ জাত হিন্দু জাতীয়তাবাদের ক্রমবিস্তৃতিই এর কারণ।

ওদুদের মতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-১৮৮৬)-এর আত্মসম্পূর্ণ ভগবৎ সাধনা, সন্ন্যাসপ্রীতি, গুরুপ্রীতি, অবতারবাদ প্রচার—এই পুনরুজ্জীবনবাদকে পুষ্ট করেছিল। তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) বিশ্বজয় এবং তাঁর বলিষ্ঠ মতবাদ এই মতবাদের প্রসারে সহায়ক হয়েছিল। যদিও বিবেকানন্দের মধ্যে মানবপ্রীতির দিকটি উপেক্ষিত হয়নি। বরং মানবসেবার উন্নত আদর্শে তিনি রামকৃষ্ণ-শিষ্যদের তিনি প্রাণিত করেছিলেন। তথাপি তিনি সৃষ্টিধর্মী কাজে খুব বেশি মন দিতে পারেননি। কারণ এজন্য প্রয়োজন ছিল সংস্কারপন্থী হওয়া। বিবেকানন্দ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও তা বাস্তবায়িত করতে পারেননি। ধর্মজীবনে শক্তি সঞ্চার করতে গিয়ে তিনি অর্থহীন বহু সংস্কারকেই শক্তিশালী করে তুলেছিলেন।

কাজী আবদুল ওদুদ নব জাগরণের অন্যতম দিক রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের দিকটিকেও উপেক্ষা করেননি। তাঁর মতে ব্ল্যাক অ্যাক্টস ও ইলবার্ট বিল সম্পর্কে ইউরোপীয়দের সফল সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ বাঙালিদের সংঘবদ্ধতার শক্তি সম্পর্কে অবহিত করে দেয়। এদিকে শাসকশক্তির মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ, অস্ত্র আইন, মফস্‌সলে কলেজ বন্ধ করে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার প্রয়াস প্রভৃতিকে বাঙালিরা তাদের দমিত করার চেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করে। তদুপরি আই. সি. এস. পদ থেকে সামান্য কারণে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপসারণ ও আই. সি. এস. পরীক্ষার বয়স কমানো তাদের এই ধারণাকে পুষ্ট করে। ফলে শিক্ষিত বাঙালির আত্মপ্রকাশের প্রয়াস ১৮৭৬-এ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপনে রূপ পায়। ক্রমে জন্ম নেয় ভারতীয় কংগ্রেস। কিন্তু শীঘ্রই এই জাতীয়তাবোধ আপন উদার অসাম্প্রদায়িক ভূমিকা থেকে বিচ্যুত হয়। আবদুল ওদুদের এই মত যথার্থ যে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আইন বাঙালিদের মধ্যে যে প্রবল প্রাণপূর্ণ প্রতিবাদ জাগিয়েছিল তা পূর্বে দেখা যায়নি। কিন্তু ক্রমে এ আন্দোলন বিদেশি দ্রব্য বয়কট-এর ক্ষেত্রে জবরদস্তি করার সূত্রে হিংস্র রূপ নিল এবং হয়ে উঠল সাম্প্রদায়িক। স্থানে স্থানে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা শুরু হল। ক্রমে বাংলার জাতীয়তাবাদ সন্ত্রাসবাদের দিকে মোড় নেয়। নেতৃবৃন্দ হয়ে ওঠেন দিশেহারা।

কাজী আবদুল ওদুদের মতে এ সংকটময় পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ আপন অবুঝ হিন্দু-ঐতিহ্যমনস্কতা ত্যাগ করে গ্রহণ করেন প্রকৃত পথ নির্ধারণের কঠিন দায়িত্ব। রবীন্দ্রনাথ বললেন বর্তমানে প্রয়োজন—কর্মক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা এবং ব্যাপ্ত মঙ্গল ইচ্ছার দ্বারা পরস্পরকে 'হৃদয়ের সহিত' গ্রহণ করা। পারস্পরিক অবজ্ঞা ও বিরোধ দূর করে নির্ভীক বিরাট বিপুল মনুষ্যত্বের অধিকারী হওয়ার সাধনা করা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতকে সমকালের দেশনেতাগণ স্বপ্নদর্শী কবির মত বলে উপেক্ষা করেন। সাধারণ মানুষও দীর্ঘ শ্রমসাধ্য গঠনমূলক মানব প্রীতিভিত্তিক কর্মধারার পরিবর্তে বয়কট, সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতি তাৎক্ষণিক ফলদায়ক চিন্তাধারার প্রতিই আকৃষ্ট হয়।

বাঙালির স্বদেশভাবনা তথা জাতীয়তার সাধনা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল একথা স্বীকার করেছেন ওদুদ। তাঁর মতে পরে গান্ধিজি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ধর্মের অর্থ শাস্ত্রগ্রন্থ নয় চিরন্তন বিবেক—'Religion is eternal human conscience'—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এবং এভাবেই তিনি মানবতাবাদী উনিশ শতকের বাংলার নব জাগরণের নেতাদের পথই অনুসরণ করেন। ওদুদ আরও মনে করেন গান্ধিজি অহিংসা, সাম্প্রদায়িক মৈত্রী ও শৃঙ্খলার উপর জোর দিয়ে বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলনে পরিণত করেন। কিন্তু কাজী আবদুল ওদুদের মতে গান্ধিজির অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের পথ বাঙালি তথা ভারতবাসী গ্রহণ করেনি। ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আই. এন. এ.—দুটিই সশস্ত্র আন্দোলনের প্রকাশ। এভাবেই উনিশ শতকে রেনেসাঁসজাত বাঙালির 'অপূর্ব-আত্মপ্রকাশ-চেষ্টা' সন্ত্রাসবাদের প্রবল টানে বিপর্যস্ত হল। তাই তাঁর সিদ্ধান্ত রেনেসাঁস-এর মুখ্য ধারা জাতীয় জীবনে বিস্তৃত উন্নতির ধারা তথা জীবনবোধ ও রাজনীতির ধারায় বিপর্যয় এসেছিল।

কিন্তু আনুষঙ্গিক সাহিত্য ও শিল্পকলার ধারায় এসেছিল জীবন সম্বন্ধে আগ্রহ এবং তজ্জনিত আনন্দ আর উৎসাহ। এই মনোভাবের সমুন্নত প্রকাশ লক্ষিত হয় মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে। তবে ওদুদের মতে বাংলার সাহিত্যে পরে কিন্তু মহত্ত্বের তুলনায় রমণীয়তাই প্রাধান্য পেয়েছে। শিল্পকলার ক্ষেত্রেও তিনি একই পরিণাম লক্ষ করেছেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাঙালি যে প্রয়াস সত্ত্বেও উন্নতি লাভ করেনি তাঁর এ কথাও যথার্থ। তিনি ঠিকই বলেছেন যে তুলনায় বিজ্ঞান-জ্ঞান সাধনায় বাঙালির অধিক সফল।

তাঁর মতে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা প্রবল হলেও উদার মানবিকতার প্রকাশও ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষিত হয়। পূর্ববঙ্গের পরবর্তী তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে এই মুক্ত বুদ্ধির প্রকাশই তিনি দেখতে পেয়েছেন।

কাজী আবদুল ওদুদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত বাংলার রেনেসাঁস বিপর্যস্ত হয়েছে কিন্তু বিফল হয়নি। কারণ যা জীবনের গভীর সত্য—ক্ষয়হীন কালজয়ী তার প্রকাশ। তবে 'সত্যাশ্রয়ীর আবির্ভাব হলেই সত্য আবির্ভূত হয়।' কাজেই দেশবাসীর পারস্পরিক উদার সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্ব বিকাশের মধ্য দিয়ে একদা আবার সঞ্জীবিত হবে বাঙালি তথা ভারতবাসী। কারণ এটাই আধুনিক পৃথিবীর যথার্থ পন্থা।

কাজী আবদুল ওদুদের বাংলার রেনেসাঁস সম্বন্ধে গভীর চিন্তনজাত এইসব মতামতের যাথার্থ্য অনস্বীকার্য।

২.৫ বাংলার রেনেসাঁস : কাজী আবদুল ওদুদ : গঠনশিল্প

প্রবন্ধের গঠন নানা ধরনের হয়। তবে মূলত প্রবন্ধকে অনুভবপ্রধান ও বিষয়প্রধান—দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। যুক্তির প্রকৃষ্ট বন্ধনে বক্তব্যের তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণঋদ্ধ উপস্থাপনা উভয়তই প্রবন্ধের মূল লক্ষণ।

কাজী আবদুল ওদুদের 'বাংলার রেনেশাঁস' শীর্ষক ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত দীর্ঘ প্রবন্ধটি বিষয়প্রধান প্রবন্ধের পর্যায়ে পড়ে। যুক্তির শৃঙ্খলিত উপস্থাপনে বক্তব্য বিষয়ের প্রতিষ্ঠায় তিনি সফল। তথ্যবিপুলতা আর সম্যক বিশ্লেষণ—আলোচ্য প্রবন্ধটির বিশিষ্টতা।

প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্পষ্টতা এবং সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা বিষয়মুখ্য প্রবন্ধের অন্যতম শর্ত।

কাজী আবদুল ওদুদ এ প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ের দুটি পৃষ্ঠায় তাঁর প্রতিপাদ্য যে বাংলার রেনেসাঁস—এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এসেছে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ব্যাপ্ত ইউরোপের নব জাগরণের প্রসঙ্গ। কারণ ইউরোপীয় রেনেসাঁস-জাত সভ্যতা-সংস্কৃতি-সাহিত্যের সংস্পর্শেই বাংলায় দেখা দেয় রেনেসাঁস।

এরপরে তিনি কেন বাংলার রেনেসাঁসকে বিষয় করেছেন তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে বাঙালি-মনে এই রেনেসাঁস সম্পর্কে দেখা দিয়েছিল উদাসীনতা। অতীত সম্পর্কে সচেতনতাই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার উৎস। আধুনিক বাংলার তথা ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতি-সাহিত্য-রাজনীতি তথা রাষ্ট্রীয় আদর্শ—জীবনের সর্বক্ষেত্রে রূপান্তর এনেছিল যে বাংলার রেনেসাঁস—সে সম্বন্ধে সচেতনতাই এদেশের ভবিষ্যতের উন্নতির উৎস—এই বিশ্বাস থেকেই উঠে এসেছে আলোচ্য দীর্ঘ প্রবন্ধটি।

পরের অংশে যুক্তি ও তথ্য বিশ্লেষণ দ্বারা বাংলার রেনেসাঁস-এর যথার্থ সূচনা যে রামমোহন রায়ের কলকাতায় আগমন এবং 'বেদান্ত' গ্রন্থ প্রকাশ থেকে—এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন ওদুদ। মাত্র দুটি পৃষ্ঠায় সংহতভাবে তিনি

বাংলার রেনেসাঁস-এর উৎস, তা নিয়ে আলোচনার কারণ এবং রেনেসাঁস-এর সূচনা সময়—এই তিন বিষয় উপস্থাপিত করেছেন।

কাজী আবদুল ওদুদ বাংলার রেনেসাঁস—এ বিষয়টিকে যুক্তি-তথ্যের যথাযথ বিন্যাস দ্বারা স্বচ্ছতা দিয়েছেন। তবে তিনি নিজস্ব একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন—বক্তব্যের কালানুক্রমিক বিন্যাস। রেনেসাঁস-এর সূচনা থেকে বিপর্যয়—প্রতি পর্যায়ে তিনি প্রধান চিন্তানায়ক এবং বিশিষ্ট বিষয়কে কালানুক্রমিকভাবে বিবৃত করার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রথম অধ্যায়ে কাজী আবদুল ওদুদ মূলত কলকাতায় রামমোহনের প্রয়াসে কেমন করে নব জাগরণের সূচনা হল তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে রামমোহনের ইংল্যান্ড-এ প্রবাস এবং মৃত্যুর সংবাদে।

এই বিবৃতির মধ্যে রামমোহনের জীবনের বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। রামমোহনের মুক্তবুদ্ধির উৎসটি তিনি তথ্য ও যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। সমকালের বাংলার সংস্কার-অন্ধকার দূর করার জন্য রামমোহনের প্রচেষ্টার বিবরণ যেমন ওদুদ দিয়েছেন; তেমনই বিশ্লেষণ করেছেন রামমোহনের আত্মমর্যাদাবোধ এবং অন্যের অধিকার ও মর্যাদা সম্বন্ধে বোধ—এই নতুন মানসিকতা। বাংলা তথা কলকাতার সমাজে তখন দেখা দিয়েছিল হঠাৎ ধনী বাবুর দল। শ্রাদ্ধ, বিবাহ, দুর্গোৎসব প্রভৃতি চিরাগত অনুষ্ঠানকে তারা বিত্ত প্রকাশের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তার সঙ্গে ছিল ভোগের উচ্ছৃঙ্খলতা। রামমোহন প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে প্রচার করলেন একেশ্বরবাদ এবং স্পষ্ট ভাষায় বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ধর্মের নামে সমাজে যা চলছে তা ভদ্র সমাজের অযোগ্য। রামমোহনের ইংরেজি-বাংলা রচনা থেকে প্রচুর এবং বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়েছেন ওদুদ। ফলে প্রবন্ধের আয়তন বেড়েছে—কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে সহজবোধ্য হয়েছে রামমোহনের চিন্তার নবীনতা। পাঠক পরিচিত হয়েছেন রামমোহনের যুক্তিবিন্যাসের সঙ্গে। রামমোহনের প্রয়াসের বিরোধিতা যেমন হয়েছিল তেমন কিছু মানুষ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর মত। তার প্রমাণও কাজী আবদুল ওদুদ দিয়েছেন সমকালের কিছু সংবাদপত্রের সংবাদ উদ্ধৃত করে। যেমন ১৮১৭ খিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল' ('Calcutta Monthly Journal') থেকে তিনি শান্তিপুরের জনৈক খ্যাতনামা গোস্বামীর মৃত্যুকালে প্রকাশ্যে বেদান্তে বিশ্বাস ঘোষণা সংক্রান্ত সংবাদের অনুবাদ দিয়েছেন। ১৮৩১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার অদূরে জাতিধর্ম নির্বিশেষে পাঁচশো লোকের একত্র ভোজন এবং বাইবেল, কোরান ও গীতা পাঠের সংবাদের কথাও তিনি বলেছেন।

সতীদাহ প্রথা রোধ, একেশ্বরবাদ প্রচার, পাশ্চাত্য শিক্ষার সপক্ষে মতপ্রকাশ—রামমোহনের এই সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজের আনুষঙ্গিক উন্নতি সহ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন ওদুদ; সঙ্গে আছে নিপুণ বিশ্লেষণ।

রামমোহনের মতবাদ যে আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল, তিনি যে পরবর্তী লিগ অবনেশনস বা ইউ. এন. ও.-র মতো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন; আর রাষ্ট্রিক বাধা ছিন্ন করে বিশ্বমানবের মৈত্রীর কথা ভেবেছিলেন—এই সব তথ্যের গুরুত্ব তিনি যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর দক্ষ বিশ্লেষণে স্বচ্ছ হয়ে গেছে এই সত্য যে প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মবাদমূলক অধ্যাত্মচেতনা, মধ্যযুগের আরব দেশের সুফিদের মানবপ্রীতির সাধনা আর আধুনিক ইউরোপের বস্তুনিষ্ঠ সাধনার সুষম অন্বয়ে রামমোহনের সাধনা হয়ে উঠেছিল স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট।

রামমোহনের সাধনা যে তুলনায় বাস্তবে রূপায়িত হয়নি তার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন কাজী আবদুল ওদুদ। তিনি প্রমাণ করেছেন—সমকালের সমাজকাঠামো ও মানবচিন্তা রামমোহনের সাধনার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেনি। তাই ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন ও ট্রাস্টডিড রচনা সত্ত্বেও এটি একটি শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও ধর্মসংগীত শ্রবণের কেন্দ্র মাত্রে পর্যবসিত হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের মানুষের পারস্পরিক প্রীতি ও হিত সাধনের কেন্দ্র হতে পারেনি এই প্রতিষ্ঠান।

রামমোহনের সাহিত্যসাধনার দিকটি কাজী আবদুল ওদুদ দৃষ্টান্ত দ্বারা উপস্থাপিত করেছেন। বাংলা গদ্যকে রামমোহন যে স্ব-বশ, স্বাধীন, স্বতন্ত্র করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন এই সত্য উদ্ধৃত অংশগুলি থেকে উপলব্ধি করা যায়।

প্রথম অধ্যায়ের সঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ের যোগ সাধন করা হয়েছে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের অবস্থার বর্ণন-সূত্রে। এর সঙ্গে বিশ্লেষিত হয়েছে এর কারণ। সে কারণ এই যে, ব্যক্তি রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাসূত্রে সমকালের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মতবাদের তাৎপর্য তাঁদের বোধগম্য হয়নি। ফলে রামমোহনের অবর্তমানে ব্রাহ্ম সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু নবজাগরণের ধারা থেমে গেল না। এবার এর নিয়ন্তা হলেন হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক কবি দার্শনিক হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিয়ো (Henry Vivian Derozio ১৮০৯-১৮৩১) এবং তাঁর ছাত্রগোষ্ঠী। ওদুদ এ প্রসঙ্গে ডিরোজিয়োর সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁর সাহিত্যজীবনও মানসিকতার সুমিত পরিচয় দিয়েছেন। কীভাবে তিনি ছাত্রদের মানস-মুক্তির প্রয়াস করেছিলেন তারও বিশ্লেষণমুখ্য সংহত আলোচনা করেছেন ওদুদ। তাঁর ছাত্রগোষ্ঠী বা ইয়ং বেঙ্গলদের যৌবনের নবোৎসাহে হিন্দু সমাজকে আক্রমণের দিকটি তিনি উপেক্ষা করেননি। সেই সময়ের সংবাদপত্র থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি বিষয়টিকে স্বচ্ছতা দিয়েছে।

ডিরোজিয়ো-র বিরুদ্ধে অভিযোগ ও তাঁর দেওয়া উত্তরও তিনি বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তবে বৃন্দাবন ঘোষাল নামক 'গল্পজীবী' ব্রাহ্মণের ডিরোজিয়ো-বিরোধী প্রচার যে ডিরোজিয়ো-বিতাড়নের প্রত্যক্ষ কারণ—তার সমর্থনে কোনো প্রমাণ দেওয়া হয়নি। এটিকে কিছুটা ত্রুটিই বলা যায়।

ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে প্রধান নয় জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন ওদুদ। তাঁদের প্রত্যেকের বিশেষত্ব স্পষ্ট হয়েছে এই পরিচয়ে। বিশ্লেষণ করে ওদুদ দেখিয়েছেন যে ইয়ং বেঙ্গল গণ তাঁদের উদার মানবিকতা, স্বদেশপ্রেম, সারল্য ও ন্যায়নিষ্ঠতায় হয়ে উঠেছিলেন রামমোহনের যথার্থ উত্তরসূরী। রামমোহনের অভিপ্রেত ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান সাধনার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁদের প্রচেষ্টা ছিল মূল্যবান।

এখানে ওদুদ বাংলা সাহিত্যের নতুন রূপ গ্রহণের বিষয়টিও বিশ্লেষণ করেছেন। তবে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন চিৎপ্রকর্ষের দিকটিকে। ইয়ং বেঙ্গলদের পরে নব জাগরণের ধারক হন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনসাধনায় নতুন শক্তি প্রাপ্ত ব্রাহ্ম সমাজ।

ওদুদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয় দিয়েছেন; দিয়েছেন তাঁর ব্যক্তিত্ববিকাশের কথাচিত্র। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি বিষয়টিকে পাঠকের পক্ষে সহজগম্য করে তুলেছে। ওদুদ যুক্তি ও তথ্য সহায়ে প্রমাণ করেছেন দেবেন্দ্রনাথই প্রথম ঘোষণা করেন শাস্ত্র নয় ধর্মের প্রকৃত আধার 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ' হৃদয়। এ প্রসঙ্গে লেখক রামমোহনের ধর্ম সম্পর্কিত ধারণাও বিশ্লেষণ করেছেন।

এ অংশেই তত্ত্ববোধিনী সভা, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর সম্পর্কে ক্ষুদ্র বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন ওদুদ। এঁদের প্রয়াসে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশের দিকটিও তাঁর নজর এড়ায়নি। তবে প্রাধান্য পেয়ে বিদ্যাসাগরের সংস্কারক রূপটি।

এ সময়ের মধ্যে বাঙালির রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার প্রসার এবং স্ত্রীশিক্ষা ও বেথুন বিদ্যালয়ের কথাও এসেছে। তবে তা ততটা বিস্তৃত নয়।

এ অধ্যায়ে ওদুদ বলেছেন—এ সবই নব জাগরণের গঠনাত্মক দিক। কিন্তু এর সঙ্গে দেশে 'ভাঙার' দিকটি বড়ো হয়ে দেখা দেয় মুসলমান সম্প্রদায় আর চাষিদের মধ্যে। তা ছাড়া লেখক এ অংশে নীল বিদ্রোহ, ব্ল্যাক অ্যাক্টস, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন আর খ্রিস্টধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে ব্রাহ্ম-হিন্দুদের সাময়িক ঐক্যের উল্লেখও করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে ১৮৫৭-এর সিপাহি বিদ্রোহ, ১৮৫৯-৬০-এর নীল বিদ্রোহ এবং দুই বিদ্রোহে বাঙালির মনোভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে যুক্তি আর তথ্যের সাহায্যে। এ অংশে বাংলা নাটক, কাব্য ও কথাসাহিত্যে নবযুগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে; আলোচিত হয়েছেন মূলত মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙালির রাষ্ট্রনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, আই. সি. এস. পরীক্ষার বয়স কমানোর বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলন আর ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন—এই দুটি দিকে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই সংগ্রামের আলোচনা আছে তৃতীয় অধ্যায়ে। তবে এ অংশের মূল বিষয় কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান আন্দোলন এবং ব্রাহ্ম সমাজের বিভাগ।

ওদুদ বেশ বিস্তৃতভাবে উদাহরণ ও উদ্ধৃতি দিয়ে কেশবচন্দ্রের আন্দোলনের গুণ ও দোষসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। বিবৃতি আর বিশ্লেষণ, তথ্য এবং যুক্তির সুমিত সমন্বয়ে অধ্যায়টি বিশেষ মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ইংরেজ শাসনের সূচনা থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্রমাবনতি এবং নব জাগরণ সময়ে তাদের আত্মসংশোধন প্রয়াস বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। আলোচনার সীমা উনিশ শতকের শেষে কংগ্রেস স্থাপনের সময় পর্যন্ত প্রসারিত। এ অংশে বক্তব্যের স্বচ্ছতার প্রয়োজনে কালানুক্রমিকতার বিন্যাস হয়েছে স্বতন্ত্র। অন্যান্য অধ্যায়ের মতো পূর্ববর্তী-পরবর্তী অধ্যায়গত যোগ এ অংশে অনুপস্থিত। অধ্যায়ের প্রথমাংশে ইংরেজ শাসনের ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থার অবনমন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও নিষ্কর ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায় মুসলিম উচ্চবিত্তদের দুর্গতি, মুসলমানদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও বিদ্বেষবশত ইংরেজি শিক্ষাবিষয়ে বিরোধী মনোভাব—এইসব বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের প্রথম পরিবর্তনমূলক আন্দোলন শুরু হয় আরবে—সেই ওহাবি আন্দোলনের মূল কথা ছিল আদি ইসলামে ফিরে গেলেই মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি হবে। ভারতেও এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত ওদুদ তিতুমিরের কথাও যথাসম্ভব যানুপুঙ্খভাবে উপস্থাপিত করেছেন। সিপাহি বিদ্রোহ, ওহাবি বিদ্রোহ, মুসলিম-শিখ যুদ্ধের ইংরেজ-মুসলিম যুদ্ধে পরিণতি—এ সবের ফলে মুসলমানদের সঙ্গে ইংরেজ-শাসকদের সম্পর্কের তিক্ততার বৃদ্ধি—কোনো কিছুই ওদুদের দৃষ্টি এড়ায়নি। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য যে সব শিক্ষিত মুসলমান সক্রিয় হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নবাব আবদুল লতিফ ও তাঁর স্থাপিত মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি, সৈয়দ আমির হোসেন, আলিগড়ের স্যার সৈয়দ আহমদ। কিন্তু এঁদের প্রচেষ্টার ত্রুটি হল ইংরেজি ভাষা, শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন ও চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতি করাকেই লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা। এই আধুনিক শিক্ষাকে যথার্থভাবে কাজে লাগানোর জন্য জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বিষয়ে তাঁদের প্রয়াস তেমন শক্তিশালী ছিল না। এইভাবে বিবরণ-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বাংলার তথা ভারতের অবস্থা- পরিবর্তনের একটি পূর্ণ ভাষাচিত্র এই ছোটো অধ্যায়টিতে কাজী আবদুল ওদুদ অঙ্কিত করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে কাজী আবদুল ওদুদ বাঙালির রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ, হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ, শশধর তর্কচূড়ামণির অদ্ভুত মতবাদ এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে নির্মোহ দৃষ্টিতে যুক্তিসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ করেছেন। এ অংশেও আছে প্রাসঙ্গিক বিস্তৃত উদ্ধৃতি।

অধ্যায়টিকে ওদুদ তিন ভাগে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম ভাগে আছে বাংলার স্বদেশপ্রীতি কেমন করে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক জাগরণে পরিণত হল তারই বিবৃতি এবং বিশ্লেষণ। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াসে হয়ে উঠেছিল সর্বভারতীয় এক প্রতিষ্ঠান। যদিও উত্তর ভারতে স্বজাতিপ্রেমিক স্যার সৈয়দ আহমদ ইংরেজদের সঙ্গে প্রীতিসম্পর্ক স্থাপনের জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাধা দিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু বিচলিত হলেন না। ফলে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হয়ে উঠল সর্বভারতীয় এক প্রতিষ্ঠান।

পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ওদুদ দেখিয়েছেন কেমন করে শাসক ইংরেজের বিরূপতা, বাঙালির শক্তির স্ফুরণকে দমিত করার জন্য সক্রিয়তা আর কর্নেল ওলকট ও মাদাম হেলেনা পেট্রভনা ব্লাভাট্স্কি-র থিয়সফিক্যাল সোসাইটির প্রয়াস—বাংলার রেনেসাঁসজাত সৃষ্টিধর্মী উদার মানসিকতার প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করল।

ইলবার্ট বিল-এ বিচার বিভাগে কয়েক শ্রেণির ভারতীয় জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটকে ইউরোপীয় জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট-এর সমমর্যাদা দানের প্রস্তাব করা হয়। এদেশের ইউরোপীয়গণ সমবেতভাবে এর বিরোধিতা করে এই যুক্তিতে যে ইউরোপীয় অপেক্ষা এদেশের প্রতিমাপূজক জাতিভেদ-বিশ্বাসী অধিবাসীগণ নৈতিক হীনতার জন্য উন্নত ইউরোপীয়দের বিচারক হওয়ার অযোগ্য। এই অপমানের ফলে সমাজের সংস্কারসমূহের সমর্থনের মনোভাব আর ইউরোপীয় সমাজের সমালোচনার প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠল দেশবাসীর মনে।

তারই সঙ্গে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে শশধর তর্কচূড়ামণির প্রয়াসে সনাতনপন্থীদের বল বৃদ্ধি পেল। বিশেষত তিনি হিন্দুধর্মের সংস্কারগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করায় সহজে তাঁর মত জনচিত্ত আকর্ষণ করেছিল। এইভাবে ক্রমশ সনাতনপন্থীরা হয়ে উঠেছিল বেশ শক্তিশালী। থিয়সফি আন্দোলনে আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উপর জোর দেওয়ায় সংস্কারবিরোধী দল প্রবল হয়ে উঠল। হিন্দু জাতীয়তাবাদ এইভাবে পরিণত হল হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদে। এই পুনরুজ্জীবনবাদকে সহায়তা করল রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও সাধনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে ওদুদ দেখিয়েছেন রামকৃষ্ণ আসলে ছিলেন পুরোনো আত্মসম্পূর্ণ অধ্যাত্মবাদের সাধক। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুগপ্রভাব তিনি স্বীকার করেছেন। তাঁর সকল মত যে সমর্থনযোগ্য নয়—ওদুদের নিপুণ বিশ্লেষণ সে সত্য প্রমাণ করেছে। যেমন রামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ'—বাণীটি যে যথার্থ নয় তা তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন। কারণ কোনো ধর্মই সম্পূর্ণ সত্য নয়। প্রতি ধর্মের মধ্যে আছে মিথ্যা বা অসার্থক চিন্তা। মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়তাই প্রকৃত ধর্ম। আনুষ্ঠানিক ধর্ম যদি মনুষ্যত্ব সাধনের সহায়ক না হয় তবে তা আচার মাত্র।

পরমহংসদেবের অপূর্ব ভগবৎনির্ভরতা, সন্ন্যাস প্রীতি, ভাবসমাধি, তাঁকে অবতার বলে শিষ্যগণের প্রচার আর বিবেকানন্দের বিশ্বজয় এই সবের সমন্বয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে তাঁর প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যুক্তিধর্মী সৃষ্টিশীল মানসিকতার প্রসার। স্বামী বিবেকানন্দ যৌবনে ছিলেন প্রাণবন্ত তরুণ। কিন্তু যুগধর্ম তাঁকে করে তুলল সংশয়ী ও জিজ্ঞাসু। তিনি রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অসম্ভব দৈহিক ও মানসিক বলের পরিচয় দিয়ে গড়ে তোলেন রামকৃষ্ণকেন্দ্রিক সমাজসেবার একটি বিশাল সংস্থা—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন।

ওদুদ সুন্দরভাবে স্বামী বিবেকানন্দের ত্রুটি ও দুর্বলতার এবং শক্তির দিকটি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন বিবেকানন্দের ত্রুটি ছিল সার্থক মূল্যবান চিন্তাধারার সঙ্গে দুর্বল অস্পষ্ট ভাবনার মিশ্রণ। যেমন ধর্মকে তিনি সমাজ-সংস্পর্শ-বিহীন আত্মচিন্তারও উৎকর্ষ প্রাপ্তির পথ হিসেবে দেখেছেন। অথচ বাস্তবে তিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কঠোর মত প্রকাশ করেছেন, মাদ্রাজের (বর্তমান চেন্নাই) ব্রাহ্মণদের জাতিগর্বে আঘাত দিয়েছেন। নারীদের সমস্যা সমাধানের কোনো প্রয়াসও তিনি করতে পারেননি। তবে ওদুদ স্বীকার করেছেন প্রবল পৌরুষ এবং গভীর মানবপ্রীতি ও স্বদেশপ্রেমেই বিবেকানন্দের যথার্থ পরিচয়। তাঁর এই প্রীতির বলে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও রামকৃষ্ণের ভগবৎ-সাধনা শক্তিলাভ করেছিল। কিন্তু সন্ন্যাসপ্রীতি, প্রবল ঈশ্বরনির্ভরতার মতো জীবনবিমুখ প্রবণতার ফলে তা দেশ ও জাতির জীবনে ইতিবাচক কোনো শক্তি সঞ্চারে সমর্থ হয়নি।

এইভাবে রেনেসাঁস-এর প্রতি স্তরের নেতাদের কর্মপ্রণালীর পূর্ণ বিশ্লেষণ ওদুদের এই দীর্ঘ প্রবন্ধকে দিয়েছে সম্পূর্ণতা। দীর্ঘতা সত্ত্বেও শিথিলতা নেই তাঁর রচনায়—এ সত্য অবশ্য স্বীকার্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে তথা শেষ অধ্যায়ে বিবরণ আর বিশ্লেষণ রীতির সমন্বয়ে বাংলার রেনেসাঁস-এর বিপর্যস্ত হওয়ার দিকটি স্পষ্টতা পেয়েছে। এখানে তিনি তথ্য, উদাহরণ আর যুক্তির মাধ্যমে দেখিয়েছেন হিন্দু জাতীয়তাবাদ আসলে ছিল হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি গৌরববোধ। যদিও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তাকে দীপ্তি দিয়েছিল তবু তা ছিল কিছুটা সংকীর্ণ। এরপর আছে শ্রী অরবিন্দের কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে ক্ষুদ্র বিশ্লেষণ-ভিত্তিক আলোচনা। সিস্টার নিবেদিতার মূল্যায়নও এ অংশে স্থান পেয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন ভারতীয়দের ইংরেজ ও ইউরোপ সম্বন্ধে ভয়হীন করা এবং নিজস্ব আত্মিক সম্পদ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা ছিল এই দুই ব্যক্তিত্বের লক্ষ্য।

অধ্যায়টির প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে আছে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চেতনার বিশ্লেষণ ও বিচার। ওদুদ যথার্থই দেখিয়েছেন যে হিন্দুত্ব সম্বন্ধে মোহমুক্ত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ অল্প দিনেই; আর গ্রহণ করেছিলেন ভারতীয়দের আত্মশক্তিতে উদ্‌বোধিত করবার পথ। ১৯০৫-এর বঙ্গ ভঙ্গ পরিকল্পনা এবং তা রোধ করার জন্য বাঙালির প্রাণপণ প্রয়াসই তাঁকে প্রাণিত করেছিল এই কর্মে। কারণ বঙ্গ ভঙ্গ কালের বিরোধী আন্দোলন বয়কট-এর মাধ্যমে দৈহিক শক্তিকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে জাগে বিরূপতা। শাসক-সহায়তায় সে বিরূপতা দ্রুত হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক। দেখা দেয় দাঙ্গা। ভারতীয় কংগ্রেস ক্রমে হয়ে উঠেছিল শক্তিমান—সেখানেও দেখা দেয় চরমপন্থী দল। নরম দলের সঙ্গে চলে তাদের বিরোধ। বাড়তে থাকে শাসকদলের নিপীড়ন। সেই সময়ে ঘটে ১৯০৮-এর ২৫মে মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষেপের ঘটনা—যাতে ভারতবিরোধী মানসিকতাসম্পন্ন বিচারক কিংসফোর্ড-এর বদলে মারা যায় দুই ইংরেজ মহিলা। এ ঘটনার এক মাসের মধ্যে মানিকতলায় আবিষ্কৃত হয় বোমার কারখানা।

এর ফলে নেতাদের মধ্যে দেখা দেয় বিভ্রান্তি। নব শক্তিতে উদ্‌বোধিত তরুণদলের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। রবীন্দ্রনাথ এ পরিস্থিতিতে ভারতের সমস্যা-জটিলতা এবং তা থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেন। তাঁর সেই পথনির্দেশের প্রকৃতি ও সত্যতা—প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্র-প্রবন্ধের উদ্ধৃতি এবং বিশ্লেষণ দ্বারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন ওদুদ। কিন্তু এই সত্য পথ কবির স্বপ্ন বলে উপেক্ষিত হয়।

প্রবন্ধের শেষের দিকে আছে জাতীয় কংগ্রেসের নতুন নেতা মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলনের বিশ্লেষণ। কাজী আবদুল ওদুদ তথ্য ও যুক্তির দ্বারা বিশদ করেছেন কেমন করে গান্ধি হয়ে উঠলেন নব জাগরণ-উদ্ভূত মানবতার দূত।

দীর্ঘদিন গান্ধিজি চিরাগত ধর্মীয় ধারণার বশবর্তী ছিলেন। কিন্তু অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলন শুরু করার পর তিনি উপলব্ধি করলেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন লিখিত ধর্মশাস্ত্র ধর্ম নয়—ধর্ম মানে চিরন্তন মানব বিবেক, Religion is eternal human conscience. এভাবেই ওদুদ গান্ধিজিকে বাংলার রেনেসাঁস-নায়কদের পর্যায়ভুক্ত করেছেন।

এর পরে ওদুদ ব্যাখ্যা করেছেন রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধিজির অহিংস অসহযোগ সর্বাংশে গৃহীত ও সফল না হওয়ার কারণ। এই রূপে তিনি বাংলার নব জাগরণের প্রধান ধারা জাতীয় উন্নতির ধারা, জীবনবোধ ও রাজনীতির ধারা কেমন করে সন্ত্রাসবাদের উত্তেজনায় বিপর্যস্ত হয়ে যায়—সে ইতিহাসকে পূর্ণতা দিয়েছেন।

বাংলা রেনেসাঁস-এর অন্যান্য ধারা—সাহিত্য, শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, বাণিজ্য-ব্যবসায়—সব কয়টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন কাজী আবদুল ওদুদ। বাংলার মুসলমানদের একাংশের মধ্যে উদার মানবতার প্রকাশ ঘটেছিল সে সত্য বিবৃত ও বিশ্লেষণ করায় ওদুদের আলোচনা হয়ে উঠেছে সামগ্রিকতায় সুন্দর।

সমাপ্তিতে তিনি বাংলার নব জাগরণ বিপর্যস্ত হওয়ার কারণ রবীন্দ্রনাথের একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতির দ্বারা স্পষ্ট করে

দিয়েছেন। অনেকে বলতে পারেন এর ফলে লেখকের স্বকীয় চিন্তাশক্তির অভাব বড়ো হয়ে উঠেছে। এই মত গ্রহণ করা যায় না এ কারণে যে রবীন্দ্র-উদ্ধৃতির নির্বাচনটি হয়েছে সংগত। এবং এক্ষেত্রে কবির বিশ্লেষণ যথার্থ ও সর্বোত্তম।

কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন মননশীল গদ্য সাহিত্যিক। তাঁর প্রবন্ধের ভাষা চিন্তার ভারে ক্লিষ্ট নয়—মননদীপ্তিতে উজ্জ্বল এবং প্রাঞ্জল। ক্বচিৎ ঈষৎ আবেগের প্রকাশ লক্ষিত হলেও তিনি চিন্তাবিদের কাম্য নিরাসক্তি প্রায় সর্বত্র বজায় রাখতে পেরেছেন। স্বচ্ছ, স্পষ্ট, বলিষ্ঠ গদ্যভাষা এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিকে কখনও ক্লান্তিকর করে তোলেনি।

তাই আমরা বলতে পারি বিবৃতি ও বিশ্লেষণের সুষম অন্বয়, তথ্য ও যুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার, পক্ষপাতহীনতা, রেনেসাঁস-এর প্রতিটি দিক সম্বন্ধে আলোচনা এবং ভাষার স্বচ্ছতা 'বাংলার রেনেশাঁস'কে প্রকৃত সাহিত্যগুণান্বিত অথচ বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ করে তুলেছে। বাংলার রেনেসাঁসকে তিনি যেভাবে পাঠকের সামনে পূর্ণায়তরূপে উপস্থাপিত করেছেন সেটি তাঁর প্রবন্ধশিল্পী হিসেবে সফলতার প্রমাণ।

২.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। কাজী আবদুল ওদুদের দৃষ্টিতে বাংলার রেনেসাঁস-এর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।

২। মুসলমান সমাজ এবং বাংলার রেনেসাঁস—কাজী আবদুল ওদুদের অনুসরণে উভয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

৩। কাজী আবদুল ওদুদের মতে কোন কোন কারণে কোন সময়ে বাংলার রেনেসাঁস বিপর্যস্ত হয়েছিল—বিশ্লেষণ করুন।

৪। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন—মুসলিম সাহিত্য সমাজ, ওহাবি আন্দোলন।

২.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। কাজী আবদুল ওদুদ—আবদুল কাদির (ঢাকা)

২। কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী (২য় খণ্ড) সম্পাদনা—আবদুল হক (ঢাকা)

৩। কাজী আবদুল ওদুদ : স্মৃতি ও সত্তা—সম্পাদনা অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, জাহিরুল হাসান, আশিস দে, শীতলদাস জোয়ারদার

৪। শুভোদয়—অন্নদাশঙ্কর রায়

৫। সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬। আবদুল ওদুদ নির্বাচিত প্রবন্ধ;

একক ৩ □ উত্তরতিরিশ : বুদ্ধদেব বসু

গঠন

৩.০ বুদ্ধদেব বসু : সংক্ষিপ্ত জীবনী

৩.১ প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু : সংক্ষিপ্ত আলোচনা

৩.২ 'উত্তরতিরিশ' গ্রন্থ পরিচয় ও প্রবন্ধ পরিচয়

৩.৩ গঠন শিল্প : 'উত্তরতিরিশ'

৩.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৩.৫ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ বুদ্ধদেব বসু : সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম : ১৯০৮ সালের ৩০ নভেম্বর মাতামহের কর্মস্থল বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লায় বুদ্ধদেব বসুর জন্ম। ভূদেবচন্দ্র বসু ও বিনয়কুমারীর পুত্র বুদ্ধদেব জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃহারা হন। পিতা পরে দ্বিতীয় বিবাহ করেন এবং তাঁর সঙ্গে বুদ্ধদেবের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তাঁকে পালন করেন মাতামহ চিন্তাহরণ সিংহ ও মাতামহী স্বর্ণলতা। নোয়াখালিতে তাঁদের বাড়িতেই কেটেছিল বুদ্ধেদেবের বাল্যজীবন।

শিক্ষা : চিন্তাহরণ সিংহ ছিলেন সেকালের দারোগা কিন্তু গভীর ছিল তাঁর বিদ্যানুরাগ। বুদ্ধদেবকে তিনি ইংরেজি, সংস্কৃত ও গণিত শিক্ষা দান করেন। এবং বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও উৎসাহিত করেন। বুদ্ধদেব লিখেছেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত লেখকদের বই পড়েই তিনি বাংলা শিখেছিলেন। ১৯২২-এ নোয়াখালি ছেড়ে ঢাকায় আসেন বুদ্ধদেব। ১৯২৩-এ তিনি ভরতি হয়েছিলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের নবম শ্রেণিতে।

বুদ্ধদেব ছিলেন মেধাবী ছাত্র। মাতামহের দেওয়া উপযুক্ত পাঠ পুষ্ট করেছিল সেই মেধাকে। তাই ১৯২৫-এ প্রবেশিকা পরীক্ষা তিনি প্রথম বিভাগে পঞ্চম হয়ে পাস করেন এবং ঢাকার সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের আই. এ. ক্লাসে ভরতি হন। এই কলেজের গ্রন্থাগারে ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিবিধ গ্রন্থ। 'লন্ডন মার্কারি' আমেরিকার 'ডায়াল' প্রভৃতি পত্রিকা নিয়মিত আসত গ্রন্থাগারে। প্রচুর পাশ্চাত্য সাপ্তাহিক পত্রিকাও নেওয়া হত। বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যিক মন গড়ে ওঠার কাজে সহায়তা করেছিল এই গ্রন্থাগার।

প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় হয়ে ১৯২৭-এ আই. এ. পাস করে বুদ্ধদেব লাভ করেন কুড়ি টাকার মাসিক বৃত্তি। এ বছরের জুলাই-এ তিনি ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ক্লাসে ভরতি হন। ১৯৩০-এ তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে বি.এ. পাস করেন। পরের বছর ১৯৩১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাস করেন; এ পরীক্ষায়ও তিনি ছিলেন প্রথম বিভাগে প্রথম স্থানের অধিকারী।

কর্মজীবন : ১৯৩১-এ ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় আসেন বুদ্ধদেব। বছর দুয়েক গৃহশিক্ষকতা আর ছোটো গল্প-উপন্যাস রচনাই ছিল তাঁর আয়ের উৎস। ১৯৩৪-এ তিনি রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪৫-এ তিনি এ কাজ ছেড়ে দেন। ১৯৪৪-এ তিনি দৈনিক 'দি স্টেটসম্যান'

(‘The Statesman’) পত্রিকায় স্বাধীন সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৯৪৫-এ তিনি এ পত্রিকার তৃতীয় সম্পাদকীয় লেখার কাজ পান। কিন্তু সাহিত্যচর্চা বিঘ্নিত হচ্ছিল বলে তিনি ১৯৫১ সালে দুটি কাজই ছেড়ে দেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের সৌজন্যে ১৯৫২ সালে তিনি ছ-মাসের জন্য ইউনেস্কোর এক প্রকল্পের উপদেষ্টা নিযুক্ত হন।

১৯৫৩ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পিটসবার্গ-এর পেনসিলভেনিয়া কলেজ ফর উইমেন-এ এক বছরের জন্য অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৬-তে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগে প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি পদত্যাগ করেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দু-বছরের এক বক্তৃতা-সফরে আমন্ত্রিত হন। ১৯৭০-এ তিনি ‘পদ্মভূষণ’ লাভ করেন। তাঁর অবশিষ্ট কর্মজীবন ছিল সাহিত্যনির্ভর। মূলত কবি বুদ্ধদেব জীবিকার চাপে লিখেছিলেন ছোটোগল্প, উপন্যাস, আর ছোটোদের গল্প-উপন্যাস। ফলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে একথা বলা যায়। ১৯৭৪ সালের ১৮ মার্চ অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

সাহিত্যজীবন : জ্ঞানোন্মেষের পর থেকেই সাহিত্যমনস্ক বুদ্ধদেবকে শব্দ দিয়ে গঠিত ছবি মুগ্ধ করত; প্রকৃতির সাহচর্যেও তৃপ্ত হত তাঁর মন। এভাবেই তাঁর সাহিত্যিক মন পরিণত হয়ে উঠেছিল। নয় বছর বয়সে তিনি ছয় থেকে সাত স্তবকের একটি ইংরেজি কবিতা রচনা করেন। এটিই তাঁর প্রথম রচনা। এরপরে অবশ্য তাঁর রচনার মাধ্যম হয় বাংলা। পয়ার-ত্রিপদীতে তিনি রচনা করেন রামায়ণ, কিশোর পত্রিকা ‘মৌচাক’-এ পাঠাতে থাকেন লেখা; প্রকাশ করেন হাতে লেখা পত্রিকা ‘বিকাশ’ বা ‘পতাকা’। ঢাকার ‘তোষিণী’ ভিন্ন কলকাতার ‘অর্চনা’, ‘নারায়ণ’, ‘শঙ্খ’ পত্রিকায় মুদ্রিত হয় তাঁর কবিতা। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর একটি ইংরেজিতে লেখা গল্প।

তেরো থেকে পনেরো বছর বয়সে বুদ্ধদেব যেসব কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি থেকে নির্বাচিত তিরিশটি কবিতার সংকলন ‘মর্ম্মবাণী’ ১৯২৪-এ ঢাকা থেকে বের হয়। এটি তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে ঢাকার ‘প্রাচী’ পত্রিকায় বের হয় বুদ্ধদেব বসুর প্রথম বাংলা গল্প ‘একটা বসন্তের দিন’।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ‘কল্লোল’-এ মুদ্রিত হয় বুদ্ধদেব বসুর বিতর্কিত অশ্লীলতার অপবাদগ্রস্ত গল্প ‘রজনী হ’লো উতলা’। লেখকের বয়স তখন মাত্র সতেরো বছর।

১৯২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষে বুদ্ধদেব রচনা করেন একটি অভিনন্দন ‘কবিতা’। কবিতাটি কবি-সংবর্ধনা সভায় পঠিত হয়।

আই. এ. পরীক্ষার পর ঢাকায় লেখা হয় বুদ্ধদেবের নিজস্বতায় উজ্জ্বল প্রথম কবিতা ‘বন্দীর বন্দনা’। কবিতাটি মুদ্রিত হয় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা ‘কল্লোল’-এ। বুদ্ধদেব বসু তখন বের করতেন হাতে লেখা পত্রিকা ‘প্রগতি’। আই. এ. পরীক্ষায় পাওয়া বৃত্তির অর্থে ১৯২৭-এ পত্রিকাটি মুদ্রিত রূপ পায়। মাত্র দু বছর চললেও (১৯২৯-এ বন্ধ হয়ে যায়) পত্রিকাটি বাংলার সাহিত্য জগতে তুলেছিল আলোড়ন। এ পত্রিকার অন্য সম্পাদক ছিলেন কবি অজিতকুমার দত্ত।

‘কল্লোল’-এর মতো ‘প্রগতি’ও ছিল সমকালীন জীবন বিশেষত নীচের তলার মানুষের জীবনের রূপকার। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বকীয়তায় বিশিষ্ট হবার প্রয়াস করেছিল এ পত্রিকা। তার অন্বিষ্ট ছিল ‘সহস্রের নিষ্পেষণের নাগপাশ থেকে’ ব্যক্তির মুক্তি-প্রচেষ্টা (সম্পাদকীয়, প্রথম সংখ্যা)। ‘প্রগতি’ কবি জীবনানন্দ দাশকে এনেছিল প্রকাশের জগতে। তাঁর অন্যান্য কবিতার সঙ্গে বিখ্যাত ‘বোধ’ আর ‘অবসরের গান’ মুদ্রিত হয় ‘প্রগতি’তেই। ‘শনিবারের চিঠি’র আক্রমণের লক্ষ্য ‘প্রগতি’তে মুদ্রিত হয়েছিল বিষ্ণু দে-র কবিতা, বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্তের অনেক কবিতা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘বিবাহের চেয়ে বড়ো’, বুদ্ধদেবের ‘টান’, ‘ঝুট’ ইত্যাদি গল্পের সঙ্গে তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘সাড়া’ও ‘প্রগতি’-তে মুদ্রিত হয়েছিল।

বুদ্ধদেব বসুর 'অতি আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্য' (মাঘ ১৩৩৪), 'বাঙলা কবিতার ভবিষ্যৎ' (ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৩৬) প্রভৃতি প্রবন্ধও 'প্রগতি'-তে মুদ্রিত হয়। এ সময়েই ১৩৩২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা 'কল্লোল'-এ মুদ্রিত হয় তাঁর প্রবন্ধ 'কবি সুকুমার রায়'। প্রবন্ধটি সুকুমার রায়কে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বলা যায় পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বই বুদ্ধদেব বসুকে করেছিল প্রাবন্ধিক; যেমন জীবিকার দায় কবি বুদ্ধদেবকে করে তুলেছিল কথাসাহিত্যিক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বুদ্ধদেব বসু ছিলেন ছাত্র সংসদের সাহিত্য-সম্পাদক। তাঁর প্রয়াসে উন্নত হয়েছিল জগন্নাথ হলের বার্ষিক পত্রিকা 'বাসন্তিকা'। বুদ্ধদেবের 'কঙ্কাবতী' নামের প্রসিদ্ধ কবিতা এ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়।

১৯৩০ সালে মুদ্রিত হয় বুদ্ধদেব বসু-র প্রথম কবিতা-সংকলন 'বন্দীর বন্দনা', প্রথম উপন্যাস 'সাড়া' এবং প্রথম গল্প-সংকলন 'অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প'।

১৯৩১-এ বুদ্ধদেব চলে আসেন কলকাতা। এখানে তাঁর জীবন ছিল লেখনীনির্ভর। জীবনধারণের দায়ে তিনি লিখেছিলেন অজস্র গল্প আর বেশ কিছু উপন্যাস। 'আমার যৌবন' বুদ্ধদেব স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন "আমি লিখছি শুধু নগদ মূল্যে উপন্যাস আর ছোটো গল্প আর ছোটোদের গল্প আর ফাঁকে ফাঁকে বিনোদ হিসেবে খেয়ালি চালে মজুরিহীন প্রবন্ধ দু-একটা।" ('আমার যৌবন', বুদ্ধদেব বসু ১ম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃ. ৮২)

বুদ্ধদেব বসুর 'এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে' গল্প-সংকলনটি ১৯৩২ সালে অশ্লীলতার অভিযোগে নিষিদ্ধ হয়। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৬৭ তে প্রকাশিত তাঁর 'রাত ভরে বৃষ্টি' ও অশ্লীলতার দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বিচারে তাঁর জয় হয়।) তখন বুদ্ধদেব বসুর উদ্যোগে গঠিত হয় নতুন প্রকাশন সংস্থা, গ্রন্থকারমণ্ডলী। স্বল্পায়ু এই সংস্থা থেকে বের হয়েছিল মোট তিনটি কবিতা-সংকলন; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'আমরা', বুদ্ধদেব বসুর 'একটি কথা' এবং বিষ্ণু দে-র প্রথম কবিতা-সংকলন 'উর্বশী ও আর্টেমিস'।

১৯৩৫-এর ১ অক্টোবর বুদ্ধদেব বসু আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় বের হয় প্রথম কবিতা বিষয়ক বাংলা পত্রিকা ত্রৈমাসিক 'কবিতা'। সহকারী সম্পাদক ছিলেন সমর সেন। পত্রিকাটি চলেছিল প্রায় পঁচিশ বছর—শেষ সংখ্যা বের হয় ১৯৬১ সালে। তৃতীয় বর্ষ থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করেন, ১৯৪০ সালে সরে যান সমর সেন। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসুর একক সম্পাদনায় বের হতে থাকে 'কবিতা'। এক সময়ে সহকারী সম্পাদক হিসেবে এসেছিলেন নরেশ গুহ (১৯৫৪-১৯৫৮) ও জ্যোতির্ময় দত্ত (পৌষ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ সংখ্যাটির)। কিন্তু 'কবিতা' পত্রিকা পুরোপুরি ছিল বুদ্ধদেব-নির্ভর। কবিতাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা, আধুনিক কবিতার প্রচার, বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিবাদ, আধুনিক কবিতার যথার্থ সমালোচনা—এই ছিল পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য। বহু নতুন কবির কবিতা প্রথম মুদ্রিত হয় 'কবিতা'-য়। বিশেষ উল্লেখ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা প্রথম মুদ্রিত হয় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা 'কবিতা' পত্রিকায়।

বুদ্ধদেব 'বৈশাখী' নামের একটি বার্ষিকীর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে, চলেছিল ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। হুমায়ুন কবিরের সম্পাদনায় ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ'। প্রথম বছরে বুদ্ধদেব বসু ছিলেন এ পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক।

'কবিতা' প্রকাশের কিছু পরে বুদ্ধদেব বসুর উদ্যোগে গড়ে ওঠে প্রকাশন-সংস্থা 'কবিতা ভবন'। ১৯৪২ সাল থেকে 'কবিতা ভবন' বের করতে থাকে 'এক পয়সায় একটি' নামের চার আনা মূল্যের ষোলো পৃষ্ঠার কবিতা গ্রন্থমালা। মোট আঠারোটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এ সিরিজে। জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' সিরিজটির উল্লেখ্য গ্রন্থ। ১৯৪৩ সাল থেকে 'কবিতা ভবন' থেকে প্রতিভা বসুর সম্পাদনায় ছোটো গল্প গ্রন্থমালাও বের হতে থাকে।

'কবিতা ভবন' প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতা-সংকলন 'পদাতিক'

(১৯৪৩)। ১৯৪০-এর জুলাই মাসে এ সংস্থা প্রকাশ করে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নামের কবিতা-সংকলন। সম্পাদক ছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায় সংকলনটির একটি নতুন সংস্করণ বের হয় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে।

ফ্যাসিবাদের ক্রমপ্রসার অন্যান্য শিল্পী-সাহিত্যিকদের মতো বুদ্ধদেব বসুকেও করেছিল উদ্বিগ্ন। তাই ফ্যাসিবাদের বিস্তার রোধের চেষ্টায় গঠিত 'প্রগতি লেখক সংঘ'-এর প্রতি ছিল তাঁর সহানুভূতি। ১৯৩৮-এর ২৪/২৫ ডিসেম্বর ভবানীপুরে আশুতোষ মেমোরিয়াল হল-এ 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'-এর দ্বিতীয় সর্ব ভারতীয় সম্মেলন হয়। সম্মেলন পরিচালনার জন্য গঠিত সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন বুদ্ধদেব। অন্য তিন জন ছিলেন—মুলকরাজ আনন্দ (২০০৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬)। বুদ্ধদেব বসু এই সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য : আধুনিক লেখকের অবস্থা' ('Bengali Literature Today : Position of Modern Writer') বিষয়ে। এ সংঘের ক্ষীণায়ু মাসিক পত্র 'প্রগতি'-তেও তিনি লিখতেন।

১৯৪২-এর ৮ মার্চ ঢাকায় তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দর নৃশংস হত্যার অভিঘাতে গঠিত 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এ যোগ দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। লিখেছিলেন 'প্রতিবাদ' কবিতাটি; সই করেছিলেন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবাদ-বিবৃতিতে। 'প্রতিবাদ' সোমেন চন্দের স্মরণে প্রকাশিত 'প্রাচীর' কবিতা-সংকলনে মুদ্রিত হয়। তিনি 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম' নামের পুস্তিকাও লিখেছিলেন। তবে সাহিত্যমনস্ক বুদ্ধদেব বেশি দিন প্রগতি দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেননি; সরে এসেছিলেন নিজস্ব পরিমণ্ডলে।

পুস্তক তালিকা : স্বক্ষেত্র কবিতা হলেও উপন্যাস, ছোটো গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, ভ্রমণকথা, ছোটোদের জন্য গল্প-উপন্যাস কবিতা—সবই লিখেছিলেন বুদ্ধদেব। তাঁর গ্রন্থ সমূহের একটি বিষয়ানুক্রমিক ও কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া গেল।

কবিতা-সংকলন :

১। 'মর্ম্মবাণী'; ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, ২। 'বন্দীর বন্দনা'; ১৯৩০, ৩। 'একটি কথা'; ১৯৩২, ৪। 'পৃথিবীর পথে'; ১৯৩৩, ৫। 'কঙ্কাবতী'; ১৯৩৭, ৬। 'নতুন পাতা'; ১৯৪০, ৭। 'এক পয়সায় একটি'; ১৯৪২, ৮। '২২শে শ্রাবণ'; ১৯৪২, ৯। 'বিদেশিনী'; ১৯৪৩, ১০। 'দময়ন্তী'; ১৯৪৩, ১১। 'রূপান্তর'; ১৯৪৪, ১২। 'দ্রৌপদীর শাড়ী'; ১৯৪৮, ১৩। 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর'; ১৯৫৫, ১৪। 'বারোমাসের ছড়া'; ছোটোদের কবিতা, ১৯৫৬, ১৫। 'যে আঁধার আলোর অধিক'; ১৯৫৮, ১৬। 'দময়ন্তী : দ্রৌপদীর শাড়ি ও অন্যান্য কবিতা'; ১৯৬৩, ১৭। 'মরচে-পড়া পেরেকের গান'; ১৯৬৬, ১৮। 'এক দিন : চিরদিন ও অন্যান্য কবিতা'; ১৯৭১, ১৯। 'স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা'; ১৯৭১।

অনুবাদ কবিতা-সংকলন :

১। 'কালিদাসের মেঘদুত'; ১৯৫৭, ২। 'ডাক্তার জিভাগো' (কবিতাংশ অনুবাদ ও সম্পাদনা); ১৯৬০, ৩। 'শার্লবোদলেয়ার : তাঁর কবিতা'; ১৯৬১, ৪। 'হ্যেল্ডার্লিনের কবিতা'; ১৯৬৭, ৫। 'রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা'; ১৯৭০।

সম্পাদিত কবিতা-সংকলন :

১। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'; ১৯৬৩।

কাব্যনাট্য :

১। 'কালসন্ধ্যা'; ১৯৬৯, ২। 'অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ'; ১৯৭০, ৩। 'সংক্রান্তি/প্রায়শ্চিত্ত : ইক্কাকু সেন্নিন'; ১৯৭৩।

নাটক :

১। ‘মায়া-মালঞ্চ’ (‘কালো হাওয়া’ উপন্যাসের নাট্যরূপ); ১৯৪৪, ২। ‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’; ১৯৬৬, ৩। ‘কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ’; ১৯৬৮, ৪। ‘পুনর্মিলন’; ১৯৭০।

ভ্রমণ-নিবন্ধ :

১। ‘সমুদ্রতীর’; ১৯৩৭, ২। ‘আমি চঞ্চল হে’; ১৯৩৭, ৩। ‘সব পেয়েছির দেশে’; ১৯৪১, ৪। ‘জাপানী জার্নাল’; ১৯৬২, ৫। ‘দেশান্তর’; ১৯৬৬।

গল্প-সংকলন :

১। ‘অভিনয়, অভিনয় নয়’; ১৯৩০, ২। ‘রেখাচিত্র’; ১৯৩১, ৩। ‘এরা আর ওরা এবং আরও অনেকে’; ১৯৩২, ৪। ‘অদৃশ্য শত্রু’; ১৯৩৩, ৫। ‘খাতার শেষ পাতা’; ১৯৪৩, ৬। ‘হাওয়া বদল’; ১৯৪৫, ৭। ‘একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা’; ১৯৪৫, ৮। ‘গল্প-সংকলন’; ১৯৪৫, ৯। ‘একটি কি দুটি পাখি’; ১৯৪৬, ১০। ‘চার দৃশ্য’; ১৯৬২ বঙ্গাব্দ, ১১। ‘একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু’; ১৯৬০, ১২। ‘হৃদয়ের জাগরণ’; ১৯৬১, ১৩। ‘ভাসো আমার ভেলা’; ১৯৬৩, ১৪। ‘তুমি কেমন আছো’ (গল্প ও নাটিকা’); ১৯৬৭, ১৫। ‘প্রেমপত্র’; ১৯৭২।

অনুবাদ গল্প :

১। ‘পিরানদেল্লোর গল্প’; ১৯৪৪, ২। ‘হাউই’ (অস্কার ওয়াইল্ড-এর অনুবাদ); ১৯৪৪।

উপন্যাস :

১। ‘সাড়া’, ১৯৩৩, ২। ‘অকর্ম্মণ্য বা একটি বাঙালী বুডিন’, ১৯৩১, ৩। ‘মন-দেয়া-নেয়া’ ১৯৩২, ৪। ‘যবনিকা পতন’, ১৯৩২, ৫। ‘রডোডেনড্রন গুচ্ছ’, ১৯৩২, ৬। ‘সানন্দা’, ১৯৩৩, ৭। ‘আমার বন্ধু’, ১৯৩৩, ৮। ‘যেদিন ফুটলো কমল’, ১৯৩৩, ৯। ‘হে বিজয়ী বীর’ ১৯৩৩, ১০। ‘ধূসর গোধূলি’, ১৯৩৩, ১১। ‘অনেক রকম’ (নাট্যোপন্যাস) ১৩৪০ বঙ্গাব্দ (মার্জিত সংস্করণ ‘ক্ষণিকের বন্ধু’, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ), ১২। ‘অসূর্যম্পশ্যা’, ১৯৩৩, ১৩। ‘একদা তুমি প্রিয়ে’, ১৯৩৪, ১৪। ‘সূর্য্যমুখী’ ১৯৩৪, ১৫। ‘রূপালি পাখি’, ১৯৩৪, ১৬। ‘লাল মেঘ’ ১৯৩৪, ১৭। ‘পরস্পর’, ১৯৩৪, ১৮। ‘বাড়ি-বদল’, ১৯৩৫, ১৯। ‘বাসর ঘর’, ১৯৩৫, ২০। ‘পারিবারিক’, ১৯৩৬, (মার্জিত সংস্করণ ‘দুই নদী এক ঢেউ’, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ), ২১। ‘পরিক্রমা’, ১৯৩৮, ২২। ‘কালো হাওয়া’, ১৯৪২, ২৩। ‘জীবনের মূল্য’, ১৯৪২, ২৪। ‘অদর্শনা’, ১৯৪৪ (মার্জিত সংস্করণ ‘তুমি কি সুন্দর’, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ), ২৫। ‘বিশাখা’, ১৯৪৬, ২৬। ‘তিথিডোর’, ১৯৪৯, ২৭। ‘মনের মতো মেয়ে’ ১৯৫১, ২৮। ‘নির্জন স্বাক্ষর’, ১৯৫১, ২৯। ‘মৌলিনাথ’ ১৯৫২, ৩০। ‘শেষ পাণ্ডুলিপি’, ১৯৫৬, ৩১। ‘শোণপাংশু’ ১৯৫৯, ৩২। ‘নীলাঞ্জনের খাতা’ ১৯৬০, ৩৩। ‘পাতাল থেকে আলাপ’, ১৯৬৭, ৩৪। ‘রাত ভ’রে বৃষ্টি’, ১৯৬৭, ৩৫। ‘গোলাপ কেন কালো’, ১৯৬৮, ৩৬। ‘আয়নার মধ্যে একা’, ১৯৬৮, ৩৭। ‘বিপন্ন বিস্ময়’, ১৯৬৯, ৩৮। ‘রুকমি’, ১৯৭২, ৩৯। ‘এক বৃদ্ধের ডায়েরি’ (মরণোত্তর) ১৯৮০, ৪০। ‘প্রভাত ও সন্ধ্যা’ (মরণোত্তর) ১৯৮০।

স্মৃতিকথা :

১। ‘আমার ছেলেবেলা’, ১৯৭৩, ২। ‘আমার যৌবন’, (মরণোত্তর), ১৯৭৬, ৩। ‘আমাদের কবিতাভবন’ (মরণোত্তর)।

কিশোর সাহিত্য

গল্প-সংকলন :

১। ‘রঙিন কাঁচ’, ১৯০৩, ২। ‘ঘুম পাড়ানি’, ১৯৩৩, ৩। ‘সাগর-রহস্য’ ১৩৪২ বঙ্গাব্দ (প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে)। ৪। ‘কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড’, ১৯৩৫, ৫। ‘আজগুবি জানোয়ার’, ১৯৩৬ (প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে) ৬। ‘শনিবারের

বিকেল', ১৯৩৯, ৭। 'গল্প-ঠাকুর্দা, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, ৮। 'পথের রাত্রি', ১৯৪০, ৯। 'ঘুমের আগের গল্প', ১৯৪১, ১০। 'ভদ্রতা কাকে বলে', ১৯৪১, ১১। 'রান্না থেকে কান্না', ১৯৫৬, ১২। 'জ্ঞান থেকে অজ্ঞান', ১৯৫৮, ১৩। 'ছোটোদের ভালো ভালো গল্প', ১৯৬৩, ১৪। 'বই ধার দিয়ো না', ১৯৬৬, ১৫। 'হাসির গল্প'।

অনুবাদ গল্প :

১। 'অপরূপ রূপকথা' (দু খণ্ড) ১৯৩৫, (হান্স অ্যান্ডারসন-এর অনুবাদ), ২। 'স্বার্থপর দৈত্য', ৩। 'সুখী রাজপুত্র', ১৯৫৬, ৪। 'হ্যামেলিনের বাঁশিওলা', ১৯৬০।

উপন্যাস :

১। 'জলতরঙ্গ' (নাট্যোপন্যাস) ১৯৩৩, ২। 'অন্য কোনোখানে', ১৯৫০।

গোয়েন্দা উপন্যাস :

১। 'দস্যুর দলে ভোমরা', ১৯৪০।

২। 'ছায়া কালো কালো', ১৯৪২।

৩। 'ভূতের মতো অদ্ভুত', ১৯৪২।

৪। 'কালবৈশাখীর ঝড়', ১৯৪৫।

৫। 'তাসের প্রাসাদ', ১৯৫১।

যুক্ত রচনা :

১। 'বিসর্পিল' (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে), ১৯৩৪।

২। 'বনশ্রী' (পূর্বোক্ত দুই লেখকের সঙ্গে), ১৯৩৪।

৩। 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' (প্রতিভা বসুর সঙ্গে), ১৯৫৪।

৪। 'সাতনরী' (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, রমেশ সেন ও রাধাকিঙ্কর রায়চৌধুরীর সঙ্গে)।

প্রবন্ধ :

১। 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', ১৯৩৫।

২। 'উত্তরতিরিশ', ১৯৪৫।

৩। 'কালের পুতুল', ১৯৪৬।

৪। 'সাহিত্য চর্চা', ১৯৫৪।

৫। 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য', ১৯৫৫।

৬। 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি', ১৯৫৭।

৭। 'সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ', ১৯৬৩।

৮। 'কবি রবীন্দ্রনাথ', ১৯৬৬।

৯। 'প্রবন্ধ সংকলন', ১৯৬৬।

১০। 'মহাভারতের কথা' (মরণোত্তর), ১৯৭৪।

১১। 'কবিতার শত্রু ও মিত্র' (মরণোত্তর), ১৯৭৪।

১২। 'An Acre of Green Grass', ১৯৪৮।

১৩। 'Tagore : Portrait of a Poet', ১৯৬২।

৩.১ প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু : সংক্ষিপ্ত আলোচনা

কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটো গল্পকার বুদ্ধদেব বসু বেশ কিছু মূল্যবান প্রবন্ধও লিখেছিলেন। উপন্যাস কবিতা-সংকলন, গল্প-সংকলনের তুলনায় তাঁর প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা বেশি নয়—মাত্র এগারোটি। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা পঞ্চাশ, গল্প-সংকলন ও কবিতা সংকলনের সংখ্যা যথাক্রমে চুয়াল্লিশ ও পঁচিশ।

যুক্তির শৃঙ্খলিত বিন্যাস, বক্তব্যের বিশ্লেষণমুখ্য পরিবেশন, তথ্যসমৃদ্ধি প্রবন্ধের মূল শর্ত। রচয়িতার নিজস্ব উপলব্ধি প্রকাশের কোনো সুযোগ প্রবন্ধে নেই। বিশেষত প্রবন্ধে আবেগ সঞ্চারিত করে দেওয়া সহজ নয়। বুদ্ধদেব সেই কঠিন কর্মে সফল। কারণ তিনি যুক্তির তুলনায় উপলব্ধি ও রসবোধকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর অনুভবপ্রধান প্রবন্ধ পাঠে জাগ্রত হয় পাঠকের সাহিত্যবোধ ; এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

তাঁর সমালোচনায় প্রধান হয়েছে মন্ময়তা, প্রাধান্য পেয়েছে স্বকীয় ধারণা। তবু স্বেচ্ছাচারী, শৃঙ্খলাহীন নয় তাঁর প্রবন্ধসাহিত্য। বক্তব্যের পরিমিত, সংহত অথচ আবেগস্পন্দিত প্রকাশে ঋদ্ধ তাঁর প্রবন্ধ একই সঙ্গে তৃপ্ত করে পাঠকের হৃদয় ও মননকে। তাঁর আলোচনা বিশ্লেষণভিত্তিক। বিশেষ করে যখন তিনি বলেন প্রচলিত ধারণার বিপরীত কথা তখন তাঁর বিশ্লেষণ হয়ে ওঠে দীপ্তিময়। তথাপি প্রবন্ধের প্রার্থিত নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন বুদ্ধদেব বসু। এই কারণেই তাঁর রচিত রম্য প্রবন্ধগুলি হয়ে উঠেছে এত আকর্ষক। অবশ্য রম্যতা এবং আকর্ষণীয়তা বুদ্ধদেবের প্রবন্ধের সাধারণ লক্ষণ। তিনটি স্মৃতিকথা কয়েকটি ভ্রমণনিবন্ধ আর কিছু রম্য প্রবন্ধ লিখলেও সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কিত আলোচনা-সমালোচনাই বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধের মূল বিষয়। তাঁর প্রথম মুদ্রিত প্রবন্ধ 'কবি সুকুমার রায়' প্রকাশিত হয় ১৩৩২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার 'কল্লোল'-এ। প্রবন্ধটি সুকুমার রায়কে সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

'প্রগতি' (১৯২৭-১৯২৯), 'কবিতা' (১৯৩৫-১৯৬১)—ব্যতিক্রমী এই দুই পত্রিকার সম্পাদনা বুদ্ধদেব বসুর প্রাবন্ধিক সত্তার বিকাশের অন্যতম কারণ। 'সাহিত্যচর্চা' (১৯৫৪)-র সব প্রবন্ধই 'কবিতা'-র জন্য লেখা হয়েছিল।

বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমূহকে মূলত দুটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়—কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী সম্পর্কে অনুভব-গভীর আলোচনা, সাহিত্যের সমালোচনা। বুদ্ধদেব বসু আলোচনা করেছেন মধুসূদন, নজরুল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, শিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কৃতি সম্পর্কে। আধুনিক কবিতার পোষক এবং ধারক বুদ্ধদেব এ সম্পর্কেও লিখেছিলেন বেশ কিছু প্রবন্ধ।

সাহিত্যিক এবং ব্যক্তি সম্পর্কিত প্রবন্ধসমূহে আছে তাঁদের সাহিত্য এবং শিল্পের বিস্তৃত সমালোচনা। আধুনিক কবিতা নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা আছে তাঁর দুটি প্রবন্ধে, একটির ভাষা বাংলা, নাম 'আধুনিক কবিতার প্রকৃতি'; অন্য প্রবন্ধটি ইংরেজিতে লেখা, নাম 'মডার্ন বেঙ্গালি পোয়েট্রি' ('Modern Bengali Poetry')। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি স্থান পেয়েছে তাঁর 'অ্যান অ্যাকর অব গ্রিন গ্রাস' ('An Acre of Green Grass', ১৯৪৮) সংকলনে। প্রবন্ধ দুটিতে আছে তিরিশ ও চল্লিশের দশকের কবিতা সম্পর্কে বিস্তৃত বিশ্লেষণ। কবিতা উপভোগ ও পাঠকরুচি নির্মাণের নিদর্শন এই দুটি প্রবন্ধ। 'আধুনিক কবিতা' (১৯৫৪) নামের নিজের সম্পাদিত সংকলনের ভূমিকাপ্রবন্ধ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য

সংগ্রহের ভূমিকা এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক'—এই তিন প্রবন্ধেও বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বাংলা কবিতার গতি প্রকৃতির যথাযথ বিশ্লেষণ করেছেন।

'কালিদাসের মেঘদূত' (১৯৫৭)—স্ব-কৃত এই অনুবাদটির ভূমিকায় কালিদাস সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার ভ্রান্তি যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন বুদ্ধদেব।

'মহাভারতের কথা' (১৯৭৪) বুদ্ধদেব বসুর গভীর মনন ও নিবিড় অনুভবের ফসল। মহাকাব্য মহাভারত তাঁর লেখনীতে লাভ করেছে নতুন তাৎপর্য। আধুনিক দৃষ্টিতে মহাভারতের কাহিনি ও চরিত্রের এরূপ ব্যাখ্যা আর কোনো বাঙালি প্রাবন্ধিক করেছেন কিনা সন্দেহ। 'সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ' সংকলনের 'রাজশেখর বসু' ও 'শিশিরকুমার ভাদুড়ী' প্রবন্ধ দুটি বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনাশক্তির বিস্তৃতির পরিচায়ক। বিশেষত শিল্পের সঙ্গে শিল্পীরচরিত্রের আলোচনায় তিনি সফল।

অবশ্য মধুসূদন সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন সঠিক নয়। মধুসূদন নবজাগ্রত মানবতাবোধের উদ্দীপনা হেতু রাবণ-ইন্দ্রজিৎ-শূর্পণখাকে নতুন তাৎপর্য দিয়েছিলেন। এই বিষয়টি বুদ্ধদেব বসু ঠিক মতো বোঝেননি। বাংলা ছন্দে ছেদ ও যতির অসমতা ভেঙে দিয়ে মধুসূদন এনেছিলেন প্রবহমানতা—এ সত্য বুদ্ধদেব বসু স্বীকার করেছেন। তবে তাঁর মতে মধুসূদন একাজ সচেতনভাবে করেননি এবং তিনি অপচিত প্রতিভার উদাহরণ।

পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু শার্ল বোদলেয়ার (Charles Pieree Baudelaire : ১৮২১-১৮৬৭), রাইনার মারিয়া রিলকে (Rainer Maria Rilke : ১৮৭৫-১৯২৬) এবং হেল্ডারলিন আর তাঁদের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনা তিনটি এই তিন কবির বুদ্ধদেব-কৃত অনুবাদ-কবিতা সংকলনের ভূমিকা হিসেবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বুদ্ধদেব সামগ্রিক আলোচনা করেছেন 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। রবীন্দ্র-কবিতা বিষয়ে বুদ্ধদেবের উপলব্ধির প্রকাশ লক্ষিত হয় গ্রন্থটিতে। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত 'জয়ন্তী উৎসর্গ' গ্রন্থে আছে রবীন্দ্র-প্রেমের কবিতা বিষয়ে বুদ্ধদেবের সংবেদনশীল আলোচনা।

রবীন্দ্র-কবিতা নিয়েই বুদ্ধদেব বসুর ছন্দ সম্পর্কিত আলোচনার শুরু। 'বাংলা ছন্দ', 'বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ : মানসী', 'রবীন্দ্রনাথের গানে, পদ্য ও গদ্য'—তাঁর তিনটি উল্লেখ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধ তিনটিতে নতুন কিছু নেই। কিন্তু রবীন্দ্র-গানে ছন্দোমুক্তির প্রয়াস সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা বিশেষ মূল্যবান।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের আলোচনা কালে বুদ্ধদেব ততটা শক্তির পরিচয় দিতে পারেননি। তাঁর প্রধান মত রবীন্দ্র-উপন্যাসে কবি আর কথাশিল্পীর পূর্ণ সমন্বয় ঘটেনি। ফলে ক্ষতি হয়েছে উপন্যাসের।

তিনি আরও বলেছেন প্লট নির্মাণ বিষয়ীবুদ্ধির কাজ আর কবিস্বভাবী লেখক এই কারণেই কাহিনি-কাঠামো নির্মাণে ততটা সফল হননি।

রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে যে ভিন্নতর প্রকরণের কথা বলেছেন বুদ্ধদেব তা সমর্থন করেননি। তিনি 'চোখের বালি' (১৯০২)-কে বলেছেন সীমিত শক্তির উপন্যাস। অথচ 'চোখের বালি' বাংলা উপন্যাসে সূচনা করেছিল ব্যক্তিত্বের সমস্যা যা পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসে ছিল অনুপস্থিত। 'নৌকাডুবি' (১৯০৬)-র কৃত্রিমতা বুদ্ধদেব বুঝেছেন। কিন্তু তার কারণ যে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বর্জন ও বহির্মুখী ঘটনার আধিক্য—তা তিনি বুঝতে পারেননি। 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬)-র সমস্যা সম্পর্কেও তাঁর বিশ্লেষণ যথার্থ নয়। বুদ্ধদেব বসুর মতে 'গোরা' (১৯০৯), 'চতুরঙ্গা' (১৯১৬) এবং 'যোগাযোগ' (১৯২৯)-ই রবীন্দ্রনাথের শিল্পসফল উপন্যাস। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে আছে নানা ত্রুটি। যেমন 'শেষের কবিতা' (১৯২৯)-র গল্পাংশ দুর্বল; 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪)-এ কবি মাঝে মাঝে আপন অভিজ্ঞতার বাইরে চলে গেছেন। 'দুই বোন' (১৯৩২) ও 'মালঞ্চ' (১৯৪২) দুটি উপন্যাসেই রয়েছে সংহতির অভাব।

বুদ্ধদেব রবীন্দ্র-সৃষ্টির সামগ্রিক আলোচনায় সফল। কিন্তু পৃথকভাবে বিশ্লেষণকালে আপন অনুভূতির উপর নির্ভরতা হেতু এসেছে ভ্রান্তি।

রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্প সম্পর্কে বুদ্ধদেবের উচ্ছ্বাস অসংগত নয়। ছোটো গল্পের একমুখী ভাব, সংকেতময় উপস্থাপন রবীন্দ্র-লেখনীতেই প্রথম নির্মিত হয়েছিল। ছোটো গল্পের উপযুক্ত ভাষাও তিনি সৃষ্টি করেছেন; সময় আর বিষয় পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁর ভাষারও ঘটেছে পরিবর্তন—এসবই বুদ্ধদেব লক্ষ করেছেন। তাঁর নিপুণ বিশ্লেষণে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে রবীন্দ্র-ছোটো গল্পের আন্তর-সৌন্দর্য।

এখানেও কিন্তু বুদ্ধদেব কবি ও কথাশিল্পীর সমন্বয়-সূত্র সর্বদা রক্ষা করতে পারেননি। ছোটো গল্পে রবীন্দ্রনাথ যে বাস্তবের সঙ্গে মানবমনের চিরন্তন বৃত্তির সংঘাত-জনিত চিত্র অঙ্কন করেছেন তা বুদ্ধদেব বসুর আলোচনায় ততটা স্পষ্ট হয়নি।

'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' (১৯৩৫) বুদ্ধদেব বসুর অনুভবসমৃদ্ধ প্রবন্ধ-সংকলন। প্রমথ চৌধুরী ১৩৪২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বিচিত্রা'-য় গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তা বুদ্ধদেব বসুর এরূপ প্রবন্ধের মূল বৈশিষ্ট্য—"এ জাতীয় প্রবন্ধের প্রধান গুণ হচ্ছে তা কিছু প্রমাণ করতে চায় না কোনো কিছু শিক্ষা দিতে চায় না।" সাহিত্যের তাত্ত্বিক আলোচনায় বুদ্ধদেবের উৎসাহ ছিল না। এ বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা কম। 'কবিতার শত্রু ও মিত্র' তাঁর সাহিত্যতত্ত্বভিত্তিক একমাত্র প্রবন্ধ। 'দময়ন্তী' কবিতা সংকলনের প্রথম সংস্করণে (১৯৪৩) কবিতার ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কিত একটি আলোচনা ছিল, পরবর্তী সংস্করণে তা বর্জিত হয়। তিনি লেখকের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও প্রস্তুতি নিয়ে দু-একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'কিসের জন্য আর্ট' এবং 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধ দুটিতে তিনি লেখকের সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য যে আত্মপ্রকাশের অনিবার্য প্রেরণা—সেই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'লেখার ইস্কুল' প্রবন্ধে তিনি লেখকের শিক্ষা, প্রস্তুতি ও শ্রমকে মূল্যবান মনে করেছেন। আবেগ এবং তার নিয়ন্ত্রণ সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে দুয়েরই আবশ্যকতা তিনি প্রমাণ করেছেন।

বুদ্ধদেব বসু ছিলেন অনুভবপ্রধান প্রাবন্ধিক। আপন উপলব্ধিকেই তিনি বিবিধ প্রকারে প্রবন্ধে রূপায়িত করেছেন। অবশ্যই তার সঙ্গে আছে যুক্তি ও তথ্যের সুমিত অন্বয়। প্রবন্ধ-সাহিত্যের একটি শাখা রম্য প্রবন্ধ রচনায় সে জন্যই তিনি বিশেষ নিপুণতা অর্জন করেছেন। 'উত্তরতিরিশ' তাঁর এরূপ কুড়িটি রম্য প্রবন্ধের সংকলন।

৩.২ 'উত্তরতিরিশ' গ্রন্থপরিচয় ও প্রবন্ধপরিচয়

'উত্তরতিরিশ'-এর কুড়িটি রম্য প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৪ সাল। প্রবন্ধগুলি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৯৪৫-এ। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৫২) যুক্ত হয় ১৯৪৭-এ লেখা দুটি প্রবন্ধ 'সবচেয়ে দুঃখের দুঘণ্টা' ও 'নোয়াখালি'।

'বেলে লেৎর্স'—এই ফরাসি সংজ্ঞাটির বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে রম্য রচনা। 'বেলে' কথাটির অর্থ মনোহর 'লেৎর্স'-এর অর্থ সাহিত্য। সংজ্ঞাটির ভিত্তি রচনাকৌশলের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ আকর্ষক ভঙ্গিতে বিন্যস্ত লেখকমনের নানা চিন্তার উপস্থাপনই রম্য রচনা বা 'বেলে লেৎর্স'। প্রকৃত রম্য নিবন্ধকার গভীর মননের অধিকারী এবং তাঁর নিজস্ব অনুভব, লঘু ভঙ্গিতে উপস্থাপনে সক্ষম। সেই উপস্থাপনে তাঁর ব্যক্তিস্বভাবের প্রতিফলন থাকা দরকার।

বুদ্ধদেব বসু ছিলেন মনন-গভীরতার অধিকারী এবং রম্যভঙ্গিতে স্বীয় অনুভবের লিপিচিত্রণে সক্ষম প্রাবন্ধিক। ফলত তাঁর লেখনীতে রম্য নিবন্ধ সহজেই অর্জন করেছে শিল্প-সফলতা। 'উত্তরতিরিশ' সংকলনের প্রথম প্রবন্ধের নাম **'উত্তরতিরিশ'**। এই নাম থেকে আহরিত হয়েছে গ্রন্থের নাম। এটি লেখকের একান্ত ব্যক্তিমনের চিন্তার ফসল।

প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসে বুদ্ধদেব বসু প্রবন্ধটিতে যৌবনের তুলনায় প্রৌঢ়ত্বের অস্ত্যর্থক দিকগুলি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি যৌবনকে অনুভূতি-প্রাবল্যের জন্য স্বসৃষ্ট দুঃখের উৎস হিসেবে দেখেছেন এবং প্রৌঢ়ত্বের স্বস্তিময় স্বাধীনতাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বলেছেন।

তিনি আপন অনুভবকে এমনভাবে রূপায়িত করেছেন যে তা হয়ে উঠেছে সর্বজনীন। প্রবন্ধের শুরুতে আছে বয়োবৃদ্ধি সম্পর্কে মানুষের অসচেতনতার কথা। এ সত্য অবশ্য স্বীকার্য যে বয়স যে বাড়ছে সে সম্পর্কে পারিপার্শ্বিকই মানুষকে সচেতন করে দেয়। তরুণরা করে শ্রদ্ধাস্নিগ্ধ ব্যবহার, অথবা তাদের ক্রুদ্ধ অপমানাত্মক ব্যবহারেও জড়িয়ে থাকে বয়সের অনুষঙ্গ।

বাল্যসঙ্গীদের বয়স্কমুখ আর ব্যবহারও ব্যক্তিকে সচেতন করে অপগত যৌবন সম্বন্ধে। এ অভিজ্ঞতা কেবল লেখকের নয়—প্রায় সব মানুষের।

এর পরের অংশে বুদ্ধদেব বসু যৌবনের দুর্বলতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা কারণহীনভাবে যৌবনের স্তুতি করে থাকেন। বিশেষ যুবতী নারীর বন্দনায় চিরদিনই কবিগণ মুখর। অথচ নারীর যৌবন নিছক একটি জৈবিক ব্যাপার। কবিদের বক্তব্য যৌবন ক্ষণিকের বলেই তা মূল্যবান এবং যুবতী নারীর মধ্যে প্রকৃতির আদিম প্রাণশক্তির প্রকাশ লক্ষিত হয় বলেই তা বন্দনীয়।

বুদ্ধদেবের মতে যৌবন-বন্দনা করেছেন বিশ্বের বহু কবি। তবে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ। কারণ তিনি যৌবনের সত্যকে উপলব্ধি করেছেন।

নিবন্ধের পরের অংশে রয়েছে বুদ্ধদেবের মূল বক্তব্য। তাঁর মতে যৌবনে অনুভূতির অতিরেক মানুষকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপন করতে দেয় না। আপন শক্তি সম্বন্ধে তার বিশ্বাস বাস্তবের সংঘাতে বারে বারে ভেঙে যায়। সংযমের অভাবে মনের কথা উপস্থাপনে সে অক্ষম। বয়স্কদের শাসনে তার বিশ্বজগতের সঙ্গে নব পরিচয়ের কামনা পূর্ণ হয় না। আর সংবেদনশীলতার আধিক্যহেতু এসব বাধা তার মনকে করে তোলে বেদনার্ত।

আসলে মানুষ উপলব্ধি দিয়ে বিশ্বকে গ্রহণ করে। সুখ-দুঃখ তার উপলব্ধির ফল। তাই কোনো মানুষই কোনো বয়সেই পূর্ণ সুখী নয়।

তথাপি যৌবন অপেক্ষা প্রৌঢ়ত্ব কাঙ্ক্ষণীয়। কারণ তারুণ্যের অনুভূতির প্রাবল্য হেতু আসে দুঃখ। প্রৌঢ়ত্বে আসে তা দমনের ক্ষমতা। পরিণামে সুখ যায় বেড়ে। তাই বুদ্ধদেব প্রৌঢ়ত্বকে বলেছেন জীবনের শ্রেষ্ঠ এবং উপভোগ্য সময়। দেহ ও মনের শক্তি তখন পূর্ণতা পায়, শেখা যায় মানস শক্তির যথাযথ ব্যবহারের কৌশল। পাওয়া যায় উপার্জন ভিত্তিক সার্বিক স্বাধীনতা।

অনুভব-প্রাবল্য যৌবনের দুঃখের উৎস। পরিণত বয়সে বুদ্ধি হয় সংযত শক্তিমান; কিন্তু হৃদয়-অনুভব ও উৎসাহ হয় দুর্বল। প্রৌঢ়ত্ব তথা মধ্যবয়স উভয়ের মিলনস্থল। এ বয়সে জগৎ সম্পর্কে কৌতূহল ও আনন্দবোধ ক্ষীণ হয় না। অথচ অনর্থক অনুভূতি-বাহুল্য তখন লুপ্ত। বরং অনুভূতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ, উৎসাহ-উজ্জ্বলতার সঙ্গে বুদ্ধির দৃঢ়তার মিলনে মন হয়ে ওঠে শক্তিমান। হৃদয়ানুভবকে জীবনের উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগের ক্ষমতা লাভ করা যায় প্রৌঢ়ত্বে। বুদ্ধদেব এ ব্যাপারটিকে নিজের বোধ দিয়ে জেনেছেন।

নব যৌবনে বিশ্বের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের আনন্দে আচ্ছন্ন থাকে মন। ফলে বুদ্ধির মুক্তি হয় ব্যাহত। মধ্য বয়সে রূপ-উপভোগের সচেতন ক্ষমতা জাগ্রত হয় মনে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় তারুণ্যের অভিজ্ঞতা। ফলে বস্তুর যথার্থ রূপ জানা যায়; অনুভব করা যায় তার সৌন্দর্য।

প্রৌঢ় বয়সে পাওয়া যায় পরিণতির সুখকর সম্ভাবনা আর তারুণ্যের ভাববিহ্বলতা নির্লিপ্তভাবে গ্রহণের ক্ষমতা।

১৯৪২-এ রচিত প্রবন্ধটিতে মূলত আপন প্রৌঢ়ত্বজনিত আনন্দ ও যৌবনের আবেগ-উন্মাদনাজাত দুঃখের বিশ্লেষণই মুখ্য। সমকালের যুদ্ধ, গর্জিত আন্দোলন কম্পিত সময়ের ছায়া প্রবন্ধটিতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

'নব বসন্ত' 'উত্তরতিরিশ'-এর দ্বিতীয় প্রবন্ধ। ১৯৪৩-এ রচিত এ প্রবন্ধের বিষয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে জীবনের, অস্তিত্বের ক্ষয়হীনতার, চিরন্তনত্বের দিকটির উপস্থাপন। প্রকৃতির ঋতুপরিবর্তনকে বন্ধ করতে পারেনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী রূপ, রুদ্ধ হয়নি মানুষের আনন্দিত হওয়ার শক্তি। বুদ্ধদেব বসু বসন্তপ্রভাতের আনন্দের মধ্য দিয়ে অনুভব করেছেন সেই সত্য এবং সে অনুভূতিকে দিয়েছেন ভাষারূপ। প্রবন্ধটিতে রম্য লঘু ভঙ্গিতে মানুষের বিনাশহীন অস্তিত্বের সত্য উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে জাপানের বর্মা আক্রমণের সময়ে মানুষ বোমার আতঙ্কে দলে দলে কলকাতা ত্যাগ করেছিল। কলকাতার বোমাহীন সুস্থতা আর স্থানান্তরে নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে তারা ফিরে আসে কলকাতায়। তারপরেই কলকাতায় বোমা পড়ে। কিন্তু মানুষ আতঙ্কিত হয় না। বিপদ যখন সম্ভাব্য ছিল তখন তার ভীষণতা ছিল প্রবল, যখন তা সত্য হয়ে দেখা দিল তখন মানুষ তাকে গ্রহণ করল সহজে। এর কারণ মানব-প্রকৃতির সম্প্রসারণধর্মী সহনশীলতা। যুদ্ধ, বিপ্লব, রক্তপাতের সম্ভাবনায় ভীত হয় সে। কিন্তু তাদের সম্মুখীন হয়ে মানুষ নিঃশেষে বিনষ্ট হয় না। সকল রক্তপাত, সমস্ত ধ্বংস তুচ্ছ করে উঠে আসে নবীন জীবন। ব্যক্তিমানব ধ্বংস হয় কিন্তু মানবজাতিকে মুছে দিতে পারে না কোনো মানবিক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তাই সামূহিক বিনাশের মধ্যেও মনে থাকে এ আশ্বাস যে জীবন আবার তার স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হবে। বুদ্ধদেব বসুর মতে মানুষ অমর, কারণ সব মানুষ একসঙ্গে মারা যায় না। মানুষ দুঃখজয়ী—কারণ সে সর্বদা দুঃখে অভিভূত থাকে না। লেখকের মতে এর কারণ মানুষের মনের গঠন এমন যে কোনো বিশেষ প্রবণতা স্থায়ী হয় না তার মনে। আবার প্রকৃতির অনিবার্য নিয়মে প্রতি মানুষের মনে সব সময় একই প্রবণতা ক্রিয়াশীল থাকে না। তাই পথে দাঙ্গা চললেও ঘরে বসে কিছু মানুষের সাহিত্যালোচনা বিঘ্নিত হয় না।

বুদ্ধদেব অনুভব করেছেন মানুষ কোনো কোনো ব্যাপারে প্রকৃতির অধীন এবং তার দুঃখ সহ্য করার কারণ এই অধীনতা। দুঃখের প্রথম আঘাতে বিহ্বল হয় মানুষ। কিন্তু দ্রুত সে ফিরে পায় স্বাভাবিকতা। প্রিয় বিষয়ে উন্মুখ হয়ে ওঠে সে। ব্যক্তিজীবনের শোক-দুঃখের মতো সমষ্টিজীবনকে আঘাতকারী যুদ্ধ বা রাষ্ট্রবিপ্লব সম্বন্ধেও একথা সত্য। প্রথম আঘাতের পর মানবসমাজ হয়ে ওঠে স্বাভাবিক। এভাবেই দুঃখের উপর জয়ী হয় মানবস্বভাব।

মননশীলতার কারণে প্রাণীজগতে মানুষ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু জীবনের ক্রমপ্রবাহ যা প্রাণকে করে অমর—সেখানে সে কিছু জৈব নিয়মের অধীন। নারীপুরুষের পারস্পরিক টান বা বসন্ত-সময়ের মনের উদ্দীপনা—দুটিই জৈব নিয়ম। প্রকৃতির এই অপ্রতিরোধ্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াসমূহ জীবনকে করে তোলে চিরন্তন। তাই মানবজীবন অতিক্রম করে দুঃখের সাময়িক প্রবলতা। ব্যক্তিমানব আর মানবসমাজ—উভয় ক্ষেত্রেই এটি সত্য।

দুঃখভোগের কঠোরতার মধ্যেও প্রকৃতির নিয়ম আর ব্যক্তিমনের অনুভব থাকে অপরিবর্তিত। প্রাণধারণের ভিত্তি এই সত্য। তাই যুদ্ধের সংকট-ক্ষণেও প্রকৃতির রূপ নাড়া দেয় তার মনকে; তরুণ আকৃষ্ট হয় তরুণীর প্রতি। যথা নিয়মে চলে ঋতুর পরিবর্তন। এ থেকে বোঝা যায় উপস্থিত বিপদের বাইরেও এমন কিছু আছে যা চিরদিনের। ঘটনার ওঠানামার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। মানুষের প্রাণের সঙ্গে আছে তার অদৃশ্য অচ্ছেদ্য যোগ। সেই যোগই সর্ববিধ সংকটের মধ্যে মানুষকে স্বাভাবিক ও প্রকৃতিস্থ রাখে।

লেখক অনুভব করেছেন ব্যক্তি-মানুষের বিরাট বিশাল শ্রমের ফল প্রায়ই ক্ষয়প্রবণ ও পরিবর্তনশীল। তেমনই ক্ষয়প্রবণ প্রসিদ্ধ সব সমরনায়ক বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব। উপস্থিত সময়ের পরে তারা হয়ে যাবে ইতিহাসের শুষ্ক তথ্য। সাধারণ মানুষের ছোটো ছোটো দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে টিকে থাকে সভ্যতা; টিকে থাকে মানুষ। তারই সঙ্গে টিকে থাকে সন্তানস্নেহ, সৌন্দর্যদর্শনের তৃপ্তি, সাহিত্য সৃষ্টির আনন্দের মতো চিরদিনের আনন্দ। স্রষ্টা কবি হিসেবে বিনাশাতীত

সাধারণ জীবনের একজন হিসেবে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকালের বৈনাশিকতার মধ্যে শীতের শেষে আগত বসন্ত দিনের মধ্যে বুদ্ধদেব শুনেছেন এই বাণী।

প্রবন্ধের শেষাংশ রবীন্দ্রনাথের 'ওরা কাজ করে' আর জীবনানন্দ দাশের 'ক্ষেতে প্রান্তরে' ('সাতটি তারার তিমির' : ১৯৪৮) ও 'পৃথিবীলোক' কবিতায় অনুরূপ ভাবনার ছায়া লক্ষিত হলেও এ অনুভব একান্তই বুদ্ধদেবের ব্যক্তিমনের অনুভব।

১৯৪৩ সালে রচিত প্রবন্ধটির আর এক বিশেষত্ব সময়ের ছায়া—যা বুদ্ধদেবের অনেক রম্য প্রবন্ধেই অনুপস্থিত।

'বড়ো রাস্তায় ছোটো ফ্ল্যাট'—১৯৪৩ সালে লেখা প্রবন্ধটি একান্তই বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব অনুভবের ফসল। রাসবিহারী এভিনিউ—কলকাতার এই বড়ো রাস্তার দুশো দুই নম্বর বাড়ির একটি ফ্ল্যাট-এ ছিল তাঁর বাস। সে বাড়ি থেকে দেখা যেত রাস্তায় চলমান জীবন-প্রবাহ। নগরবাসী হয়েও একটু বিচ্ছিন্ন থেকে নারী, শিশু, বেকার, চাকুরে—বহু মানুষের পথচারণের মধ্যে তিনি দেখতে পেতেন বিচিত্রস্বাদী জীবনের উজ্জ্বল রূপ এবং সিনেমা দেখার মতো আনন্দ উপভোগ করতেন।

তারপরে এল পঞ্চাশের মন্বন্তর, এল কনট্রোল। চাষিদের ফসল কৌশলে দখল করে তা মূল্যের বিনিময়ে তাদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হল; উদ্দেশ্য দুর্ভিক্ষ-রোধ। এবার ফ্ল্যাট-এর বারান্দা থেকে তিনি দেখতে পেলেন গ্রাম বাংলার বাস্তব চিত্র। কলকাতার দক্ষিণের গ্রাম থেকে দলে দলে নানা বয়সের নারী আর কয়েকজন বৃদ্ধ অন্নের সন্ধানে এল কলকাতায়। বুদ্ধদেবের চোখে পড়ল ফুটপাথে সংসার গড়েছে তাদের অনেকে। রাত থেকে লাইন করে শুয়ে আছে কনট্রোল দোকানের সামনে। উদ্দেশ্য দোকান খোলার সঙ্গে সঙ্গে চাল সংগ্রহ। সেই স্বল্প সম্বলে তাদের ক্ষুধা মেটে না। খাদ্য সংগ্রহের একাগ্র নিষ্ঠায় তারা সন্ধান করে প্রতি গৃহ; ভিড় করে উৎসব-প্রাঙ্গণে। তথাপি তাদের জীবনে আছে আনন্দের অবকাশ; পারস্পরিক সহায়তা, শিশুর হাসি, আর গল্পকৌতুকের অবসর।

আবার নানা বয়সের বেশ কিছু বধূ, কন্যা, প্রৌঢ়া কলকাতার দক্ষিণের গ্রামগুলি থেকে রাত্রির শেষ প্রহরে কনট্রোল-প্রদত্ত চাল পাওয়ার জন্য ভিড় করে কলকাতায়। সঙ্গে তাদের থাকে শিশু। তাদের স্বামী, পিতা, ভ্রাতাদের সারা দিনের শ্রমে পাওয়া টাকা নিয়ে তারা আসে নগর কলকাতায়। অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে নানা ক্লেশ সয়ে তারা ফিরে যায়। দিনের শেষ থেকে রাত্রির অনেকটা সময় জুড়ে অব্যাহত থাকে চালের পুঁটলি কাঁধে তাদের ঘরে ফেরার পালা।

বুদ্ধদেব বোঝেন এরাই যথার্থ দেশ। এইসব মেয়েরা দরিদ্র হলেও ভদ্র গৃহস্থ। বেঁচে থাকার দায়ে পথে নামলেও তাদের মুখে আছে ভদ্রতার অবশেষ। জীর্ণ পরিচ্ছদে সুচারুভাবে লজ্জা আবৃত করার কৌশল তাদের জানা। সুপ্রসাধিত 'বালিগঞ্জিনী'-কে আপন বলে গ্রহণ করতে পারে লেখকের মন। যদিও তাঁর বুদ্ধি বলে ওই জীর্ণ চীর পরা নারীকঙ্কালগুলিই বাংলা দেশের যথার্থ প্রতিরূপ। তবু তাদের সঙ্গে একাত্মতার বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাঁর জীবনযাত্রার মার্জিত পদ্ধতি। তিনি শুধু দর্শকের মতো দূর থেকে দেখতে পারেন এদের মন থেকে মুছে যায়নি মানবিকতা। হারানো সন্তানের খোঁজে ব্যাকুল হয়ে ওঠে তারা। মুহূর্তের আনন্দে হেসে ওঠে। তাদের শীর্ণ শিশুর দলও চাঁদ ধরার স্পর্ধা দেখায়। এভাবেই তারা অতিক্রম করে যায় অবস্থার দারিদ্র্যকে এবং বিস্মিত লেখক বুঝতে পারেন এ বৈপরীত্যের কারণ। তাঁর মনে হয় এর কারণ জীবনের স্বাভাবিক টিকে থাকার নিয়মের মধ্যে নিহিত। ১৯৪৩-এ লেখা প্রবন্ধটিতে রয়েছে সমকালের রুদ্র রূপের সপ্রাণ ভাষাচিত্র।

'খাকি' নিবন্ধে বুদ্ধদেব বসু মূলত নির্দিষ্ট পেশার নির্দিষ্ট পোশাকের বর্ণের দোষগুণ বিশ্লেষণ করেছেন। পোশাকের সঙ্গে মনোভাব ও আচরণের সম্পর্কও তাঁর চোখ এড়ায়নি। প্রবন্ধটির উৎস নির্দিষ্ট বাস-এ খাকি পোশাক পরা পাঁচ যুবকের অভব্য আচরণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে যুদ্ধ সম্পর্কিত কিছু আধা সামরিক অস্থায়ী কর্মের সৃষ্টি হয়। এসব পদে যারা নিযুক্ত হয় তাদের বেশির ভাগ ছিল অমার্জিত স্বভাব, শিক্ষাহীন, শোভনতাহীন রাস্তার 'ছোঁড়া'। সব দেশের সব বড়ো শহরেই থাকে এরূপ যুবক দল। দুর্ব্যবহারের জন্য তারা কুখ্যাত। তথাপি লেখকের মতে কলকাতা, ঢাকা, লখনউ—প্রভৃতি এদেশের বৃহৎ নগরের এই 'ছোঁড়া'রা যতদিন ধুতি, লুঙি, পাজামা পরত; ততদিন পোশাকের শালীনতা তাদের আচরণকে দুঃসহ করে তুলত না। কারণ দীর্ঘ পরাধীনতা অথবা স্বভাবনম্রতার কারণে এ দেশীয়দের পোশাকে, আচরণে, আলাপে থাকে শান্তভাব। এরপর বুদ্ধদেব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের স্বভাবের তুলনা করেছেন। পাশ্চাত্যের মতো প্রাচ্যবাসীর মনোভাব মুখমণ্ডলে স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয় না। স্বভাবচঞ্চল পাশ্চাত্য জাতির প্রবল প্রাণশক্তি বিশ্ব জয় করেছে। স্বভাবের শান্ততা প্রাচ্যের মনুষ্যত্বকে রক্ষা করেছে। পাশ্চাত্যের ভালো ও মন্দ-উভয়ের মধ্যে আছে অতিরেক। প্রাচ্যের ভালো যেমন অত্যুত্তম নয়; মন্দও তেমনই অত্যন্ত খারাপ নয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝড় সব কিছু পালটে দিয়েছে। চাহিদার কারণে আধা সামরিক পদে নিযুক্ত হয়েছে রাস্তার 'ছোঁড়ারা'। কাটাছাঁটা খার্কি উর্দির স্পষ্টতা উন্মুক্ত করে দিয়েছে তাদের অবয়ব আর চরিত্রের বর্বরতা। অশিক্ষার সঙ্গে সামরিক ঔদ্ধত্যের সংযোগে তাদের মনুষ্যত্ব চূর্ণ হয়েছে। আপনাদের হীনতা সম্পর্কে লজ্জার যে আভাস ছিল তা গেছে মুছে। প্রভুশক্তির কুৎসিত অনুকরণে এরা বিজয়ী ও বিজিত উভয়েরেই লজ্জার কারণ হয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গত বুদ্ধদেব খাকি পোশাক সম্পর্কে আপন মনোভাব বিশ্লেষণ করেছেন। বুয়র যুদ্ধের সময় আত্মগোপনের প্রয়োজনে আফ্রিকার মাটির রঙের সাদৃশ্যে সামরিক পোশাকের রং হিসেবে নির্বাচিত হয় এই অস্পষ্ট অনুজ্জ্বল রং। আধুনিক যুদ্ধের উন্নত হত্যাকৌশল খাকির এই আত্মগোপনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়েছে। তথাপি যুদ্ধের রং হিসেবে চারদিকে দেখা দিয়েছে খাকি রঙের আধিক্য। বাঙালি মেয়েরা নারীবাহিনীতে যোগ দিয়ে পরছে খাকি শাড়ি। শৌখিন যুবকেরা ফ্যাশন হিসেবে পরছে খাকি ইজের আর ঝোপকামিজ (বুশ শার্ট)।

তিনি খাকিকে বলেছেন মানবিক অনুভব বর্জিত নৈর্ব্যক্তিক রং। যুদ্ধের সঙ্গে যদি ক্রোধ, ঈর্ষা প্রভৃতি মানবিক বৃত্তি জড়িত না থাকে তবে তা থামার সম্ভাবনা কম। ক্রোধ-ঈর্ষাজাত যুদ্ধ একদিন অবসিত হয়। কুরুপাণ্ডব বা রামরাবণের যুদ্ধ তাই থেমে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূলে নেই তেমন কোনো হৃদয়বৃত্তির সম্পর্ক; যুদ্ধ হচ্ছে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের। ট্যাঙ্ক, বোমা, মেশিনগানের মতো মানুষও সেই যুদ্ধের উপকরণ মাত্র। এই যুদ্ধের নিয়ন্তারা আছে নেপথ্যে; তাদের পারস্পরিক কূটচাল অনুযায়ী চলছে যুদ্ধ। আধুনিক জগতের আবিষ্কার এই ক্রোধহীন নৈর্ব্যক্তিক অ-মানুষিক যুদ্ধ। সেই অ-মানুষিক সংগ্রামের প্রতীক খাকি রঙের উর্দি।

শাসক ইংরেজ এনেছে এই নিকৃষ্ট রং। তাই খাকির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভীতি। সে কারণে খাকি-পরিহিতদের সঙ্গে থেকে যায় একটা দূরত্ব।

এরপরে বুদ্ধদেবের বিচার্য এই রংটির শিল্পগুণ। তাঁর মতে শ্বেতকায়দের খাকি পোশাক তেমন কুৎসিত মনে হয় না। কিন্তু বাঙালির তৈলাক্ত তাম্র ত্বকের পক্ষে খাকি অশোভন।

যামিনী রায়ের স্বাধীন ভারতের সৈন্যদের পোশাকের রং সম্বন্ধে চিন্তাকে তেমন গুরুত্ব দেননি বুদ্ধদেব। খাকির ব্যাপ্তির সম্মুখীন হয়ে তিনি বুঝেছেন সে চিন্তার গুরুত্ব। তাঁর মতে সৈনিক, পিয়ন, লিফটম্যান—এইসব কর্মীদের পোশাকে খাকির বদলে আসুক অন্য রং। কোর্তা পাতলুনের স্থান গ্রহণ করুক পাজামা পাঞ্জাবি, এর ফলে কর্মীদের সঙ্গে স্থাপিত হবে জনতার হৃদয়ের সম্পর্ক। উদাহরণ হিসেবে তিনি লন্ডন এবং দেশীয় পুলিশের পোশাকের তুলনা করেছেন। পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে লন্ডন পুলিশের পোশাক; তাই তারা হয়ে উঠেছে মানুষের বন্ধু। আর লাল পাগড়ি খাকি কোর্তা, কামিজ পট্টি আর জুতো পরা দেশীয় পুলিশকে মানুষ ভয় করে এবং জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। পোশাকের রং যদি হয় খাকির বদলে সাদা, গেরুয়া বা বৌদ্ধদের মতো পীত; তবে সহজেই নিরাপত্তা

কর্মী, পুলিশ, সৈন্য—সবার সঙ্গে স্থাপিত হবে মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ক। পারস্পরিক সেই ঘনিষ্ঠতার অনুভবে জীবন হয়ে উঠবে সহনীয়।

১৯৪৩-এ রচিত এ প্রবন্ধ সমকালের অভিঘাতে স্পন্দিত বুদ্ধদেব বসুর সংবেদনশীল হৃদয়ের প্রকাশে হয়ে উঠেছে সুন্দর।

'জিনিস' নিবন্ধটির রচনাকাল ১৯৪৩। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক অবস্থার একটি ভিন্নধর্মী বিশ্লেষণ আছে এ নিবন্ধে। এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ সত্য যে অর্থ নয়—জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন দেহ-মনের পুষ্টিসাধক বস্তুসমূহ।

অনুভব-অভিজ্ঞতা দিয়ে সেই সত্য উপলব্ধি করেছেন লেখক। আগে স্ত্রীর জিনিস অর্থাৎ বিবিধ দ্রব্য ক্রয়ের ঝোঁককে তিনি কারণহীন বলে মনে করতেন। যদিও দেখা যেত সামান্য অ্যাসট্রে কি টেবিলঢাকা মনকে করতে পারে সঞ্জীবিত। আবার যে দ্রব্য বাহুল্য মনে হয়েছিল সহসা প্রয়োজনের মুহূর্তে সে হয়ে ওঠে পরম সহায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লেখক বুঝতে পারেন দ্রব্য বা জিনিসই মানুষের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে। চাল, চিনি, বসন, বাসন, কাগজ, কয়লা, কলম, আলপিন—মানুষের জাগতিক আর মানসিক উভয় অস্তিত্বের মূলে আছে এইসব ছোটো-বড়ো জিনিস। অর্থের বিনিময়ে এদের সংগ্রহ করা যায়—এখানেই অর্থের মূল্য। অথচ সাধারণ মানুষ অর্থকেই মনে করে পরমার্থ, জিনিসকে করে উপেক্ষা।

ধনবিজ্ঞানীরা বলেন অর্থ উপভোগ-উপকরণ ও উপায় আয়ত্তে আনার মাধ্যম। তাই সভ্য মানুষের অর্থ সংগ্রহের অভীপ্সা এত প্রবল। বাস্তবে কিন্তু অর্থকেই বড়ো মনে করে মানুষ; তাই অল্প মূল্যে বা বিনা মূল্যে পাওয়া বস্তুকে সে তুচ্ছ মনে করে। ধনী মূল্যবান বস্তুসমূহ সংগ্রহ করে ব্যবহারের কারণে বা প্রীতির প্রেরণায় নয়-ধনের ঘোষণা রূপে। বস্তুতন্ত্রের এই নিকৃষ্ট রূপ যখন দেখা দেয় তখনই আসে তার ধ্বংসের কাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এনেছে সেই জড়বাদ-ধ্বংসকারী বিপ্লব; মানুষ আজ বুঝেছে ধন বা অর্থ নয় মানুষের যথার্থ প্রয়োজন অর্থের বিনিময়ে লব্ধ বস্তু।

বুদ্ধদেব বসু লিখছেন আধুনিক দার্শনিক—বার্ট্রান্ড রাসেল (Bertrand Arthur Russell : ১৮৭২-১৯৬৯) কোনো এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন আধুনিক অর্থনীতির বিকৃতি হেতু মানুষ জিনিস কিনে টাকার জন্য দুঃখিত হয়। যুদ্ধকালে জিনিসের দুর্লভতা বুঝিয়ে দেয় রাসেল-এর উক্তির যথার্থতা। ক্রয়বিক্রয়ের প্রক্রিয়ায় এক পক্ষ পায় অর্থ অন্য পক্ষ পায় বেঁচে থাকার উপকরণ। উভয় পক্ষই এর ফলে হয় উপকৃত। কিন্তু এতদিন ক্রেতার মনোভাবে ছিল অনুগ্রহের আধিক্য। যুদ্ধ পালটে দিয়েছে সেই চিত্র। এখন বিক্রেতা জিনিস দিয়ে ক্রেতাকে করছে অনুগ্রহ।

লেখক অনুভব করেছেন মধ্যবিত্ত জীবনে এর ফলে আসেনি তেমন কোনো পরিবর্তন। জিনিস যখন সুলভ ছিল তখন তার হাতে ছিল না অর্থ; আর অর্থ যখন সুলভ হল তখন জিনিস হল দুর্লভ। ফলে তাদের অবস্থা রইল একই রকম।

মানুষ কেমন করে সঠিকভাবে তার প্রয়োজনীয় জিনিস পেতে পারে তা নিয়ে পৃথিবী জুড়ে চলছে পরিকল্পনা। যদিও তার সুফল নিহিত দূর ভবিষ্যতে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে জিনিসহীন বাজারে ক্রেতাকে দেওয়া হচ্ছে জিনিসের যত্নের উপদেশ।

লেখকের মতে এর ফলে জিনিসের প্রতি জাগছে ভালোবাসা আর জিনিস-উৎপাদকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

এই সংকটের ফলে ব্যবহার্য জিনিসের সঙ্গে মানুষের একটি সহজ অন্তরঙ্গতার সম্বন্ধ গড়ে উঠছে। জীবনকে পূর্ণ করে দেওয়ার সামর্থ্য রাখে জিনিস—তিনি বুঝেছেন এ সত্য। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছেন তাঁর কলমের কথা। দুঃখ-সুখের সঙ্গী কলমটি দুষ্প্রাপ্যতা আর মহার্ঘতার কারণে হয়ে উঠেছে প্রিয়তর।

এভাবেই যুদ্ধের কারণে জাত মূল্যবৃদ্ধি মানুষকে জিনিসের যথার্থ প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছে।

'ব্ল্যাক আউট' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে লিখিত একটি মন্ময় প্রবন্ধ। রচনাকাল ১৯৪১-এর জুন। সম্পূর্ণ অনুভব-উজ্জ্বল ক্ষুদ্র নিবন্ধটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ব্ল্যাক আউট-এর কারণে কলকাতায় সাধারণত দুর্লভ রাত্রির রূপ চিত্রিত হয়েছে। বিদ্যুতের চড়া আলো কলকাতা থেকে কেড়ে নিয়েছিল অন্ধকার রাত্রির সৌন্দর্য, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর রূপ। যুদ্ধকালীন নিষ্প্রদীপতার নির্দেশের কারণ পথে জ্বলত না আলো। ফলে রাতে ঘরের মধ্যে ঘুমের জন্য নিটোল অন্ধকার হয়েছিল সুলভ। পথে পথে আলোয় বিক্ষত অন্ধকার ফিরে পেয়েছিল তার পূর্ণ রূপ। সে অন্ধকার কখনও বিস্তৃত, ব্যাপ্তিতে দীপ্ত কখনও বা 'স্নিগ্ধ চিক্কণ'। বাস্তবে অসুবিধা সত্ত্বেও এর ফলে সৌন্দর্যবোধ হয় তৃপ্ত। আর চাঁদ-ওঠা রাতে শহরের কঠিন পথ হেসে ওঠে নীলাভ জ্যোৎস্নার স্পর্শে; গাছের পাতায় জ্বলে জ্যোৎস্নার হিরে-মুক্তো। আকাশে দেখা মেলে মেঘ-আলো-করা টুকরো চাঁদের মুচকি হাসির; মেঘহীন আকাশে দেখা যায় তারা।

নগরে বিশেষত কলকাতার মতো বড়ো নগরে মানুষ বঞ্চিত হয় প্রকৃতির রূপ আর স্পর্শ-গন্ধ-ধ্বনি থেকে। ব্ল্যাক-আউট এনে দিয়েছে সেই সুযোগ।

কিছুদিন অবশ্য এই অন্ধকারের নিস্তব্ধ শান্তি বিঘ্নিত হয়েছিল ট্রাফিক-এর গোলমালে আর জনতার কোলাহলে। বুদ্ধদেব এখানে প্রকাশ করেছেন আপন মত। তাঁর মতে পালটে দিতে হবে দিনের কর্মসময়। ভোর ছ টায় শুরু হয়ে বেলা দুটোয় শেষ হবে কাজ। সন্ধ্যে হতেই সবাই শুয়ে পড়বে; ট্রাম-বাস যাবে থেমে। ব্ল্যাক-আউট-এর ফল প্রকৃতিরূপ-উপভোগের সুযোগ তখন পুরোপুরি পাওয়া যাবে। তবে যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে তা-ও কম নয়। কিন্তু শীঘ্রই পরিস্থিতি পালটে গেল। দেখা দিল জ্বালানি তেলের অভাব; বাস-ট্যাক্সি হল দুর্লভ; পথে জনসমাগম হ্রাস পেল। ট্রামের শব্দ ভিন্ন গভীর স্তব্ধতায় আপন স্বরূপে প্রকাশ পেল প্রকৃতি। এই প্রাপ্তিতে তৃপ্ত বুদ্ধদেবের কবি মন।

অনুভবের উষ্ণ স্পর্শ প্রবন্ধটিকে করে তুলেছে মনোরম। রম্য প্রবন্ধের সার্থক দৃষ্টান্ত 'ব্ল্যাক আউট'।

তির্যক দৃষ্টিতে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে লেখা রম্য প্রবন্ধ 'প্রোফেসর', লেখক বুদ্ধদেব বসুর মতে প্রোফেসর একটি বিশেষ শ্রেণির জীব। বালককাল থেকেই তিনি গুরুজনবাধ্য, পুস্তক-মনস্ক, বিলাসবর্জিত, নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তি। পরীক্ষায় ভালো ফল করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই তিনি পাঠ করেন গ্রন্থ। পুস্তক পাঠের আনন্দ থেকে তিনি বঞ্চিত।

জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবনেও তিনি থাকেন অচল। কলেজে পড়ার সময় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া, গল্প করা, সহপাঠিনীর সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ—কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করেনি। পরীক্ষা পাসের লক্ষ্যে নিবদ্ধদৃষ্টি তিনি পাঠ্য বই পড়েছেন আর করেছেন অধ্যাপকদের তুষ্ট করার চেষ্টা। আপন স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশকে প্রাণপণে রোধ করে তিনি একমনে পড়েছেন পাঠ্য বই আর সমালোচনা-গ্রন্থ।

পরীক্ষায় ভালো ফল করার কঠিন সাধনায় সফল হলেন তিনি; পেলেন কাঙ্ক্ষিত প্রোফেসরি। ক্রমে তিনি লাভ করলেন প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি, করলেন গবেষণা—পেলেন পিএইচ. ডি. ডিগ্রি। এসবের পুরস্কারস্বরূপ উচ্চপদ লাভ করলেন তিনি। তাঁর শেষ আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানের পদ প্রাপ্তি।

প্রবন্ধের পরের অংশে বুদ্ধদেব গবেষণাকে বলেছেন উন্নত কেরানির কাজ। তাঁর মতে প্রচুর বই নাড়াচাড়া করে সনতারিখ যুক্ত তালিকা তৈরি বা বহু দেশি-বিদেশি পণ্ডিতের মতামত চয়ন করে একত্রিত করার নামই গবেষণা। গবেষণা সৃষ্টির আনন্দহীন একটি কাজ। সৃষ্টির আনন্দ অনুপস্থিত বলেই এ কাজে সাধারণের প্রবৃত্তি নেই। এরূপ কাজ যিনি করতে পারেন তাঁকে পণ্ডিতের সম্মান ও বিশাল ডিগ্রি দিয়ে সম্মানিত করা সমাজের কর্তব্য।

এর মধ্যে গবেষণা ও গবেষকের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে তাকে কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না।

সাল-তারিখের সঠিক তালিকা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্যবান। আর গবেষণার সফলতা নির্দিষ্ট বিষয়ের বোধি-উজ্জ্বল আলোচনায়—যে আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় সৃষ্টির মূল্য। কাজেই বুদ্ধদেবের মত সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়।

বুদ্ধদেবের মতে আনন্দবিহীন কর্তব্য অনায়াসে করতে পারাতেই প্রোফেসরের মহিমা। পঠনপাঠন দ্বারা লব্ধ আনন্দ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা নেই। বাস্তব জগতে তিনি অসহায়। গ্রন্থকে জীবনভাষ্য বলে মনে করেন না বলেই প্রোফেসর থাকতে পারেন অবিচল। বই তাঁকে উজ্জীবিত করে না; জাগ্রত মনের দুঃখ থেকে তিনি মুক্ত। কল্পনা, চিন্তা—এসব মানসিক গুণ তাঁর নেই।

তাই জাগতিক সুখের অভাবে না থাকলেও তিনি অন্তরে অসহায়। শান্তিময়, স্বচ্ছন্দ, মসৃণ তাঁর জীবন। দরিদ্র হলেও চরিত্রবান সংসার সতত তাঁকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। পরের প্রাপ্য না দেওয়ার সাহস তাঁর নেই। অপরকে বঞ্চনা করার মতো তীক্ষ্ণ সাংসারিক বুদ্ধির অধিকারী তিনি নন। চরিত্রহীন হওয়ার মতো সাহসের অভাবেই তিনি চরিত্রবান। তাই বিষয়ী তাঁকে বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে প্রতিবেশী। তার উপরে আছে পরীক্ষার্থীর উদ্দেশ্যনিবিড় চাটুবাদ। আপন জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয়।

কর্মক্ষেত্রেও তিনি সুখী। বিদ্যাদানকে তিনি আনন্দের সঙ্গে অন্বিত করেন না। তরুণ ছাত্রের প্রাণোৎসাহ তাঁর শিক্ষাগুণে হয় অন্তর্হিত। পাঠকে প্রাণবিচ্ছিন্ন করার দুঃসহ সাধনায় তিনি সিদ্ধ। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে নেই তাঁর অন্তরের যোগ। তাঁর বোঝা এবং বোঝানোয় অনুভবের স্পর্শ মাত্র নেই। কাব্যকে নীরস করে তোলা, সরল বিষয়কে জটিল করা এবং জটিল বিষয়কে জটিলতর করে তোলার কাজে তিনি কৃতী। বহু বর্ষের ক্লান্তিহীন সাধনায় তিনি জগৎ ও জীবনের সব কিছুকেই করে তুলেছেন যান্ত্রিক। নিত্য নতুন মানসিক প্রক্রিয়ার সংঘাত বা সমস্যা সমাধানের মতো কর্ম তিনি করেন না। তাই তাঁর আলোচ্য সাম্প্রতিক সাহিত্য নয়; বহু চর্চিত প্রাচীন সাহিত্যই তাঁর স্বক্ষেত্র।

তাঁর প্রণীত গ্রন্থ পাঠককে করে তোলে সাহিত্য সম্পর্কে অনুৎসাহী। প্রাণের স্বতোৎসারিত আনন্দ তাঁর কাছে উপেক্ষার বিষয়। তিনি বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন বিষয়কে রসহীন, প্রাণহীন তথ্য-তালিকায় রূপান্তরিত করাই বিদ্যার কাজ। এরূপ কঠিন কর্মে সফলতা হেতুই তিনি সম্মানীয়।

এ প্রবন্ধের মূলে হয়তো আছে লেখকের কোনো ব্যক্তিগত তিক্ত স্মৃতি। আবার এ সত্যও মেনে নিতে হবে কেবল পরীক্ষা-উত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে যাঁরা পড়েছেন এবং পড়িয়েছেন—তেমন পাণ্ডিত্যগর্বী অধ্যাপকও এদেশে কম নেই। প্রবন্ধটির উদ্দিষ্ট এরূপ প্রোফেসর যাঁদের নিয়ে জীবনানন্দ লিখেছিলেন 'সমারূঢ়' নামের তিক্ত কবিতাটি।

১৯৩৯ সালে রচিত **'পড়া'** নামের হালকা চালের নিবন্ধটিতে বুদ্ধদেব বসু প্রকৃত পাঠকের বিশেষত্ব এবং বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

তাঁর মতে পাঠক তিন ধরনের। এক দল পাঠক নিজেদের বিদগ্ধতার প্রমাণ হিসেবে বই পড়েন; তাঁদের পাঠ্য নামী লেখকদের বই। দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠক সময় কাটানোর জন্য পড়েন হালকা বই। এই দু দলের কেউই প্রকৃত পাঠক নন। প্রকৃত পাঠক তাঁরা—যাঁরা কেবলমাত্র উপভোগের আনন্দ লাভের কারণে বই পড়েন।

প্রকৃত পাঠকও কিন্তু অনেক সময়ে পাঠ্য বই সম্পর্কে ভ্রান্তির শিকার হন। লেখক-খ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা এমন বই পড়েন যা আনন্দদায়ক নয়। সাধারণত পাঠক তখন লেখকের শক্তিকে কটাক্ষ করেন না। তাঁর ধারণা হয় আপন বোধের দুর্বলতা হেতু তিনি গ্রন্থ-উপভোগে অক্ষম। বিখ্যাত গ্রন্থ মাত্রেই যে পাঠ্য হিসেবে শ্রেষ্ঠ নয়—এ সত্য স্বীকারের সাহস বহু পাঠকেরই নেই। এজন্য যথার্থ পাঠক যাঁরা বইকে পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারেন তাঁদের সংখ্যা কম।

বুদ্ধদেব বসুর মতে গ্রন্থের বিস্তৃতিও পাঠের অন্তরায়। তিনি বলেন ছোটো গল্প বিশেষত কবিতার আকার ক্ষুদ্র বলেই তা পাঠককে আকর্ষণ করে। বিশেষত বার বার পাঠেই কবিতার মর্ম উদঘাটিত হয়। ভালো কবিতা প্রতি পাঠে হয়ে ওঠে নতুন। পাঠক সে পাঠে পায় তৃপ্তি।

কিন্তু উপন্যাসের উৎসাহী পাঠকও প্রিয় উপন্যাসের দ্বিতীয় পাঠে অনাগ্রহী। এর কারণ প্রথমত উপন্যাসের দীর্ঘতা; দ্বিতীয়ত উপন্যাস কাহিনিনির্ভর আর প্রথম পাঠেই কাহিনি-পরিণাম জানা যায়। ফলে পাঠক দ্বিতীয় পাঠের প্রয়োজন বোধ করে না। তাই উপন্যাসের অবয়ব দীর্ঘ না হওয়াই ভালো এবং কাহিনি আকর্ষক হওয়া কাম্য। এরপর বুদ্ধদেব বসু আপন মতের সমর্থনে কিছু প্রমাণ দিয়েছেন।

উনিশ শতকের অধিকাংশ ইংরেজি উপন্যাসের আকার বড়ো; এবং প্রস্তাবনা অংশ রসহীন। অনেক পাঠকের উৎসাহ এ অংশেই নষ্ট হয়ে যায়; আসল গল্পের পৌঁছোনোর উৎসাহ তাঁদের থাকে না। ফরাসি উপন্যাস তুলনায় সুপাঠ্য। কারণ তার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অবয়ব, বাহুল্যহীন বর্ণনা এবং আকর্ষক সূচনা। আধুনিক ইংরেজি উপন্যাসের আকার ফরাসি উপন্যাসের প্রভাবে হয়েছে পরিবর্তিত।

কাহিনির আকর্ষক উপস্থাপনা পাঠকমনকে উপন্যাস পাঠে উৎসাহী করে। চার্লস ডিকেন্স (Charles John Huffam Dickens : ১৮১২-১৮৭০) আর টমাস হার্ডির (Thomas Hardy : ১৮৪০-১৯২৮) উপন্যাসে আছে এই আকর্ষক ভঙ্গি। আনাতোল ফ্রাঁস (Anatole France : ১৮৪৪-১৯২৪)-এর উপন্যাসের গতি ধীর হলেও কাহিনি-অভিমুখী। লেভ টলস্টয় (Lev Nikolevich Tolstoi : ১৮২৮-১৯১০)-এর দীর্ঘ উপন্যাসেও আছে গল্পের দুর্বার টান। ফলে পাঠক এঁদের উপন্যাস পড়ে উপভোগ করতে পারে।

কিন্তু অনেক বিখ্যাত উপন্যাসই অনাকর্ষক। যেহেতু পাঠকের উপভোগ্যতায় গ্রন্থের সার্থকতা; সে হেতু এসব গ্রন্থকে মহৎ বলা যায় না। আবার পাঠকের যোগ্যতা, রুচি ও শিক্ষার উপর নির্ভর করে তাঁর প্রিয় লেখক নির্বাচন। তাই গ্রন্থের আকর্ষণ গুণও ব্যক্তিভেদে হয় ভিন্ন। সে কারণে গ্রন্থের আকর্ষক গুণহীনতা সম্বন্ধে মতভেদ হওয়া সম্ভব। তথাপি এটি প্রমাণিত সত্য যে মহৎ লেখক অধিকাংশ পাঠকের মনকে টেনে রাখতে পারেন। কিন্তু ব্যতিক্রমী লেখকও আছেন। এঁদের বই পাঠককে পড়তে হয় কষ্ট করে। উদাহরণ হিসেবে বুদ্ধদেব মার্শাল প্রুস্ত (Marcel Proust : ১৮৭১-১৯২২)-এর নাম করেছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে তাঁর রচনা। কিন্তু পাঠক বুদ্ধদেবের মতে প্রুস্ত-এর রচনা দুষ্পাঠ্য।

প্রবন্ধের শেষে বুদ্ধদেব দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছেন আপন মত। তাঁর মতে বই পড়ার প্রধান ও প্রথম শর্ত ভালো লাগা। যে বই উপভোগ করা যায় না তা থেকে প্রাপ্তির মাত্রা শূন্য। আবার লেখার কৌশল শেখার জন্য চাই আনন্দদায়ক গ্রন্থ।

প্রথম যৌবনের আনন্দে তিনি একদা সব বই-ই পড়তেন সমান ভালো লাগা নিয়ে। আজ তা নেই। তাই তিনি ভালো না লাগা বই অসমাপ্ত রাখতে দ্বিধা করেন না। তরুণ বয়সে তাঁর ধারণা ছিল বই শেষ না করা সৌজন্যহীন আর নীতিগর্হিত কাজ।

কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতি, সুলভতা আর পাশ্চাত্যে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থসংখ্যা আর বিষয়—দুটিই গেছে বেড়ে। ফলে নির্বাচন ভিন্ন সাধারণ পাঠকের পক্ষে বই পড়া অসম্ভব। কাজেই তাকে নির্বাচন করতেই হয়।

বইপড়া উচিত কিনা এ প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন দেখা যায় অবিরাম গ্রন্থপাঠে বিপর্যস্ত হচ্ছে স্বাভাবিক বুদ্ধি; কোনো কোনো মানুষ হয়ে যাচ্ছেন বাস্তব বিস্তৃতির শিকার। অধিক গ্রন্থপাঠের পক্ষে যাঁরা বলেন তাঁরা পড়েন প্রচুর বই। কিন্তু অন্যকে বইয়ের নাম বলে বিস্মিত করা ভিন্ন গ্রন্থ থেকে তিনি আর কিছুই পান না।

বই পড়া ভালো। কারণ বই আনন্দ দেয় এবং সুন্দর করে বাঁচতে শেখায়। সুন্দর করে ভালো করে বাঁচাই জীবনের উদ্দেশ্য। বই এর একটি উপায়মাত্র। কাজেই মানুষের উচিত আপন প্রয়োজনমতো বইপড়া। তা না হলে উপায় বড়ো হয়ে ছাপিয়ে যাবে উদ্দেশ্য—যা কোনো ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়।

১৯৩৭-এ লেখা **'কথা ও কথক'** নিবন্ধের বিষয় কথা বলার শিল্পকৌশল। বুদ্ধদেব বসুর মতে কথা বলা একটি শিল্প। সে শিল্পে সকলে দক্ষ নন। কেউ কেউ এ শিল্পে পারদর্শী। দ্রুত তাঁরা দিতে পারেন কথার উজ্জ্বল উত্তর। তুচ্ছ ঘটনা তাঁদের বর্ণনার গুণে আকর্ষণ করে শ্রোতার মন। তাঁদের কথায় থাকে অতিরঞ্জন; কিন্তু তা কথাকে করে তোলে সুন্দর।

যাঁদের কথা বলায় নিপুণতা নেই তাঁরা আড্ডা জমাতে পারেন না। মজার ব্যাপার তাঁদের কণ্ঠে হয়ে ওঠে ক্লান্তিকর। কথার খোঁচায় বিদ্ধ হলেও তৎক্ষণাৎ বুদ্ধিশানিত উত্তর দানে তাঁরা অক্ষম।

কিন্তু উত্তম বক্তা আর প্রকৃত রসিক মানুষ মাঝে মাঝে প্রশংসার আধিক্যে হারিয়ে ফেলেন বাস্তব জ্ঞান। তখনই আসে বিপদ। তুচ্ছ কথাকে মোচড় দিয়ে কৌতুককর করার ক্লান্তিকর চেষ্টায় তিনি বিফল হন। তাঁর মজার গল্পের পুনরাবৃত্তি শ্রোতাদের শ্রান্ত করে। খ্যাতি রক্ষার চেষ্টায় খ্যাতির উৎস যায় শুকিয়ে।

আবার এমনও দেখা গেছে বচনপটু রসিক বক্তা অনেক সময় শ্রোতার অরসজ্ঞতার শিকার হন। তাঁর সাধারণ কথাকেও রসিকতা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে তিনি তাতে অপ্রস্তুত হন না।

কথনশিল্পের সফলতা তাই কেবল কথকের উপর নির্ভর করে না—শ্রোতার উপরেও তা নির্ভরশীল। বুদ্ধিমান, সচেতন, রসগ্রহণে সক্ষম শ্রোতাই রসস্রষ্টা কথকের স্রষ্টা। এঁদের সংখ্যা সব দেশেই খুব কম। এজন্যই রসিক কথকের সংখ্যাও কোনো কালেই খুব বেশি হয় না।

'মতান্তর ও মনান্তর' ১৯৪০ সালে রচিত লঘু ভঙ্গির গুরু প্রবন্ধ। তর্ক আলোচনার প্রভেদ ও দোষগুণ বিশ্লেষিত হয়েছে এই শিথিল গঠনের প্রবন্ধটিতে। তর্ক আর আলোচনা এক নয়। তর্ক স্নায়ুকে উৎপীড়িত করে; আলোচনা করে উজ্জীবিত। প্রসঙ্গত এসেছে তর্ক যাঁদের প্রিয় নয় এমন কিছু ব্যক্তির প্রসঙ্গ। দৃঢ়বিশ্বাসী ব্যক্তি তর্ক পছন্দ করেন না। কারণ তর্কে আহত হয় তাঁদের বিশ্বাস। এর মধ্য দিয়ে কিন্তু তাঁর বিশ্বাসের দুর্বলতাই প্রমাণিত হয়। বিরোধিতাকে তর্কের মাধ্যমে চূর্ণ করার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বাসের সত্যতা। সাধারণত ধর্মবিশ্বাসীগণই হন এরূপ তর্কবিমুখ।

আপন বিরোধিতা সহ্য করতে পারেন না অহংকারী ব্যক্তিগণ। তাঁরাও তর্কের পক্ষপাতী নন। সফল ব্যবসায়ী, পণ্ডিত প্রোফেসর আর আত্মসচেতন শিল্পীদের মধ্যে প্রায়শ এরূপ ব্যক্তির দেখা মেলে।

বুদ্ধদেব বসুর মতে দুজন মানুষ কোনো সময়েই সব বিষয়ে একমত হতে পারেন না। এই অমিলই মানুষের কাছে প্রিয় করে তোলে মানুষের সঙ্গ। সব কথার সায়যুক্ত উত্তর মনে আনে অবসাদ। প্রতিটি ব্যক্তিমনের স্বাতন্ত্র্য আলাপকে করে তোলে আনন্দময়। সেই আলাপে উদঘাটিত হয় বিষয়ের নতুন নতুন দিক।

তর্ক বুদ্ধদেব বসুর পছন্দ নয়। কারণ তর্ক প্রায়শ হয়ে ওঠে কুতর্ক। দু জনে পুরোপুরি বিপরীত দৃষ্টিতে কথা বলে; একে অন্যকে টানতে চায় নিজের পক্ষে। তর্কের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দুপক্ষেরই মেজাজ হয়ে ওঠে তপ্ত; সমাপ্তিতে উভয়ের মনেই আসে অবসাদ। আলাপ-আলোচনার সঞ্জীবনী প্রভাব তর্কে অনুপস্থিত।

আলাপ-আলোচনা দেহ ও মন—দুটিকেই সঞ্জীবিত করে এটাই বুদ্ধদেব বসুর মত। কারণ বহু ব্যক্তি একই বিষয়ে আলোচনা করলেও সকলে একই মূল্যবোধে বিশ্বাস করেন না। ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির চিন্তার বাঙ্‌ময় প্রকাশ বিষয়টির বিকাশের সহায়ক হয়; আলোচকদের মনও হয় সমৃদ্ধ। এজন্যই বন্ধুত্ব হয় সম মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে। মূল্যবোধের ঐক্য যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে একই বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত হয় আলাপ। এবং পরিণতিতে মতান্তর

থেকে সৃষ্টি হয় মনান্তর। বুদ্ধদেবের মতে প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে তর্ক করা উচিত নয়। কারণ উভয়েই স্ব স্ব মতবাদে অটল থাকায় নির্মল অবসর শীঘ্রই হয়ে ওঠে আবিল। এক্ষেত্রে প্রয়োজন বিষয় পরিবর্তন। কিন্তু তেমন আত্মসংযম কম লোকেরই থাকে। আপন মতকে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশ করবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারে কম লোক। ফলে মতান্তর আর মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।

আলোচনা কেমন হওয়া উচিত—এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু দিয়েছেন তাঁর এক দার্শনিক বন্ধুর উদাহরণ। তিনি কোনো বিষয় উপস্থাপন করে সমবেত সকলের মতামত শোনেন। পরিশেষে এমন ন্যায়সম্মত সিদ্ধান্ত পেশ করেন যে কারও কিছু বলার থাকে না। তাঁর আলাপ শোভন এবং চিন্তাশীল। তাঁর কথায় পুনরাবৃত্তি থাকে না। আর আপাত মীমাংসার পরই তিনি প্রসঙ্গ পালটে দেন। ফলে আলোচনা তথা আলাপ হয় বিচিত্র এবং গতিশীল। উপস্থিত সকলেই কিছু না কিছু বলার সুযোগ পায় এবং সময়ের হয় সুব্যবহার।

তাহলে বিপরীত মতের ব্যক্তির সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত? স্বভাবত মনে আসে এ প্রশ্ন। তাদের এড়িয়ে চলার অর্থ পলাতক মনোবৃত্তির প্রশ্রয়দান।

বিপক্ষকে নিজের মতে আনার চেষ্টাও করা যায়। কিন্তু বিপক্ষও আপন মত প্রচারের প্রাণপণ প্রয়াস করে। ফলে প্রশ্নে, উত্তরে, প্রতি উত্তরে সৃষ্টি হয় অন্তহীন জটিল বিতর্ক। কালক্ষয়ের কোনো উপযুক্ত ফলও পাওয়া যায় না।

দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক অনৈক্য থাকলে বিরোধিতা দরকার। কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বিরোধিতা এড়িয়ে চলাই শালীনতা রক্ষার একমাত্র পথ। মতান্তর যখন সমাজজীবনে ব্যাপ্ত হয় তখন তা আত্মপ্রকাশ করে বিপ্লব-প্রতিবিপ্লব, যুদ্ধ-গৃহযুদ্ধ হিসেবে। পরিশেষে গড়ে ওঠে নতুন সমাজ।

ব্যক্তিগত ছোটো ছোটো মতভেদের পশ্চাতে জীবন্ত বিশ্বাস থাকলে এভাবেই তা হয়ে উঠতে পারে সমাজবিধ্বংসী শক্তি। মতান্তর থেকে মনান্তর হওয়া স্বাভাবিক সত্য। জীবন্ত জাতির বিদ্বেষ আর প্রীতি উভয়ই হয় প্রবল। মতান্তরে তার প্রকাশ লক্ষিত হয়। জাতীয় প্রাণশক্তি দুর্বল বলেই আমাদের বিদ্বেষ আর প্রীতি—কোনোটাই তেমন শক্তিশালী হয় না।

সমাপ্তিতে বুদ্ধদেব বসু লিখছেন খাওয়া-পরা আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি সাধারণ বিষয়ে রুচিবৈষম্য বন্ধুত্বের অন্তরায় নয়। মৌল বিষয়ে মতভেদই বন্ধুত্বের বিনাশ ঘটায়। দুটি মানুষের সম্বন্ধ যদি হয় মাতা-পুত্র-স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘনিষ্ঠ এবং সেখানে একের জীবনসাধনা অন্যের উপহাসের বিষয়; একের বিশ্বাসহীনতা অন্য জনের জীবনসম্বল—সেখানে মিলন সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্ক হতে পারে না হৃদয় অনুভূতি-আর্দ্র মানবিক সম্বন্ধ। উভয়ে উভয়কে সহ্য করে যায়—এই মাত্র।

বহির্জীবনে এরূপ ভিন্নতা থেকে আসে মতান্তর। যে মতে ব্যক্তি অস্তিত্ব বিপন্ন হয় অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তার সকল উপাদানকে অস্বীকার করে যে মত—তার সঙ্গে মানিয়ে চলা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে মনান্তর স্বাভাবিক এবং সংগত। ১৯৪০-এ রচিত প্রবন্ধটিতে সমকালীন রাজনীতির দোলাচলতার ঈষৎ আভাস লক্ষিত হয়।

১৯৩৯ সালে রচিত **'মাত্রাজ্ঞান ও অতিরঞ্জন'** নিবন্ধে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে লেখক দেখিয়েছেন বাঙালির স্বভাবে আছে উচ্ছ্বাসপ্রবণতা তথা বাড়াবাড়ি। যে কোনো অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে আধ ঘণ্টা-পনেরো মিনিট জাতীয় সংগীত গাওয়া ও সে সময় দাঁড়িয়ে থাকা তার একটি উদাহরণ। বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকলেই যে জাতীয় সংগীতের প্রতি তথা স্বদেশের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শিত হয় তা নয়। কারণ জাতীয় সংগীত দেশ নয়; দেশপ্রেমের একটি প্রতীক। সময়ের ওজনে তার দাম বাড়ে না। যেহেতু জাতীয় সংগীত প্রতীক—তার জন্য বেশি সময় ব্যয় অর্থহীন। সংক্ষিপ্তভাবে সুরটি বাজালেই যথেষ্ট। কারণ মানুষের সময় কম; কাজ অনেক।

শুধু জাতীয় সংগীতের ক্ষেত্রেই নয়—বাঙালির প্রায় সব অনুষ্ঠানে আর জীবনের প্রতি পদক্ষেপে দেখা যায় এই অতিরেক। উদাহরণ হিসেবে বুদ্ধদেব বসু বাংলা সিনেমার কথা বলেছেন। ইঙ্গিতের উপর বাংলা চলচ্চিত্র-পরিচালকের বিশ্বাস নেই—আস্থা নেই দর্শকের বোধের উপর। অতিরঞ্জিতভাবে সব কিছু প্রদর্শনই বাংলা ছবির বিশেষত্ব। সেজন্য বাস্তবতা লঙ্ঘনেও তার আপত্তি নেই। তাই প্রোফেসরের বাড়ির চায়ের পার্টি হয় আড়ম্বরবহুল, ধর্মঘটের দৃশ্যে থাকে না উত্তেজনা।

শিল্পে অতিরেক অসংগত নয়। বিশেষত কৌতুকের ভিত্তি অতিরঞ্জন। মানুষের স্বাভাবিক চরিত্র-দুর্বলতার অতিরঞ্জিত উপস্থাপনেই সৃষ্টি হয় কৌতুক। অন্য ধরনের ছবিতেও অতিরঞ্জন দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝাতে পারেন মাত্রাজ্ঞান-সম্পন্ন পরিচালক। চ্যাপলিন-এর ছবিতে ক্ষুধার তীব্রতা বোঝাতে বন্ধুর বিশাল কুক্কুট রূপ গ্রহণ তার একটি দৃষ্টান্ত। পরিচালকের রসবোধ কাজ করছে বলেই সার্থক এই অতিরেক। বাংলা ছবিতে অতিরঞ্জনের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। বাংলা ছবির নির্মাতারা বোধ হয় ভাবেন পরিমাণের আধিক্যের উপর উৎকর্ষের মাত্রা নির্ভর করে। তাই নাচ, গান, কলকাতার পার্টি, গ্রাম্য উৎসব, ধর্মঘট, প্রেম, স্বদেশ—সব কিছুর সামঞ্জস্যহীন সমাহার বাংলা ছবিকে করে তোলে অবাস্তব এবং শিল্পগুণহীন।

শুধু শিল্পে বা সভা-সমিতিতে নয়; বাঙালির সমাজজীবনেও লক্ষিত হয় মাত্রাজ্ঞানহীন অতিরেক। তাদের সামাজিক উৎসবে আমন্ত্রিতের সংখ্যায় থাকে না নিয়ন্ত্রণ; ভোজ্য দ্রব্যের আয়োজনে দেখা যায় অপচয়। বক্তার বক্তৃতায় দেখা যায় উচ্ছ্বাস; অভিনয়ে লক্ষিত হয় কৃত্রিমতা। অর্থাৎ বাস্তব-বিচ্ছিন্নতাকেই বাঙালি উৎকর্ষের শর্ত বলে মনে করে।

বাঙালির এই মাত্রাজ্ঞানহীনতা তথা বাহুল্যপ্রিয়তা প্রভাবিত করে তার বিজ্ঞাপনকে। অথচ সংক্ষিপ্ত, ইঙ্গিতসমৃদ্ধ প্রকাশই বিজ্ঞাপনের সাফল্যের শর্ত। বাঙালি-মনে বিজ্ঞাপনের এই শিল্পশর্ত সম্পর্কে বিশেষ সচেতনতা লক্ষিত হয় না। বিশেষণ-সমৃদ্ধ উপস্থাপনার সঙ্গে বিখ্যাত ব্যক্তির প্রশংসাপত্র সংযোজনকেই বাঙালি ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপনের চরম প্রকাশ বলে মনে করেন। বাঙালির বইয়ের বিজ্ঞাপনেও একই ব্যাপার দেখা যায়। কারণহীন বিশেষণ-বাহুল্য আর বিখ্যাত বিদেশি লেখকদের তুলনা দেওয়াতেই গ্রন্থ বিজ্ঞাপন সীমাবদ্ধ।

এই অতিরঞ্জন-প্রবণতার জন্যই বাংলায় সার্থক গ্রন্থ-সমালোচনার এত অভাব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমালোচনা হয় নিছক প্রশংসা অথবা বিশুদ্ধ নিন্দা। প্রশংসাত্মক সমালোচনা প্রায়শ সংযমের অভাবে বইয়ের বিজ্ঞাপন হিসেবে হয় ব্যর্থ। নিন্দামূলক সমালোচনা অবশ্য বইয়ের ক্ষতি করে। কারণ নিন্দা সহজেই বিশ্বাস্য হয়। অন্যের নিন্দা আপন শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে গোপন তৃপ্তির অনুভব জাগায় বলেই এরূপ সমালোচনা বইয়ের ক্ষতিই করে।

বাঙালি চায় নির্দিষ্ট একটি আদর্শের রূপ হিসেবে লেখককে গ্রহণ করতে। তাই নতুন লেখক তার মনোজগতে প্রবেশাধিকার পায় না। ব্যক্তিগতভাবে লেখক অনেক সময় স্তুত হন। কিন্তু সে স্তুতি, সে প্রশংসা যেমন বন্যার মতো আসে তেমন দ্রুত ধ্বংসও হয়। এরও কারণ বাঙালি মনের অতিরেকপ্রবণতা ও মাত্রাজ্ঞানের অভাব—যা তার চরিত্রের বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'এ-যুগের কবিতা' নিবন্ধটির রচনাকাল ১৯৩৯। এ নিবন্ধে আধুনিক কবিতার বিষয়ের যে যুগোচিত পরিবর্তন হয়নি—এই দিকটি আলোচিত হয়েছে। বুদ্ধদেব যন্ত্রের ধ্বনি ও দৃশ্যের সৌন্দর্য বিশ্লেষণের পথে উপনীত হয়েছেন এই সিদ্ধান্তে।

কিটস্ (John Keats : ১৭৯৫-১৮২১) বলেছিলেন পতঙ্গের গুঞ্জনেও আছে কাব্যস্পন্দন। বুদ্ধদেব আপন অনুভব-লব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রমাণ করেছেন যন্ত্রের ছন্দিত শব্দেও আছে মধুরতা—যা অনায়াসে হতে পারে কবিতার বিষয়।

লেখক প্রথমে যন্ত্রধ্বনির মাধুর্যের দিকটি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে দূর থেকে শোনা ট্রেনের শব্দের আছে অপরূপ একটি মাধুর্য। আবার দূর পাল্লার ট্রেনের যাত্রীর কানেও ট্রেনের চাকার ঝংকৃত শব্দ সৃষ্টি করে আশ্চর্য এক আবেশ। এই আবেশ হতে পারে কবিতার জন্ম-উৎস। তা যে হয় না তার কারণ যন্ত্র এখনও আমাদের অনুভব-গভীরতার সেই স্থানে পৌঁছোতে পারেনি যেখান থেকে উঠে আসে কবিতা।

ইলেকট্রিক ডায়নামোর নিয়মিত স্পন্দনও রাতের অন্ধকারে হয়ে ওঠে কাব্যময়। বুদ্ধদেবের মতে সব ধরনের যন্ত্রের গতিজাত ধ্বনিই একটি স্পষ্ট ছন্দে বাঁধা। সেই ছন্দস্পন্দ আমাদের মনকে আলোড়িত করে। এবিষয়ে শ্রেষ্ঠ স্টিমার-এর গম্ভীর, উদার, রহস্যময় দূরশ্রুত ভোঁ। রেলের বাঁশির চপলতা সে ধ্বনিতে নেই। কারখানার বাঁশির হুকুমের ভঙ্গিও অনুপস্থিত স্টিমার-এর বাঁশিতে। তাই তার ধ্বনিরূপ মনকে করে দেয় ঘরছাড়া।

নিবন্ধের পরের অংশে বুদ্ধদেব বলেছেন যন্ত্রের দৃশ্যসৌন্দর্যের কথা। যন্ত্র বদলে দিয়েছে প্রকৃতির দৃশ্যরূপ। তার ফল যে সব সময়ে খারাপ হয়েছে এমন নয়। কারখানার চিমনি গঙ্গার উভয় তীরের সৌন্দর্য ধ্বংস করেছে। কিন্তু গঙ্গার ঘাটে ভাসমান জাহাজের বলিষ্ঠ সৌন্দর্য অস্বীকার করা যায় কি? তেমনই রাত্রির গঙ্গার আলোকস্পন্দিত কালো জলের সৌন্দর্যও অস্বীকার করা যায় না।

বিরাট রেলের ইঞ্জিনের যে একটি পুরুষালি রূপ আছে সে বিষয়েও পাঠককে সচেতন করে দিয়েছেন লেখক। ইঞ্জিনটি নির্মাণের সময় সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়নি—নজর রাখা হয়েছে তার উচ্চতম কার্যকারিতার দিকে। তথাপি অস্বীকার করা যায় না তার উপমাহীন রূপ। বিশাল কারখানার মহিমান্বিত রূপকেও অস্বীকার করা সহজ নয়। কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি কবিতার বিষয়।

নিবন্ধের শেষ অংশে বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য বর্তমান মানুষের জীবনকে বদলে দিয়েছে যন্ত্র। কিন্তু কবিতাকে পালটাতে পারেনি সে। তাই কবিতার উপজীব্য এখনও যন্ত্রসৌন্দর্য নয়; প্রকৃতির রূপ। এই প্রকৃতি-নিবিড়তার কারণ হয়তো মানুষের কৃষিনির্ভর আদিম জীবন। সে জীবনে প্রকৃতির ভূমিকা ছিল ব্যাপক। মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ই স্থান পায় সাহিত্যে তথা কবিতায়। তাই কবিতায় প্রকৃতির ঋতুরূপ আর মেঘ-বৃষ্টি-রোদের ছিল বড়ো স্থান।

আধুনিক মানুষের জীবনে যন্ত্র এনেছে বিপ্লব; আজ সে প্রকৃতি-নির্ভরতা থেকে অনেকটা মুক্ত। কিন্তু কবিতায় তথা সাহিত্যে এই যন্ত্রবিপ্লবের প্রভাব আজও অনুপস্থিত। তার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ বিবর্তনের।

তাই আধুনিক কবিতা যথেষ্ট আধুনিক নয়। যন্ত্রযুগে তার অবস্থান, কিন্তু কৃষিযুগ নিয়ে তার কাজ। হয়তো একদিন যন্ত্রকে মানুষ দেখতে পাবে সেই আবেগের চোখে—যে চোখে ধরা পড়ে বর্ষার কালো মেঘের রূপ। কবিতা তখনই হয়ে উঠবে যন্ত্রযুগের যথার্থ কবিতা। তার আগে কবিতায় যন্ত্রের উল্লেখ থাকবে; হয়তো দেখা যাবে এ উল্লেখের প্রাচুর্য। কিন্তু তা নিয়ে বিচলিত বা অহংকৃত হওয়া অর্থহীন। কারণ বিষয় নয় কাব্যিক গুণ দিয়েই কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হয়।

১৯৪০-এ লেখা **'মহুয়ার দেশে'** অনুভবসমৃদ্ধ স্নিগ্ধ একটি ভ্রমণকথা। অখ্যাত এক স্থানে শীতশেষে সপরিবার বেড়াতে গিয়েছিলেন লেখক। তাঁদের আশ্রয়স্থল ছিল বড়ো একটি বাংলো। সে বাংলোর অঙ্গন ছিল বিশাল। বড়ো বড়ো গাছ ছিল তার অঙ্গনে আর ছিল হাঁস-মুরগি, পায়রা, গিনি ফাউল, গোরু—এইসব পোষ্য প্রাণী। কাক আর বেড়াল ছিল না—যা স্থানটির বিশেষ গুণ বলে মনে হয়েছিল লেখকের। অবশ্য স্থানটিতে অতীতে বেশ কয়েকটি সাপ দেখা গিয়েছিল। লেখকের অবস্থান কালেও মারা হয়েছিল একটি নবীন চিতি সাপ।

স্থানটির বিশেষত্ব বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন লেখক। তাঁর মতে খ্যাতিহীনতাই এই স্থানটির বৈশিষ্ট্য। এখানে ছিল

না কোনো সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান। তুষার বা সমুদ্রের রূপের ব্যাপ্ত মহৎ বিশালতা মানুষকে মুগ্ধ করে। সেই সৌন্দর্যের কণামাত্র উপভোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় মন থাকে উদ্বিগ্ন। পাহাড়ের ক্ষেত্রেও দেখা যায় একই ব্যাপার। দর্শন ও ভ্রমণের স্থান এত অধিক থাকে যে সবটা উপভোগ করা যায় না। ফেরার আগে মনে জেগে থাকে না দেখার অনুতাপ।

অখ্যাত এই স্থানটিতে সৌন্দর্যপ্রসিদ্ধ স্থানের অভাবে নেই বেড়াতে যাবার গোলমাল। সমতল এই স্থানটি সাধারণ বলেই সুন্দর। কাছাকাছি নেই কোনো দর্শনীয় পাহাড় বা ঝর্না। দক্ষিণে পরেশনাথ পাহাড় আর পশ্চিমে খন্ডৌলি পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকলেও তারা দেখার জন্য ডাকাডাকি করে না। রেল-স্টেশন, মুদি-দোকানের মতো স্বাভাবিকভাবে এখানে আছে শালের সারি, মহুয়ার বন, মাঠ আর নিড়োনো খেত। আর আছে রেল কোম্পানির বিশাল পুকুর। স্নান আর কাপড়কাচা নিষেধের নোটিস সত্ত্বেও সেটি হয়ে উঠেছিল সারা গ্রামের স্নানাগার আর রজকালয়। অগাধ নীল আকাশের নীচে চঞ্চল-উজ্জ্বল বাতাস মেখে এখানে একদিন স্নান করেছিলেন লেখক।

তিনি উপভোগ করেছিলেন এই গেরুয়া প্রান্তরের নিজস্বতায় মন্ডিত দুপুর। কাজ আর অবসরের চাপে কলকাতায় দুপুরের নিজস্ব রূপ মুছে গেছে। এখানে তিনি দুপুরের ঈষৎ মদির স্বাদ অনেকটা সময় নিয়ে উপভোগ করেন। প্রিয় কবির নতুন বইয়ের মতো, বিচিত্র কবিতাগুচ্ছের মতো এখানে দুপুরগুলি এক একটি সুরে বাঁধা। কোনো দিন হালকা মেঘ করে। জোরালো হাওয়ায় শুকনো পাতা-ঝরা বাগানে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা দেখেন মহুয়ার ফুল, আমের বোল আর হঠাৎ-আসা পাখির রূপ। কোনো দিন যাওয়া হয় বাড়ির বাইরে। উপভোগ করা হয় বিস্তৃত প্রান্তরের নির্জন রূপ। কোনো দিন নির্মল নীল আকাশের নীচে চড়া রোদে বসা হয় উত্তরের চওড়া ঠান্ডা বারান্দায়। মেয়েরা বাজান গ্রামোফোন, লেখক করে নিজের কাজ। তারপর ক্রমে দুপুর ঢলে পড়ে বিকেলের কোলে। এমন দীর্ঘ মধুর দুপুর তিনি অন্য কোনো স্থানে পাননি। সময় এখানে অনেক আর সময় কাটানোর উপকরণও প্রচুর।

সন্ধ্যায় এখানে থেমে যায় জীবন। আকাশে কখনও দেখা যায় একা চাঁদ; কখনও অন্ধকার বিদীর্ণ করে তীক্ষ্ণ দ্যুতি তারার দল। জ্যোৎস্নার পরিবর্তে ঘন বোনা কাপড়ের মতো গাঢ় অন্ধকারের ধীর আগমন তাঁদের মুগ্ধ করে। কারণ অন্ধকারের এমন জমাট গাঢ় রূপ দেখতে তাঁর অভ্যস্ত নন। তারা-ভরা আকাশ, জোনাকি-জ্বলা গাছের মাথা তাঁদের মুগ্ধ করে।

স্থানটির একটি বিশেষত্ব কোথাও বের হতে হয় না আর বের হতে ইচ্ছা হলেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না সাজগোজ। বের হবার আগে ভদ্র বেশ ধারণ না করার স্বাধীনতা দুর্লভ এবং উপভোগ্য। কারণ সাধারণত বেড়াতে গিয়েও মানুষকে পোশাকের দাসত্ব করতে হয়। বিখ্যাত স্থানগুলিতে মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বের হওয়া যায় না। তোড়জোড় আর মাজাঘষার প্রয়োজন নেই বলেই এখানে ভ্রমণ আরামদায়ক। পুরোপুরি আটপৌরে হবার স্বস্তি শরীরকে দেয় বিশ্রাম—মনকে দেয় শান্তি। এখানে পাওয়া যায় সামাজিকতার বাঁধনহীন স্বস্তি। প্রকৃতির মধ্যেও এখানে আছে আটপৌরে ঘরোয়াভাব। তাই তার সঙ্গে বলা যায় মনের কথা। প্রকৃতি যেখানে সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত সেখানে সে মানুষের মুগ্ধ হৃদয় নিঃশেষে কেড়ে নিয়ে আরও কিছু দাবি করে। আর এই গেরুয়া মাটির প্রান্তর আর দূর পাহাড়ের রেখা আগন্তুকের কাছে কোনো দাবি করে না। চার পাশের নির্জনতা, অবসরের প্রাচুর্য প্রকৃতির অনাড়ম্বরতা এখানে মনের মধ্যে বোনা হয়ে যায়। কিন্তু মনকে তা ভারগ্রস্ত করে না। এখানেই 'মহুয়ার দেশে'র আসল সৌন্দর্য।

১৯৩৯ সালে লেখা **'ডাকঘর'** নিতান্ত ব্যক্তিঅনুভব-সমৃদ্ধ রচনা। বুদ্ধদেব বসু এই নিবন্ধে ডাকঘরকে বিভিন্নভাবে দেখেছেন। নিতান্ত বালকবয়সে মফস্সল শহরের শান্ত-মন্থর জীবনে তিনি ডাকঘরকে দেখেছিলেন গতিময়, বর্ণোজ্জ্বল জীবনধারার বাহক রূপে। বস্তুত ডাকঘর বহির্জগতের ব্যাপ্ত জীবনপ্রবাহের সঙ্গে ব্যক্তিমানবের সংযোগ রক্ষা করে।

ডাকঘরের মধ্যে নিঃসঙ্গ বালক বুদ্ধদেব পেয়েছিলেন সত্তাস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি। তাঁকে চিঠি লিখতেন অনেক স্বজন; তাঁর নামে আসত নানা পত্রপত্রিকা আর বই। এসব কিছু পাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি অনুভব করতেন আপন অস্তিত্বের মূল্য।

একটু বড়ো হয়ে লিখতে শুরু করলেন বুদ্ধদেব। সেই সব লেখা ছাপার উদ্দেশ্যে পাঠানোর জন্যও ডাকঘরের দরকার। আর সেই উৎকণ্ঠ আগ্রহের ব্যর্থ অবসানের ক্ষেত্রটিও ছিল ডাকঘর।

প্রাপ্তবয়স্কের মনেও রয়ে যায় বাল্যবিস্ময়ের অবশেষ। তাই বয়স্ক বুদ্ধদেবের মনেও ডাকঘর সম্পর্কে থেকে গেছে অজানা এক আকর্ষণ। তবে সে ডাকঘর শহরের ব্যস্ত, ভিড়াক্রান্ত বড়ো ডাকঘর নয়। নির্জন মফস্‌সলের ছোটো সুন্দর ডাকঘরই তাঁর প্রিয়। তাই দার্জিলিঙে ম্যাল-এ যাবার পথের ডাকঘর তাঁর ভালো লেগেছিল। ডাকঘরের উপরতলায় বাস ছিল পোস্টমাস্টারের। তাকে ভাগ্যবান ভেবেছিলেন তিনি। আবার জলাপাহাড়ের পথে ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া কাঞ্চনজঙ্ঘামুখী দোতলা ডাকঘরটিও হরণ করেছিল তাঁর মন। এই ডাকঘরেরও দোতলায় বাস ছিল পোস্টমাস্টারের। কৈশোরের মুগ্ধতা ভিন্ন আর এক কারণে তাঁর বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছিল এই পোস্টমাস্টারের জীবন। কারণ এই ব্যক্তি বাস করছে প্রকৃতির সৌন্দর্যের শান্ত ব্যাপ্তির মধ্যে। আবার বহমান চঞ্চল জীবনস্রোতের সঙ্গেও রয়েছে তার যোগ। তাই বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা বুদ্ধদেব বসুর মনে একটি বিশেষ ছাপ রেখে গিয়েছিল সেই ডাকঘর আর পোস্টমাস্টার।

'স্পোর্টস-এর বিরুদ্ধে'—১৯৩৯ সালে লেখা হয়। এই নিবন্ধে বুদ্ধদেব বসু আধুনিক পৃথিবীর ক্রীড়া ও ক্রীড়াবিদ সম্পর্কে মত্ততার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে বর্তমান পৃথিবী বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কে উদাসীন। এখন জনতার কাছে সমাদৃত খেলোয়াড়। কারণ খেলার মধ্যে পাওয়া যায় সাময়িক উত্তেজনার চরম রূপ। বুদ্ধদেব বসু নৈতিক কারণে যে কোনো ধরনের স্পোর্টস বা ক্রীড়ার বিরোধী। তাঁর মতে এর ফলে মানুষের কোনো শুভ হয়নি। মূলত বিত্তবানদের শারীরিক শ্রমের কারণে স্পোর্টস-এর উদ্ভব। আদিম শিকারজীবী মানুষ বা কৃষিনির্ভর মানুষের জীবনে স্পোর্টস ছিল না। কারণ তখন জীবিকার জন্য সব মানুষই শ্রম করতে বাধ্য ছিল। কৃষিযুগের পর যখন সমাজ বিত্তনির্ভর হল তখন সমাজে দেখা দিল ধনী ও দরিদ্রের ভিন্নতা। শ্রমহীন বিত্তবানদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আবশ্যক শ্রম এবং বিনোদনের কারণে বিবিধ রোমাঞ্চকর ক্রীড়ার উদ্ভব।

প্রথম দিকে শ্রমহীন জীবন যাপন করত মুষ্টিমেয় রাজা। তাদের জীবনে প্রধান স্থান ছিল যুদ্ধের। তাই তাদের বিনোদনের জন্য প্রাণঘাতী, রক্তাক্ত শারীরিক ক্রীড়ার উদ্ভব হয়েছিল। রোম-এ গ্ল্যাডিয়েটরদের খেলা তার প্রমাণ। বর্তমানে স্পেন-এর ষাঁড়ের সঙ্গে যুদ্ধের খেলায় রয়ে গেছে তার স্মৃতি।

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে শ্রমভিত্তিক পেশার স্থান দখল করল বহু বিচিত্র শ্রমহীন কাজ। রাজা-জমিদারদের স্থানে দেখা দিল বণিক সম্প্রদায়। রক্তপাতপ্রধান খেলার স্থলে এল পরিমার্জিত নানা খেলা। পৃথকভাবে শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজন যতই বাড়ল ততই স্পোর্টস হয়ে উঠল প্রয়োজনীয়। এটুকুই স্পোর্টস-এর গুণ। তা ছাড়া খেলার কোনো পৃথক গুণ নেই, খেলোয়াড়েরও নেই স্বতন্ত্র কোনো চারিত্রিক গুণ। ইংরেজিতে স্পোর্টসম্যান কথাটির অর্থ ভদ্রলোক; তার কারণ বিত্তবান ভদ্রশ্রেণির মানুষ স্বাস্থ্যরক্ষার কারণে ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করত।

স্পোর্টস সম্বন্ধে লেখকের আপত্তি এ কারণে যে আধুনিক সভ্যতা খেলা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে থাকে। খেলার দ্বারা যে মনোহর স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য ও নিপুণতা লাভ করা যায় তার মূল্য তিনি স্বীকার করেন। যেমন সার্কাসে ট্রাপিজ-এর খেলা। খেলার সঙ্গে অর্থের যোগও লেখক পছন্দ করেননি। তাই তাঁর মতে বিশুদ্ধ ও মনুষ্যোচিত ক্রীড়ার চর্চা কেবলমাত্র গ্রিস দেশে লক্ষিত হয়। প্রাচীন গ্রিসের খেলা ছিল নানা রূপ শারীরিক নৈপুণ্য প্রদর্শন—আর পুরস্কার ছিল অর্থ নয় লরেল পাতা। তাদের অলিম্পিক খেলায় ছিল সাহিত্য ও সংগীতেরও প্রতিযোগিতা।

নৈপুণ্য থাকলেও আধুনিক কোনো খেলা এমন নয় যে সব ছেড়ে তাকেই গ্রহণ করতে হবে। অথচ পাশ্চাত্যের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও হয়ে উঠেছি স্পোর্টস-পূজারী। পাশ্চাত্যের দেশগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—বার্ট্রান্ড রাসেল-এর মতে যুক্তিবুদ্ধির উৎকর্ষ অপেক্ষা ক্রীড়ায় উৎকর্ষকে বেশি মূল্য দেয়।

রাসেল না বললেও ইউরোপ-এর অবস্থা আলাদা নয়। অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ-এ ফার্স্ট হওয়া ছেলে সম্বন্ধে ইংরেজের ঔৎসুক্য নেই। কিন্তু ক্রীড়ানিপুণ অক্সফোর্ড ব্লু সারা ব্রিটেন-এর প্রশংসাপাত্র। অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ-এর নৌকাবাইচ, ঈটন-হ্যারো-র ক্রিকেট ম্যাচ ব্রিটিশ মাত্রেরই উৎসাহের বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয়তম অধ্যাপক অপেক্ষা বাচখেলায় জয়ী ক্যাপ্টেন সাধারণের অধিক শ্রদ্ধার পাত্র।

সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানের যে সব কর্মী সভ্যতার গতিশীলতা বজায় রাখেন তাঁদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কোনো উৎসাহ নেই। অথচ ক্রিকেট-খেলোয়াড়ের নাম জানে সারা পৃথিবী। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও দেখা যায় অশিষ্ট, বিদ্যাচর্চায় অসফল ছাত্র ফুটবল-দক্ষতার কারণে বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধার পাত্র। লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরির জন্য অর্থ সংস্থান হয় না যে সব বিদ্যালয়ে সেখানে স্পোর্টস-এর জন্য অর্থ ব্যয়ে কৃপণতা দেখা যায় না। বিদ্যালয়ে শুধু নয় সারা দেশেই দেখা যায় বিদ্যা ও বুদ্ধির চর্চার অপেক্ষা স্পোর্টস-এর সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক মূল্য অধিক—যা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। এভাবেই যুক্তি ও উদাহরণসহ স্পোর্টস নিয়ে মাতামাতির বিরোধিতা করেছেন বুদ্ধদেব বসু এ নিবন্ধে।

১৯৩৮-এ লেখা **'মেক-আপ-এর বিপক্ষে'**-একান্ত ব্যক্তিমনের চিন্তার প্রকাশক লঘু নিবন্ধ। আধুনিক বাঙালি তথা ভারতীয় মেয়েদের মেক-আপ তথা কৃত্রিম প্রসাধন-প্রিয়তার আধিক্যের সমালোচনা আছে নিবন্ধটিতে। কিন্তু নেই কোনো তিক্ততা।

তাঁর মতে রংহীন শ্বেত ত্বকের অধিকারী পাশ্চাত্য মেয়েরা ব্যবহার করে রুজ, লিপস্টিক, নেল পলিশ-এর মতো নানা কৃত্রিম রং। উদ্দেশ্য আপন ত্বকের বর্ণাভাব পূরণ। ভারতীয় তথা বাঙালি মেয়েরা স্বাভাবিক চিক্কন শ্যামল বা বাদামি রঙের দেহত্বকের অধিকারী। তাদের রং মাখা তথা প্রসাধনের প্রয়োজন নেই। তাদের প্রসাধনের কারণ শুধুই ফ্যাশন।

মেক-আপ-এর বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবের অভিযোগ দুটি—প্রথমত, নৈপুণ্যের অভাবে মেক-আপ প্রায়শ স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়। লেখকের দ্বিতীয় আপত্তিটি নৈতিক। মেক-আপ মেয়েদের সহজাত প্রকৃত রূপ-রং আবৃত করে। রবীন্দ্রনাথ তাই প্রসাধনকে বলেছেন 'চেহারার উপর জালিয়াতি'।

প্রসাধনের সপক্ষে বলা হয় মেয়েরা চিরকালই আপন রূপকে বাড়াবার চেষ্টা করেছে। সে প্রয়াসের প্রধান কারণ স্বীয় দেশ ও সময়ে প্রচলিত সৌন্দর্য ধারণার সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে নেওয়ার বাসনা। এজন্য তারা করেছে অর্থব্যয় এবং নিজেকে দিয়েছে কষ্ট। রোমের রানিরা স্নান করেছেন গাধার দুধে। কালিদাসের কাব্যনায়িকারা বনজ উপকরণ দিয়ে করেছে প্রসাধন। চীনা মা মেয়ের পা ছোটো করার জন্য তাকে কষ্ট দিয়েছেন নির্মমভাবে। জাপানের মেয়েরা খোপা ঠিক রাখার জন্য বালিশের পরিবর্তে শক্ত কাঠে মাথা রেখে ঘুমিয়েছে বহু যুগ ধরে। কাজেই প্রসাধন মেয়েদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

আবার একথাও বলা হয় সূক্ষ্ম বিচারে পান খাওয়া থেকে খোপায় ফুল দেওয়া, সাবান মাখা—সবই প্রসাধন। আজকের লেখকের আপত্তি রুজ লিপস্টিক নিয়ে। আমাদের পূর্বপুরুষদের আপত্তি ছিল সাবান ব্যবহারেও।

আসলে স্বাস্থ্য এবং সুরুচির সঙ্গে আত্মবিজ্ঞাপনের প্রভেদ অতি সূক্ষ্ম। সভ্যতা মানে যে বাহুল্যের সংখ্যা বৃদ্ধি একথা অবশ্য স্বীকার্য। বাহুল্য তাকেই বলা যায়, সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকার জন্য যা অপরিহার্য নয়। মেক-আপ তাই

বাহুল্য মাত্র। নিত্য ব্যবহারের জিনিসকে সুন্দর করে তোলা সভ্যতার একটি লক্ষণ। নারী ও পুরুষের নিজেকে সুন্দর করে তোলার চেষ্টাও স্বাভাবিক একটি প্রবৃত্তি। মেক-আপ-এর সঙ্গে তার তফাত শুধু মাত্রায়। প্রকৃতির দান ফুল চুলে পরলে মনে যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ জাগে তার সঙ্গে তুলনা চলে না রাসায়নিক প্রসাধনীর চতুর ব্যবহারের।

মেক-আপ-এর একটি সামাজিক দিকও বর্তমান। বোতলে পোরা সৌন্দর্য উপাদান নিয়ে গড়ে উঠেছে বিশাল ব্যাবসা। অর্থের বিনিময়ে সুন্দর করে তোলার দোকানের সংখ্যা গেছে বেড়ে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সৌন্দর্যচর্চার গ্রন্থ। এর ফলে অপচয় ঘটছে বিশাল পরিমাণ অর্থের।

চড়া দামে নানা মাপের শিশি, বোতল কৌটোয় ভরা প্রসাধন কেনা এবং ব্যবহার করার কারণে যে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে তা দিয়ে সমাজপরিবর্তন করা সম্ভব ছিল। কিন্তু প্রসাধনের আকর্ষণ এতই প্রবল যে, এসব যুক্তি শোনার মতো মন কারও নেই। কাজেই চলবে সময়, শ্রম আর অর্থের এই বিপুল অপচয়; প্রতিবাদ হবে নিষ্ফল।

১৯৪৩ সালে লেখা **'হরিবোল'** নিবন্ধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বুদ্ধদেব বসুর জীবনের একটি বাস্তব ঘটনা। বিয়ের পর বুদ্ধদেব বসু ভাড়া নিয়েছিলেন রসা রোডের মোড়ে গোলাম মহম্মদ ম্যানসন-এর দোতলার একটি ফ্ল্যাট। বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী প্রতিভা বসুর ছিল ভয়ানক ভূতের ভয়। তিনি 'জীবনের জলছবি' নামের স্মৃতিচিত্রে লিখেছেন "ওই অঞ্চলের শববাহকরা সব এই বাড়ির তলা দিয়ে গিয়ে ডাইনে কেওড়াতলার দিকে মোড় নিত। প্রত্যেকটি হরিধ্বনির শব্দে রাত্রিবেলা আমার ঘুম ভেঙে যেতো। বাকি রাত ভূতের ভয়ে কাতর হয়ে পড়ে থাকতাম।" (পৃ. ১০৯, 'জীবনের জলছবি', প্রতিভা বসু, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ ১৪০০, তৃতীয় মুদ্রণ ১৪০৩)।

এই বাস্তব প্রেক্ষিতে রচিত **'হরিবোল'** নিবন্ধটিতে সংক্ষেপে ভূতের ভয়ের প্রকৃতির চমৎকার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরে খ্রিস্টান ও মুসলিম শবসৎকারের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হিন্দুদের শবসৎকার পদ্ধতির প্রশংসা করেছেন তিনি। কিন্তু 'হরিবোল'-এর ঘোর বিরোধিতা করা হয়েছে নিবন্ধটিতে। তবে শববাহকদের হরিধ্বনি দেওয়ার কারণও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন।

নিবন্ধের প্রথমে আছে মক্ষিরানি নামে অভিহিত পত্নীর 'হরিবোল' শ্রবণজনিত ভয়ের ছবি। সঙ্গে বিশ্লেষিত হয়েছে ভূতের ভয়ের প্রকৃতি—"যেটা অলৌকিক, যেটা ইন্দ্রিয়ের অতীত, যেটা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বহির্ভূত, তার প্রতি কোনো কোনো চিত্তের একটা স্বাভাবিক উন্মুখতা থাকে।...বাইরের কোনো কোনো ঘটনাও মনের মধ্যে এই আতঙ্ক-আবিল অস্বাস্থ্য ঘনিয়ে তুলতে সাহায্য করে।...ভিত্তিহীন ভয়ের বীজ আছে আমাদের সকলের মনেই, তবে...আমাদের সহজ স্বাভাবিক জীবনের রোদালো জোরালো স্রোত তাকে প্রায় সব সময়ই চাপা দিয়ে রাখে। কিন্তু কখনো কখনো আমাদের মনকে বাইরে থেকে এমনভাবে উত্তেজিত করে তোলা সম্ভব যে জীবনের সহজ প্রসন্নতা থেকে স্খলিত হ'য়ে আমরা তখনকার মতো ভয়ের পিচ্ছিল চোরাবালিতে ডুবে যাই।

সেই ভয়ই ভয়ের রাজা যা অহেতুক। যে-ভয়ের কারণ আছে তার সঙ্গে লড়াই চলে, কিন্তু যে ভয় নিষ্কারণ সে অপ্রতিরোধ্য। অল্প মাত্রায় হলে সেটা উপভোগ্য হতে পারে, কিন্তু যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, মনুষ্যত্বের পক্ষে তার মতো হানিকর আর-কিছুই নয়।" (পৃ. ১৬৯-১৭০, 'হরিবোল', 'উত্তরতিরিশ', বুদ্ধদেব বসু, নিউ এজ পাবলিশার্স, ১ম প্রকাশ ১৯৪৫, ২য় সংস্করণ ১৯৫২)। এই ভয়ের উদ্রেক করে শববাহকদের উচ্চ 'হরিবোল' ধ্বনি। নিজের স্ত্রীর মধ্যে তিনি দেখেছেন ভয়ের সেই ভয়ানক রূপ—যা তাঁদের বাসা বদলাতে বাধ্য করে। কারণ নেই যে ভয়ের সেই ভূতের ভয়ের এমন নিপুণ অথচ সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ কমই দেখা যায়।

প্রবন্ধের পরের অংশে লেখক যুক্তি আর উদাহরণ দিয়ে হিন্দু, খ্রিস্টান ও মুসলিম শবযাত্রার পদ্ধতির ব্যাখ্যা করেছেন; তুলনা করেছেন হিন্দু ও খ্রিস্টানদের সৎকার পদ্ধতির। তাঁর মতে হিন্দুদের দাহ পদ্ধতিই সৎকারের সেরা

উপায়। কবরে স্থানের অপচয় হয়। কফিনবদ্ধ প্রিয়জনের শবদেহ মাটির গর্ভে ক্রিমিকীটের খাদ্য হয়—এ ব্যাপারটির মধ্যে আছে বীভৎসতা।

খ্রিস্টানদের গোরস্থানে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য তীব্র। ধনীরা সেখানে সেরা স্থানটি কবরের জন্য ক্রয় করেন; তাঁদের কবরে বসানো হয় মার্বেল ফলক।

অবশ্য চিতার চাইতে কবরে আপাতশোভনতা বর্তমান। তাই ইংরেজি সাহিত্যে কবর নিয়ে লেখা হয়েছে স্মৃতিমেদুর, বিষণ্ণ, দীর্ঘশ্বাসবহুল অনেক কবিতা। কবর যেন মৃতের প্রিয়হৃদয়ে বেঁচে থাকার করুণ প্রয়াস। তথাপি মৃতের স্মৃতি মনে রাখে না তার প্রিয়তম জন। জীবনের পক্ষে সেটাই শুভ ও স্বাস্থ্যকর। প্রিয়জনের কবরে ফুল দিয়ে দুদিন চোখের জল ফেলা যায়। কিন্তু সময়ের অমোঘ নিয়মে শোক জীর্ণ হয়। ফুল দেওয়া অনুভূতি-শূন্য নিয়মে পরিণত হয়—যা মৃত্যুকে করে অপমান।

তার চেয়ে ভালো শবদেহকে ভস্ম করে তাকে দেহের আদি উৎস মাটি, আগুন, জল, আকাশ, হাওয়ায় মিশিয়ে দেওয়া। যা শেষ হয়েছে তাকে নির্মমভাবে মুছে দেওয়াই শ্রেয়। প্রাণহীন দেহ আবর্জনা মাত্র, তা বিনষ্ট করাই উচিত। মৃত্যুর মধ্যে যে চরম সমাপ্তি আছে—দাহ তারই প্রতীক। হরিধ্বনি ক্ষুণ্ণ করে মৃত্যুর এই মহিমা।

বুদ্ধদেব বসু হরিধ্বনির কারণ সন্ধান করতে চেয়েছেন। কখনও তাঁর মনে হয়েছে এ ধ্বনি দিয়ে জীবিতকে মৃত্যুর অনিবার্য পরিণামের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মানুষ যদি সর্বদা মৃত্যুচিন্তায় মগ্ন থাকে তবে জীবন হয় অর্থহীন। অথবা মানুষ ভালো-মন্দ সংক্রান্ত সংস্কার উপড়ে ফেলে মরিয়া হয়ে জীবনকে ভোগ করতে চেষ্টা করে। তাই যুদ্ধসময়ে সৈনিকরা হয়ে ওঠে এত উচ্ছৃঙ্খল।

মৃত্যুভাবনা প্রবল হলে মানুষকে হয় সংসার ত্যাগ করতে হয় নতুবা বেছে নিতে হয় আত্মবিনাশের পথ। নয়তো শিক্ষা-সংযম বিসর্জন দিয়ে প্রবৃত্তিতাড়িত জীবন যাপন করতে হয়। যে চিন্তা মানুষকে অমানুষ করে দেয় তার কোনো মূল্য নেই। মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ গুণের বিকাশের জন্য প্রয়োজন মানুষ মৃত্যুহীন—এই ভ্রান্তির। কাজেই জীবিতকে অর্ধমৃত করে তোলার উপায় স্বরূপ এই হরিধ্বনি বন্ধ হওয়াই ভালো।

এর পরে বুদ্ধদেব অনুমান করেছেন নির্জন নিশীথে শব বহন কালে প্রায় অনাত্মীয় শববাহকগণ ভয় পায়। সেই ভয় দূর করার জন্যই তারা অমানুষিক উচ্চ স্বরে হরিধ্বনি দেয়। ব্ল্যাক আউট-এর সময় রাত তিনটেয় পাহারাওলাও এরূপ বীভৎস চিৎকার করে যা নিরীহের হৃদয় কাঁপিয়ে দেয় আর দুর্বল হৃদয়কে বন্ধ করে দিতেও পারে।

একদা বুদ্ধদেব দেখেছিলেন মুসলমানদের নিঃশব্দ শব বহনের গম্ভীর মহিমাময় একটি দৃশ্য। তাঁর মতে এ দৃশ্য মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের মনে উদ্রেক করে শান্ত শ্রদ্ধার। মৃত্যুর অর্থ গতিময় জীবনের অবসান। দেবতার নামে উন্মত্ত চিৎকার সে অবসানের শান্ত গাম্ভীর্যকে ক্ষুণ্ণ করে।

খ্রিস্টানদের শবযাত্রার মধ্যে লেখক দেখেছেন পার্থিব সমারোহের আধিক্য। জমকালো গাড়িতে চলে কারুকার্যমণ্ডিত কফিন। গাড়িতে করে সঙ্গে চলে সুসজ্জিত শোককারীগণ। জাঁকজমক ক্ষুণ্ণ করে মৃত্যুর মহিমা।

হিন্দু মতে আত্মীয়বন্ধুরা নতমুখে নগ্নপদে মৃতের শব বহন করে। এই দৃশ্যের বেদনার্দ্র বিনয় দর্শকমনে উদ্রেক করে সম্ভ্রমের। কিন্তু 'হরিবোল' চিৎকার বিনাশ করে দৃশ্যটির গভীর গম্ভীর আবহ। হিন্দুদের দু-একটি নীরব শবযাত্রাও লেখকের চোখে পড়েছে। সে দৃশ্য দেখে তাঁর মনে জেগেছে জীবন সম্বন্ধে শুদ্ধ পবিত্রতার বোধ। চিৎকার ও নৃত্যসহ কীর্তন মুছে দেয় এই শুদ্ধতা অনুভব। দেবতা যদি থাকেন তবে নীরবে তাঁর নাম করাই উত্তম। অকারণ অন্যকে পীড়িত করে দেবমহিমা কীর্তন অর্থহীন।

বুদ্ধদেব বসুর গভীর চিন্তার ফসল এ প্রবন্ধ কিন্তু বাঙালিমনকে প্রভাবিত করতে পারেনি। শববাহকদের হরিধ্বনি

আজও রাত্রির আর মৃত্যুর গাম্ভীর্য বিনষ্ট করেই চলেছে। তথাপি তাঁর চিন্তা মুষ্টিমেয় পাঠককে বিষয়টি সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করে; এখানেই নিবন্ধটির সার্থকতা।

১৯৪৪ সালে রচিত **'আড্ডা'** নিবন্ধে বুদ্ধদেব বসু আড্ডার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। আড্ডার কয়েকটি শর্তও তিনি দিয়েছেন। আড্ডা জিনিসটি তাঁর কাছে এতই বড়ো যে বিশ্বপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে আড্ডার মূল্য নির্ধারণ করেছেন তিনি নির্দ্বিধায়।

বুদ্ধদেবের মতে আড্ডা একান্তভাবে বাঙালির প্রাণের জিনিস। মিটিং, পার্টি, ক্লাব—কোনো কিছুর সঙ্গে আড্ডার তুলনা চলে না। মিটিং-এর থাকে নির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্য। পার্টিতে আনুষ্ঠানিকতা বড়ো বেশি। ক্লাব-এ প্রাণ নেই, বহিরঙ্গই সেখানে প্রাধান্য পায়।

আড্ডার মেজাজ অন্য কোনো দেশে আছে কিনা সন্দেহ; সম্ভবত একারণেই অন্য কোনো ভাষায় নেই আড্ডার প্রতিশব্দ। অন্য অন্য দেশের লোক বক্তৃতা দিতে পারে, রসিকতা করতে পারে, ফুর্তি করে রাত কাটাতে পারে—কিন্তু আড্ডা দিতে পারে না।

যদিও ভারতের সর্বত্র আড্ডা দেখা যায় ; কিন্তু বাংলার সজল কোমল আবহেই তার পূর্ণ বিকাশ। বাংলার ঋতু সমূহের কমনীয় পরিমণ্ডলে আড্ডা পায় বিকাশের পরিবেশ। যে সব দেশে শীত-গ্রীষ্ম দুই-ই প্রবল সেখানে আড্ডা জমে না।

লেখকের মতে আড্ডা মানুষকে শিক্ষিত করে; সাহিত্যিক আড্ডা থেকে পায় সাহিত্যের উপাদান।

আড্ডার মেজাজ খামখেয়ালি, তার আত্মা অত্যন্ত কোমল। তাই আড্ডার পোশাক পার্টি বা মিটিং-এর মতো ধোপদুরস্ত নয়। আড্ডার পোশাক হওয়া চাই স্পর্শকোমল আরামদায়ক, অযত্নহীন এবং ছন্দোময়।

সকলে আড্ডা দিতে পারে না। আড্ডার নামে প্রায়ই সমবেত মানুষগুলি স্ব স্ব অধীত বিদ্যার পরিচয় দিতে চায় অথবা জমিয়ে তোলে পরচর্চার আসর।

দিন নির্দিষ্ট করে আড্ডার আসর জমানো যায় না। লেখক বলেছেন একবার তাঁরা আড্ডা থেকে সাহিত্যসভা আহ্বানের ব্যবস্থা করেছিলেন। জ্ঞানীগুণীদের আমন্ত্রণ করে সেখানে করা হত নানা সদালাপ। কিন্তু দু-তিনটি সফল অধিবেশনের পর সে প্রয়াস হয়ে দাঁড়ায় নিছক নিয়মপালন।

নিয়ম করে অফিস যাওয়া যায়, আড্ডা দেওয়া যায় না। আড্ডার প্রধান শর্ত নিয়মহীনতা। আড্ডা হবে অনিয়মিত, অসাময়িক, অনায়োজিত এবং সচেতনতাহীন। তবে এলোমেলোভাবেও গড়ে ওঠে না আড্ডা। প্রচ্ছন্ন ও প্রখর গঠনশক্তিই গড়ে তোলে আড্ডা। কয়েকটি শর্ত পূরণ হলে তবেই পাওয়া যায় প্রকৃত আড্ডা।

(১) আড্ডার মানুষগুলি সম-মর্যাদার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যিনি সত্যই বড়ো তাঁকে শ্রদ্ধা করা যায়; তাঁর সঙ্গে আড্ডা দেওয়া যায় না। মানসিকতার দিক থেকে যারা কিছুটা নিম্নস্তরের তাদের সঙ্গেও আড্ডা জমে না।

আড্ডার লোকসংখ্যা দশ-বারো জনের বেশি ও তিনের কম হওয়া চলে না। দশ-বারো জনের বেশি হলে আড্ডা হয়ে যায় সভা; তিনের কম হলে হয় কথোপকথন।

আড্ডার মানুষগুলির থাকা দরকার মানসিক জ্ঞাতিত্ব। মনের টান যাদের স্বাভাবিকভাবে কাছে টানে আড্ডা তাদের জন্য এবং তাদের মধ্যেই সীমিত থাকা দরকার।

আড্ডা বসবে এই সম-মানসিকতার মানুষগুলির কারও বাড়িতে। যে বাড়ির আবহ আড্ডার সবচেয়ে অনুকূল—সেটিকেই আড্ডার জন্য নির্বাচন করা উচিত। এজন্য বাড়ি ভাড়া করলে আড্ডা হয়ে উঠবে কৃত্রিম। তবে মাঝে মাঝে স্থান পরিবর্তনও প্রয়োজন। কারণ এর ফলে মন হয়ে ওঠে সতেজ।

ঋতুর পরিবর্তন আর চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে আড্ডা ঘর থেকে বারান্দা, বারান্দা থেকে ছাদে চলে যেতে পারে। তা হলে প্রকৃতির ছোঁয়া লাগবে মানুষের মনে। তবে স্থান নির্বাচনে ভুল হলে চলবে না। ভুল জায়গা মানুষগুলিকেও ভুল মানুষ করে দিতে পারে।

আড্ডার জায়গায় আড়ম্বর থাকবে না, থাকবে আরাম। আসবাব হবে নরম নিচু; সহজে স্থানান্তরযোগ্য হলে আরও ভালো। চেয়ার-টেবিলের কাছেই থাকবে ফরাস। ইচ্ছা হলেই ক্লান্ত কেউ সেখানে গড়িয়ে নেবে অনুমতি ব্যতিরেকেই।

পানীয় বলতে থাকবে কাচের গ্লাসে ঠাণ্ডা জল আর পাতলা সাদা কাপে সুগন্ধি সোনালি চা। খাবার হবে স্বাদু, স্বল্প এবং শুকনো। ফলে শুয়ে শুয়েও খাওয়া যাবে আর হাত ধোয়ার জন্য স্থান ত্যাগ করতে হবে না। জমকালো নয়, পরিচ্ছন্ন বাসনে গৃহকর্ত্রী নিজেই পরিবেশন করবেন খাদ্য-পানীয়।

কথাবার্তা হবে মসৃণ-মন্থর; তাতে থাকবে না কোনো চিন্তা বা চেষ্টা। মনের যে সব চিন্তা কাজের চাপে চাপা থাকে—কথায় সেসব ভাবনা প্রকাশ লাভ করবে। কথার মধ্যে থাকবে না সংকোচ, বিষয়বুদ্ধি বা দায়িত্বের চিহ্ন। ভালো কথা বলার বাধ্যতা থাকবে না। বলা হবে সাধারণ কথা। নতুবা চুপ করে থাকাই শ্রেয়। জোর করে বানানো কথার চাইতে নীরবতাই ভালো। কথার টানাপোড়েনে বোনা কাপড়ের সোনালি পাড় নীরবতা। পাড় কাপড়কে দেয় রূপ, নীরবতা কথাকে দেয় স্পষ্টতা। তাই চুপ করে থাকাকে যাঁরা বুদ্ধির পরাজয় বা সৌজন্যের ত্রুটি মনে করেন তাঁরা আড্ডার মর্ম বোঝেন না।

তার্কিক আর পেশাদার হাস্যরসিকের জন্য আড্ডা নয়। প্রাজ্ঞ বা লোকহিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষও থাকবে আড্ডার বাইরে। কারণ উদ্দেশ্য আড্ডার শত্রু। মহৎ বা তুচ্ছ—কোনো উদ্দেশ্যই আড্ডায় প্রবেশ করবে না। আড্ডা কোনো উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নয়; কোনো কাজ বা উপকারও তা থেকে পাওয়া যায় না। আড্ডা বিশুদ্ধ, নিষ্কাম এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।

স্ত্রীপুরুষের মিশ্রণেই আড্ডা জমে ওঠে। কেবল পুরুষদের আড্ডায় কথা আবদ্ধ থাকে কাজের সীমায়; কখনও বা তা লঙ্ঘন করে সুরুচির গণ্ডী। শুধু মেয়েদের আড্ডায় আলাপ সীমিত থাকে ঘরকন্না, ছেলেপুলে, শাড়ি-গয়নার মধ্যে।

মহিলাদের সংস্রবে পুরুষদের আর পুরুষ-সান্নিধ্যে মেয়েদের রসনা হয়ে ওঠে মার্জিত, স্বর নিম্ন, অঙ্গভঙ্গি শ্রীযুক্ত। মেয়েদের স্নেহ, লাবণ্য ন্যূনতম অনুষ্ঠানের সূক্ষ্ম বন্ধন আর পুরুষদের ঘরছাড়া মনের উদ্দাম বলিষ্ঠতা—দুয়ের মিশ্রণে আড্ডা হয়ে ওঠে সুন্দর, সুষম এবং সম্পূর্ণ। কারণ পৃথকভাবে নারী ও পুরুষ অনেক ভালো কাজ করে। কিন্তু উভয়ের মিলনেই সৃষ্টি হয় ছন্দ।

আড্ডা স্থির নয় বহমান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটে যায় তার রূপ। আড্ডায় পাওয়া যায় মনের খোরাক। আড্ডায় কখনও প্রধান হয় কৌতুকের উদ্দেশ্যহীনতা; কখনও নিছক ভালো লাগার অনুভূতি পূর্ণ করে দেয় আড্ডা; কখনও স্বপ্নমেদুরতা সঞ্চার করে মনে। আড্ডা বুদ্ধিতে দেয় হৃদয়ের স্পর্শ; হৃদয়ে সঞ্চারিত করে বুদ্ধির দীপ্তি।

বিশ্ব সভায় অখ্যাত বাঙালির একমাত্র অথচ অতুল্য সম্পদ আড্ডা।

প্রকৃতি সহ্য করে না কোনো অতিরেক। তাই বিশ্বজয়ী জাতিও প্রকৃতির নিয়মে ভ্রষ্ট হয় খ্যাতির শিখর থেকে; তলিয়ে যায় অখ্যাতির অতলে। বাঙালির লোভ নেই বিশ্ব জয়ে। তার মন্ত্র বিশুদ্ধ বেঁচে থাকার মন্ত্র; উদ্দেশ্যহীন আনন্দের ব্রত তার আড্ডা। আড্ডা জোর করে দখল করে না কিছু। কারণ ধরে রাখতে গেলেই হারাতে হয়; ছেড়ে দিলেই যায় পাওয়া। তাই পৃথিবীর রাষ্ট্রনীতি যখন বলে 'কাড়ো' তখন আড্ডার নীতি 'ছাড়ো'। তাই আড্ডা মৃত্যুহীন।

বুদ্ধদেব বসুর দুশো দুই নম্বর রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর বাড়ির আড্ডা ছিল বিখ্যাত। তাঁর স্বভাবও ছিল আড্ডার অনুকূল। আপন অনুভূতি আর অভিজ্ঞতার রসে জারিত এই মনোরম নিবন্ধটির তুলনা বাংলা রম্য নিবন্ধের ইতিহাসে কমই পাওয়া যায়।

১৯৪৫-এ লেখা ব্যতিক্রমী এবং নিতান্ত ব্যক্তিগত একটি নিবন্ধ **'সবচেয়ে দুঃখের দু-ঘণ্টা'**। চুল কাটার মতো আটপৌরে বিষয়টিকে যেভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে এ নিবন্ধে তা বুদ্ধদেব বসুর অনুভবশক্তির সূক্ষ্মতার প্রমাণ।

চুল কাটবার জন্য সেলুন-এ যাওয়া লেখকের পছন্দ নয়। মানসশক্তির উৎস দেহের শ্রেষ্ঠ অঙ্গটির উপর কোনো অপরিচিত ব্যক্তির ইচ্ছেমতো ব্যবহার তাঁর কাছে অস্বস্তিকর। তার উপরে আছে তার অমনোযোগিতা আর সেলুন-এর অপরিচ্ছন্নতা। অথচ স্বজন-বন্ধুদের তীক্ষ্ণ বচন বর্ধনশীল কেশগুচ্ছের অধিকারী তাঁকে নানাভাবে বিদ্ধ করে। ফলে দু মাস অন্তর লেখককে অসহায়ভাবে মাথা সঁপে দিতে হয় হৃদয়-সম্পর্কহীন কেশকর্তকের কাছে।

তাঁর মনে পড়ে অতীতের তরুণ কেশকর্তক কাঁচি-সম্বল গোবিন্দকে। সে সবার চুল কাটত না। স্ব-নির্বাচিত বিশেষ বিদগ্ধ জনেরই সে চুল কাটত। তার নির্বাচিতদের মধ্যে ছিলেন বুদ্ধদেব। চুল কাটার সঙ্গে চলত তার মুখ। এইভাবে সে অপনোদন করত একটানা বসে থাকার ক্লান্তি। আসলে কিছুটা মনের সম্পর্ক ছিল বলেই গোবিন্দ ছিল বুদ্ধদেবের পছন্দের পরামাণিক। সে মারা গেছে। বর্তমানে আর নাপিতেরা চুল কাটতে আসে না বাড়ি বাড়ি। এখন যেতে হয় সেলুন-এ। সেখানে নরসুন্দরগণ নিজেদের মধ্যে সিনেমার গল্প নিয়েই ব্যস্ত থাকে। চুল যিনি কাটাচ্ছেন তাঁর মনোরঞ্জনের কথা মনেও পড়ে না তাদের। তাই চুল কাটতে গিয়ে বেশির ভাগ পুরুষ দেহের ক্লান্তি আর মনের শূন্যতার চাপে ঘুমিয়ে পড়েন। অনেকে সময়টা কাটান নির্বিঘ্ন নিরাপদ ঈষদুষ্ণ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে। বুদ্ধদেব বসু এ সময় কাটান হালকা প্রবন্ধ, সংকলন, সজীব সাময়িক পত্র বা হৃদয়প্রধান গল্প-সংকলন পড়ে। এসব বই হওয়া চাই বড়ো হরফে ছাপা; তাদের পাতা থেকে চুলের কণাগুলি সহজেই ফুঁ দিয়ে সরানো যাওয়া চাই। এরকম সরস সহজ বই হাতে এলে তিনি তুলে রাখেন।

এর পরে আছে সময় নির্বাচনের ব্যাপার। সেলুন বৃহস্পতিবার পূর্ণ দিবস আর শুক্রবার আধা বন্ধ। শনি-রবিও ছুটির দিন আর সকাল-সন্ধ্যায় সেলুনে হয় ভিড়। সোম, মঙ্গল, আর বুধবারের দুপুর তাঁর প্রিয় সময়। যে দিন এ সময়ে কোনো জরুরি কাজ থাকে না সেদিনই তিনি ট্রামে চড়ে যান হাজরা মোড়। যাওয়া, ফিরে আসা আর একটু অপেক্ষা করা—সব মিলিয়ে দুটি ঘণ্টা লাগে। সময় কাটাবার জন্য তিনি পড়েন বই—সেসব বইয়ের ধরন আগেই উল্লেখিত হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসুর মতে পুরুষের চুল কাটা, দাড়ি কামানো—এসব সামাজিক কর্তব্য মাত্র। তার সঙ্গে তাদের প্রাণের যোগ নেই। কিন্তু মেয়েদের প্রসাধনের সঙ্গে আছে তাদের প্রাণের যোগ। সমাজের গণ্ডী সেখানে নেই। আনন্দ উচ্ছল প্রাণের লীলায় তাদের প্রসাধন হয় সুন্দর। একলা মেয়ের কেশচর্চা—শুকোনো থেকে বাঁধা পর্যন্ত পূর্ণতার প্রশান্তিতে অপরূপ। আর একদল মেয়ের চুল বাঁধার সময় হাসিতে, কটাক্ষে, অঙ্গভঙ্গিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে আনন্দ। এই আনন্দের যোগ নেই বলেই পুরুষের চুল কাটার দোকানগুলি এত গম্ভীর নীরস। রূপ সম্বন্ধে মেয়েরা বিনীত ও তৃপ্ত। পুরুষের মধ্যে আছে রূপের গোপন অহংকার। তাই সে আয়না দেখতে চায় না।

এই সব কারণে সেলুন-এ প্রাণের সচলতা অনুপস্থিত। নেই জিনিস ক্রয়ের সময়ের মতো কৌতূহল ও ঔৎসুক্য। পরস্পরের অপরিচিত কিছু ব্যক্তি একই ঘরে এমন বিষয়ে লিপ্ত যাতে তার মনের কোনো ভূমিকা নেই—আছে কেবল শারীরিক উপস্থিতি। তাই চুলকাটা লেখকের কাছে অস্বস্তিকর। দেহধারণের এই অনিবার্য দুঃখের জন্যেই তিনি পরজন্মে মেয়ে হওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তারপরই তাঁর মনে পড়েছে আজকাল মেয়েরাও চুল কেটে ফেলছে। তাই তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত সবচেয়ে দুঃখের দুটি ঘন্টা থেকে মুক্তি পাওয়ার এক মাত্র পথ—না জন্মানো।

চিন্তার নিজস্বতায়, প্রকাশরীতির স্বচ্ছন্দ সরসতায়, উপলব্ধির প্রাণময় ভাষ্য রচনায় এই নিবন্ধটি হয়ে উঠেছে সফল একটি রম্য রচনা।

১৯৪৬-এ ১৬ আগস্ট স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের দাবিতে মুসলিম লিগ-এর প্ররোচনায় কলকাতায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে শুরু হয়েছিল ভয়ংকর এক দাঙ্গা। হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন—বিবিধ নারকীয়তার কলঙ্কিত এই দাঙ্গা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে বাংলার অন্যত্র। এ বছরের অক্টোবর মাসে নোয়াখালিতে শুরু হয় এই দাঙ্গা। এখানে আক্রান্ত হয় হিন্দু নারীপুরুষ। গান্ধিজি দাঙ্গা থামানোর তাত্ত্বিক আলোচনা ছেড়ে স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ার পরিকল্পনা করেন। তদনুসারে তিনি কয়েকজন অনুগত সংগঠনকর্মী সহ বাংলায় আসেন ১৯৪৬-এর অক্টোবর-এ আর নোয়াখালি যান নভেম্বর-এ। মার্চ পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন এবং দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন স্থান ঘুরে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন।

এই প্রেক্ষিতেই রচিত হয় বুদ্ধদেব বসুর **'নোয়াখালি'** নিবন্ধটি। রচনাকাল ১৯৪৭। নিবন্ধটি দুটি ভাগে বিন্যস্ত। প্রথম ভাগে আছে নোয়াখালি সম্পর্কে স্মৃতিচারণ। বুদ্ধদেব বসুর জীবনের প্রথম তেরো বছর কেটেছিল নোয়াখালিতে। তখন তিনি স্কুলে পড়তেন না। নোয়াখালির মাঠঘাট আর প্রান্তরে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। তাঁর কৈশোর দৃষ্টিতে নোয়াখালির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিল অপরূপ। নারকেল-ঝাউ-সুপুরি-গাব-মাদার প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ সমাবেশে ঘন সবুজ হয়ে থাকত নোয়াখালি। গৃহস্থদের পরিষ্কার উঠোনে ফুটত নানা রঙের গাঁদা। অসংখ্য পুকুর আর ডোবা স্নিগ্ধ করেছিল নোয়াখালির আবহ। অঞ্চলটির পাশ দিয়ে বয়ে যেত ভীষণ এবং শ্রীহীন নদী মেঘনা। বছরের অর্ধেক সময় নদীটি হয়ে যেত প্রায় জলহীন। কিন্তু বর্ষা তাকে দিত প্রবল শক্তি। তার স্রোতের আঘাতে ভেঙে পড়ত পাড়। শহরের প্রায় অর্ধেক চলে গিয়েছিল তার গ্রাসে।

এরপর বুদ্ধদেব নোয়াখালি শহরের মানুষগুলির পরিচয় দিয়েছেন। শহরটিতে ছিল প্রায় বাঙালি হয়ে যাওয়া কিছু পোর্তুগিজ, স্থায়ী বাসিন্দা কয়েক ঘর বাঙালি গৃহস্থ আর কয়েকজন সরকারি চাকুরে। যেমন এস. ডি. ও., পুলিশ-ইন্সপেক্টর, পি. ডবলিউ. ডি.-র কর্তা প্রভৃতি। এঁদের প্রায় সকলেরই বদলির চাকরি। স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে ঈষৎ আত্মম্ভরী ছিলেন গুহ, গুহরায় আর রায়চৌধুরী পরিবার। এঁরা ছিলেন আধুনিকমনা। এঁদের ছেলেরা পড়ত কলকাতার কলেজে। ছুটিতে এসে শহর জুড়ে করত হইচই। টাউন হল-এ করত নাটক। ডাকযোগে আনাত নানা পত্র-পত্রিকা। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে এদেরই কেউ কেউ গিয়েছিল জেলে।

বুদ্ধদেব বসু বলেছেন শহরের বিখ্যাত কবিরাজ অশ্বিনীবাবুর কথা, তাঁর অঙ্কশিক্ষক যামিনী মাস্টার আর মুসলমান বন্ধুদের কথাও তিনি লিখেছেন।

এরপরে তিনি নোয়াখালির ভাষার বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। এ ভাষা বাংলা হলেও আপন বিশেষত্বে স্বতন্ত্র। ক্রিয়াপদে পৃথক প্রত্যয় যোগ ও উচ্চারণে অর্ধস্ফুট 'হ'-এর আধিক্য এ ভাষার বিশেষত্ব।

বুদ্ধদেব বসুর মনে প্রিয় শহর নোয়াখালির নগণ্যতা সম্পর্কে ছিল আক্ষেপ। তাই তিনি বলেছেন বাংলা চিরকালই উত্তর ভারতের কাছে অবজ্ঞেয় দেশ। সেই বাংলার মধ্যে পূর্ব বাংলা তথা বাঙাল দেশ আরও অবজ্ঞার পাত্র। পূর্ব বাংলার মধ্যে নোয়াখালির স্থান আরও নীচে। সংবাদপত্রে তার নাম মুদ্রিত হয় না। অথচ এখানে আধুনিক মানসিকতার মার্জিত, শিক্ষিত ভদ্রজনের অভাব নেই। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল নোয়াখালি। তবু তাকে গণনীয় মনে করেনি মানুষ। এই অখ্যাতি সহ্য হচ্ছিল না বুদ্ধদেব বসুর, তাই ১৯২২-এ নোয়াখালি ছেড়ে ঢাকায় পড়তে গিয়ে খুশি হয়েছিলেন তিনি।

১৯৪৬-এর হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার নগ্ন হিংস্রতায় অবসান ঘটল এই অবজ্ঞার। শুধু বাংলা বা ভারত নয়; সারা

পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল নোয়াখালির নাম। লন্ডন, নিউইয়র্ক-এর সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হল তার কথা। নারীত্ব এখানে লাঞ্ছিত হয়েছে তাই মেয়েদের মনে রক্তের অক্ষরে আঁকা হয়ে গেল নোয়াখালি। এমনই করে যেন নোয়াখালি নিল তাকে অবজ্ঞা করার প্রতিশোধ।

এরপরে নোয়াখালিতে এলেন গান্ধি। নোয়াখালি তার সব পাপ, সব হিংসা ধুয়ে ফেলে পবিত্র হল স্নিগ্ধ হল। নোয়াখালির রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর—এইসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্থান ধন্য হল গান্ধিজির আগমনে। এভাবেই নোয়াখালিতে—যেখানে মানবতা হয়েছিল ধ্বস্ত, সেখানেই ঘোষিত হল মনুষ্যত্বের জয়। সমকালের এক অখ্যাত স্থানে রচিত হল মনুষ্যত্ব কি বিনষ্ট হবে—চিরকালের এই প্রশ্নের চিরন্তন উত্তর। মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তি তার লোভ, হিংসা—এ সবের ইতিহাস, যুদ্ধ-পরের সারা বিশ্বে লেখা হচ্ছে। আর মানুষের মধ্যের দেব অংশ, পবিত্র অংশের প্রকাশ দেখা গেল একমাত্র নোয়াখালিতে। কারণ গান্ধিজি নোয়াখালির হিংসাধ্বস্ত মানুষগুলির মনে জাগিয়েছিলেন মনুষ্যত্ব, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা। এভাবেই গড়ে উঠল মানুষের দেবত্বের ইতিহাস।

নোয়াখালির দাঙ্গার জন্যই গান্ধিজি মুক্তি পেলেন স্বার্থসর্বস্ব রাজনীতির কূটচক্র থেকে, মানুষের দুর্দশা যাদের ব্যাবসার মূলধন তাদের হীন ষড়যন্ত্র থেকে; সভা, সমিতি, দল, দলপতি, তর্কবিতর্ক মন্ত্রণার বিষতিক্ত পরিবেশ থেকে। সংখ্যা, তথ্য ও আইনের স্থূলতা থেকে; লোভীর সঙ্গে নিহিত প্রতিযোগিতার ঘূর্ণি থেকে, মিথ্যা, মত্ততা, জননেতার অবশ্যম্ভাবী আত্মার বিনষ্টি থেকে নোয়াখালির দাঙ্গার জন্য মুক্ত হতে পারলেন তিনি।

জনতার নীতিহীন উন্মত্ততা সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের প্রাথমিক শর্ত। জননেতাকে মেনে নিতে হয় নীতিভ্রষ্টতা। তাই নেতা হওয়ার অর্থ চরিত্রচ্যুত হওয়া। সংঘবদ্ধভাবে মানুষ ভালো হতে পারে না। কেবল এককভাবে মানুষ হতে পারে সৎ আর মহৎ।

মানুষ তা বুঝতে পারে না। এমনকি পঁচিশ বছরের মধ্যে দুই বিশ্বযুদ্ধে সংঘবদ্ধ মানুষের বীভৎস রূপ দেখে আর যুদ্ধ-পরবর্তী স্থানীয় ছোটো ছোটো যুদ্ধ দেখেও মানুষের এ বিশ্বাস নষ্ট হয়নি যে রাজনৈতিক নেতারাই মানুষের উদ্ধারকর্তা। বাস্তব সত্য এই যে রাজনীতি মানুষকে দেয় পারস্পরিক হানাহানির অস্ত্র। তাকেই উজ্জীবনের উৎস বলে মানুষ ভুল করেছে। তার এই ভ্রান্তি আজও ঘোচেনি।

গান্ধিজি মুক্ত হয়েছেন এই ভ্রম থেকে। সারা জীবন স্বদেশের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন। আজ সে স্বাধীনতার সম্ভাবনায় হিংসার এমন উদ্বেলিত রূপ দেখে তিনি স্তম্ভিত হলেন। নিজেকে তিনি সরিয়ে নিলেন রাজনীতির কুটিলতা থেকে।

তিনি আশ্রম ভেঙে দিলেন, ত্যাগ করলেন সঙ্গীদের। সঙ্গীহীন হয়ে তিনি স্বীয় বিবেকের অনুসরণ করতে পারলেন। এভাবেই তিনি অর্জন করলেন পবিত্রতা। এই একক সাধনা তাঁর কর্মের প্রায়শ্চিত্ত। এ ছাড়া তাঁর জীবন-সাধনা ব্যর্থতা হত। তিনি মানুষকে নিয়ে যেতে চান সেই স্বর্গে যেখানে নেই কোনো হিংসা বা ঈর্ষা। সেখানে ভয় নেই বলে বীরত্ব অর্থহীন, লোভ না থাকায় ত্যাগ অনুপস্থিত; ক্রোধ না থাকায় নেই সংযম।

ব্যর্থতা নিশ্চিত জেনেও লুপ্ত হল না তাঁর আশা। তিনি নোয়াখালির দুর্গম পথে হেঁটে গেলেন। গ্রামের পর গ্রামে, দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি বাড়িতে তিনি গেলেন; অংশ নিলেন প্রত্যেকের দুঃখের। আটাত্তর বছর বয়সেও দৃঢ় দেহ আর আশ্চর্য শান্ত স্বভাব নিয়ে তিনি নোয়াখালির পথে বের হলেন। অহিংসার অগ্নিপরীক্ষা বা চিরস্থায়ী শান্তি স্থাপন করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাঁর কাম্য নয় রাজনৈতিক স্বর্গ—যা বহু মানুষের অতৃপ্ত কামনা আর ঈর্ষাকে তৃপ্ত করতে জন্ম দেয় যুদ্ধের। তিনি গড়ে তুলতে চান সেই স্বর্গ—কোনো কোনো মানুষ যার আভাসটুকু পায়। সে স্বর্গের পূর্ণ রূপ দান এবং তাকে রক্ষা করতে পারে এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে কম।

দাঙ্গা-বিদীর্ণ, অবজ্ঞাত নোয়াখালির জল-জঙ্গালে, পথের ধুলোয় গান্ধিজি গড়ে তুলেছেন সেই মানসিক শুদ্ধতার আর শান্তির স্বর্গ। তাঁর সেই সাধনাকে স্বীকৃতি দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে নোয়াখালি শুধু নয় পৃথিবী ধন্য হবে নোয়াখালির সামান্যতা ঘুচবে; সে হয়ে উঠবে অসামান্য।

৩.৩ উত্তরতিরিশ : মূল প্রবন্ধ

আমি এখন আছি তিরিশ আর চল্লিশের মাঝামাঝি জায়গায়। সেখান থেকে তিরিশ যত দূর, চল্লিশও প্রায় তা-ই। অবস্থাটাকে বলা যেতে পারে প্রৌঢ়ত্বের শৈশব। আমার জীবনে যৌবন যখন সদ্যোজাত, সেই রঙিন বছরগুলিতে তিরিশের ধূসর দিগন্ত একটা অস্পষ্ট বিভীষিকার মতো বোধ হতো। ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের উদাহরণে উৎসাহিত হয়ে মনে-মনে এও প্রার্থনা করেছি যে ঐ শোচনীয় পরিণাম আসন্ন হবার পূর্বেই আমার জীবনের যেন অবসান হয়। খেয়ালি নিয়তি আমার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেনি। ভাগ্যিশ করেনি!

আমাদের যে বয়স বাড়ছে তার অনুভূতি নিজের মধ্যে অনেক সময়ই স্পষ্ট হয় না। এই দেহটাকে অনেকদিন ধরে ভোগ করবার মাশুলস্বরূপ মৃত্যুর নানা অগ্রদূত যতদিন না জানানি দিতে শুরু করে, ততদিন বয়োবৃদ্ধির অনস্বীকার্য ঘটনাকে প্রায় ভুলেই থাকি। বিশেষ করে জীবনের মধ্যবয়সে চারদিকে কর্মের তরঙ্গ যখন উদ্বেল, তখন সে-দিকে মন দেবারই সময় থাকে না। পৃথিবীর সূর্য-পরিক্রমণের একটি অনভিপ্রেত কিন্তু নিশ্চিত ফল এই যে, আমার জন্মের তারিখটি প্রতি বছরেই ঘুরে-ঘুরে একবার এসে হাজির হবে; কিন্তু তার সমন্ধে বালকের আগ্রহ কিংবা চিরযৌবনলুব্ধা বিগতযৌবনার উৎকণ্ঠা কোনোটাই অনুভব করি না। সে জড়িয়ে ধরবার মতো ক্ষণিকের প্রণয়ী অতিথিও নয়, এড়িয়ে যাবার মতো ভয়ংকরও নয় সে; সে যেন কোনো বাল্যবন্ধু, পঁচিশ বছর আগে যার সঙ্গে খুবই ভাব ছিলো, কিন্তু অধুনা যার সঙ্গে যোগসূত্র গেছে ছিন্ন হয়ে, এখন কদাচ রাস্তায় দেখা হলে একটু মাথা নেড়ে আপন কাজের তাড়নায় নির্দিষ্ট পথে ধাবিত হই। ওর বাৎসরিক আবির্ভব যে যৌবনের চোর এবং জরা-মৃত্যুর দেহ-দেশ-ব্যাপ্ত পঞ্চমবাহিনী, সে-কথা তথ্য হিশেবে নির্ভুল বলে জানি, কিন্তু সত্য বলে অনুভব করি না।

তাই বলে এমনও নয় যে বয়স বাড়বার খবরটা আমরা একেবারেই ভুলে থাকতে পারি। মনে করিয়ে দেবার জন্য আছে বাইরের জগৎ। যেমন রেলগাড়ির ভিতরে বসে তার গতিটা উপলব্ধি করতে হলে তাকাতে হয় বাইরের বিপরীত ধাবমান গাছপালার দিকে, তেমনি বহির্জগতের পরিবর্তনের ছবি দেখেই আমরা অনুভব করতে পারি যে আমাদের বয়স বাড়ছে। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের যে-আন্তরিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে, প্রকৃতির যে-কোনো প্রক্রিয়ার মতোই তা এমন একটি নিখুঁত ছন্দে বাঁধা যে তা সহজে লক্ষ্যগোচর হয় না; আমাদের ছেলেপুলেরা যে বাড়ছে তা যেমন আমরা বুঝেও বুঝি না, তেমনি আমরা নিজেরা যে বদলাচ্ছি তাও নিজের কাছে স্পষ্ট হতে-হতে অনেকগুলো বছর কেটে যায়। মনে-মনে কেমন একটা ধারণা থাকে, এখনো সেই কলেজের ছাত্রই আছি বুঝি— এই তো সেদিন কম্পিত বক্ষে ম্যাট্রিকুলেশনের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েছিলুম। স্মৃতির ভেল্কিতে মাঝখানকার অনেকগুলো বছর ঝাপসা হয়ে আসে, জীবনের অতীতাংশ যতই বহরে বাড়তে থাকে, ততই দূর অতীতের কাছে চলে আসবার ঝোঁক দেখা যায়। বার্ধক্যে বাল্যস্মৃতিই হয় প্রিয়তম আলোচ্য। পূর্বজন্মের সংস্কার নিয়ে জীবন যখন অনায়াসে চলতে থাকে, এমন সময় একদিন দেখি সদ্য এম.এ.-পাশ করা ছেলেরা আমার কাছে এসে খুব সমীহ করে কথা বলছে। সাহিত্যে যারা নবাগত তাদের নতচক্ষু বিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। আরো বেশি মুগ্ধ হই, যখন দেখি আমার বিরুদ্ধে তরুণতরদের রসনা ও লেখনীর দুর্দম উদ্যম। তখনই বুঝতে পারি, আমার বয়স হয়েছে। যাদের সমবয়সী বলে গ্রহণ করেছি তাদের সঙ্গে আমার এক যুগের তফাৎ। সাহিত্যক্ষেত্রে এক যুগের তফাৎ প্রায়ই দুর্লঙ্ঘ্য, দু-তিন যুগ কেটে

গেলে আবার প্রশস্ত হয় মিলনের ক্ষেত্র। যে-আমি একদিন ছিলাম তরুণ লেখকদের মধ্যে তরুণতম, সেই আমাকে এখন থেকে তরুণদের হাতে ক্রমাগত মার খেতে হবে এ-কথা ভেবে কালরহস্যের বিচিত্রতায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। নবযুবকের দল যদি আমরা বিরুদ্ধতা না করতো, সেটা হতো প্রকৃতির বিরুদ্ধতা। পূর্ববর্তীকে এই আক্রমণ ওদের যৌবনের স্বাক্ষর, আর আমার আসন্ন প্রৌঢ়ত্বের অভিজ্ঞান।

এদিকে হয়তো একদিন দেখা হয় কোনো-একটি তরুণীর সঙ্গে—দস্তুরমতো ভদ্রমহিলা, বিবাহিতা, মাতা, সংসারের বিচিত্র বন্ধনে স্নিগ্ধ গম্ভীর। অবাক হয়ে খবর শুনি যে ইনি সেই বালিকা, যাকে মাতা-ঈভের সজ্জায় ধেই-ধেই করে লাফাতে দেখেছি। সেই সঙ্গে দেখি কলেজের সহপাঠিনীকে, সংস্কৃতের অধ্যাপক যাকে ভুল করে ডাকতেন বনশ্রী বলে, তার মুখে জরার সুস্পষ্ট মানচিত্র। তারপর হঠাৎ একদিন বন্ধুকন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র আসে। সব মিলিয়ে আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে আমি বয়স্ক; আমাকে বয়স্ক বানিয়ে ছাড়ে। নিজের ভিতরের পরিবর্তন সহজে ধরা পড়ে না, কিন্তু বহির্জগতের এই পরিবর্তনস্রোত বার-বার আমার মনের তটরেখায় ধাক্কা দিয়ে বলে যায় বয়স বাড়ছে, বুড়ো হতে চলেছো। তার পৌনঃপুনিক পরামর্শ শেষ পর্যন্ত আর অবজ্ঞা করতে পারি না, বয়স্কোচিত স্থৈর্য ও গাম্ভীর্যের ভাব ধরি; আমি-যে আর যুবক নই সে-কথা অনায়াসে মেনে নিই, এবং তার জন্য মনে কোনো দুঃখও হয় না।

অন্তত, আমার তো হয়নি। বরং যৌবনের ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে মধ্যবয়সের গভীর গম্ভীর একাগ্রতায় যে পৌঁছতে পেরেছি, এতে আমি আনন্দিত।

আমার মনে হয় যৌবনকে নিয়ে কবিরা চিরকালই কিছু বাড়াবাড়ি করেছেন। এত স্তব, এত স্তুতি, এত ছন্দ—সে কার উদ্দেশে? কত মুগ্ধ ভক্তের অর্ঘ্য-নিবেদন শতাব্দীর স্রোত পার হয়ে এসে পড়েছে কায়িক যৌবনের একটি মনোহারিণী প্রতিমার পায়ে, যার রূপের অনেকখানি কবিকল্পনা থেকেই আহরিত। আর যেহেতু কবিরা বেশির ভাগই পুরুষ, সেই প্রতিমা নারীদেহেরই অবয়ব দিয়ে গড়া। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, নারীদেহে যৌবনসমাগমের যে-ব্যঞ্জনাটি প্রাকৃতিক কারণেই সুনির্দিষ্ট, তারই বন্দনায় বিশ্বের কবিকুল মুখর। কবিদের পক্ষে খুব প্রশংসার কথা নয় এটা, কিন্তু কথাটা কি সত্য নয়?

তবে কবিদের পক্ষেও বলবার কথা আছে। যৌবনের যে-সংকীর্ণ সংজ্ঞা আমি দিয়েছি তা হয়তো তাঁরা সম্পূর্ণ মেনে নিতে রাজি হবেন না। তাঁরা হয়তো বলবেন: বিশ্বপ্রকৃতির আদিম প্রাণশক্তি যেখানেই অখণ্ডরূপে প্রকাশিত, সেখানেই আমাদের অভিনন্দন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে; সূর্যোদয় আমাদের মুগ্ধ করে, সমুদ্র আমাদের রক্তে ঢেউ তোলে, বসন্তে সবুজ গাছটির দিকে তাকিয়ে চোখে আমাদের পলক পড়ে না। মানুষের দেহে যৌবনবিকাশও সেই আদিম প্রাণশক্তিরই একটি উচ্ছ্বাস, তাই সে এত সুন্দর; সে-উচ্ছ্বাসের আধার যখন হয় নারী তখন আমাদের সর্বদেহমনের ব্যাকুলতা দিয়ে যে তার ভজনা করি তার কারণ প্রাকৃতিক হলেও নিতান্তই জৈব নয়। ওর সমস্তটাই সৃষ্টির আদিলীলার অন্তর্গত; যে-বিশ্বশক্তির টানের নদীতে জোয়ার আসে, বসন্তে ফুল ফোটে, এখানে আমরা তারই অধীন। কবিরা বলবেন, এ জিনিষটা ছোটো করে দেখো না। বস্তুর দিকে না-তাকিয়ে ভাবের দিকে চেয়ে দ্যাখো। কোনো বিশেষ-একটি মেয়ের দেহে যৌবনের আবির্ভাব একটা জীবতত্ত্বঘটিত তথ্য মাত্র, তা নিয়ে বিস্মিত কি উল্লসিত হবার কিছু নেই; কিন্তু বাসনার যে-বিপুল আলোড়ন সে নিজের অজানিতেই তার চারদিকে বিস্তার করে, যে-মোহ সে ছড়ায়, যে-স্বপ্নে সে জড়ায়, তারই বন্দনা যুগে-যুগে যদি আমরা না করি, তবে আমরা কবি কিসের। যৌবনের ক্ষয় আছে, কিন্তু সেই মোহ তো চিরন্তন, সেই মোহই তো আমাদের অনন্তযৌবনা উর্বশী।

কবিদের এ-কথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে পৃথিবীর কাব্যসাহিত্যে নিছক শারীরিক যৌবনের বন্দনার পরিমাণও

বড়ো কম নয়। বিশেষত, কবিরা নিজেরা যখন যখন সদ্যযৌবনাপন্ন, সেই সময়টার যৌবনের তথ্যকেই সত্যরূপে চিত্রিত করার ঝোঁক প্রবল হয়ে ওঠে। স্বয়ং শেক্সপিয়র কাঁচা বয়সে 'ভিনাস অ্যান্ড অ্যাডনিস' লিখেছিলেন। যৌবনই প্রাণীজীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতার সময়, এই ধারণাটি নানা ভাষায় কাব্যে বার-বার ফিরে-ফিরে এসেছে। 'The days of our youth are the days of our glory';—যখন জীবনতরণী অনুকূল হাওয়ায় পাল তুলে মৃদু তালে ভেসে চলে—'Youth at the prow and Pleasure at the helm',—তার সঙ্গে কি অন্য-কোনো অবস্থার তুলনা হয়! যৌবন যে ক্ষণিক, সে-বিষয়েও কবিদের বোধ তীব্র; তাই এই অচিরস্থায়ী স্বর্ণযুগটুকু হেলায় না-হারিয়ে তার যথোচিত সদ্ব্যবহার করো, এই পরামর্শ অনেকবারই তাঁরা দিয়েছেন। 'Gather ye rose-buds while ye may.' প্রৌঢ়ত্বের কাছাকাছি এসে হারানো যৌবনের জন্য বিলাপ করেছেন অনেক কবি— 'When we *were* young! Ah, woeful when!' রবীন্দ্রনাথও করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপের সঙ্গে একটি সূক্ষ্ম হাস্যের চকিত আভা ধরা পড়ে; যৌবন চলে যাচ্ছে তা ঠিক, কিন্তু আমি জানি ও যাবার নয়— তাঁর ভাবখানা যেন এই রকম। তাঁর যৌবন-বিদায় যে তাঁরই বর্ণিত প্রেমিকের বিদায়ের মতো—

ভাবছ তুমি মনে-মনে
    এ লোকটি নয় যাবার,
দ্বারের কাছে ঘুরে ঘুরে
    ফিরে আসবে আবার—

ওতে অনেকখানি ছল আছে। এ যেন সদর দরজায় বন্ধুকে বিদায় দিয়ে খিড়কির দোর দিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনা— তাই করুণ কাতর বিদায়বাণী বলতে গিয়েও মুখের হাসি চাপা থাকছে না। এইজন্য 'ক্ষণিকা'তে হাসি-কান্নার এই বিচিত্র বিজড়িত লীলা, এইজন্য পঞ্চাশোর্ধ্বে 'বলাকা'র অপরূপ যৌবনবন্দনা। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই যৌবনের তথ্যকে বড়ো করে দেখেননি, তার সত্যকেই দেখেছিলেন— সে-কথা স্পষ্ট বলা আছে 'চিত্রাঙ্গদা'য়; তাঁর সাধনা যৌবনের আয়ুর উদ্দেশে নয়, তার আত্মার উদ্দেশে, এবং সে-সাধনায়, আমরা সকলেই জানি, কী অসামান্য তাঁর সিদ্ধি। যৌবনের যে-পরশমণির স্পর্শ আছে 'বলাকা'য়, কোনো তরুণ রূপ-পূজকের সাধ্য নেই তা দিতে পারে। সত্তরের মোহনায় এসে তিনি প্রশ্ন করলেন:

যৌবন বেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি?

জবাব দিলেন নিজেই:

নহে, নহে, আছে তারা; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে ....

আশি বছরের রোগ-জর্জর দেহে যখন তিনি বন্দী, তখনও তাঁর মধ্যে দেখেছি যৌবনের এই উপলব্ধি। মানবজীবনে চিরযৌবনের যদি কোনো মানে থাকে সে তো এ-ই, এ ছাড়া আর কী? রবীন্দ্রনাথই প্রকৃতপক্ষে যৌবনের কবি—হেরিক নন, বায়রন নন, ভারতচন্দ্র নন।

তবে যৌবনের যেটা নিতান্ত দৈহিক দিক, তার নুন আমরা সকলেই কোনো না কোনো সময়ে খেয়ে থাকি, অতএব তার গুণ গাইবার লোক কোনোকালেই বিরল হয় না! তার আবির্ভাব দেহে-মনে এমন একটি জন্মান্তরকারী বিপ্লব আনে, যার সংঘাতে কবিতা ফুটবেই। আমি শুধু বলতে চাই যে ঐ অবস্থাটাকে কবিতায় যতটা সুখের বলে বর্ণনা করা হয় আসলে তা তত সুখের হয় না— অনেকের পক্ষেই হয় না। নবযৌবনের অকারণ পুলকের সঙ্গে

অনেকখানি অনর্থক দুঃখও জড়িত, যাদের স্বভাব কল্পনাপ্রবণ তাদের পক্ষে সে-দুঃখ প্রায় দুঃসহ হয়ে উঠতে পারে। একদিকে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, অন্য দিকে চারদিকের পাথরের দেয়ালে নির্ঝরের কপাল ঠুকে মরা। একদিকে আশ্চর্য জাগরণ, বিশ্বজগতের সঙ্গে সচেতন মনে প্রথম রোমাঞ্চকর পরিচয়, অন্য দিকে নিরন্তর আত্মনিপীড়ন, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংগতিস্থাপনের অক্ষমতাজনিত অফুরন্ত যন্ত্রণাভোগ। এক হিশেবে ষোলো বছরের ছেলের মতো দুঃখী আর নেই; তার নবজাগ্রত, বিনিদ্র আত্মচেতনা তাকে এক মুহূর্তের শান্তি দেয় না; তার চালচলন, হাবভাব, কথাবার্তা সবই কেমন খাপছাড়া; সামাজিক পরিবেশে সে অত্যন্ত অসংগত, এবং সে নিজেও তা জানে। তাতে তার দুঃখ বাড়ে বই কমে না। মনে মনে তার ধারণা যে পৃথিবীটাকে বদলে দেবার জন্যই সে এসেছে, কিন্তু তার ইচ্ছেমতো পৃথিবীর এক চুল বদল হচ্ছে না, সব দিকেই বয়স্কদের পাষাণ-রাজত্ব অটুট থেকে যাচ্ছে, এমনকি বাস্তব জীবনে সে নিজেও তার আদর্শকে সব সময় অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছে না, প্রায়ই ঘটছে স্খলন-পতন, এবং এ-নিয়ে তার মনে একটি তীব্র বিক্ষোভের তোলপাড় অবিশ্রান্ত চলেছে। শুধু তা-ই নয়, তার এই দুঃখে সে নিতান্ত নিঃসঙ্গ, কারণ দুঃখটা যে তার ঠিক কী নিয়ে, তা ধারণা করবার মতো পরিণত চিন্তাশক্তি তার নেই, তার উপর মুখের কথায় মনের ভাব প্রকাশ করবার কৌশলও সে শেখেনি। তাই ঠিক তার মনের কথাটি কাউকেই সে বলতে পারে না— খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও না— বোবা দুঃখের বোঝা অসহায়ভাবে বয়ে বেড়াতে হয়। যে-সব উপলক্ষে তার দুঃখের অনুভূতি প্রবল হয়ে ওঠে সেগুলি প্রায়ই তুচ্ছ— পরবর্তী জীবনে সে-সব স্মরণ করে হয়তো তার হাসি পায়—কিংবা পায় না। যাঁরা একেবারেই পাকা হিশেবিয়ানার উচ্চচূড়ায় অধিরূঢ় না হন তাঁদের পক্ষে হাসি না-পাওয়াই স্বাভাবিক, কারণ উপলক্ষটা যা-ই হোক, দুঃখটা তো বাস্তব, সেটাকে অস্বীকার করা যায় না। শিশু তার পুতুলের পা ভাঙলে কাঁদে, আমাদের চোখে কারণটা অতি তুচ্ছ, কিন্তু তাই বলে তার দুঃখটা তো কম নয়। সে-দুঃখের স্থায়িত্ব হয়তো অল্প, কিন্তু তীব্রতা খুবই বেশি। শেলির বিষয়ে লিখতে গিয়ে ফ্রান্সিস টমসন ঠিকই বলেছিলেন যে শিশুর দুঃখ যেমন ছোটো, শিশুও তো ছোটো। ছোটো মানুষের পক্ষে ছোটো দুঃখের নিপীড়নই দুঃসহ। কথাটা এত সত্য যে বলবার যোগ্যই হতো না, যদি-না দেখা যেতো যে ব্যবহারি জীবনে আমরা প্রায়ই এটা ভুলে থাকি।

নবযৌবনের এই যে ছবি আমি আঁকলুম তা সকল বয়স্কজনের স্মৃতির সঙ্গে মিলবে কিনা জানি না। আমি অবশ্য আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। হয়তো আমি অত্যন্ত বেশি ভাবপ্রবণ ছিলুম বলে অত্যন্ত বেশি কষ্ট পেয়েছি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমার বয়স যখন আঠারোর অঞ্চলে, আমি মনে-মনে এ প্রার্থনা জানিয়েছি— ঈশ্বর, আমাকে খুব চটপট বুড়ো করে দাও, তাহলে বাঁচি। এ-প্রার্থনায় আন্তরিকতার অভাব ছিলো না, কেননা চারদিকে তাকিয়ে দেখেছি বয়স্কদের প্রশান্ত নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা; তারা খায়-দায়, আপিশ করে, ঘুমোয়, কিছু নিয়ে ছটফট করে না— এদিকে আমি কত-কিছু নিয়েই দিন-রাত জ্বলে-পুড়ে মরছি। সে-বয়সেও এটা বুঝেছিলাম যে আমার অতি-তারুণ্যই আমার এই যন্ত্রণাভোগের হেতু, বুড়োদের যত্ না মুখে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছি, মনে-মনে তাদের হিংসে না-করেও পারিনি। আমার সেই কাঁচা বয়সের মন ছিলো এত বেশি অনুভূতিশীল যে সেটা প্রায় একটা ব্যাধির মতো, যে-কোনো দিক থেকে একটুখানি হাওয়া দিলেই আমি উদ্দাম হয়ে উঠতুম, নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতে নিজেকে এক-এক সময় মনে হতো ঝড়ের ঝাপটা-খাওয়া ক্ষতবিক্ষত জাহাজের মতো।

বেঁচেছি। যৌবনের উত্তাল জলরাশি পার হয়ে এসেছি, প্রৌঢ়ত্বের শান্ত দিগন্ত দেখা যাচ্ছে চোখের সামনে। যদি দেবতা এসে বর দিতে চান— তোমাকে আবার আঠারো বছরের যুবা করে দিচ্ছি, আমি হাত জোড় করে বলবো, দোহাই তোমার প্রভু, বর ফিরিয়ে নাও। আঠারো হবার দুঃখ একবার যে পেয়েছে, সে কি আবার সেখানে ফিরে যেতে চাইবে! অনেকে বলেন, আহা, শিশুরা কী সুখী! যদি আবার শিশু হতে পারতুম! কথাটা মোটেও চিন্তা করে বলেন না। শিশুর মন সচেতন নয়; তার কল্পনা আছে, চিন্তা নেই; তাই তার সুখ-দুঃখ কুয়াশার মতো ব্যাপ্ত কিন্তু

অনবয়ব; আর বয়স্কদের শাসনের শিশুর জীবন এমন আষ্টে-পৃষ্ঠে বিজড়িত যে আমার তো মনে হয়, তার জীবনে দুঃখের ভাগই বেশি। বেচারারা কি ইচ্ছেমতো দেয়ালে ছবি আঁকতে পারে, না কি সোফার কাপড় কাটতে কিংবা নিজেদের হাত-পা ভাঙতেও পারে! এমনকি তারা রেলগাড়ির জানালার ধারে বসলেও আমরা হৈ হৈ করে উঠি। নিজস্ব দেহে কিংবা পৈতৃক সম্পত্তির যেটুকু ভাঙচুর তারা করে উঠতে পারে, সে নেহাৎই বয়স্কদের কঠিন প্রহরী-দৃষ্টি এড়িয়ে, এবং বিধাতার অবিমিশ্র আশীর্বাদে। কোনোরকমে যে একবার সাবালক হয়ে উঠতে পেরেছে, সে যে কী করে আবার শৈশবে ফিরে যাবার ইচ্ছ প্রকাশ করতে পারে, আমার তা কল্পনার অতীত। ঠিক তেমনি অবিশ্বাস্য মনে হয় যখন বয়স্ক লোক তারুণ্যের উন্নত্ততায় আরো একবার ঝাঁপ দিতে চায়।

তারুণ্যের উন্নাদনা শেষ হয়েছে, বেঁচেছি। জীবনের মধ্যবয়সের স্থৈর্য এসেছে, বেঁচেছি। যে-কোনো ক্ষণিক আকস্মিক হাওয়ায় আর আন্দোলিত হতে হয় না। একটি মুহূর্তের একটি অনুভূতি আর মনকে কান ধরে নাচিয়ে বেড়াতে পারে না। যখন-তখন যে-কোনো কারণে-অকারণে চিত্তবিক্ষেপ আর ঘটে না, হাতের কাজে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হতে পারি, এদিকে অবকাশসম্ভোগের আনন্দকেও খামোকা মন-খারাপের হাওয়া এসে মলিন করতে পারে না। রাগ চাপতে শিখেছি, শিখেছি উদ্যত অভিমানকে এক চড়ে দাবিয়ে দিতে, ফুটো কলসি থেকে জলের মতো ভালোবাসা আর যেখানে-সেখানে ঝরঝর করে ঝরে পড়ে না। তুচ্ছকে তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করার শক্তি পেয়েছি। জীবনে দুঃখের ভাগ আশ্চর্যরকম কমে গিয়েছে। সেই সঙ্গে সুখও কি কমেছে? না তো।

আমার বিশ্বাস জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবন নয়, জীবনের মাঝামাঝি অবস্থাটাই সবচেয়ে ভালো। আমি নিজে আপাতত ঐ অবস্থায় এসে পড়েছি বলেই যে তার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করছি, তা নয়; শুনতে পাই বর্তমানকে অবজ্ঞা করে অতীতের অতিরঞ্জিত স্তাবকতা করাই মনুষ্যস্বভাব। তার উপর জীবন যখন মধ্যদিনে, তখন ভোরবেলার সোনালি আলোর জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলাই সাহিত্যের ঐতিহ্যসংগত। কিন্তু সত্যি বলছি, এই সময়টাতেই জীবন সবচেয়ে উপভোগ্য, অন্তত আমার তো তা-ই বোধ হচ্ছে। দেহের ও মনের, ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির পরিপূর্ণ শক্তির আমি এখন অধিকারী, জরার আভাসমাত্রা পাওয়া যাচ্ছে না; অথচ সে-শক্তি যেখানে-সেখানে ডন কুইক্সোটীয় চালে অন্ধ বেগে ধাবিত হচ্ছে না, তাকে সংহত রেখে তার যথাসম্ভব সুমিত প্রয়োগের বিদ্যা আমার শেখা হয়েছে। কাঁচা বয়সে জীবন ছিলো গুরুজনের শৃঙ্খল জড়িত; এখন আমি স্বাধীন, নিজের জীবিকা একান্তরূপে নিজেই উপার্জন করি, আমার উপর কথা বলবার কেউ নেই। এই স্বাধীনতা যে কত আনন্দের তা কেমন করে বোঝাই। স্বোপার্জিত অন্নের প্রথম স্বাদ আমার মনে এনেছিলো এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, সে-রোমাঞ্চ এতদিনের অভ্যাসের চাপেও একেবারে নষ্ট হয়নি। জীবিকা-অর্জনের যে-পরিশ্রম ও বিরক্তি সেটা কখনোই যে নিপীড়ক বলে বোধ হয় না তা বলবো না, কিন্তু মোটের উপর ওটাকে আমি কিছু মনেই করিনে, তার বিনিময়ে যে-স্বাধীনতা পেয়েছি তাতে ক্ষতিপূরণ হয়েও অনেকখানি হাতে থাকে। তার উপর, আমি বিশেষভাবে ভাগ্যবান, কারণ আমার জীবিকার কিছু অংশ আমার আনন্দের সঙ্গে মিলিত; আমাকে যে সব সময়ই নিরানন্দ অপ্রিয় কাজ করতে হয় না এ-জন্য নামহীন অদৃষ্টের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা স্বতই উচ্ছ্বসিত। এই সাহিত্যরচনা আমার জীবিকাও বটে, আনন্দও বটে; আমার কাজের আর খেলার স্রোত এখানে এক হয়ে গেছে, এবং আধুনিক জগতে কাজে যার আনন্দ সে-ই তো ভাগ্যবান।

তরুণ বয়সে মনে-মনে ভয় ছিলো যে প্রৌঢ়ত্বের প্রভাবে আমারও হৃদয়বৃত্তি হয়তো নিঃসাড় হতে আরম্ভ করবে। কিন্তু এখন দেখছি যে তা তো হলো না। অনেকেরই হয়—আবার কারো-কারো হয়ও না; কেন হয় না, সে-আলোচনায় গিয়ে কাজ নেই। বিশ্বজগতের সঙ্গে এখন আমার কী সম্বন্ধ, সেটা স্পষ্ট করে বোঝবার যখন চেষ্টা করি, তখন দেখতে পাই যে নবযৌবনের শক্তি তার অমিত অনুভূতিশীলতায়, তার দুর্বলতা তার ভারসাম্যের, তার মাত্রাজ্ঞানের অভাবে। আর পরিণত বয়সের শক্তি তার সংযমে, তার বুদ্ধির বলশালিতায়, তার দুর্বলতা তার হৃদয়বৃত্তির

ক্ষীণতায়, তার উৎসাহের রক্তহীনতায়। 'If youth could and age would!' এই তো চিরকালের আক্ষেপ। কিন্তু একটা অবস্থা নিশ্চয়ই আছে যখন উভয়শক্তির মিলন হয়, নয়তো পৃথিবীতে এত বড়ো-বড়ো কাজ সম্পন্ন হতে পারতো না। সেটাই মধ্যবয়স।

দেখতে পাচ্ছি পৃথিবী সম্বন্ধে আমার কৌতূহল, আমার আনন্দবোধে এখনো মরচে পড়ার লক্ষণ নেই। অশিথিল উৎসাহ নানা কর্মস্রোতে প্রবাহিত। কাঁচা বয়সের অনুভূতির প্রবলতা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তার প্রয়োগবিদ্যা তখনও অনায়ত্ত, তাই ও-বয়সে ভালো কবিতা লেখা সম্ভব হলেও অন্য কোনোদিকেই কাজের মতো কাজ প্রায় কিছুই হয়ে ওঠে না। নবযৌবনের বিপুল ব্যর্থতা প্রকৃতিরই নির্দেশ, অনেকখানি অপব্যয় না-করে প্রকৃতি কিছুই গড়তে পারে না; মানুষের দেহ যেমন বহু শতাব্দীব্যাপী অমিতব্যয়ী বিবর্তনের ফল, তেমনি শৈশব-যৌবনের বিস্তর বাজে খরচের ফলেই মানুষের পরিণত মন গড়ে ওঠে। এখন আমার অনুভূতির সঙ্গে মিলেছে পর্যবেক্ষণ; উৎসাহের উচ্ছলতা বুদ্ধির দৃঢ়তাকে অঙ্গীকার করে নিয়েছে; প্রতিদিনের হাতে এই শিক্ষাই আমি পাচ্ছি কেমন করে মনের সচেতনতাকে, হৃদয়ের সংবেদনাকে জীবনক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয়— আর এখানেই নবযুবকের উপর আমার জিৎ। বিশ্বপ্রকৃতিকে যেন এইমাত্র প্রথম দেখলুম, নবযৌবনে এই আনন্দ অস্পষ্ট ভাব-নীহারিকার আকারে মনের আকাশ আচ্ছন্ন করে রাখে; সে-আনন্দ অনেকটা নিপীড়নেরই মতো, তার বিদ্যুৎ-ময় স্পর্শ প্রায় শ্বাসরোধকারী। এখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার দেখাশোনা প্রতিদিনের নতুন আলোয়, প্রতি মুহূর্তের নতুন কোণ থেকে, সেটা কেবলই একটা ভাব আর নয়, সেটা রূপ; তাকে শুধুই অনুভব করি না, তাকে চোখেও দেখি। এই দেখার পটভূমিকায় আছে অতীত জীবনের সঞ্চিত অচেতন অভিজ্ঞতা; তারই আলোয় বস্তু স্পষ্ট আকার নেয়, যা ছিলো হাওয়া তা হয়ে ওঠে ছবি। অল্প বয়সের বাষ্পাকুল মন কিছুই দ্যাখে না, শুধু অনুভব করে— তাই তার আনন্দের মধ্যে দুঃখের পরিমাপ এত বৃহৎ।

সেই ভাববিহ্বল তারুণ্যের লীলা আজ আমার আশেপাশে চোখ মেলে দেখছি, আর মনে-মনে হাসছি। সে-হাসি ঈর্ষার নয়, করুণার নয়, ব্যঙ্গের নয়, সে-হাসি ভালোবাসারই। ওর মধ্যে আমারই অতীতের ছবি দেখতে পাচ্ছি, ওখানে চলেছে আমরাই পুনর্জন্ম, এদিকে আমি নির্লিপ্ত হয়ে কোণের আসনটিতে বসে দেখছি। এর চেয়ে উপভোগ্য অবস্থা আর কী হতে পারে? কোনো সন্দেহ নেই, এই সময়টাই জীবনের শ্রেষ্ঠ। এই অবস্থায় আরো কুড়ি বছর হয়তো কাটাতে পারবো, এমন আশা করা অন্যায় নয়। আরো কুড়ি বছর! আরো কত ঐশ্বর্য, আরো কত পরিণতি, আরো কত সার্থকতা! আনন্দে-উৎসাহে আমার বুক ভরে উঠছে। জীবনের জয় হোক! কত নতুন দিগন্ত আমার চোখের সামনে কাঁপছে, পূর্ণতার সম্ভাবনায় অচেতন মনের বিশাল অরণ্যে কত আলোড়ন।— কিন্তু অচেতনকে এখনই আহ্বান করবো না; যা প্রচ্ছন্ন তা প্রচ্ছন্নই থাক, যথাসময়ে তা প্রকাশিত হবে। আপাতত আমি আমার এই সদ্য-আগত মধ্যজীবনকে আমার নবীন প্রৌঢ়ত্বকে স্বাগতসম্ভাষণ জানাই, সাদরে সানন্দে তাকে বরণ করি; সে আমাকে ধন্য করেছে, পূর্ণ করেছে, আশা করি আমিও তাকে কিছু ফিরিয়ে দিতে পারবো। আপাতত আমার নতুন-পাওয়া শিশু-বয়স্কতার গৌরবে শীতের এই সকালবেলার রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে আমি বসলুম— জীবনের স্রোত চোখের উপর দিয়ে ভেসে যাক, আমি চুপ করে দেখি।

৩.৪ 'উত্তরতিরিশ'-এর নির্মাণশিল্প

রম্য রচনা প্রবন্ধেরই শাখা। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বর্তমান গঠনগত প্রভেদ। প্রবন্ধ তন্ময় রচনা। রম্য রচনায় প্রাধান্য পায় মন্ময়তা। প্রবন্ধে প্রতিপাদ্য বিষয়কে লেখক তথ্য, যুক্তি সহযোগে বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন; রম্য

রচনায় কোনো তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয় লেখকের মনের নিভৃত চিন্তাসমূহ। বিবিধ উদাহরণ দ্বারা মনোগ্রাহী ভাষায় লেখক তাদের লিপিরূপ দান করেন।

প্রবন্ধের গঠন সংহত। রচয়িতার ব্যক্তিমনের প্রকাশ সেখানে অনুপস্থিত। রম্য রচনা অনেকটা শিথিল গঠন; লেখকের মানসিক অনুভব এখানে অনায়াসে স্থান করে নেয়। কিন্তু মননগভীরতা ভিন্ন অনুভবের স্বচ্ছন্দ রূপদান সম্ভব নয়। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন তীক্ষ্ণ মনন ও গভীর অনুভব-ক্ষমতার অধিকারী। 'উত্তরতিরিশ'-এর কুড়িটি নিবন্ধে রম্য রচনার এই সব শর্ত সে কারণেই রক্ষিত হয়েছে। লেখক বুদ্ধদেব বসুর অনুভূতির জগতে যে সব বিষয় এবং ঘটনা আলোড়ন তুলেছে তাদের স্বচ্ছন্দ, হৃদয়বেদ্য ভাষারূপ লক্ষিত হয় এই কুড়িটি রচনায়। এই সব নিবন্ধের মধ্যে একান্ত ব্যক্তিগত নিবন্ধ যেমন আছে তেমনই আছে বিশেষ ঘটনাকেন্দ্রিক অনুভব-নিবিড় লিখন। সব প্রবন্ধেই নিবিড় চিন্তন ও প্রগাঢ় অনুভব-শক্তির যথার্থ সমন্বয় লক্ষ করা যায়।

দুটি নিবন্ধের আলোচনা দ্বারা আমরা বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করব। আপাত-তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে গভীর অনুভবের চিত্রণ হিসেবে উল্লেখ্য নাম-নিবন্ধ 'উত্তরতিরিশ'। এ নিবন্ধে তিরিশোত্তীর্ণ লেখক প্রৌঢ়ত্বের মহিমা উদাহরণ এবং বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ চেষ্টা বিফল হয়নি। লেখক পুরো বিষয়টি আপন অনুভবের ভিত্তিতে উপস্থাপিত করেছেন। বিষয়টি কিন্তু অভিনব। প্রৌঢ়ত্বের ইতিবাচক দিকগুলি যেভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে এ নিবন্ধে তা পূর্বে বা পরে হয়েছে বলে মনে হয় না।

লেখক বুদ্ধদেব বসুর মতে যৌবনে আবেগ আর উচ্ছ্বাসের অতিরেক লক্ষিত হয়। তুচ্ছ ঘটনা মনকে করে বিচলিত আর বেদনার্ত। পরিণামে গঠনমূলক সৃষ্টি হয় দুরূহ। প্রথম যৌবনে মানুষ স্বভাবত থাকে অভিভাবকের অধীন। ফলে তার আচরণ-বিচরণ হয় শৃঙ্খলিত।

প্রৌঢ়ত্বে আবেগের তরলতা অপগত হয়। তার সঙ্গে থাকে মানসিক স্থৈর্য। ফলে দুঃখ-যন্ত্রণাকে নিয়োজিত করা যায় সৃষ্টিমূলক কর্মে। বার্ধক্যের সামগ্রিক অবসন্নতা প্রৌঢ়ত্বে থাকে না অথচ থাকে স্বনিয়ন্ত্রিত জীবনের সুখ। এই সব কারণে বুদ্ধদেব প্রৌঢ়ত্বকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বলে মনে করেছেন।

তাঁর এ সিদ্ধান্ত তিনি পর্যায়ক্রমে উপস্থাপিত করেছেন। প্রৌঢ়ত্বে স্বীয় অনুভবের বর্ণনা, বয়োবৃদ্ধি সম্পর্কে পরিস্থিতি মানুষকে কেমন করে সচেতন করে দেয় তার উদাহরণসহ বিশ্লেষণ যথেষ্ট মনোগ্রাহী। পাশাপাশি যৌবন সম্পর্কে বিভিন্ন কবি এবং রবীন্দ্রনাথের যৌবনভাবনার বিশ্লেষণ প্রবন্ধটিকে সমৃদ্ধ করেছে। স্বীয় তীক্ষ্ণ সংবেদনশীল মনের অনুভব-অভিজ্ঞতা দিয়ে বুদ্ধদেব যৌবনের দুঃখময় দিকটির বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রৌঢ়ত্ব সম্বন্ধে আপন যুবক বয়সের চিন্তা আর বাস্তব অনুভবের বিশ্লেষণের পর নিবন্ধটি সমাপ্ত হয়েছে প্রৌঢ়ত্ব বন্দনায়।

নিবন্ধটিতে নেই দৃঢ় সংহতি। যুক্তি-তথ্যের তুলনায় অনুভবের ঈষৎ এলায়িত উপস্থাপন লেখাটিকে করে তুলেছে মনোরম। এ নিবন্ধটিকে বলা যায় স্বগত চিন্তার ভাষারূপ। লেখকমানসের অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভাসই রচনাটিকে করে তুলেছে আকর্ষক।

সম্ভবত এ ধরনের অনুভব-গাঢ় নিবন্ধ রচনা কবির পক্ষেই সম্ভভব। ব্যক্তি-অনুভবের এমনই রম্য চিত্রণের আর একটি দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' সংকলনের নিবন্ধসমূহ। বুদ্ধদেবের প্রিয় লেখক রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে তাঁকে প্রভাবিত করেছেন—এ সম্ভাবনা একেবারে নস্যাৎ করা যায় না।

একান্ত ব্যক্তি অনুভবের মনোজ্ঞ রূপায়ণ 'সবচেয়ে দুঃখের দু-ঘণ্টা' নিবন্ধটি। সেলুন-এ গিয়ে চুল কাটার মতো

তুচ্ছ বিষয় এখানে আকর্ষক হয়ে উঠেছে উপস্থাপন-কৌশলে এবং লেখকমনের স্পর্শে। প্রসঙ্গত মেয়েদের চুল বাঁধার একক ও দলবদ্ধ রূপ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ভাষায় রূপ পেয়েছে নিবন্ধটিতে।

ঈষৎ শিথিলভাবের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপের সুর আর নিভৃত চিন্তার অনবদ্য সমন্বয় লক্ষিত হয় 'উত্তরতিরিশ' সংকলনের প্রতিটি নিবন্ধে। এখানেই রম্য নিবন্ধ-রচয়িতা বুদ্ধদেবের কৃতিত্ব। তাঁর রম্য নিবন্ধের উৎস অনুভব-বিন্দু। সেই বিন্দুটিকে কেন্দ্র করে তাঁর চিন্তাদ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়েছে। তুচ্ছ বিষয় তাঁর অনুভব-গভীরতার স্পর্শে হয়ে উঠেছে মূল্যবান। আবার অপেক্ষাকৃত গভীর-গম্ভীর বিষয়ও তাঁর পরিবেশন-গুণে হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ এবং সুন্দর।

ভাষা : 'আমার যৌবন' নামের স্মৃতিকথায় বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন (পৃ. ৬৪) তাঁর ভাষা চিন্তার দ্বারা নির্মিত—"কলকাতায় এসে নানা জেলার বুলি শুনছি আমি, কুড়িয়ে পাচ্ছি অনেক নতুন মৌখিক শব্দ—আর এমনি করে, কানে শুনে-শুনে, নানান জাতের বাংলা বই পড়ে পড়ে, অনেক বর্জন ও স্বীকরণের মধ্য দিয়ে আমি গড়ে তুলছি সেই ভাষা—অন্তত তার কাঠামো—আজ দীর্ঘ কাল ধরে আমি যাতে কথা বলছি বই লিখছি।" এইভাবে বুদ্ধদেব গড়ে তুলেছেন একান্ত নিজস্ব একটি ভাষা। এ ভাষা বিষয় অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় না। রম্য নিবন্ধ আর বিষয়-গম্ভীর প্রবন্ধ—দুই ক্ষেত্রেই তিনি ব্যবহার করেছেন একই ভাষা।

সূক্ষ্ম জটিল চিন্তা আর অনুভবের স্পন্দন প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন বুদ্ধদেব বসু। তাই বুদ্ধিদীপ্তির সঙ্গে কাব্যময়তার মিশ্রণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর রম্য নিবন্ধের ভাষা।

তাঁর গদ্য ভাষার ভঙ্গি ও অন্বয়ে ইংরেজির প্রভাব আছে। তার সঙ্গে তৎসম-প্রবণতা আর বাংলা ভাষার চলিত বাগ্‌ধারা, যেমন 'পাত্তা পাওয়া', 'খেই হারানো' প্রভৃতির মিশ্রণের কারণে জটিল বাক্য (বহু বাক্যের সমাহার ও বিন্যাস) ব্যবহারের পক্ষপাতী হলেও তাঁর ভাষা হতে পেরেছে মনোরম ও আকর্ষক। অন্তরঙ্গ আলাপের ধরনে গঠিত তাঁর গদ্যরীতি সহজেই পাঠকের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে পারে। পরিমিতিবোধ ও শব্দসচেতনতা বুদ্ধদেব বসুর ভাষার বিশেষত্ব। ভাব প্রকাশের কারণে তিনি তৎসম, তদ্ভব ও ইংরেজি শব্দের মিলিত ব্যবহারে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

বিশেষ্য-বিশেষণের সঙ্গে ভাবার্থে 'তা' প্রত্যয় ব্যবহার ('ব্যক্তিতা', 'নিষ্প্রদীপকতা') দুটি শব্দের যোগে নতুন শব্দ নির্মাণ ('সিনেমাচঞ্চল', 'কটকট-শব্দিত'), নতুনভাবে পরিচিত শব্দ-ব্যবহার, ('নিঃশাসন উল্লাস', 'একরোখা আত্মচেতনা'), বিদেশি শব্দের আক্ষরিক ভাবানুবাদ ('রাজন্যজয়িত' (রয়াল)), 'ঝোপ-কামিজ' (বুশ-শার্ট), বিশেষণের নতুন প্রয়োগ ('ন্যাকামি নিপুণ', 'অসেতুসম্ভব') বুদ্ধদেব বসুর ভাষার বিশেষত্ব। 'উত্তরতিরিশ'-এর নিবন্ধগুলিতেও লক্ষিত হয় তাঁর এই সব ভাষা-বিশেষত্ব। সব মিলিয়ে এ গ্রন্থে অনুভবের প্রাণময় রূপায়ণে সফল তাঁর ভাষা। 'উত্তরতিরিশ' সংকলনের 'ব্ল্যাক-আউট' নিবন্ধের কিছু অংশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত হল।

"এই নিষ্প্রদীপকতার আদেশে যেন অন্ধকারের পুনরুজ্জীবনের উৎসব শুরু হলো। আজকাল সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ থেকে স্নিগ্ধ চিক্কণ অবলুপ্তি নামে, নিজের বাড়ি হাৎড়ে খুঁজে ফিরি, ... বাড়িগুলি বেশিরভাগ গা-ঢাকা দিয়ে চুপ।" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালের ব্ল্যাক-আউট-এর এমন অনুভব-উদ্ভূত সপ্রাণ বর্ণনা খুব কম লেখকের লেখাতেই পাওয়া যায়। বস্তুত এই প্রাণময় প্রাঞ্জলতাই 'উত্তরতিরিশ'-এর নিবন্ধ-ভাষার বিশেষত্ব। বিষয় ও মাধ্যমের এই সুষম অন্বয়ে সমৃদ্ধ এ গ্রন্থের নিবন্ধ-ভাষা। উদ্ধৃত অংশটি তারই প্রমাণ।

৩.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। কোন ধরনের প্রবন্ধকে রম্য রচনা নাম দেওয়া হয়েছে? 'উত্তরতিরিশ' গ্রন্থের নিবন্ধগুলিকে কি সার্থক রম্য রচনা বলা যাবে? যুক্তিসহ উত্তর লিখুন।

২। ‘উত্তরতিরিশ’ গ্রন্থের দুটি নিবন্ধ অবলনে রম্য নিবন্ধের বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। ‘উত্তরতিরিশ’ গ্রন্থের নিবন্ধ সমূহ ব্যক্তিমনের স্পন্দনের লিপিরূপ—উক্তিটি উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করুন।

৩.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। বুদ্ধদেব বসু : মননে অন্বেষণে—সম্পাদক তরুণ মুখোপাধ্যায়

২। বুদ্ধদেব বসু : নানা প্রসঙ্গে—সম্পাদক আনন্দ রায়

৩। বুদ্ধদেব বসু—সুদক্ষিণা ঘোষ

৪। আমার ছেলেবেলা—বুদ্ধদেব বসু

৫। আমার যৌবন—বুদ্ধদেব বসু

৬। আমাদের কবিতাভবন—বুদ্ধদেব বসু

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE